# গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার

## বীরেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

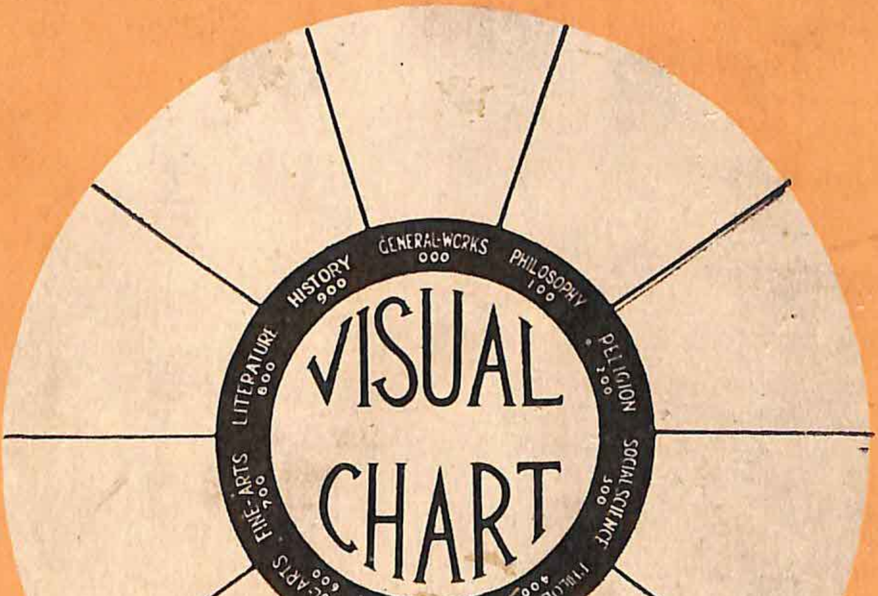


বুকস এণ্ড পিরিওডিক্যালস (পাবলিশিং হাউস)

"বহুদিন পর বীরেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "গ্রন্থ ও গ্রন্থগার" বইখানা পড়ে মনে হ'লো, এই পশ্চিমী বিদ্যাটিকে দেশীয় বিদ্যায় রূপান্তরিত করবার একটা সজাগ চেষ্টা বোধ হয় এতদিনে শুরু হ'লো। পশ্চিমী গ্রন্থাগার বিদ্যার পাঠ বীরেনবাবু নিয়েছেন, অন্যান্য অনেকের মতই। বহুদিন তিনি বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে উপ-গ্রন্থাগারিকের কাজও করেছেন। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তিনি তাঁর অধীত, আহৃত ও অভ্যস্ত বিদ্যাকে নিজের বুদ্ধি ও কল্পনা, জীবন ও কর্মের সঙ্গে জড়িয়ে নিজের মতন করে নূতন করে ভেবেছেন, সেই ভাবনাকে নিজের ভাষায় পরিবেশন করেছেন। তিনি বাংলা লিখতে জানেন নিজের বক্তব্য সাজিয়ে গুছিয়ে কি করে বলতে হয় তা জানেন তা ছাড়া, তার বক্তব্য ও সাজানো গুছানোর মধ্যে তাঁর নিজস্ব চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীর মুদ্রণ সুস্পষ্ট।

আমার আশা ও বিশ্বাস, বীরেন বাবুর এই বইখানা বাংলা দেশে গ্রন্থাগার বিদ্যার প্রসারে একটি নতুন পথের সন্ধান দেবে।"

নীহার রঞ্জন রায়

মূল্য—পঁয়ত্রিশ টাকা

This book was taken from the Library of Extension Services Department on the date last stamped. It is returnable within 7 days.

3736

# গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার

( সমগ্র গ্রন্থাগার বিজ্ঞান )

বীরেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

উপগ্রন্থাগারিক, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।

02
বন্দ্যো

INSTITUTE OF EDUCATION FOR WOMEN
3736
Dept. of Extension Services.
8.1.82
CALCUTTA-27

বুকস এণ্ড পিরিওডিক্যালস ( পাবলিসিং হাউস )
রবীন্দ্রনগর :: মেদিনীপুর
১৯৭৭

Grantha 'O' Granthagar
by Beerendra Ch. Bandhapadhya
(c) বীরেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রথম মুদ্রণ—১৯৭৭

প্রকাশক—
অশোক রায়
বুকস এণ্ড পিরিওডিক্যালস
(পাবলিশিং হাউস)
রবীন্দ্রনগর,
মেদিনীপুর।

মুদ্রণে—
ছাপালেখা
রবীন্দ্রনগর,
মেদিনীপুর।

প্রচ্ছদ—
স্মৃতিকণা সেন।

# উৎসর্গ

বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার কর্মিবৃন্দ, যাঁরা, আমার দীর্ঘ গ্রন্থাগার জীবনের সঙ্গে প্রীতিতে জড়িত, যাঁরা তাঁদের নিরলস আত্মোৎসর্গে ও সেবায় ব্যক্তিগত দৈন্য ও অস্বাচ্ছন্দ্য উপেক্ষা করে বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারকে বিশ্বভারতীর উজ্জ্বলতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, তাঁদের কর্মযোগের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের প্রতীক হিসেবে এই অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থটি উৎসর্গীকৃত হল ॥

॥ গ্রন্থকার ॥

# ভূমিকা

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে দেশে যখন গ্রন্থাগার বিদ্যা নিয়ে আলাপালোচনা সুরু হয়, গ্রন্থাগারের সামাজিকীকরণ, গ্রন্থাগার আইন আন্দোলন ইত্যাদি নিয়ে কিছু কিছু কাজ কর্মের সূচনা হয় তখন এসব বিষয় নিয়ে দেশে কোনো পরম্পরা বা ট্রাডিসন ছিল না, আর তা ছিল না বলেই ভারতীয় কোনো ভাষাতেই এসব বিষয় নিয়ে কোনো বইও ছিল না। অন্য অনেক বিষয়েই যেমন এসব বিষয়েও তেমনই আমাদের প্রায় একমাত্র নির্ভর ছিল ইংরাজী বই ও পত্র পত্রিকার উপর। তার ফলে গত পঞ্চাশ বছরে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার-বিদ্যা ইত্যাদি ব্যাপারে দেশে যে পরম্পরাটা গড়ে উঠেছে তা একান্তই পশ্চিমী ধাঁচের, পশ্চিমী ছাঁচের। এতে লজ্জা বা পরিতাপের কিছু নেই। সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারনেই আমাদের বর্তমান জীবনের উপাদান-উপকরণে, মন বুদ্ধিকল্পনার বায়ুমণ্ডলে পশ্চিম অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে; কাজেই গ্রন্থাগার সংপৃক্ত আমাদের চিন্তা ও কর্মে আধুনিক পশ্চিমী ধ্যান-ধারণা, ক্রিয়া পদ্ধতি, প্রযুক্তি প্রকরণ ইত্যাদি সোচ্চার হবে, এতে বিস্মিত হবার কারন নেই। আমাদের আধুনিক শিক্ষার সমগ্র জগৎটা জুড়েই তো পশ্চিম অত্যন্ত সোচ্চার এবং যেহেতু শিক্ষা ও সাক্ষরতার সঙ্গে গ্রন্থাগারের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, শেষোক্ত ক্ষেত্রেও এই সোচ্চারতা স্বাভাবিক।

ইতিহাসের ছাত্র মাত্রই জানেন, সুপ্রাচীন কাল থেকেই আমাদের এই দেশে বাইরে থেকে এসে অধিষ্ঠিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন নানা নরগোষ্ঠীর নানা ভিন্ দেশি মানুষ, তাদের নিজ নিজ ধর্ম, সামাজিক রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, পোষাক আসাক, খাদ্য পানীয় ইত্যাদি সঙ্গে বয়ে নিয়ে। নানা সময়ে নানা ভিন্ দেশি লোকেরা নানা ফুল ফল মূল নানা গাছ-গাছড়াও এনেছেন। তেমনই এনেছেন নানা ধ্যানধারনা, নানা কলা কৌশল, নানা দেবদেবী। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ইতিহাসের আবর্তে আবর্তিত ভারতবর্ষ এ সব কিছুকেই কালে কালে ধীরে ধীরে চলমান জীবনের অঙ্গ করে নিয়েছে; কোথাও বেশী কোথাও কম। তার ফলে একসময় যা ছিল বহিরাগত, বিদেশি, আজ তা ভারতীয়, আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি। এই স্বাঙ্গীকরণ-ক্রিয়া প্রায় একটি জৈব নিয়ম। যে দেশ ও জাতি যত জীবন সমৃদ্ধ সে দেশ ও জাতির স্বাঙ্গী করণ-শক্তিও তত প্রবল।

আধুনিক কালে এই স্বাঙ্গীকরণ শক্তির অপূর্ব প্রকাশ দেখা গেছে বাংলা সাহিত্যে। পশ্চিমী সাহিত্যকে বাংলা সাহিত্য যে কী অদ্ভুত ভাবে কী অপরূপ শিল্প নৈপুণ্যে স্বাঙ্গীকৃত করে নিয়েছে তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে মাইকেল মধুসূদন থেকে সুরু করে সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে প্রভৃতির বিচিত্র রচনায়; এই স্বাঙ্গীকরণ ক্রিয়া আজও চলেছে। আমাদের বিচিত্র ধ্যান ধারনা. রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্ম, স্বাজাত্যবোধ. নানা সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অনুষ্ঠান—প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও এই স্বাঙ্গীকরণের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, শিক্ষা বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি বিদ্যার ক্ষেত্রে পশ্চিমকে আমরা তেমন করে আমাদের জীবনের সঙ্গে অনুস্যূত করে নিতে পারিনি। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজী এবং আরও কেউ কেউ শিক্ষার ক্ষেত্রে সে চেষ্টা করে-ছিলেন, কিন্তু তার ব্যাপক প্রসার কিছু ঘটেনি। বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি বিদ্যার ক্ষেত্রেও এ ধরণের কিছু কিছু প্রয়াস হয়েছে,, প্রধানত আমাদের আঞ্চলিক ভাষাগুলির মাধ্যমে বিজ্ঞান আয়ত্ত করার প্রচেষ্টায়। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়. বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা ও বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এ ব্যাপারে পথ দেখিয়েছেন।

শিক্ষা ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে এইমাত্র যা' বললাম, সে-মন্তব্য গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার আন্দোলন, বিশেষভাবে গ্রন্থাগার বিদ্যা সম্বন্ধেও সমান প্রযোজ্য। স্বাঙ্গীকরণ ক্রিয়া এসব ব্যাপারে এখনও যথেষ্ট সোচ্চার হয়ে উঠেনি. খুব সজাগ কোনো চেষ্টা যে সেদিকে আছে তাও মনে হয় না। এসব বিষয়ে ভারতবর্ষে, দেশ ও সমাজের প্রেক্ষাপট স্মরণ রেখে আঞ্চলিক ভাষার কিছু কিছু পত্র পত্রিকা চালু আছে, বই পত্রও মাঝে মাঝে লেখা হয়, প্রকাশিত হয়, পঠন পাঠনও হয়। কিন্তু এ সমস্তই পশ্চিমী গ্রন্থাগার বিদ্যা বিষয়ক পত্র পত্রিকা পুঁথি পত্রের নকল, না হয় এসব রচনা থেকে বহুলাংশে ধার করা অথবা সে সব রচনার পাদটীকার মত করে লেখা। কোনো বিদ্যায় স্বাঙ্গীকরণ এভাবে হয় না, হতে পারে না। নানা উপায়ের মধ্যে একটি উপায়, অধীত ও পশ্চিম থেকে আহৃত বিদ্যার আমূল রূপান্তর ঘটানো, অনুবাদের মাধ্যমে নয়, একেবারে অঞ্চল ও আঞ্চলিক ভাষার রূপে, নিজস্ব বুদ্ধি ও কল্পনার রসে জারিত করে, নিজের জীবন ও কর্মের সঙ্গে জড়িয়ে সেই বিদ্যাকে প্রকাশ করা, পরিবেশন করা। পরকে আপন করার অন্য উপায় নেই।

বহুদিন পর বীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার" বইখানা পড়ে মনে হ'লো, এই পশ্চিমী বিদ্যাটিকে দেশীয় বিদ্যায় রূপান্তরিত করবার একটা

সজাগ চেষ্টা বোধ হয় এত দিনে শুরু হলো। পশ্চিমী গ্রন্থাগার বিদ্যার পাঠ বীরেন বাবু নিয়েছেন, অন্যান্য অনেকের মতই। বহুদিন তিনি বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে উপ-গ্রন্থাগারিকের কাজও করেছেন। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তিনি তাঁর অধীত, আহৃত ও অভ্যস্ত বিদ্যাকে নিজের বুদ্ধি ও কল্পনা, জীবন ও কর্মের সঙ্গে জড়িয়ে নিজের মতন করে নূতন করে ভেবেছেন, সেই ভাবনাকে নিজের ভাষায় প্রকাশ ও পরিবেশন করেছেন। তিনি বাংলা লিখতে জানেন নিজের বক্তব্য সাজিয়ে গুছিয়ে কি করে বলতে হয় তা জানেন। তা ছাড়া, তার বক্তব্য ও সাজানো গুছানোর মধ্যে তাঁর নিজস্ব চিন্তা ও দৃষ্টি ভঙ্গীর মুদ্রণ সুস্পষ্ট।

আমার আশা ও বিশ্বাস, বীরেন বাবুর এই বইখানা বাংলা দেশে গ্রন্থাগার বিদ্যার প্রসারে একটি নতুন পথের সন্ধান দেবে।

নীহার রঞ্জন রায়।

২৫শে মে ১৯৭৭
ক'লকাতা

# প্রকাশকের নিবেদন

সাম্প্রতকালে প্রকাশন প্রকল্পের নানাবিধ অবস্থা বিপর্যয়ের জন্য 'গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার' বইটি প্রকাশ করতে অনিবার্য ভাবে কিছু বিলম্ব হয়ে গেল। বিশেষত, এ ধরণের বিশেষ বৃত্তিকেন্দ্রিক বিষয় নিয়ে মফস্বল শহর থেকে বই ছাপানো আয়স সাধ্য ব্যাপার। এই সকল অসুবিধার মধ্যে বইটিতে অনেক মুদ্রন প্রমাদ থেকে গিয়েছে। এ ধরণের প্রযুক্তিকুশল গ্রন্থের পাঠক স্বভাবতই উচ্চমানের এবং বিশিষ্ট শ্রেণীর। ভুলগুলি তাঁরা নিজগুণে মার্জনা করে নিতে পারবেন বলে বিশ্বাস করি। অনেক ক্ষেত্রে একই শব্দের বানান বিভিন্ন অংশে ভিন্ন প্রকার হয়ে গিয়েছে। এই ত্রুটিগুলির জন্য সুধী পাঠক-বৃন্দের কাছে মার্জনা প্রার্থনা করি। আমাদের আশা, বইটি এতৎসত্ত্বেও তাঁদের পড়তে এবং বুঝতে কষ্ট হবেনা। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কিত এই বইটির মুদ্রণ ও প্রকাশনের গুরু দায়িত্ব আমরা নিয়েছি ; পাঠকবর্গের সহৃদয়তা এবং সহানুভূতি, বৈদগ্ধ এবং বিচার-বৈশিষ্ট্য আমাদের মূলধন। ইতি

বিনীত—

অশোক রায়

# মুখবন্ধ

সাম্প্রতকালে গ্রন্থগার-বিজ্ঞান বিশিষ্ট বৃত্তিকুশলীবিদ্যা হিসেবে সকল দেশেই স্বীকৃত। গ্রন্থাগার পরিচালনা এখন আর কেবলমাত্র কতকগুলি নিত্য কর্ম পদ্ধতির মধ্যে আবদ্ধ নেই। আধুনিক জনজীবন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার, বিদ্যাশ্রেণীর বিভিন্ন প্রকার এবং চেতনার বিচিত্রতায় এর ক্ষেত্র ব্যাপ্ততর হয়েছে। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজের এমন বিষয় নেই, এমন অনুষঙ্গ নেই যা এর সীমানাভুক্ত নয়। এ জন্য পদ্ধতিগত ভাবে এই বিদ্যা আয়ত্ত করবার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

গ্রন্থাগার পরিচালনায় পুস্তকের বর্গীকরণ, সূচীকরণ এবং পুস্তকের সঞ্চারনই একমাত্র ক্রিয়াপর্ব নয়। অন্যান্য ক্রিয়াপর্ব যেমন এই মুখ্য বিষয়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত, তেমনি আবার স্বাতন্ত্র্যেও স্বীকৃত। বই ব্যতীত অন্য বহুবিধ জ্ঞানসামগ্রী যেমন গ্রন্থাগারের আওতায় এসে গিয়েছে, তেমনি জ্ঞানের প্রসার এবং সহায়ক প্রকল্প হিসেবেও অনেক ক্রিয়াকলাপ আবশ্যিকভাবে এর অঙ্গীভূত হয়েছে। এই ধরনের তাবৎ প্রসঙ্গ কেমন তা জানবার এবং চিনবার, ধারানুক্রমে সংরক্ষণের এবং অনুসরণে সুনিয়মিত ও সুনিয়ন্ত্রিত কার্যক্রম খাড়া করবার কথা ভাবতে হয়। গ্রন্থাগার যেভাবে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিস্তৃত হয়ে উঠেছে, এবং এর ফলে যেভাবে গ্রন্থাগারবিদ্যা জটিল হয়ে পড়ছে তা'র পরিপ্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্ট পন্থা রচিত না হ'লে গ্রন্থি জটিলতর হয়ে যাবে,—মোচন করা হবে দুরূহ।

এই প্রেক্ষাপটেই গ্রন্থের জন্ম থেকে সুরু ক'রে তা'র বিবিধ কর্মকাণ্ড গ্রন্থাগারিককে জানতে হয়। বই অথবা অধীতব্য বিদ্যা নিয়ে সমস্যার তো শেষ নেই, গবেষকদের জিজ্ঞাসারও অন্ত নেই। তাই একেবারে মূল থেকে বিষয়টির তাবৎ পরিচয় জেনে রাখতে হয় গ্রন্থাগারিককে। এ সবই পুঁথিগত সত্যান্বেষণের পর্ব, সূক্ষ্ম বিচারের নির্দেশক।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের দুটি অঙ্গ। প্রযুক্তির আর প্রকাশের। তথ্যের আর তত্ত্বের। বলতে পারি বহিরঙ্গের এবং অন্তরঙ্গের। আমার গ্রন্থটিকে আমি প্রচলিত পন্থা ছেড়ে একটু অন্য রকম ভাবে সাজিয়েছি—উক্ত দুই অঙ্গকে প্রকট ক'রে তুলবার অভিপ্রায়ে। প্রথম এবং শেষ অধ্যায় দুটি গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের ঐতিহাসিক বিবরণ মাত্র। মূল গ্রন্থাংশে এসেছে বইএর বহিরাঙ্গিক

এবং আভ্যন্তরীন বিচার-বিশ্লেষণ, —যা'কে বলেছি বইএর চিত্ররূপ এবং রস-রূপ। প্রথমটি বইএর উৎপত্তির এবং গঠনের বিচার, দ্বিতীয়টি বিষয় বস্তুর বিশ্লেষণ ও সজ্জা। পরবর্ত্তী অধ্যায় গ্রন্থাগার প্রসঙ্গ, —তা'র সংগঠন এবং পরিচালনার বিভিন্ন দিক ও ধারা। এভাবে সাজিয়ে আমি গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের বিভিন্ন অবয়ব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিতে চেষ্টা করেছি। এ জন্যই গ্রন্থবিদ্যা (Bibliography) তার দুই পরিচয়ে দু'ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে, গ্রন্থবীক্ষণ এসেছে রসরূপের পর্যায়ে।

গ্রন্থটিকে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের প্রবেশক হিসেবে সর্বাশ্রয়ী ক'রে তুলতে চেয়েছি, যাতে একটি মাত্র বই এর মধ্যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী ও কর্মী ক্রিয়াপর্বের সব কটি ধারার পরিচয় পান। স্বভাবতই এ রকম আকাঙ্খা গগনচুম্বী। কেন না, সব কটি বিভাগের সবিস্তর আলোচনা দুই মলাটের মধ্যে বিধৃত হ'লে তা'র আকার হবে অতিস্ফীত, একটি বইএর মধ্যেই সব পাবার ভাব বজায় থাকবে না, – মনে হবে যেন একের মধ্যে একাধিক বই। গ্রন্থাগার-কুশলী মাত্রেই জানেন যে গ্রন্থাগার প্রযুক্তি পর্বের এবং উদ্যোগ পর্বের প্রত্যেকটি পর্যায়ই স্বতন্ত্রভাবে সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনার বিষয়বস্তু হ'তে পারে। তাই প্রত্যেক বিষয়ের প্রধান এবং অপরিহার্য অংশগুলিতেই আলোচনা সীমাবদ্ধ থেকেছে।

আরেকটি বক্তব্য ও বক্ষমান বিষয়সূত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে না মনে করি। গ্রন্থাগার শিক্ষা জগতের অপরিহার্য অঙ্গ হ'লেও এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞান অবশ্য জ্ঞাতব্য ও স্বীকৃত পাঠক্রম হ'লেও বিচিত্র বা দুর্বোধ্য কারনে এখনো শিক্ষা মহলে যথোপযুক্ত মর্যাদা পায়নি। শিক্ষিত মহল, বিশেষ ক'রে শিক্ষক ও বিদ্যার্থী শ্রেণী যদিচ জানেন গ্রন্থাগার ব্যতীত বিদ্যাচর্চার কাজ অচল হয়ে পড়ে, —এমন কি গ্রন্থাগারকর্মীদের সেবা সূত্রে তাঁরা চূড়ান্ত ভাবে উপকৃত এবং বিশেষভাবে সাহায্য প্রাপ্ত, তবুও এঁদের সমপর্যায়ভুক্ত ভাবতে যেন বাধে। ব্যতিক্রমের কথা মনে রেখেও ব্যাপারটা অনুভব করা যায়। দেশের সরকারী মহল এবং শিক্ষাবিদরা যদি এদিকে নজর দেন তবেই অবস্থার উন্নতি সম্ভবপর। শুধু কর্মীদের বা কর্তব্যকর্মের উন্নতিই নয়, গ্রন্থাগারের সংগ্রহ এবং বিচিত্র থেকে বিচিত্রতর প্রক্রিয়ায় সেগুলির ব্যবহারের পথ সুগম ক'রে দেওয়ার কাজ ব্যাপক সহায়তা ছাড়া হয় না।

এই সূত্রে আমি প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের রচনা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেব।

গ্রন্থ মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার চিন্তা নিয়ে আলোচনা করেছি। বিদগ্ধ সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে যখন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গঠিত হচ্ছে তখন তিনিও যুক্ত ছিলেন এটির সঙ্গে। শুধু তিনিই নন, তৎকালীন চিন্তা নায়কদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিলেন গ্রন্থাগারে প্রতি উৎসাহী। প্রমথ চৌধুরীর 'বই পড়া' নামক নিম্নোক্ত রচনাংশ গ্রন্থাগার-সেবীদের পক্ষে যেমন তেমনি গুনীজনের কাছেও নিঃসন্দেহে প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন ঃ—

"— লাইব্রেরীর মধ্যেই আমাদের জাত মানুষ হবে। সেই জন্য আমরা যত বেশি লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা করব, দেশের তত বেশী উপকার হবে "

"আমার মনে হয়, এ দেশে লাইব্রেরীর -সার্থকতা হাসপাতালের চাইতে কিছু কম নয়, এবং স্কুল ও কলেজের চাইতে কিছু বেশী। এ কথা শুনে অনেকে চমকে উঠবেন, কেউ কেউ আবার হেসেও উঠবেন। কিন্তু আমি জানি, আমি রসিকতা করছিনে, অদ্ভূত কথাও বলছিনে ~।"

"আমার বিশ্বাস, শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। সুশিক্ষিত লোক মাত্রেই স্বশিক্ষিত। ∴ শিক্ষকের সার্থকতা শিক্ষা দান করায় নয়, কিন্তু ছাত্রকে তা অর্জন করতে সক্ষম করায়। শিক্ষক ছাত্রকে পথ দেখিয়ে দিতে পারেন। মনোরাজ্যের ঐশ্বর্যের সন্ধান দিতে পারেন, তার কৌতূহল উদ্রেক করতে পারেন, তার বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত করতে পারেন, তার জ্ঞান পিপাসাকে জ্বলন্ত করতে পারেন, এর বেশী আর কিছু পারেন না। যিনি যথার্থ গুরু, তিনি শিষ্যের আত্মাকে উদ্বোধিত করেন এবং তার অন্তর্নিহিত সকল প্রচ্ছন্ন শক্তিকে মুক্ত এবং ব্যক্ত করে তোলেন। সেই শক্তির বলে সে নিজের মন নিজে গড়ে তোলে, নিজের অভিমত-বিদ্যা নিজে অর্জন করে। বিদ্যার সাধনা শিষ্যকে নিজে করতে হয়। গুরু উত্তর সাধক মাত্র।

" স্কুল কলেজের শিক্ষা যে অনেকাংশে ব্যর্থ, সে প্রায় অধিকাংশ লোকই একমত। আমি বলি শুধু ব্যর্থ নয়, অনেক স্থলে মারাত্মক ; কেন না আমাদের স্কুল কলেজ ছেলেদের স্বশিক্ষিত হবার হবার যে সুযোগ দেয় না, শুধু তাই নয়, স্বশিক্ষিত হবার শক্তি পর্যন্ত নষ্ট করে। ...

"আমি লাইব্রেরীকে স্কুল কলেজের উপরে স্থান দিই এই কারণে যে, এ স্থলে লোকে স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে স্বশিক্ষিত হবার সুযেগে পায় ; প্রতি লোক তার স্বীয় শক্তি ও রুচি-অনুসারে নিজের মনকে নিজের চেষ্টায় আত্মার রাজ্যে

জ্ঞানের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। স্কুল কলেজ বর্তমানে আমাদের যে অপকার করছে, সে অপকারের প্রতিকারের জন্য শুধু নগরে নগরে নয়, গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা করা কর্তব্য। আমি পূর্বে বলেছি যে, লাইব্রেরী হাসপাতালের চাইতে কম উপকারী নয়; তার কারন আমাদের শিক্ষার বর্তমান অবস্থায় লাইব্রেরী হচ্ছে একরকম মনের হাসপাতাল।"

কটেজ লাইব্রেরী ও ভবানীপুর ইন্‌ষ্টিটিউটের সাহিত্য শাখার অধিবেশনে ১৩২৫ বঙ্গাব্দে, —অর্থাৎ ছাপান্ন বছর পূর্বে প্রদত্ত এই ভাষণ আজকের দিনেও কত সত্য ও বাস্তব। সম্ভবত আরও বেশী বাস্তব। রঙ্গনাথন গ্রন্থাগার চিন্তায় বিশিষ্টতম অবদান রাখবার আগে থেকেই এই সকল গুণিবৃন্দ এভাবে গ্রন্থাগারের কথা ভেবেছিলেন। তখন ছিল বৃটিশ রাজত্ব-কাল। এখন স্বাধীন ভারতের যৌবন উত্তীর্ণ প্রায়। এখনো শিক্ষা জগতের যেমন সম্যক উন্নতি হয়নি, তেমনি গ্রন্থাগার প্রকল্পেরও অগ্রগতি ব্যাহত হয়ে রইল; আনুষঙ্গিক হিসেবেই শুধু টিকে আছে। এজন্যই মনে হয় গ্রন্থাগার-কর্মীদের সর্বতোভাবে শিক্ষিত হয়ে এই ব্যবহারিক বিজ্ঞানের সকল পর্বে পারঙ্গম হয়ে কর্তব্য পালনের শপথ নেওয়া প্রয়োজন।

শেষ কথায়, অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষকে। তাঁরা India's National Library গ্রন্থ থেকে কিছু আলোক-চিত্র-লিপি এই গ্রন্থে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন বলে; কৃতজ্ঞতা জানাই বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষকে তাঁদের পুঁথি বিভাগে সংরক্ষিত সম্পদ থেকে কিছু আলোকচিত্র- লিপি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন ব'লে। প্রীতিভাজন সহকর্মী, বিশ্বভারতী কলাভবনের অধ্যাপক, শ্রীসম্পৎ কুমার ডেভিড অধিকাংশ আলোক চিত্র প্রস্তুত ক'রে দিয়ে এবং গ্রন্থাগার-সহকর্মী প্রীতিভাজন শ্রীবনমালী দত্তশর্মা নক্সাগুলি তৈরি ক'রে আমাকে উপকৃত প্রীতি-ঋণে আবদ্ধ করেছেন। কলকাতার 'টিউলিপ' সংস্থার আলোক চিত্রী প্রীতিভাজন দিলীপ সেনের সহায়তা ও এই সূত্রে স্বীকার্য। নির্দেশপঞ্জী প্রস্তুতিতে স্নেহভাজন সুমন মুখোপাধ্যায় এবং স্বপন ঘোষের সহায়তা স্মরণ করি। সর্বশেষ বক্তব্য, যে আন্তরিক উৎসাহে প্রকাশন প্রকল্পের দুরূহতাকে উপেক্ষা করে শ্রীযুক্ত অশোক রায় গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব বহন করেছেন তার অনুল্লেখ অকৃতজ্ঞতারই নামান্তর মাত্র হবে।

শান্তিনিকেতন,
৩০ আশ্বিন, ১৩৮৩।

শ্রী বীরেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

# সূচীপত্র


ভূমিকা : নীহার রঞ্জন রায়
প্রকাশকের নিবেদন
মুখবন্ধ

১ম অধ্যায় : গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার ১-১৬

প্রবেশক ১
লিখিত ভাষা ও লেখন সামগ্রীর কথা ৩
সেকালের গ্রন্থ সংগ্রহ কথা ৯

২য় অধ্যায় : গ্রন্থকথা ১৭-২১০

বইএর দুই রূপ : চিত্ররূপ, রসরূপ ১৯
কাগজ ২০
কালি ২৭
হরফ বা মুদ্রা ২৯
মুদ্রা বিন্যাস বা হরফ গাঁথাই ৩৩
উপস্থাপন ৩৮
বইএর মাপ ৩৯
দপ্তর চিহ্ন ৪১
যান্ত্রিক মুদ্রা বিন্যাস ৪১
মনোটাইপ ৪২
লাইনোটাইপ ৪৩
স্টিরিওটাইপ ৪৪
ইলেক্‌ট্রোটাইপ ৪৪
ফটো কম্পোজিং, লিথোগ্রাফি ৪৫
জেরোগ্রাফি ৪৫
প্রুফ দেখা ৪৬
মুদ্রণ যন্ত্র ৪৭
চিত্রণ ৪৯
কাঠখোদাই ৫২
চিত্রতক্ষণ ৫২
জিন্‌কোগ্রাফি বা রেখাচিত্র ৫২
হাফটোন ৫৩
একোয়াটিণ্ট ৫৫
মেজোটিণ্ট ৫৬
কপার এন্‌গ্রেভিং বা তাম্রতক্ষণ ৫৬

| | |
|---|---|
| ড্রাইপয়েণ্ট | ৫৭ |
| এচিং | ৫৮ |
| ফটোগ্রেভিওর | ৫৮ |
| লিথোগ্রাফি | ৬০ |
| ফটো-লিথোগ্রাফি | ৬১ |
| ফটো-লিথো-অফসেট | ৬২ |
| কোলোটাইপ | ৬৩ |
| মুদ্রণে বর্ণপ্রয়োগ | ৬৪ |
| গ্রন্থন | ৬৬ |
| বইএর বিভিন্ন অংশ | ৬৭ |
| পুস্তকের সংজ্ঞা | ৭১ |
| সংস্করণ | ৭২ |
| গ্রন্থস্বত্ব | ৭২ |
| গ্রন্থনের সেকাল ও একাল | ৭৪ |
| বই বাঁধাই—দপ্তরীর কাজ | ৭৭ |
| মলাটের মালমশলা | ৮৪ |
| বইএর বিষয়মূল্য বা রসরূপ | ৮৭ |
| জ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ | ৮৯ |
| পুস্তকের শ্রেণী বিভাগ | ৯০ |
| বর্গীকরণ ও সূচীকরণ | ৯২ |
| পুস্তক বর্গীকরণ | ৯৩ |
| বিভিন্ন বর্গীকরণ পদ্ধতি | ৯৯ |
| ডিউই দশমিক বর্গীকরণ | ১০০ |
| সার্ব দশমিক বর্গীকরণ | ১১৪ |
| প্রসারশীল বর্গীকরণ | ১১৮ |
| বিষয়ানুক্রমিক বর্গীকরণ | ১২১ |
| গ্রন্থবৃত্ত বর্গীকরণ | ১২৪ |
| দ্বিবিন্দু বর্গীকরণ | ১৩০ |
| লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস বর্গীকরণ | ১৪১ |
| গ্রন্থ বর্গীকরণে আন্তর্জাতিক চিন্তা | ১৪৫ |
| প্রাচ্য বর্গীকরণ পদ্ধতি | ১৪৭ |
| গ্রন্থচিহ্ন। গ্রন্থাগার চিহ্ন। গ্রন্থসংলেখ | ১৫৫ |
| পুস্তক সূচীকরণ | ১৫৬ |
| পত্রক বিন্যাস | ১৯৫ |
| গ্রন্থবিদ্যা : | ১৯৭ |
| গ্রন্থেক্ষণ : | ১৯৮ |
| গ্রন্থবীক্ষণ : | ২০৩ |

৩য় অধ্যায় ঃ গ্রন্থাগার কথা ২১১ ৪০২
গ্রন্থ সংগ্রহের ব্যবহারিক প্রসঙ্গ ২১১
গ্রন্থাগার : গ্রন্থাগারিক : পাঠক/গ্রন্থাগার ও গ্রন্থ ২১১
জাতীয় গ্রন্থাগার ২১৪
জন গ্রন্থাগার ২১৬
বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ২১৭
মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার ২২০
বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ২২১
গবেষণা গ্রন্থাগার ২২২
বিশেষ গ্রন্থাগার ২২৩
সংবাদ গ্রন্থাগার ২২৩
বেতার গ্রন্থাগার ২২৪
শিল্প. বাণিজ্য গ্রন্থাগার ২২৫
হাসপাতাল গ্রন্থাগার ২২৬
কারা গ্রন্থাগার ২২৭
অন্ধদের গ্রন্থাগার, মূক-বধিরাদির গ্রন্থাগার ২২৯
গ্রন্থাগারিক ও পাঠক ২৩০
গ্রন্থাগারের পঞ্চনীতি ২৩৫
রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার ২৪০
গ্রন্থাগার দর্শন : গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ২৪৪
গ্রন্থাগার বৃত্তি ও বিভিন্ন জ্ঞানবিভাগ ২৪৬
গ্রন্থাগারের সেবাক্রম ২৪৭
গ্রন্থাগারের ব্যবহারিক নীতি ২৪৯
গ্রন্থাগারিক : দায়িত্ব ও কর্মনীতি ২৫৮
গ্রন্থাগার সংগঠন ২৬০
গ্রন্থাগার ভবন ২৬১
গ্রন্থাগার সমিতি ২৭২
গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার সমিতি ২৭৪
কর্মীনিয়োগ ২৭৫
গ্রন্থাগারের নিয়মাবলী ২৭৭
গ্রন্থাগার পরিচালনা ২৭৯
প্রযুক্তিতত্ত্ব ২৮০
কর্মীনিয়োগের সূত্র ২৮২
অর্থবণ্টনের সূত্র ২৮৫
আন্তঃ গ্রন্থাগার পুস্তক ঋণ ২৮৬
সংযুক্ত গ্রন্থসূচী ২৮৭
পুস্তক নির্বাচন ২৮৮

পুস্তক বিভাগের কর্মধারা ২৯৫
পরিগ্রহণ ২৯৯
প্রচারণ ৩০১
মঞ্চপদ্ধতি ৩০২
প্রচলন প্রক্রিয়া ৩০৪
পরিপোষণ বিভাগ ৩১৯
পুস্তক সম্ভার গণন ৩২০
মঞ্চসজ্জা ৩২২
পুস্তক সংরক্ষণ ৩২৩
গ্রন্থাগার দপ্তর, গ্রন্থন বিভাগ ৩৩১
সাময়িকী বিভাগ ৩৩৩
পুস্তিকা, স্মারক, ইস্তাহার ৩৪৮
জিজ্ঞাসা বিভাগ ৩৫১
তথ্য গ্রন্থ পরিচয় ৩৬৩
অভিধান ৩৬৪
কোষগ্রন্থ ৩৬৮
মানচিত্র ৩৭৩
ভৌগলিক নির্দেশিকা (গেজটিয়ার) ৩৭৫
বর্ষপঞ্জী, বার্ষিকী ৩৭৬
ঘটনাপঞ্জী ৩৭৭
নির্দেশপঞ্জী ৩৭৮
গ্রন্থপঞ্জী ৩৭৯
গ্রন্থতালিকা ৩৮২
সূচীগ্রন্থ ৩৮৩
সংক্ষিপ্তসার ৩৮৫
পথপঞ্জী, লঘুপুস্তক ৩৮৭
পঞ্জিকা ৩৯০
নথি ৩৯০
দৃশ্য শ্রাব্য সামগ্রী ৩৯৩
গ্রন্থাগার প্রচার ও প্রসার ৩৯৪

**৪র্থ অধ্যায় ঃ গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার ঃ সমাপক** ৪০৩ ৪২৮

একালের গ্রন্থ সংগ্রহ কথা। গ্রন্থাগার আন্দোলন ৪০৩
ভারতীয় গ্রন্থাগার কাহিনী ৪১০

**পরিশিষ্ট ( দ্বিবিন্দু বর্গীকরণ )** ৪২৯-৪৩০

চিত্রণ ১-২০
নির্দেশ পঞ্জী ক-ঠ
গ্রন্থে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দকোষ I-VI

# ১ম অধ্যায়

## প্রবেশক

প্রথম অধ্যায়

বই থাকলেই তা সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবার প্রশ্ন ওঠে। ব্যক্তিগত প্রয়োজনেও যখন বইএর পরে বই জমতে থাকে তখন সেই গ্রন্থসমষ্টি একটি ঘরের মধ্যে তাকে বা আলমারিতে রেখে আমরা গ্রন্থাগার আখ্যা দিতে পারি। আবার কয়েকজনে মিলে সমষ্টিগতভাবেও গ্রন্থাগার গড়তে পারি। পারিবারিক জীবনেই হোক বা গোষ্ঠীগত জীবনেই হোক কোনো না কোনো আকারে বা প্রকারে গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। এবং ব্যক্তিগত বা ব্যষ্টিগত যেকোনো গ্রন্থ সংগ্রহ থেকেই লোকে বই ধার ক'রে পড়ে। নিজের বাড়ীতে যখন পরিমাণে বই কম থাকে তখন সেগুলিকে সাজিয়ে রাখবার জন্য বিশেষ ভাবতে হয় না। কোথায় কোন বই রাখা আছে তা মনে থাকে। কেউ যদি তার মধ্য থেকে কোনো বই ধার করে নিয়ে যায় তাহলেও কে কোন বই নিয়েছে মনে রাখা অসম্ভব হয় না। কিন্তু বেশী বই জমে গেলে নানান সমস্যার সৃষ্টি হয়। কোনো একটি ধারায় বা পদ্ধতিতে সাজিয়ে না রাখলে যেমন কোনো বিশেষ একটি বই খুঁজে বা'র করা কঠিন হয়, তেমনি কে কোন বই ধার নিয়েছে লিখে না রাখলে ভুলে যাবার সম্ভাবনা থাকে। গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান এই সহজ প্রয়োজনীয় সূত্রগুলিই মেনে চলে। নিজের বাড়িতেই হোক বা পাড়ার সমিতিতেই হোক বইএর স্তূপ যখন জমে ওঠে তখন সেগুলিকে কোনো পদ্ধতিতে সাজাবার, —মাথা খাটিয়ে নিজেদের সুবিধে বুঝে একটা উপায় বা'র করবার দরকার হয়। যেমন, বইএর নাম অনুযায়ী বা লেখকের নাম অনুযায়ী সাজানো যায়। ছোট বড় মাপ অনুযায়ী সাজানো যায় বা বইগুলির রঙ অনুযায়ী সাজানো চলে, বইওর বিষয় অনুযায়ী সাজানো যেতে পারে, অথবা আরো হরেক রকমে সারিবদ্ধ করা চলে।

নিজের কাজের জন্য না হয় যাহোক একটা ব্যবস্থা করে নিলেই চলে, কিন্তু কয়েকজনে মিলে যুক্তি করে বই কিনে যৌথভাবে পড়াশোনার পত্তন করলে একটা সর্বজনগ্রাহ্য বিধি-ব্যবস্থা এবং সকলের সুবিধে মতো নিয়ম খাড়া করতে হয়। সংগৃহীত গ্রন্থের যত্ন নেবার জন্য এবং পরিচর্যার জন্য দায়িত্বশীল কোনো ব্যক্তির উপরে ভার দিতে হয়। এইভাবে গ'ড়ে ওঠে প্রকৃত গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগার বিবিধ বইএর সংগ্রহকেন্দ্র, ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি গ্রন্থাগারিক, —যিনি বই ও পড়ুয়াদের মধ্যে যোগসূত্র। গ্রন্থাগারিক বইএর যত্ন নেন, সাজিয়ে গুছিয়ে রাখেন, পড়ুয়ারা যা'তে প্রয়োজন মতো বইটি হাতের কাছে পান সেদিকে নজর রাখেন, কোন ধরনের পাঠকের জন্য কোন জাতীয় বই দরকার বা কী কী বই রাখলে সকলের কাজে লাগবে, বিশেষ বিশেষ বিষয়ের জন্য কোন বইগুলি পড়া উচিত, —এ সবই বিচার করেন গ্রন্থাগারিক। গ্রন্থাগারিক হ'তে গেলে মনে রাখতে হবে তিনি তাঁর জীবন সকলের সুবিধের জন্য উৎসর্গ ক'রে দিলেন। এটি তাঁর সামাজিক কর্তব্য, —তিনি সমাজ সেবক। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'গ্রন্থাগারিকের কাজ মস্ত কাজ।' শুধু বইএর খবরদারি বা ঠিক মতো বইটি পড়ুয়ার হাতের কাছে হাজির ক'রে দেওয়াতেই তাঁর কাজ শেষ হয় না। তিনি পুস্তক ও পাঠক্রমের নির্বাচন-সূত্রে সাধারণের মনকে বিদ্যা আর জ্ঞানের দিকে চালিত করেন, দেশের নিরক্ষরতা দূর করবার ব্যাপারে সাহায্য করেন, এবং সর্বাঙ্গীন শিক্ষার অনুকূল আবহাওয়া তৈরী করেন।

গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের বিবর্তনের যেমন ইতিহাস আছে তেমনি এর ব্যবহারিক দিকের আছে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি। বহুযুগ—বহুকাল থেকে দেখে ঠেকে শিখে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার বিদ্যার একটা ধারা খাড়া হয়েছে। এ যুগে গ্রন্থের যেমন বিশাল পরিমাণ তেমনি বিষয় বৈচিত্র্য, তেমনি পাঠকদের বিভিন্ন প্রকৃতি আর প্রয়োজন—রুচি আর অভিরুচি। তাই গ্রন্থাগার যেমন সুশৃঙ্খল-ভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে হয়, সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে বিন্যস্ত না করলে যেমন তালগোল পাকিয়ে যায়,—কাজ চলে না, তেমনি পাঠক শ্রেণীর প্রয়োজন বিচার এবং রুচি বৈচিত্র বিশ্লেষণ করে দেখতে হয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে। গ্রন্থ যেমন সমাজ চিন্তার ধারক, গ্রন্থাগারিকও তেমনি সমাজ চেতনার বাহক। এই ধারা পরম্পরায় উৎস মুখে গ্রন্থের মর্মকথা এবং গ্রন্থ সংগ্রহের ইতিকথার আলোচনা দরকার। কেন না লিখন বিদ্যা ও লিখিত বিদ্যা পরস্পর সম্পৃক্ত।

বইএর সৃষ্টি হল কেমন ক'রে, বই তৈরী হয় কিভাবে এবং কিভাবে গ'ড়ে উঠল গ্রন্থাগার সেই ঐতিহ্যের ভিত্তিতেই আধুনিক গ্রন্থবিদ্যার ইমারৎ খাড়া হয়েছে।

সে যুগে মানুষ যখন প্রথম লিখতে শিখল তখন থেকেই লিখিত জিনিষটি রেখে দেবার প্রয়োজন বা আগ্রহ বোধ করল। প্রত্নতাত্ত্বিক ক্ষেত্র থেকে আমরা ইট, কাঠ প্রভৃতি নানান সামগ্রীতে লেখা গ্রন্থ সমষ্টির বিবরণ পাই। তার পরের যুগে পাই পাতা বা গাছের ছালে লেখা পুথি। তারপরে ক্রমে আজকের দিনের কাগজ আর মুদ্রিত গ্রন্থ। প্রাচ্যে যেমন পাশ্চাত্যেও তেমনি এই সব পুথি যত্ন ক'রে রাখবার এবং ব্যবহারের জন্য সাজাবার নিদর্শন আমাদের হাতে এসে পৌঁছেচে। বিষয়ানুক্রমে গ্রন্থের শ্রেণী বিভাগ প্রচেষ্টা ও সুপ্রাচীন। এই সব প্রয়াসের ইতিহাস যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি বিচিত্র। মানুষ কী ক'রে প্রথম লিখতে শিখল, কেমন ক'রে লিখত, কিসের উপরে লিখত, কী দিয়ে লিখত, কেমন ভাবে তা সাজিয়ে গুছিয়ে রাখত,—সে সম্পর্কে প্রাথমিক পাঠ থাকলে গ্রন্থ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান সম্পুর্ণ হবে।

মুখের ভাষা সৃষ্টি করেছে মানুষ। আকারে ইঙ্গিতে আর মুখ থেকে নানা রকমের শব্দ বার ক'রে নিজের ভাব-ভাবনা আরেকজনকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা থেকে ভাষার উৎপত্তি। তার পরে মানুষ চাইল তার ভাবনার স্মৃতি থাক ধরা, ভাবনাকে পাঠানো যাক দূরের মানুষের কাছে। তখন সে আঁকল পাথরের উপরে ছবি, আর সেই ছবির সূত্র ধরে এল ভাষার লিখিত রূপ। এই ভাষা এক নিরবচ্ছিন্ন ভাবধারায় সংহত হয়ে সৃষ্টি করল পুথির,—গ্রন্থের। যা ধারা পরম্পরায় গ্রথিত হয় তাই গ্রন্থ। তারপরে এইসব গ্রন্থ স্তরে স্তরে বিন্যস্ত ক'রে রাখবার প্রয়োজনে গড়ে উঠল গ্রন্থাগার।

## লিখিত ভাষা ও লেখন সামগ্রীর কথা

আজকাল আমরা বই বলতে ছাপানো কতকগুলি কাগজের পত্রাকার সমষ্টি বুঝি। কিন্তু কাগজ তো এই সেদিনের আবিষ্কার। তার আগে তাহলে মানুষ লিখত কিসের উপরে? লিখতই বা কী দিয়ে? মানুষ লিখতে

শিখলই বা কবে থেকে ? কবে থেকেই বা ভাষার উৎপত্তি ? আদিম যুগের মানুষ আজকের মানুষেরই মতো ভয় পেলে গলা দিয়ে এক ধরণের আওয়াজ বা'র করত। রাগ হলে আরেক ধরণের; কান্নায় সময় আবার অন্য করম। কিন্তু এই সব ভঙ্গি আর ইঙ্গিত ছাড়িয়ে একের বক্তব্য অন্যকে বোঝাবার কায়দা সে শিখল কবে থেকে।

এসব প্রশ্নের সহজ কোনো উত্তর নেই। তবু অনুমান করতে কষ্ট হয়না যে আদিম যুগের মানুষও আকার ইঙ্গিতের সঙ্গে মুখ থেকে কতকগুলো শব্দ বা'র ক'রে বক্তব্য বোঝাত। কিন্তু যা'কে বক্তব্য বোঝাতে চায় সে যদি কাছে না থাকে ? তখন সে নিশ্চয়ই কোনো স্থায়ী প্রতীকের সাহায্য নিতে সুরু করল ; ছবি আঁকল। স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে পাথরের উপর পাথর সাজিয়ে স্তূপ তৈরীর নিদর্শন আমরা পাই। স্মরণের সহায় হিসেবে সুতোয় গেরো দেবার প্রথা অতি প্রাচীন। আর যে সব ধাতু, পাথর বা কাঠের উপরে নানান আঁকিবুঁকি দেখি তাই ছিল তাদের বক্তব্য প্রচারের চেষ্টা। আদি মানব প্রথম ছবি আঁকবার প্রেরণা পেয়েছিল গাছপালা জন্তু-জানোয়ারের ছন্দ দেখে, মেঘ আর তারার ছবি দেখে। সেই থেকে কোনো কিছু বোঝাতে হ'লে হুবহু তার ছবি এঁকে দেখানোর সূত্রপাত। কিন্তু মানুষ ক্রমে নানান গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তাই এ দলের ছবির সঙ্গে আরেক দলের ছবির কিছু কিছু সামঞ্জস্য থাকলেও, গরমিল ক্রমে বেড়ে চলল। এই থেকে হ'ল নানান ভাষার উৎপত্তি। আমরা আজকালকার দিনেও দেখতে পাই আন্ত-র্জাতিক প্রয়োজনে কতকগুলো সংকেতের সাহায্যে বক্তব্য বোঝান হয়। যেমন তার-বেতারের বার্তায়, গাড়ি চালকের রাস্তায়। এই নিয়মই অনুপস্থিত শ্রোতাকে বক্তব্য বোঝাবার প্রয়োজনে গ'ড়ে উঠেছে লিখিত ভাষা।

লিখিত ভাষার ধারা অনুসরণের সূত্রে আমরা দেখি সে-যুগে তিন রকমের ভাষা-সংকেত গ'ড়ে উঠেছিল। (১) চিত্র-প্রধান অর্থাৎ কোন বস্তুর প্রতিরূপ ; (২) ভাব-প্রধান, অর্থাৎ কোনো বস্তুর অন্তর্নিহিতভাবের আরোপিত রূপ ; (৩) ধ্বনি-প্রধান ; অর্থাৎ কোনো বস্তু বা ভাবের ধ্বনিগত রূপ। এই জাতীয় চিত্রলিপির ভাষার অনেকগুলিরই পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়েছে। পণ্ডিতেরা মনে করেন আমাদের বিবিধ লিখন-পদ্ধতির উদ্ভব এই প্রাচীন চিত্রানুগ লিপি থেকে।

যেমন চীনা বা জাপানী ভাষার এবং বাংলা ইংরেজি ভাষার লিখন

পদ্ধতি। সেকালের লিপিমালার মতো চীনা ভাষা অক্ষরের পরিবর্তে শব্দ সংজ্ঞা লেখা হয়। এককেটা শব্দের ভাব ও চিত্ররূপ নিয়ে তা'র হরফ, এবং ধ্বনিরূপ নিয়ে উচ্চারণ। ইংরেজি, বাংলা প্রভৃতি ভাষার ক্ষেত্রে বর্ণমালার অক্ষর সাজিয়ে একটা পুরো জিনিষের শব্দ-প্রতিরূপ খাড়া হয়। অক্ষরগুলি চিত্রের মতো হ'লেও তার সঙ্গে ভাষার যোগ যেমন নেই, তেমনি ধ্বনিজ লিপিটির শব্দের সঙ্গেও তার রূপের কোনো যোগ নেই। চীনা ভাষার বেলায় চিত্রই প্রধান ভূমিকা নিয়ে ভাব ও ধ্বনির সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করে।

পুরাকালের যে সব বিচিত্রলিপিমালার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তা'র মধ্যে সুমেরীয়, আসিরীয় ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতার কীলকাকার বা কিউনিফর্ম (Cuneiform) লিপি লেখা হ'ত ছুঁচোলো কোন ধাতুর, হাতীর দাঁতের অথবা কাঠের কীলক-জাতীয় খণ্ড দিয়ে নরম মাটির চাকতির উপরে খোদাই করে। সুমেরীয়রা এ-বিষয়ে পথ শ্রষ্টা। এই সভ্যতা টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদীর তীর জুড়ে গড়ে উঠেছিল ৩৬০০-২৩৫৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে, এবং তার স্বর্ণযুগ কলদীয়দের উর, ২৪৭৪ ২৩৯৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। এমন কি, খ্রীষ্টপূর্ব ৩১০০ অব্দেই তা'রা ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে সুরু করেছিল। মাটির নরম চাকতিগুলি লেখা হয়ে যাবার পর পুড়িয়ে শক্ত ক'রে নেওয়া হ'ত। এ গুলিই পশ্চিম ভূখণ্ডের প্রথম বই। মাটি খুঁড়ে এমন হাজার হাজার চাকতি পাওয়া গিয়েছে তা'তে দেখা যায় তারাই প্রাচীনতম সাহিত্যের স্রষ্টা, —ইলিয়াড রচনারও এক হাজার বছর আগে। ব্যাবিলনীয়রাও এই পদ্ধতিতেই মাটির চাকতির উপরে লিখত। এরাই সুমেরীয় সভ্যতার ধারক। এদের গ্রন্থাদির নিদর্শন মেলে না। তবে বরসিপ্পার বিখ্যাত গ্রন্থাগারের লিখিত চাকতিগুলির অনুলিপি করিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন আসিরীয় রাজা আসুরবানিপাল, এবং নিনেভের গ্রন্থাগারে সেগুলি রক্ষিত ছিল। ব্যাবিলনীয় জীবন ও সভ্যতার নজির মেলে এই থেকেই। আসিরীয় ভাষারও উৎপত্তি সুমেরীয় থেকে, তবে এরা তার কিছু সংস্কার ক'রে নেয়। কিউনিফর্ম লিপির বিশিষ্ট নিদর্শন হাম্মুরাবি সংহিতা এবং গিলগামেশ মহাকাব্য প্যারিসে লুভ্‌র্‌ সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। হাম্মুরাবি সংহিতাটি একরকম দানাদার পাথরেই বেলনাকৃতি খণ্ডে খোদাই করা। গিলগামেশ মহাকাব্য লিখিত হয় পারসিক, ব্যাবিলনীয় ও এলামিট (Elamite)—এই তিন ভাষায়; এটির পাঠোদ্ধার করেন সার হেনরী রলিনসন, ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে।

মিশরীয় সভ্যতার লেখমালা চলন ছিল ৩০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। এদের ভাষা ছিল চিত্রকেন্দ্রিক লিপিমালায়, —যা হায়ারো গ্লিফ (hieroglyph) নামে পরিচিত। শব্দটির উৎপত্তি গ্রীক 'hieros' অর্থাৎ 'পবিত্র' এবং 'glyphein' অর্থাৎ 'খোদাই' থেকে। ৩৯৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই লেখার নিদর্শন মেলে। কোনো একটি চিন্তার রূপ দিতে এরা একটি ছবি আঁকত, —অর্থাৎ একটি শব্দ বসাত। এ রকম ৭০০ বিভিন্ন শব্দ নিয়েই ছিল এদের —যা'কে বলা যায়—বর্ণমালা, বা ভাষা সম্ভার। ২৪ ব্যঞ্জনাক্ষর সম্বলিত এক বর্ণমালারও উদ্ভাবন করে মিশরীয়রা। তবে পুরোপুরি বর্ণাক্ষর না লিখে তারা চিত্রপ্রধান ও ভাবপ্রধান সংকেতাক্ষর মিশ্রিত করেছে দেখা যায়। এতাবৎকাল—সব লিপিই ডান দিক থেকে বাঁ দিকে লেখা। লেখবার সামগ্রী ছিল খাগজাতীয় কলম, জলের ভাঁড় আর কালি গুলবার জন্য চিত্রকরদের মতো সরঞ্জাম। লেখবার বস্তু পেপিরস (papyros)। এই 'পেপিরস' থেকেই ইংরেজি 'পেপার' কথাটির উদ্ভব। নীলনদের জলাভূমিতে ঐ নামে নলখাগড়ার মতো এক ধরণের গাছ জন্মাত। এ দিয়ে দড়ি পাকানো হ'ত, জ্বালানি হিসেবেও ব্যবহৃত হত। বন্যার সময়ে একসঙ্গে তাড়া বেঁধে ভেলার কাজও চলত। এমন কি খাদ্য সংকটের সময় কচি অঙ্কুরগুলি খেয়ে ফেলাও যেত। এই পেপিরস গাছ লম্বায় দশ-বারো হাত, গোড়ার দিকটা হাতের মতো চওড়া, কলাগাছের মতো খোসায় মোড়া। লেখবার জন্য এই খোসাগুলি কেটে নিয়ে একটার উপরে একটা আড়াআড়িভাবে রেখে জল দিয়ে ভিজিয়ে চাপ দিলেই আঠার মতো জুড়ে যেত। তারপরে এই খণ্ডগুলি একটার পর একটা জুড়ে ইচ্ছে মতো লম্বা করে নিয়ে কুষ্ঠির ছকের মতো গুটিয়ে রাখা চলত। প্যারিসের জাতীয় গ্রন্থাগার বিবলিওতেক নাসিও-নেলে যে প্রিসে পেপিরসের (Prisse papyros) নিদর্শন আছে সেটি সম্ভবত প্রাচীনতম মিশরীয় গ্রন্থ। প্তাহহোতেপের (Ptahhotep) প্রবাদ প্রবচনের এই সংগ্রহটির রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব ২৮৮০ শতক বলে অনুমান করা হয়। সম্রাট দ্বিতীয় রামেসাসের ঘটনাপঞ্জী সম্বলিত একটি ১৩০ ফুট পেপিরস পুস্তক সম্ভবত দীর্ঘতম।

হায়ারোগ্লিফ লেখার প্রামান্য নমুনা ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়নের এক সৈনিক কর্তৃক নীলনদের ধারে আবিস্কৃত এক শিলালিপি—যাকে বলে রসেটা শিলা Rosetta (stone)। বৃটিশ মিউজিয়ামে এটি রক্ষিত আছে। শিলা-

লিপিটি তিন ভাষায় উৎকীর্ণ। হায়ারোগ্লিফিক, ডেমটিক, (তৎকালীন চলতি জনপ্রিয় লেখক) এবং গ্রীক। এই ত্রিভাষিক লিখনের সাহায্যে জাঁ ফ্রাঁসোয়া শাঁপেলিয়োঁ হায়ারোগ্লিফ হরফের পাঠোদ্ধারে সক্ষম হন।

গ্রীকদের সভ্যতা সুপ্রাচীন ও মহৎ। কিন্তু ১৪৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রোমকরা গ্রীস দখল করে। তারপরে গ্রীস ও রোমের সভ্যতা মিলে মিশে গিয়েছে কিছু কাল ধ'রে। কেননা রাজ্য দখল করলেও অতবড় একটা সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য রোমকদের উপরেই প্রভাব বিস্তার করে। লাতিন সাহিত্য খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে গ'ড়ে উঠতে থাকে। গ্রীস ও রোমে (ইতালি) যে সব সামগ্রীর উপরে লেখা হ'ত সেগুলি হল গাছের পাতা বা ছাল, পাথর এবং ব্রোন্‌জ (bronze), আর কাটের খণ্ড। পেপিরসেও কিছুকাল লেখা হয়েছিল। আর লেখা হ'ত পার্চমেণ্ট ও ভেলম্ (vellum) জাতীয় চামড়ার উপরে। কাঠের উপরে লেখার জন্য কাঠের চেরা কাট সমান মাপে কেটে নিয়ে তার উপরে চিটচিটে তরল মোম মেখে চাকু বা নরুন দিয়ে খোদাই করা হত। কাঠের পাতগুলো কবজা দিয়ে একটার সংগে একটা জুড়ে নিয়ে একেকটি গ্রন্থ তৈরী হ'ত। এই ভাবে রোমকরা সেকালে ধর্মগ্রন্থ; আইন, অনুশাসন প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করেছে। লাতিন ভাষায় এই গ্রন্থকে বলা হ'ত 'কোডেক্স' (Codex), যার থেকে 'কোড' (Code)কথাটি এসেছে। গ্রীস ও রোমের প্রবর্তিত লেখার কায়দা এবং বর্ণমালা পদ্ধতি সভ্য জগতে এক বিশেষ দান। লেখা হয়েছে বাঁ দিক থেকে ডাইনে। রোমকদের প্রবর্তিত বর্ণমালা ও হরফ এবং গানিতিক সংখ্যাচিহ্ন ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করেছে একথা সকলেরই জানা।

লিখবার কাজে, সাপ, বাছুর, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতির চামড়াও ব্যবহৃত হয়েছে। সব চেয়ে ভাল চামড়া পার্চমেণ্ট আর ভেলম। ভেড়া বা বাছুরের চামড়া ভাল ক'রে ধুয়ে চূণ মেখে লোম করিয়ে ফেলা হ'ত। তার পরে সেই চামড়ার খণ্ডটিকে একটা কাঠামোতে টান ক'রে বেঁধে নিয়ে চেঁছে সাফ করে খড়ির গুঁড়ো ছড়িয়ে পাথর দিয়ে ঘষা হ'ত। লেখা হত ছুঁচোলো কলম দিয়ে। ভাল পার্চমেণ্টকে রেশমের সঙ্গে তুলনা করা চলে। পার্চমেণ্টেরই উৎকৃষ্টতম রূপ ভেলম, যা তৈরী হ'ত মৃতজন্মা অথবা অকাল-জাত বা অজাত বাছুরের চামড়া থেকে। ইহুদিরা আর পারসিকরা এর উপরে বহু বিখ্যাত বই লিখেছেন।

গাছের ছালকে পরিষ্কার ক'রে নিয়ে তার উপরে লিখত প্রায় সকল দেশেরই প্রাচীন লিখিয়েরা। কলদীয়রা গাছের এই ছালকে বলত 'লিবার' (liber) এই থেকে লাতিন 'লিব্‌র্‌ (libre) কথাটি এসেছে—যার মানে 'বই'। লাইব্রেরি' শব্দের উদ্ভব এইভাবে।

চীন দেশে অন্তত ৩০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সুষ্ঠু লিখন পদ্ধতির নিদর্শন মেলে। লিখবার সামগ্রী হিসেবে হাড়, কচ্ছপের খোল, বাঁশ, কাঠ, রেশম, এবং সুতি বস্ত্রের ব্যবহার ছিল। লেখা হত সামগ্রীভেদে চোখা অস্ত্র, পালকের কলম এবং তুলি দিয়ে। লিখন ধারা ডান দিক থেকে বাঁদিকে, পংক্তি বিন্যাস সমান্তরাল না হয়ে উপর থেকে নিচে। তবে আজকাল ইংরেজি বাংলার মতো বাঁ দিক থেকে ডান দিকে পংক্তি বিন্যাস চলছে।

ভারতবর্ষে ভূর্জপাতা, তালপাতা, এবং গাছের ছালের উপরে লিখবার বহু প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায়। বাঁশ এবং কাঠের উল্লেখও পাই। তবে নানান জাতির অভ্যুত্থান-পতনের মধ্যে ঐতিহাসিক ধারা রক্ষিত হয়নি। তাল পাতার উপরে লেখা শুধু ভারতেই নয়, সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম প্রভৃতি দেশেও চালু ছিল। তাল পাতার লম্বা লম্বা ফালিগুলির মাঝখানে ফুটো করে তার মধ্য দিয়ে সুতো চালিয়ে গেঁথে রাখা হ'ত। একের পর এক পাতা। তার পরে প্রমান মাপের দু'খণ্ড কাঠ এদিকে ওদিকে চাপিয়ে বেঁধে নিয়ে তৈরি হত একেকটি পুথি বা গ্রন্থ। এই কাঠের উপরে নানাবিধ নকশা আঁকবার প্রবণতা থেকে বিচিত্র চিত্রকর্মের নিদর্শন মেলে। বই এর 'পাতা' এবং 'পত্রাঙ্ক' কথা দুটির উৎপত্তি লিখবার সামগ্রী এই 'পত্র' থেকে। আর লিখিত এই পত্রপুঞ্জ একসঙ্গে গাঁথা বা 'গ্রন্থিত' হয়ে যে-সমগ্র পুথির সৃষ্টি তা 'গ্রন্থ'। 'পুস্তক' শব্দটি পারসিক 'পুস্ত্‌' অর্থাৎ 'চামড়া' থেকে উৎপন্ন।

ভারতবর্ষে যেসব প্রাচীন লিপিমালার ব্যবহার হয়েছিল তা'ও বিচিত্র। সিন্ধু উপত্যকার হরপ্পা ও মহেন্‌জোদারো খননের ফলে বহুবিধ পোড়ামাটি এবং ধাতুর মোহরাকিত লিপি সম্বলিত চাক্‌তি এবং মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। অন্তত আড়াই হাজার তিনহাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দের এই সভ্যতায় ব্যবহৃত লিপির অবিসংবাদিত পাঠোদ্ধার এখনো সম্ভব হয়নি। ভারতে দুটি প্রাচীন লিপির প্রচলন ছিল, খরোষ্ঠী এবং ব্রাহ্মী, ব্রাহ্মী লিপি থেকে ভারতীয় লিপিমালার উৎপত্তি। সম্রাট অশোকের জয়স্তম্ভের যেসব লিপি দেখা গিয়েছে তার মধ্যে মাত্র দুটি খরোষ্ঠী লিপিতে (ডান দিক থেকে বাঁয়ে) লেখা। বাকি সবই ব্রাহ্মী

লিপিতে (বাঁদিক থেকে ডাইনে) উৎকীর্ণ। খরোষ্ঠী লিপির প্রসার ভারতে হয়নি। ভারতে লেখা ও লেখনীর অস্তিত্বের প্রমান বুদ্ধের জীবনী এবং বৌদ্ধ জাতক কাহিনীর মধ্যে মেলে। তা'তে 'লেখক' 'অক্ষর' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার দেখি। ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে সংস্কৃত ও পালি।

## সেকালের গ্রন্থ সংগ্রহ কথা

আজকের দিনে শহরে গ্রামে ইস্কুলে কলেজে অনেক লাইব্রেরী বা গ্রন্থাগার দেখা যায়। গ্রন্থাগার গড়ে তোলাও এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। টাকা থাকলে নিজের বাড়িতেই একটা ছোটখাট লাইব্রেরী বানানো যায়। বাজারে বইএর কোনো অভাব নেই,—কিনে আনলে হ'লো।

কিন্তু এক কালে এ রকম ছিল না। এমন যুগ তো ছিল যখন কাগজ ছিল না, ছাপাখানা ছিল না, বইএর নকল করার কাজ ছিল দুরূহ,—তবু লেখা পড়ার ইচ্ছে বা দরকার ছিল মানুষের। তখনকার দিনে তারা কী করেছে? পণ্ডিতদের কাছে ছিল পুথি, সুতরাং ছাত্ররা বিদ্যালাভের জন্য তাঁদের কাছে যেত, প্রয়োজনীয় বিষয় নকল করে নিতে পারে তো পারল, নয়তো মুখস্থ করে ফেলতে হত সবটা। পণ্ডিতেরা অনেক সময়েই নিজ নিজ বিদ্যার ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবার উদ্দেশ্যে কোনো পড়ুয়াকে পুথির নকল করতে দিতেন না। তাই মিথিলার পণ্ডিত নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রের টোলে অধ্যয়ন শেষ করে বাসুদেব সার্ব্বভৌম নবদ্বীপে ন্যায়চর্চার পত্তন করেন তাঁর অধীন পুথির বিদ্যা মুখস্থ করে নিয়ে এসে। সেকালে পুথির অনেকগুলো করে নকল রাখার কাজও কঠিন ছিল। তাই চুরি করে বা জোর করে পুথি সংগ্রহের চেষ্টাও দেখা যেত। সে যাই হোক, পুথির সম্পত্তি ক্রমে যেমন বাড়তে লাগল তেমনি তা গুছিয়ে রাখবার প্রয়োজনও দেখা দিল। এইভাবে সুরু হল গ্রন্থ সংরক্ষণ পদ্ধতির। নানান প্রাকৃতিক দুর্যোগে সেকালে পৃথিবীর অনেক গ্রন্থশালা নষ্ট হয়েছে। যেমন বিসুবিয়াসের অগ্ন্যুদ্গারে পম্পেই শহরের গ্রন্থরাজি। অগ্নিকাণ্ড এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নালন্দার গ্রন্থৈশ্বর্য। যুদ্ধে যে পক্ষ জয়ী হত সে পক্ষ বিজিত দেশের সব সম্পদ নষ্ট করে দিত। এবং নিজেদের আইন কানুন, ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম সংস্কৃতি সব চালু করত। ভারতের তাবৎ ঐশ্বর্য-বিলুপ্তির এই ইতিহাস। চীনে হো-আং-তি অথবা

পীত সম্রাটের ইতিহাস অনুশাসনাদি পরবর্তী আমলে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই তো সেদিনও আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামে লাইব্রেরী অফ কংগ্রেসটি পুড়িয়ে দিয়েছিল ইংরেজরা।

তবু, দুর্যোগ দুর্বিপাক সত্বেও অনেক প্রাচীন গ্রন্থাগারের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। একেক দেশের সভ্যতা যে কত পুরোনো তা জানা গিয়েছে খুঁড়ে পাওয়া নানাবিধ সামগ্রী থেকে। তার মধ্যে পুথিও আছে, —বিচিত্র ধরনের সব পুথি। সুমেরীয়রা ২৭০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে ব্যক্তিগত, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগত এবং সরকারী গ্রন্থাগার গড়ে তুলে ছিলেন। তেল্লো শহরে এক গ্রন্থাগারে ৩০,০০০ পোড়ামাটির চাকতি বই ছিল। ব্যাবিলনের 'আক্কাদ' গ্রন্থাগার ১৭০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে স্থাপিত বলে অনুমান হয়; এর লিখিত সম্পদও ছিল পোড়া টালির পুথি। ব্যাবিলনীয়রা আইন-গ্রন্থ রচনা করেছিলেন অনেক,—আর ঐ সঙ্গে ধর্মগ্রন্থ ও ইতিহাস। ইজিপ্টের গিজে শহরে খৃষ্টপূর্ব ২৫০০ শতকে গ্রন্থাগার বর্তমান ছিল। সম্রাট দ্বিতীয় রামেসাসের রাজত্বকালে (১৩০০-১২৩৬) খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) থিবেস এবং মেম্ফিস শহরদ্বয়ে দুটি বৃহৎ গ্রন্থাগার ছিল। গ্রন্থ-সজ্জাতেও নিয়মানুবর্তিতা লক্ষিত হয়। মাটির পাত্রে পেপিরসের গুটানো গ্রন্থ রেখে তার গায়ে গ্রন্থের বিবরণ লিখে সারিবদ্ধভাবে রাখা হত পুস্তকমঞ্চে। আসিরিয়ার নিনেভে শহরে সম্রাট আসুরবানিপাল ষষ্ঠ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে যে বিরাট গ্রন্থাগার গড়ে তোলেন তা ঐতিহ্যমণ্ডিত। তাঁর নিযুক্ত লিখিয়েরা ব্যাবিলনিয়া আসিরিয়া প্রভৃতির নানান জায়গায় ঘুরে মাটির চাক্তির উপরে নকল ক'রে আনত হাজার হাজার পুথি। সূচীকরণ পদ্ধতি পর্যন্ত তিনি চালু করেছিলেন। পুস্তক মঞ্চের প্রতি সারিতে বিষয় অনুযায়ী গ্রন্থ সাজানো থাকত এবং প্রতিটি চাক্তির সঙ্গে পরিচয়-চিহ্ন লেখা চিরকুট থাকত। আর একেক কামরায় বা মঞ্চসমূহের প্রবেশ মুখে গ্রন্থরাজির তালিকা থাকত লিপিবদ্ধ।

গ্রীসের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে ইউরিপিডিসের এক বিশিষ্ট গ্রন্থাগার ছিল। ষষ্ঠ খৃষ্টপূর্বাব্দে আরেকটি গ্রন্থাগারের মালিক ছিলেন পিসিস্ট্রেটস্। এরিস্টটলের বিষয়ানুক্রমিক গ্রন্থবর্গীকরণের প্রচেষ্টার কথা গ্রন্থজগৎ বিদিত। সম্রাট টলেমির রাজত্বকালে (৩১৩-২৮৩ খৃঃ পূঃ) আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারদ্বয়ের প্রায় সাত লক্ষ গ্রন্থ সংগ্রহ সেকালের পণ্ডিত-কুলের গৌরব ছিল। ডেমেট্রিয়স্ ছিলেন অন্যতম গ্রন্থাগারিক। পুথিগুলি ছিল পেপিরসে লেখা। প্রথম গ্রন্থসূচী প্রণয়নের কৃতিত্বও এঁদেরই।

এর পরেই উল্লেখযোগ্য সম্রাট দ্বিতীয় ইউমেনেস্ ( ১৯৭-১৫৯ খৃঃ পূঃ ) স্থাপিত পারগেমাম শহরের গ্রন্থাগার। খ্যাতনামা কবি ও বৈয়াকরনিক ইউফোরিয়ান ছিলেন এর গ্রন্থাগারিক। সাহিত্য বিষয়ক পুস্তকের জন্য এই গ্রন্থাগার ছিল বিখ্যাত। প্লুটার্কের 'বিশিষ্ট ব্যক্তি জীবনী' গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে। পেপিরস ছাড়া পার্চমেণ্টেও এখানে প্রচুর বই লেখা হয়েছিল। গ্রথিত থাকত 'কোডেক্স্' পদ্ধতিতে—আধুনিক কালের বইএর আকারে। কমোডাসের রাজত্বকালে ( ১৮০-৯২ খৃঃ পূঃ ) আলেকজান্দ্রিয়াতে একটি গির্জাকেন্দ্রিক গ্রন্থাগারও গড়ে উঠেছিল।

রোমে ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার স্থাপনের উৎসাহ দেখা দিয়েছিল সেকালেই। সিসেরোর ( ১০৬-৪৩ খৃঃ পূঃ ) বিভিন্ন বাসগৃহের প্রত্যেকটিতেই ছিল তাঁর গ্রন্থ সংগ্রহ। লুকুল্লাসের ( ১১৪-৫৭ খৃঃ পূঃ ) গ্রন্থাগারের কথা প্লুটার্ক লিখে গিয়েছেন। ৮৬ খৃষ্টপূর্বাব্দে সুল্লা এথেন্স জয় ক'রে এরিষ্টটলের গ্রন্থাগারটি রোমে নিয়ে যান এবং গ্রন্থাগারিক পদে এন্‌ড্রনিকাস ও টিরান্নিয়নকে বহাল করেন। কনস্তান্তিনোপল্ যখন রাজধানী ছিল তখন সেখানকার গ্রন্থাগারে গ্রন্থ সংখ্যা ছিল এক লক্ষ ; গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন পুলিয়ান ও থিওডিসিয়াস্। রোমে খনন কার্যের ফলে বিবলিওতেকা আসাপেটি' নামে এক বিশাল গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়। পোপ আগাপেটাস্ ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকেই এটিকে বাধিত করেন। সেভিলের ইসিডোর ( ৫৭০-৬৩৬ খৃঃ ) বিশিষ্ট এক বিশ্বকোষ রচনা করেন। সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিকল্পনা করেছিলেন জুলিয়াস সিজার, তবে তা রূপায়িত হয় অগাষ্টাসের রাজত্বকালে, – খৃষ্টপূর্ব ৩৯-২৭ অব্দে। এবং সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব পান আসিনিয়াস্ পোল্লিও ( ৭৬ খৃঃ পূঃ—৫ খৃঃ ) ; স্থাপিত হয় ৩৭ খৃষ্টপূর্বাব্দে। ৩৩ খৃষ্টপূর্বাব্দে স্থাপিত হয় অক্টেভিয়ান লাইব্রেরী। চতুর্থ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রোমে আঠাশটি সাধারণ গ্রন্থাগার গ'ড়ে ওঠে। এর মধ্যে আলপিয়ান লাইব্রেরীতে একপাশে গ্রীক বই ও অন্যধারে লাতিন বই সাজানো থাকত ; সাজাবার পদ্ধতি বিষয়ানুক্রমিক, খোপের মধ্যে তাকে সাজানো থাকত বইগুলি, —পড়তে হ'ত স্বতন্ত্র পাঠকক্ষে ব'সে। রোম করা আইন, বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থরচনা ও সংগ্রহ করেছেন। সেণ্টটমাস একুইনাস ( ১২২৪-৭৪ খৃঃ ) রচিত খৃষ্টীয় ধর্মচিন্তা এক জগদ্বিখ্যাত বিরাট রচনা।

জেরুসালেমে খৃষ্টীয় শতাব্দির প্রারম্ভ থেকেই গ্রন্থাগার পত্তনের সুরু।

প্যালেষ্টাইনে বিশপ আলেকজাণ্ডার ( ২১২-৫০ খৃঃ পূঃ ) একটি গ্রন্থাগার গ'ড়ে তুলেছিলেন। ধর্মকলহের ফলে এখানকার গ্রন্থরাজি নষ্ট হয়ে যায়। নচেৎ, ২২০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ থেকে তাদের লিখিত সম্পদের উল্লেখ মেলে। এবং 'প্রাচীন সুসমাচার' ( Old Testament ) প্রভৃতি হিব্রু রচনা-সম্পদ যাদের, তাদের ঐতিহ্যের আরো নিদর্শন থাকাই ছিল স্বাভাবিক।

বাগদাদের স্বর্ণযুগে খলিফা হারুন-অল্-রসিদের সময়ে আরবের ঐতিহাসিক ওমর-অল্-ওয়াকিদির যে পরিমাণ পুথি ছিল তা'তে একশো কুড়িটা উট বোঝাই হয়ে যেত। হারুন-অল্-রসিদের পুত্র খলিফা অল্-মামুদের গ্রন্থাগার 'জ্ঞান ভাণ্ডার' স্থাপিত হয় ৮১৩ খৃষ্টাব্দে। ৯৯১ খৃষ্টাব্দে 'জ্ঞান কেন্দ্র' গ্রন্থাগার গড়ে গেলেন আরদাশির। তারপরে একে একে মাদ্রাসা স্থাপিত হ'তে থাকে। দ্বাদশ শতাব্দীতে সেখানে ছিল ছত্রিশটি গ্রন্থাগার, এর মধ্যে একটির গ্রন্থসংখ্যা ছিল দশ হাজার। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সবই ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে মোঙ্গোল আক্রমণের ফলে ধ্বংস হ'য়ে যায়। বাগদাদে পুস্তক বিক্রেতার সংখ্যাও ছিল একশোর বেশি।

প্রাচীন পারস্যে ব্যক্তিগত এবং সাধারণ গ্রন্থাগার ছিল অনেক। জ্ঞান-চর্চার বিশেষ কদর ছিল সেদেশে। বোখারোতে চিকিৎসক-দার্শনিক আবু আলি ইবন্ সিনা ( অর্থাৎ অবিচেন্না ৯৮০-১০১৭ খৃঃ ) সুলতান নু ইবন্ মনসুরের প্রাসাদ-গ্রন্থাগার সম্পর্কে বলেছেন, সেখানে একটা ঘরে আরবি ব্যাকরণ ও কবিতা, আরেকটা ঘরে আইনের বই এমনি ভাবে প্রতিটি বিষয়ের জন্য আলাদা কামরা ছিল। পণ্ডিত ইবন্ আব্বাদের ( ৯৩৮-৯৯৫ খৃঃ ) চারশো উট বোঝাই পুথি ছিল, তা'র সূচী বা ক্যাটলগ গ্রন্থই ছিল দশ খণ্ড। নিশাপুর, ইস্পাহান, বসরা, সিরাজ, মসুল প্রভৃতি প্রতিটি শহরে ছিল গ্রন্থাগার। কবি ইবন্ হামদা মনসুলে এক 'জ্ঞানকেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা করেন সেখানে পণ্ডিতদের প্রবেশ ছিল অবারিত, —অশুল্ক। এমনকি, গরীব পড়ুয়াদের সেখানে বিনামূল্যে কাগজও দেওয়া হ'ত।

কায়রোর প্রথম গ্রন্থাগার স্থাপন করেন খলিফা অল্-আজিজ ( ৯৭৫-৯৯৬ খৃঃ ) ৯৮৮ খৃষ্টাব্দে। পঁয়তিরিশটি ছাত্র সেখানে পড়বার জন্য খরচ পেত। এটির গ্রন্থ সংখ্যা ছিল এক লক্ষ। ছন্দ, ব্যাকরণ, ইতিহাস, আইন, জীবন, জ্যোতিষ, রসায়ণ প্রভৃতি বিষয়ের জন্য আলাদা কামরা ছিল। প্রত্যেক ঘরের দরজায় সেই ঘরে রক্ষিত বই এর তালিকা টাঙানো থাকত।

ইংলণ্ডের গ্রন্থেতিহাস বেশি পুরোনো নয়। বেনেভিক্ট বিসকপ রোম থেকে বই এনে তাঁর জন্মস্থান নর্দ্দাম্‌ব্রিয়াতে প্রতিষ্ঠিত ওয়্যার মাউথ মঠে ( Wear-mouth monastery ) ৬৭৪ খৃষ্টাব্দে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগার তৈরী করেন। ৬৭০-৭৩৫ খৃঃ মধ্যে সেদেশে অনেক গ্রন্থাগার গ'ড়ে ওঠে। ৮৭৫ খৃষ্টাব্দে দিমেণার আক্রমণে বহু গ্রন্থ সংগ্রহ নষ্ট হয় ; তা'র মধ্যে বিখ্যাত ইয়র্ক ও ক্যান্‌টারবারি সংগ্রহও ছিল। দশম শতাব্দিতে উইনচেস্টার। উর্সেষ্টার ও ক্যান্‌টারবারি লাইব্রেরী উল্লেখযোগ্য। ক্যান্‌টারবারি ক্রাইস্ট চার্চের যে গ্রন্থ তালিকা এষ্ট্রির প্রায়র হেনরি ( ১২৮৫-১৩৩১ খৃঃ ) প্রস্তুত করেছিলেন তাতে তিন হাজার বইএর নাম পাওয়া যায়। চতুর্দশ শতাব্দিতে ক্যান্‌টারবারি কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। আর আলাদাভাবে গ্রন্থাগার প্রতিষ্টিত হ'তে থাকে পঞ্চদশ শতাব্দিতে। ফ্রান্সের গ্রন্থাগারের সমৃদ্ধি ও রাজাদের দৌলতে। বিবলিওতেক নাসিওনেল জন্ম নিল সম্রাট দ্বিতীয় জন-এর আমলে। লুভ্‌র্‌ সংগ্রহের প্রথম গ্রন্থাগারিক ছিলেন গিলে মালে ( ১৩৬৫ থেকে ১৪১১ পর্যন্ত )। ত্রয়োদশ শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে কলেজকে কেন্দ্র ক'রে সরবম্‌ লাইব্রেরীর সূত্রপাত।

প্রাচীন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত বইগুলির পাতা ছিল পেপিরসের। প্রাচীন ইজিপ্ট, ব্যাবিলন বা কলদীয় প্রভৃতি রাজ্যের গ্রন্থচর্চার যে-নিদর্শন পাওয়া তার মধ্যে মাটির তক্তির বইও আছে। আমাদের দেশে গাছের পাতা বা ছালের উপর লেখা পুথির চল ছিল। মধ্যযুগে বই রাখা হ'ত মঠে বা গির্জায়। এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। ভারত, তিব্বত প্রভৃতি দেশেও মন্দিরে পুথি রাখার নজির মেলে। পণ্ডিতদের নিজ নিজ পুথির স্বতন্ত্র সংগ্রহ ছিল। একেকটি বই ধ'রে ধ'রে লিখতে আর নকসা কাটতে ছবি আঁকতে সময় লাগত প্রচুর, খরচও কম হ'ত না। একাধিক বই নকল করা যেমন কষ্টসাধ্য ছিল, তেমনি একটির অনুরূপ হুবহু আরেকটি তৈরী করাও সম্ভব হ'ত না। তাই নিরাপত্তার জন্য সেযুগে সব দেশেই এ রকম অনেক বিশিষ্ট গ্রন্থ পড়বার ঘরে শিকল দিয়ে আটকানো থাকত। আমাদের দেশে ধর্মভীতি প্রবল ছিল, তাই পুথিলেখক নানাবিধ দিব্যি দিয়ে ছড়া লিখে দিত পুথিতে ; —'এই বই যে চুরি করিবে সে গোমাংস ভক্ষন, পিতৃহত্যা, নারীহত্যা, ভ্রূণহত্যা প্রভৃতির পাতকী হইবেক ইত্যাদি। আজকাল ছাপাখানা এবং কাগজের দৌলতে এক বই এর সহস্র প্রতিলিপি এদেশে ওদেশে যাচ্ছে, পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় ব'সে হাতের

কাছে যে কোনো বই মিলছে। কিন্তু সেকালে পছন্দ মতো বই পড়তে আর ইচ্ছে মত জ্ঞানার্জন করতে মানুষকেই ন'ড়ে চ'ড়ে এখান থেকে ওখানে যেতে হ'ত। নালন্দা, তক্ষশীলা প্রভৃতি বিদ্যাপীঠে দেশ-বিদেশ থেকে শিক্ষার্থীরা আসতেন। আবার জ্ঞান বিতরণের জন্য যেতেনও। শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর, কুমারজীব প্রভৃতি গিয়েছিলেন তিব্বতে, চীনে, ইৎসিং, ফা শিয়েন, গুয়ানৎসং প্রভৃতি চীন থেকে এসেছিলেন ভারতে।

ভারতে হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের গ্রন্থ গৌরব অন্যান্য দেশের তুলনায় কম নয়। হিন্দু বিদ্যাপীঠ তক্ষশীলার গ্রন্থাগার খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ট শতাব্দিতেও সুসমৃদ্ধ ছিল। গৌতম বুদ্ধ, জীবক চরক, কৌটিল্য প্রভৃতি এই বিশ্ব বিদ্যালয়েরই ছাত্র। কহ্লন, ক্ষেমেন্দ্র, ভামহ, মম্মট প্রভৃতি ছিলেন কাশ্মীর ও সারদাপীঠ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রত্ন। বিজাপুরের 'বিদ্যাপুরী' এবং নগরকোটের জ্বালামুখী মন্দিরের গ্রন্থ সংগ্রহ সেকালের গৌরবের সাক্ষ্য দিত। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদ, হেতুবিদ্যা, শব্দবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, সাংখ্য, তন্ত্র, ব্যাকরন প্রভৃতি শেখানো হ'ত এখানকার গ্রন্থাগার পৃথিবীর যে-কোনো দেশের পক্ষেই গৌরব সূচক। গ্রন্থগৃহ বা 'জ্ঞানভাণ্ডার'টির নাম ছিল 'ধর্মগঞ্জ'। তিনটি স্বতন্ত্র বাড়ী নিয়ে ছিল এই গ্রন্থাগার। এগুলির নাম ছিল রত্নসাগর, রত্নোদধি এবং রত্নরঞ্জক। এক রত্নোদধি বাড়ীটিই ছিল নয়তালা বিশিষ্ট। চীনা পরিব্রাজকদের কাহিনীতে দেখা যায় নালন্দায় ১৫০০ আচার্য্য এবং ১০০০০ শিক্ষার্থী ছিলেন এককালে। নবম শতাব্দীতে বিক্রমশীলায় ছয়টি মহাবিদ্যালয় বা কলেজ ছিল। এর প্রত্যেকটিতে একশো আটজন করে অধ্যাপক ছিলেন। ওদন্ত পুরীর নাম বিদ্যাকেন্দ্র হিসেবে সুদূরপ্রসারী ছিল দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত। কিন্তু এ সবই বিদেশী বিধর্মীদের আক্রমণের তাণ্ডবলীলায় নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গিয়েছে। নালন্দা মহাবিহারের অস্তিত্ব দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত ছিল বলে জানা যায়। বিক্রমশীলা ধ্বংস হয় বক্তিয়ার খিলজীর আক্রমণে ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে।

দক্ষিণ ভারতে মহীশূরের সালতোগি, আরকটের এন্নারিয়ম, চিঙ্গলেপুটের তিরুমোক্ষদা প্রভৃতির বিদ্যায়তন বিখ্যাত ছিল। আর্যভট্ট, বরাহ মিহির, ভাস্করাচার্য প্রভৃতি এই সব কেন্দ্রের রত্নবিশেষ। দক্ষিনের মন্দিরগুলিতে বহু মূল্যবান পুথির সংগ্রহ ছিল। মুসলমানী আমলে তুলোট কাগজে লেখার প্রথা প্রথম এদেশে চালু হয়। আদি মধ্যযুগে লিখন শিল্প, পুস্তক শিল্প এবং গ্রন্থাগার এদেরাহাতে ও নূতন রূপ ব্যপ্তি পেতে থাকে।

মধ্যযুগের ইউরোপে বইএর কোনো বাজার ছিল না। নকল ক'রে বা করিয়ে নিতে হ'ত। বই পাওয়া যেত 'স্তাসিয়োনারি' (stacionarii) দোকানে। এসব দোকান থাকত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। আর থাকত নকলনবীশের দল। পরিচালনার দায়িত্ব নিত বিশ্ববিদ্যালয়েরই কর্তৃপক্ষ। ১৩৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এই দায়িত্ববান সম্পর্কে 'লিব্রেয়ার' (libraire) কথাটির প্রচলন দেখি, — অর্থ. গ্রন্থধিপ' (bookman)। ১২৩০ খৃষ্টাব্দে জার্মানির ষ্ট্রাসবুর্গে 'স্তাসিয়োনিয়েরার' (stacionierer) দেখি পুস্তক-ব্যবসায়ী হিসেবে। ১৩৬৫ খৃষ্টাব্দে ভিয়েনার বিশ্ববিদ্যালয়-সংযুক্ত পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র হিসেবে দেখি 'লিব্ররী' (librarii)। ১৪০৩ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনস্থ 'স্টেশনার'রা সংস্থা গড়ল বই এর। প্রথম প্রকাশ-সংক্রান্ত নিয়ম চালু হ'তে দেখা যায় ১২৫৯ খৃষ্টাব্দে ইতালীর বলোনা-তে। আদিম যুগের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে ছিল বলোনা, প্যারিস, প্রাগ, হাইডেলবার্গ, অক্সফোর্ড এবং কেমব্রিজ। ১২৭৫ খৃষ্টাব্দে প্যারীস বিশ্ববিদ্যালয়ও অনুরূপ একটি গ্রন্থকানুন চালু করে।

গ্রন্থাগারের লিখিত সম্পদ, অর্থাৎ গ্রন্থরাজি নানাভাবে ভাগ করবার চেষ্টা প্রাচীন আমল থেকেই হয়ে এসেছে। ধর্মগ্রন্থের বিভিন্ন বিভাগ, আইন, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি নানান বিষয়ের নানানভাবে তালিকা করা হয়েছে। সরু তাকে বিষয় বা পুথির প্রকার অনুসারে মাটির চাকতি সাজিয়ে রাখা হত। পেপিরস-পুথি গোল করে গুটিয়ে কয়েকটি সাংকেতিক বিবরণসহ মাটির রয়ামে অথবা ধাতু গোলকে রাখা হত। পার্চমেণ্ট থাকত গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থনাম অনুযায়ী অথবা বিষয় কিম্বা ধাঁচ অনুযায়ী বিভিন্ন তাকে বা পাত্রে সজ্জিত। দ্বাদশ শতাব্দী নাগাদ দেখা যায় বই কোথায় কোন তাকে রাখা হবে তার জন্যও চিহ্নের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অর্থাৎ বর্গীকরণের কাছ ঘেঁষে যাচ্ছে চিন্তাধারা, খুঁটিনাটি পদ্ধতিতে। যে-সব দামী অথবা বেশী ব্যবহৃত হয়না সেগুলো বাক্সে তুলে রাখা হত, এবং এক্ষেত্রেও নিদর্শন-চিহ্নের ব্যবস্থা ছিল। এই চিহ্ন সাধারণত বর্ণমালার হরফ দিয়ে করা হ'ত। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে এই প্রচেষ্টায় ঐক্য আনবার সূত্রপাত দেখি। বইএর গায়ে চিরকুট সেঁটে দেওয়া হত নানান রঙের। যেমন, আলতেনজেনের বই ছিল ছত্রিশটি তাকে বিন্যস্ত, তার মধ্যে ধর্মগ্রন্থের জন্য লাল রং, চিকিৎসা শাস্ত্রের সবুজ এবং আইনগ্রন্থে কালো রঙের তাপ্পি লাগানো হ'ত। ১৩৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ডোভারের সেণ্ট মার্টিন গ্রন্থাগারে একটি লেখক তালিকা (author catalogue) পর্যন্ত করা হয়েছিল।

মধ্যযুগীয় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বিভাগ ছিল গঠিত বিষয়ানুক্রমিক, এবং সাজানো থাকত বইএর আকৃতি এবং গ্রন্থ সংখ্যা অনুসারে। ইংলণ্ডের সেণ্টপলস্ ক্যাথিড্রেলের একটি গ্রন্থ সংগ্রহের ১৫০৬ খৃষ্টাব্দে লেখা হিসেবে দেখা যায় নানাবিধ চামড়া, লাল-নীল সুতো, আঠার জন্য ময়দা, কালি ছুঁচ প্রভৃতি কেনা হয়েছিল। আর খরিদ করা হয়েছিল আশিটি শিকল —বই বেঁধে রাখবার জন্য, —সেই সঙ্গে সেগুলি আটকে রাখবার নোঙ্গর হিসেবে একশো পাঁচ পাউণ্ড ওজনের নয়টি লৌহদণ্ড। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরীর জন্য ১৩৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এক কানুনের প্রবর্তন হয়; বইগুলি সভাকক্ষের উপরে শিকল দিয়ে বাঁধা অবস্থায় থাকবে —যাতে পড়ুয়ারা যখন খুশি এসে ব্যবহার করতে পারে; চল্লিশ পাউণ্ড পর্যন্ত দামের বই বিক্রি করে গ্রন্থরক্ষার খরচ তোলা যেতে পারে, ইত্যাদি। ১৪১২ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাগারের আয়তন বেড়ে উঠায় নূতন ক'রে কানুন তৈরী হল; নির্বাচন দ্বারা এক বিশিষ্ট ব্যক্তির হাতে গ্রন্থাগারের ভার দেওয়া হবে; কর্মান্তে তিনি আচার্যের হাতে গ্রন্থ গৃহের চাবি প্রত্যর্পন করবেন; বিশ্বস্ত বিবেচিত হলে পুনরায় নিযুক্ত হতে পারবেন; কর্মত্যাগ করতে হলে একমাস আগে জানাতে হবে; গ্রন্থাগারিক হিসেবে তিনি একশো শিলিং বেতন ও ছয় শিলিং আট পেনি বিশেষ ভাতা বছরে দুই কিস্তিতে নিয়মিত পাবেন— যাতে বেতনের গোলমালে তাঁর কর্মে অবহেলা না আসে; এছাড়াও প্রত্যেক স্নাতক শিক্ষাশেষে তাঁকে একটি করে পোষাক দেবেন; নির্বাচনের সময়ে গ্রন্থাগারের নিয়মাবলী তাঁকে পড়ে শোনানো হবে এবং তিনি তা পালনের শপথ নেবেন। পড়ুয়াদের জন্যও নিয়ম করা হ'ল; আট বছর দর্শন পাঠ করছেন এমন স্নাতক বা কর্মীরাই গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারবেন; অন্যান্য আবাসিকদের শপথ নিতে হবে যেন বইএর কোনো ক্ষতি না হয়; স্নাতক ছাত্রদের বিশেষ পোষাক পরতে হবে; গ্রন্থাগার খোলা থাকবে সকাল ন'টা থেকে এগারোটা এবং বেলা একটা থেকে চারটে পর্যন্ত। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি কলেজ লাইব্রেরীর এই ১২৮০ খৃষ্টাব্দে তৈরী এবং ১২৯২ খ্রীষ্টাব্দে সংশোধিত নিয়মাবলীই গ্রন্থাগার জগতের প্রথম প্রবর্তিত কানুন।

---

# ২য় অধ্যায়

## গ্রন্থকথা

দ্বিতীয় অধ্যায়

সে যুগে যখন হাতে লিখে লিখে পুথির নকল করতে হ'ত তখন থেকে একই লিপির একাধিক নকল করবার সহজ উপায়ের কথা মানুষ চিন্তা করেছে। তার বহু নিদর্শন আমরা পাই প্রত্নতাত্ত্বিক মাটির বা কাঠের ফলকে, নানাবিধ মুদ্রায়। কাঠের ফলকে নকশা এঁকে কাপড়ের উপরে ছাপ তোলা সেকালের প্রচলিত শিল্পরীতি ছিল। এভাবে বই ও ছাপানো হয়েছে। তার প্রমান তিব্বতী ত্রিপিটকের কাঠ খোদাই ( Xylograph ) প্রতিলিপি, পণ্ডিত মহলে তানজুর ও কানজুর সংস্করণ নামে বিরল গ্রন্থ। ইউরোপে এই পদ্ধতিতে ছাপানো ব্লক ( Block ) বই বিশেষ সম্পদ হিসাবে গণ্য। অবশ্য এ কাজে সম্ভবত চীনই পথিকৃৎ। নবম শতাব্দীতে সেদেশে এভাবে বৌদ্ধগ্রন্থ ছাপানো হয়। তুন হুয়াং, বা সহস্র-বুদ্ধ গুহায় রক্ষিত 'হীরক সূত্র' মুদ্রিত হয় ৮৬৮ খৃষ্টাব্দে। ১০৪১ খৃষ্টাব্দে পিং শাং চিনেমাটির হরফ তৈরী করেছিলেন। ১৩১৪ খৃষ্টাব্দে ওয়াং চাং তৈরী করলেন কাষ্ঠমুদ্রা। কোরিয়ার রাজা য়ি ১৩৯২ খৃষ্টাব্দে ধাতুমুদ্রার কারখানা স্থাপন করেন, এবং ১৪০৭ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হয় প্রথম ব্রোঞ্জ ( Bronze ) হরফের বই।

আধুনিক যুগের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার সংচাল্য হরফ ( Movable type ) প্রতিটি হরফ স্বতন্ত্রভাবে খোদাই ক'রে সাজিয়ে সাজিয়ে বাক্য গঠন ক'রে ছাপানো। এই পদ্ধতির আবিষ্কারক হিসাবে জার্মানির যোহান গুটেনবুর্গ এবং হল্যাণ্ডের লরেন্স্ কস্টারের নাম যুক্ত আছে। গুটেনবুর্গ জার্মানির মাইন্জ্ ( Mainz ) শহরে এই প্রথা চালু করেন পঞ্চদশ শতাব্দীতে। তাঁর ছাপানো 'বিয়াল্লিশ পংক্তির বাইবেল' বিখ্যাত। এর পরে যোহান ফস্ট এবং পিটার

শোয়েফার এই পদ্ধতিতে বহু বই ছাপিয়েছেন। ইংলণ্ডের প্রথম মুদ্রাকর উইলিয়াম ক্যাক্সটন। ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে ছাপানো তাঁর এক বই সেখানকার প্রথম মুদ্রিত পুস্তক। আমেরিকায় ছাপাখানা খোলে ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে। পারম্পর্য অনুযায়ী ছাপাখানার তারিখ হ'ল, ইতালিতে ১৪৬৫, ফ্রান্সে ১৪৭০, স্পেনে ১৪৭৪, ইংলণ্ডে ১৪৭৭, ডেনমার্কে ১৪৮২, সুইডেন ১৪৮৪, পুর্তুগালে ১৪৯৫, রাশিয়ায় ১৫৫৩ এবং আমেরিকায় ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে।

ভারতবর্ষে প্রথম ছাপাখানা খোলেন পর্তুগীজ মিশনারিরা গোয়াতে, সম্ভবত ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে (৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে)। ১৫৫৭-তে জল ছ্য বুস্টেমান্টো ছাপান দৌত্রিনা খ্রাইস্টা। ১৫৭৭-এ মাদ্রাজের ত্রিচুর প্রদেশে প্রথম মালাবার হরফ তৈরি হয় এবং উপরোক্ত বই এর মালাবার অনুবাদ মুদ্রিত হয় ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বাইবেলের এক তামিল অনুবাদ ছাপা হয় ১৭১১ খৃষ্টাব্দে। এই সময়ে মাদ্রাজের ট্রান্‌কেবার শহরে ভারতের প্রথম কাগজ তৈরির কল বসানো হয়। অবশ্য এরও আগে ভীমজী পারেখ-এর প্রচেষ্টায় বোম্বাই শহরে ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম মুদ্রন যন্ত্র চালু হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল।

বাংলা হরফের প্রথম ব্যবহার নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেদ রচিত 'এ গ্রামার অফ বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ' বইতে। বইটি ইংরেজিতে লেখা, তবে এর উদাহরণ উদ্ধৃতি গুলি ছিল বাংলা হরফে। এই হরফ তৈরী করেন পণ্ডিত জন উইলকিন্‌স্, —যার সহকারী ছিলেন পঞ্চানন কর্মকার। তারপরে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হয় আপজন-রচিত বাংলা-ইংরেজি অভিধান। বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠা ও বাংলা হরফকে মর্যাদা দেন উইলিয়াম কেরী। তাঁর বাংলা বাইবেল ছাপা হয় ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুর মিশনারি প্রেসে। তাঁর পুত্র ফেলিক্স এবং সহকর্মী ওয়ার্ডের সহায়তায় তিনি সেখানে একটি কাঠের মুদ্রন যন্ত্র বসান। এবং বাংলা হরফ ঢালাই ও ছাঁচ তৈরী করবার জন্য জন উইলকিন্‌সের সহকারী পূর্বোল্লিখিত বাঙ্গালী কারিগর পঞ্চানন কর্মকারকে বহু চেষ্টা ও কায়দা করে শ্রীরামপুরে নিয়ে আসেন। পঞ্চানন এবং তাঁর জামাতা মনোহর—এই দু'জনের দক্ষ হাতে বাংলা হরফের ছাঁচ ঢালাই হল, হরফ তৈরী হ'ল। শুধু বাংলা হরফই নয়, অন্যান্য ভাষারও। এবং ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কেরী সাহেব দু'লক্ষ বারো হাজার বই ছাপিয়ে ফেললেন। কেননা, এর মধ্যে, ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয়েছে এবং তার জন্য অনেক বই লিখিত এবং মুদ্রিত হতে থাকে

শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে। রামরাম বসু রচিত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' এবং উইলিয়াম কেরি রচিত 'কথোপকথন' ছাপা হয় ১৮০১ খৃষ্টাব্দে, ১৮০২-এ ছাপা হয় বাংলা রামায়ণ ও মহাভারত এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার-রচিত 'বত্রিশ সিংহাসন', ১৮০৩-এ দাউদের গীত, ১৮০৫-এ চণ্ডীচরণ মুন্শী—রচিত 'তোতা ইতিহাস', ইত্যাদি।

ক্রমে ছাপাখানার দৌলতে বইএর বাজার সরগরম হ'তে থাকল। প্রাচীন বা মধ্যযুগে বই-এর কোন বাজার ছিল না। গুরুগৃহে অধ্যয়নকালে গুরুর সংগৃহীত পুথি পড়ে ছাত্র বিদ্যালাভ করত। তেমন তেমন ক্ষেত্রে পুথির দু'চারটে নকল থাকত, বা নকল করা হ'ত। সর্বসাধারণের জন্য লিখিত সাহিত্য সম্পদ বড় একটা দেখা যেত না। রাজা রাজড়াদের সভায় সভাপণ্ডিত বা সভাকবি থাকতেন। তাঁরা শাস্ত্রপাঠ বা কাব্য রচনা করতেন, পড়ে শোনাতেন। যা রচিত হ'ত তার প্রায় সবই রাজার ইচ্ছায় বা অনুগ্রহে; রাজাকে খুশি করার জন্য। তাই মধ্যযুগের কবিদের রচিত বইগুলিতে দেবদেবীর বন্দনার সঙ্গে সঙ্গে রাজস্তুতির মুখবন্ধ থাকত। আমাদের ইতিহাস বা সাহিত্য বলতে রাজসভার রচনা। তবুও নানান লোক-কবি বা বৈষ্ণব পদকর্তাদের দৌলতে সর্বসাধারন্যে সাহিত্যরস পরিবেশিত হয়েছে ধর্মকথার মোড়কে। সে সবই ছিল শ্রুতি নির্ভর। কিন্তু ছাপানো বই বেরোবার পর থাকতেই রস-সঞ্চয়ের অধিকার পেল। সকলের ঘরে ঘরে এসে গেল বই, কেবলমাত্র গুরুগৃহে বা স্থানবিশেষে সীমাবদ্ধ রইল না। সর্বসাধারণ শিক্ষা-লাভের অধিকারী হয়ে উঠল। সাহিত্য রাজসভা থেকে নেমে এসে আসন নিল জনসভায়। বই-এর বিচারক কেবল মাত্র রাজা বা পণ্ডিতেই আর রইলেন না। এলেন প্রকাশক, বিক্রেতা, পাঠক, সমালোচক। এ যুগে পাঠকরাই লেখকদের টাকা যোগায়। সাহিত্য রচনারও মূল্য লক্ষ্য সাধারণের রুচি, প্রকৃতি ও জীবন। সেই সর্বজনিক বই-এর ইতিহাস, আকার, প্রকার ও ব্যবহার নিয়ে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান।

## বই-এর দুই রূপ

সাধারণের রুচির দিকে লক্ষ্য রাখতে গেলে, এবং বইকে অনায়াস-পঠনযোগ্য করতে গেলে বইকে আকর্ষনীয় করে তুলতে হয়, নজর রাখতে হয়

বই-এর ভিতর বাহির দুই দিকেই। বইটা হাতে নিয়ে এক নজরেই যেন ভাল লাগে সেজন্য সুন্দর করে সাজাতে হয়। মলাটটি দেখতে সুন্দর হবে, বই-এর মাপটি মনোমত হবে,কাগজ উত্তম হয় যেন, ছাপা যেন ঝরঝরে হয় যাতে বিনা কষ্টে পড়া চলে, বাঁধাই পোক্ত হওয়া দরকার, ইত্যাদি ইত্যাদি। বই-এর এই চেহারা বা বহিরঙ্গের দিকটাকে বলতে পারি আঙ্গিক বা অঙ্গ সজ্জা। চিত্ররূপ।

তারপর বইএর অন্তরঙ্গ পরিচয়, অর্থাৎ বিষয়বস্তুর কথা। কী নিয়ে লেখা, কেমন করে লেখা, কোন ধারায় লেখা, ইত্যাদি। বই-এর এই আভ্যন্তরীন দিকটাকে বলতে পারি আন্তরিক বা জ্ঞানের বিচার। রসরূপ।

প্রথমটির মধ্যে পড়ে ছাপাই বা মুদ্রন, চিত্রন, বাঁধাই ইত্যাদি। গ্রন্থসজ্জা গ্রন্থপ্রস্তুতির বিবিধ ব্যবহারিক ধারা।

দ্বিতীয়টির মধ্যে পড়ে বই-এর বিষয়ানুগ বিশ্লেষণ। এই দ্বিতীয়টিকে কেন্দ্র করেই গ্রন্থাগারিকের প্রকৌশল কর্মকাণ্ড, যাঁর সূত্র ধরে আসে গ্রন্থের বর্গীকরণ, সূচীকরণ, বিশ্লেষন। ইত্যাদি।

## (ক) বই-এর আঙ্গিক বা চিত্ররূপ

### (১) মুদ্রণ

পুস্তক প্রকাশের সুরুতেই ছাপাখানার কাজ। একটি বই ছাপাবার জন্য দরকার কাগজ, কালি, হরফ বা টাইপ, মুদ্রাযন্ত্র বা প্রেস। গ্রন্থবিজ্ঞানের পাঠ নিতে হলে এগুলির ইতিবৃত্ত ও ব্যবহার জানা প্রয়োজন।

### কাগজ

কাগজ না থাকলে আমাদের কী হাল হতো তা এ যুগে চিন্তা করা কঠিন। কাগজ নেই, অথচ আমরা বেঁচে আছি, লিখছি পড়ছি, কাচারি আদালত করছি এ কথা আজকের দিনে কি কেউ ভাবতে পারেন? সভ্যতার প্রধান অঙ্গই কাগজ,—যার সাহায্যে এত সহজে আমরা যোগাযোগ বজায় রাখতে পারি, ভাবীকালের জন্য লিখে রেখে যেতে পারি মনের কথা, দেশের

কথা। বলতে গেলে, ভাত-রুটির মতো কাগজ না হলে মানুষের জীবনযাত্রা অচল।

আর—আরও আশ্চর্য—কাগজ তৈরি করবার জন্য এমন কিছু মহার্ঘ-সামগ্রী লাগেনা। বাঁশ, কাঠ, ঘাস, পাতা, তুলো, চট, —এমনকি পুরোনো ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো, ছেঁড়া কাগজের টুকরো, —যা আমরা ফেলে দিই তারই কদর কাগজের কলে, তারই থেকে তৈরী হয় শাদা কাগজ।

কাগজ হাতে তৈরি করা যায়, কলে তৈরি করা যায়। হাতে তৈরি কাগজকে বলে তুলোট কাগজ। তৈরি করার পদ্ধতি তেমন কঠিন কিছু নয়। ছেঁড়া টুকরোগুলিকে প্রথমে বেশ ভাল করে জলে ধুয়ে নিতে হয়। তারপরে সেই ভেজা টুকরোগুলিকে মুগুর দিয়ে বা পা দিয়ে কসে থেঁৎলে নিয়ে একটা জলের পাত্রে রাখলে আঁশগুলো ভেসে ওঠে, বাড়তি অপ্রয়োজনীয় অংশ নিচে পড়ে থাকে। এই আঁশের মণ্ড থেকেই তৈরি হয় কাগজ। বড়-সড় একটা পাত্রে ঐ মণ্ড নিয়ে জল ঢেলে বেশ ক'রে নেড়ে-চেড়ে নিতে হয়। তারপরে তারের জালের একটা ছাঁকুনি দিয়ে পাত্র থেকে মণ্ড ছেঁকে তুলতে হয়। তারের-জালের এই ছাঁকুনিটি ( Deckle ) এবং ছেঁকে তুলবার কায়দাই কাগজ তৈরির ব্যাপারে প্রধান। এই জালের চারপাশে একটি কাঠামো থাকে। যেটিকে ইচ্ছেমতো খুলে নেওয়া যায়। জালের মাপ যা কাগজের মাপও তাই হবে। নানান মাপের কাগজের জন্য নানান মাপের জাল রাখা যায়, আবার কাটামোটিকে সরিয়ে সরিয়ে প্রয়োজন মতো নিয়ন্ত্রিত করেও বিভিন্ন মাপের কাগজ তৈরি করা চলে। আগেই বলেছি, কাঠামোটা তারের জালের সঙ্গে আটকানো থাকে না, আলগা থাকে। ছেঁকে তোলবার পরে মণ্ড শুকিয়ে গেলে কাঠামো খুলে নিলেই কাগজ বেরিয়ে আসে। জল থেকে মণ্ড তোলবার সময়ে কাঠামো সমেত জালটা খুব সাবধানে কায়দা করে নাড়তে হয়, যাতে আঁশগুলি চারিপাশে সমান ভাবে ছড়িয়ে যেতে পারে, কোনো একটা জায়গায় পুরু আরেক জায়গায় পাতলা না হয়, যেন বুনোটের মতো গড়ন হয়ে ওঠে। যার হাতে এই কাজ যত ভাল হয় সে তত দক্ষ কারিগর। তারের জালের বদলে চিকের মাদুর দিয়েও এদেশে একাজ করে, আর সূক্ষ্ম করবার জন্য তার সঙ্গে থাকে ঘোড়ার লোমের বুনোট। এইভাবে তৈরি মণ্ডের পাতকে শোলার বনাতের উপর বিছিয়ে আরেকটি বনাত তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। এমনিভাবে একটার পর একটা পাত রেখে একসঙ্গে বেশ কয়েকটা জড়ো ক'রে

02
বন্দ্যো
INSTITUTE OF EDUCATION FOR WOMEN
3736
Deptt of Extension
Services.

চাপ দিলে বাড়তি জল ঝরে পড়ে এবং পাতাগুলিও কিছুটা মসৃন হয়ে ওঠে। পরে বনাতগুলো বার ক'রে নিয়ে প্রায়-শুকনো কাগজগুলির চার-পাঁচটা একসঙ্গে ঘোড়ার বা গরুর লেজের দড়িতে মেলে দেওয়া হয় শুকোবার জন্য। একসঙ্গে চার পাঁচটা পাত না নিয়ে একটা একটা করে শুকোতে দিলে সে-কাগজ কুঁকড়ে যায়। কিন্তু এই যে কাগজ তৈরি হ'ল তার মধ্যে তখনো অনেক গলদ থেকে গিয়েছে; রূপের দিকে কাগজের এখানে সেখানে হয়তো ফাঁক-ফোঁকের বা ঢিলে-ঢালা বুনট থেকে গিয়েছে, গুণের দিকে হয়েছে চোষ-কাগজের মতো, —কালি শুষে নেয় বা ধেবড়ে যায়। তাই একে মসৃন আর লেখবার উপযুক্ত করার জন্য আনাজ থেকে উৎপন্ন এক প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য পূর্ণ পাত্রে এই কাগজ চুবিয়ে নিতে হয়, যাকে বলে লোডিং (Loading) তারপরে মসৃন করা হয় ঘ'ষে ঘ'ষে, যাকে বলে 'সাইজ' ( Size ) করা। রঙীন কাগজ বানাতে হলে ঐ পাত্রে রং মিশিয়ে নিলেই চলে। কলে তৈরি কাগজ ততটা হয় না। এর এক এক খণ্ডের এপাশে ওপাশে অমসৃন আঁশ বেরিয়ে থাকে। এই অমসৃন ধারগুলিকে বলে 'ডেক্‌ল্ এজ' (Deckle edge) তারের জালের অমসৃন ধারের জন্যই এই নাম। মসৃন ধার করবার জন্য কেটে নিতে হয়। তবে অনেক সময়ে এগুলোকে না কেটে ঐ ভাবেই রাখা হয় এবং মনে করা হয় বেশ একটা অভিজাত চেহারা হ'ল। এমনকি কলে তৈরী কাগজও অনেকে এই অবস্থায় রেখে দেয়। বই হয়ে যাবার পরেও ধারগুলি আর কাটেনা। শিল্পরূপের এক বিচিত্র ধারা আর কি।

কাগজের কলেও ঐ একই প্রণালীতে কাজ হয়। কাঠ, খড়, বাঁশ, তুলো ইত্যাদি কাঁচা মাল টুকরো টুকরো ক'রে ক্ষার মেশানো গরম জলের ভাণ্ডে গুলে ছেঁকে নিম্পেষক বা 'ব্রেকার ( Breaker ) যন্ত্রে ফেলে আঁশ-আলাদা ক'রে নেওয়া হয়। তারপরে চালান দেওয়া হয় তাড়ন বা 'বীটার' ( Beater ) যন্ত্রে। এই যন্ত্রে দু'টি কাজ আগে থেকেই সেরে রাখা হয়; 'লোডিং' ( Loading ), অর্থাৎ আঁশগুলির মধ্যেকার সম্ভাব্য ফাঁক-ফোঁকের বন্ধ করার জন্য চিনেমাটি বা খড়ি ইত্যাদি মিশিয়ে দেওয়া, এবং 'সাইজিং' (Sizing)। অর্থাৎ কাগজকে মসৃনতা দেবার জন্য মেশানো হয় ফটকিরি বা সাবান। এই মণ্ডকে এবার চালান করা হয় বড় একটি ভাঁড়ের (Vat) মধ্যে জল মিশিয়ে, যার ভিতরে একটি চাকা অনবরত ঘুরে ঘুরে মণ্ডটির জমাট বেঁধে-যাওয়া বন্ধ করে এবং সব জিনিষটা জড়িয়ে মিশে ক্বাথ হয়ে যায়। এখন

এই মণ্ডকে এনে ফেলা হয় 'মোল্ড্' ( Mold ) বা তারের জাল লাগানো কাঠামোর মধ্যে। এখানে মণ্ডের ধারা নিয়ন্ত্রণ ক'রে কাগজ কতটা পুরু বা পাতলা হবে তা ঠিক ক'রে নিতে হয়। 'সেভ্-অল্' ( Save-all ) নামক এক পাত্রের মধ্য দিয়ে এবারে চলে মণ্ডের ধারা, —যেটি ছাঁকুনির কাজ করে, ছাঁটাই হয়ে যায় কাগজের পক্ষে অকেজো দ্রব্য। এটির দু'ধারে রবারের বন্ধনী থাকে। যাতে মণ্ড উপচে পড়ে না যায়। উপরন্তু এই পাত্রটিকে কলের সাহায্যে নাড়ানো হয়, —যার ফলে আঁশগুলি বুনটের মতো সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। ছাঁকুনি পেরিয়ে মণ্ড গিয়ে পড়ে 'কাউচ রোলে' (Couch Roll) এই যন্ত্রে মণ্ডের জলের ভাগটা অনেকাংশে দূরীভূত হয় এবং মণ্ড কাগজের চেহারা নেয়। তারপরে এই কাঁচা কাগজ পেষণ-যন্ত্র পার হয়, যেটিতে পরপর কয়েকটি ঘূর্ণন-দণ্ড (Roller) থাকে এবং যেগুলির মধ্য দিয়ে কাগজ ক্রমশ শুকনো হয়ে বেরিয়ে আসে—বনাত-ঢাকা অবস্থায়। আরো শুকিয়ে নেবার জন্য কাগজ বিশুষ্কন যন্ত্র পার হয়ে গিয়ে পড়ে 'ক্যালেণ্ডার' যন্ত্রে এবং পরিপূর্ণ চাপের ফলে ঝকঝকে-তকতকে কাগজ বেরিয়ে আসে।

ফুরড্রিনিয়াল (Fourdrinier) যন্ত্র নামক প্রথম কাগজের কল ফ্রান্সে আবিষ্কৃত হয় ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। ভারতে কারখানা চালু হয় বাংলায় বালি শহরে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে। আরও আগে অবশ্য ১৭১১-তে মাদ্রাজে এবং ১৮২৫-এ শ্রীরামপুরের মার্শম্যান সাহেবের কাগজের কল কিছুকাল ধরে চলেছিল।

কাগজের প্রধান উপাদান 'সেলুলোজ' (cellulose) নামে এক প্রকার পদার্থ এই পদার্থটি কোনো অবস্থাতেই পরিবর্তিত হয় না বা দানা বাঁধে না বলেই এটি কাগজের পক্ষে অপরিহার্য। যে সব জিনিষ থেকে কাগজ তৈরী করা হয় তার সবগুলিতেই সমান পরিমাণে সেলুলোজ থাকে না বলে সামগ্রী ভেদে কাগজের গুণাগুনে তারতম্য ঘটে। তুলো ও রেশমের মধ্যে এটি থাকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে, শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ, সব থেকে কম থাকে কাঠে, শতকরা ৫০ ভাগেরও কম। ছেঁড়া কাপড়-চোপড় থেকে বেশ পাতলা অথচ মজবুত কাগজ তৈরী করা যায়, যেমন টাকার নোট বা সিগারেটের কাগজ। বাঁশ বা খড় থেকে পত্র-পত্রিকা বা লেখাপড়ার কাগজ মন্দ হয় না। কাঠ থেকে উৎপন্ন হয় খবরের কাগজ বা পিজবোর্ড ইত্যাদি।

হাতে তৈরি কাগজ কলের কাগজের চেয়ে মজবুত হয় বেশি, কেননা

হাতের কায়দায় মণ্ডটিকে তারের জালের ঘেরাটোপে চারপাশে সমানভাবে নাড়াচাড়া করার ফলে আঁশগুলির বুনোট বেশ ঘন হয়ে ওঠে। কিন্তু কলের কাগজে নাড়াচাড়ার কাজটা মাত্র এক দিকে হবার ফলে আরেকটা দিক কিছুটা দুর্বল থাকে এবং এই দুর্বল দিকে ভাঁজ করলে সেই ভাঁজের দাগে দাগে কাগজ কেটে যাওয়ার ভয় থাকে। অপরপক্ষে হাতে তৈরি কাগজের বুনোট সর্বত্র সমান পুরুত্বের করা এক রকম অসম্ভব কাজ, বিশেষ করে ধারের দিকগুলি একটু বেশী পুরু থেকে যায়। এর ফলে ছাপানোর কাজ অসুবিধা জনক হয়। কলের কাগজ ছাপানোর কাজ মসৃন গতিতে চলে। হাতে কাগজ তৈরী করতে হয় স্বতন্ত্রভাবে একটি একটি করে। এ জন্য সময় যেমন লাগে প্রচুর খরচও পড়ে বেশি। কলে কাগজের পাশের দিকের মাপটা ঠিক করে নিয়ে টানা ভাবে কাগজ বুনে তোলা যায় এবং পরে লম্বা দিকগুলি মাপ বুঝে কর্তক যন্ত্রে কেটে নিলেই চলে। হাতে তৈরি কাগজ স্বভাবতই কলের কাগজের চেয়ে টেকসই হয় বেশী। কিন্তু এযুগে হাজারে হাজারে বই ছাপাবার জন্য সব দিক দিয়েই কলের চাহিদা।

## জল-ছাপ (Water mark)

সাদা কাগজ আলোর দিকে ধরলে তার মাঝখানে সাদা কোন নকসা বা কিছু লেখা নজরে পড়ে। একেই বলে জলছাপ (water-mark)। সাধারণত 'ট্রেড-মার্ক বোঝাবার জন্য জলছাপের প্রচল। এই ছাপ দেবার কায়দা প্রথম বা'র করেন ১২৭০ খৃষ্টাব্দে ইটালির ফেব্রিআনো শহরের কাগজের কলওয়ালারা। জলছাপ দেবার কায়দা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। যে-কোন কাগজ আলোর দিকে ধরলে আমরা সূক্ষ্ম সমান্তরাল কতকগুলো দাগ বা লাইন দেখতে পাই সারাটি জমি জুড়ে। এ-দাগ আর কিছুই নয়, —যে-তারের জালের 'মোল্ডের' উপরে কাগজ তৈরী হয় তারই দাগ। জাল খুব সূক্ষ না হলে এবং খুব ভাল করে চার পাশে মণ্ড নাড়া না দিলে এ-দাগ সহজে মেলানো যায় না। জল ছাপ তোলারও ঐ একই কায়দা। সূক্ষ্ম তারের একটা একটা নকশা ক'রে, কিম্বা তার দিয়ে হরফ লিখে জালের সঙ্গে আটকে দিলেই তৈরী কাগজে তার ছাপ উঠে যায়। কলের কাগজে মণ্ড-স্রোত

'ডাণ্ডি রোল' (Dandy Roll) নামক যন্ত্রাংশের মধ্য দিয়ে যাবার সময়ে জল-ছাপের নক্সা থেকে এই ছাপটি তুলে নেয়।

বানিজ্যিক ছাপ হিসেবে জল-ছাপের ব্যবহার হ'লেও গ্রন্থবিদের কাছে কেবল মাত্র কাগজ কে তৈরী করল অথবা এটি কোন বিশেষ শ্রেণীর কাগজ তারই নির্দেশ দেয়না, এই কাগজে মুদ্রিত বই সম্পর্কে নানারকম তথ্য যাচাইএর ব্যাপারে সাহায্য করে। যেমন, কোনো পুরোনো বই এর ছেঁড়া অংশ হাতে এলে সেটি ঠিক কোন বইএর অংশ তার নির্ণয়ে সাহায্য করে জলছাপ। বই কত পুরোনো, কবে ছাপানো হয়েছিল, কত রকমের কাগজ ব্যবহৃত হয়েছিল, বিশেষ ধরণের কোনো কাগজ কতকাল আগের থেকে চলে আসছে, সেকালে কত রকমের ছাপ চালু ছিল, বই ছাপাবার ও বাঁধাবার কাগজ কতবার কী ভাঁজ করা হয়েছিল, এই সকল তথ্য বার করতে হলে জলছাপগুলিও বিচার করতে হয়।

## রকমারি কাগজ আর তার মাপ

কাগজ যত সাবধানেই তৈরী হোক না কেন, তার একটা দিক একটু খসখসে হবেই। কলের কাগজের যে পিঠ তারের জালের উপরের দিকে থাকে, আর তুলোট কাগজের যে-পিঠ তারের জালের সঙ্গে লেগে থাকে, তা-ই কাগজের সোজা দিক। এই পাশে লিখলে কলম সহজ ভাবে চলে। তবে খুব ভাল কাগজের উল্টো পিঠ সিধে পিঠ বোঝা যায় না। তখন জল ছাপ দেখলে বোঝা যায়।

সাধারণ তারের জালের উপরে-যার জাল-বিন্যাস একই দিকে ত'ার উপরে যে-কাগজ তৈরি হয় তাকে বলে 'লেড' (Laid) কাগজ বিন্যস্ত জালের কাগজ। কিন্তু বার্মিংহামের জব বাস্‌কারভিল বুনোট তারের জালে মসৃনতর কাগজ তৈরির পদ্ধতি চালু করেন, যাকে বলে 'ওভ' (Wove) কাগজ। এতে জালের দাগ দেখাই যায় না। ফরাসীরা এই প্রথার আরো উন্নতি করেছিল।

মোটা, পাতলা, মসৃণ, খসখসে প্রভৃতি নানারকম কাগজে বাজার ভর্তি। এর কোনোটাতে ছাপার কাজ ভালো হয়, কিন্তু কালিতে লেখা যায় না— ধেবড়ে যায় বা নিব আটকে যায়। কোনো কাগজের ব্যবহার শুধু ছবি

ছাপাবার জন্য। আবার কোনো কাগজের ব্যবহার শুধু মোড়ক হিসেবে—যা সহজে ছেঁড়েনা। সংবাদপত্রের কাগজ তো একেবারেই আলাদা, —কাঠের মণ্ড থেকে তৈরী সস্তা কাগজ, যার মূল্য সাময়িক।

চোষ কাগজ, (Blotting paper) হল 'সাইজ' না-করা কাগজ, তৈলাক্ত মিশ্রন না-থাকার ফলে চট করে কালি শুষে নেয়। চামড়া বা রেক্সিনের মতো দানাদার কাগজ বানাবার জন্য এক রকমের ছাঁচ ব্যবহার করা হয়; এই ছাঁচের উপর দিয়ে কাগজের পাত পার করে নিলেই এই বিশেষ দানাদার কাগজ (Grained paper) তৈরি।

কাগজকে রঙীন করবার জন্য 'সাইজিং-এর সময়ে পাত্রে ইচ্ছেমতো রং মিশিয়ে নিলেই চলে। কাগজকে পরিশ্রুত (Bleach) করবার মালমশলা কম দিলে বাদামী কাগজ (Brown paper) বা বেলে কাগজ বেরিয়ে আসে। তবে এ কাগজের অছিন্নতা-গুণ কাঁচা মালমশলার গুণের উপরে নির্ভর করে। হাফ-টোন ব্লক ছাপাবার উপযুক্ত কাগজ 'আর্ট পেপার'; সূক্ষ্ম চিনে-মাটি দিয়ে 'সাইজ' করে এটি তৈরি। এন্টিক (Antique) কাগজ খসখসে এবং পুরু, তৈরী হয় কিঞ্চিৎ নিরেস মালমশলা থেকে, যার ফলে বইটি মোটা-সোটা হলে বেশী দিন টেকে না, সহজে পোকায় ধরে। 'ব্যাঙ্ক' Bank। 'বণ্ড, (bond) প্রভৃতি ভালো মাল মশলার উৎকৃষ্ট কাগজ আছে, সাধারণত চিঠির কাগজ হিসেবে যার বহুল ব্যবহার। আর খুব পাতলা কাগজ 'ইণ্ডিয়া পেপার' (India paper)—যাকে 'বাইবেল পেপার'ও বলে, কেননা এই কাগজেই সাধারণত সব বাইবেল ছাপানো হয়; পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'রবীন্দ্র রচনাবলী' এই কাগজে ছাপানো; এতে অনেক পৃষ্ঠার বই হ'লেও খুব মোটা বা ভারী হয় না, অথচ মজবুত হয়।

হরেক রকম কাগজের মাপ আছে। তার মধ্যে সাধারণ কাজ চালাবার মতো কয়েকটি চালু কাগজের মাপ জেনে রাখা ভালো।

| | | |
|---|---|---|
| ফুলস্কেপ (Foolscap) | ১৩½ ইঞ্চি | × ১৭ ইঞ্চি |
| ক্রাউন (Crown) | ১৫ ইঞ্চি | × ২০ ইঞ্চি |
| ডিমাই (Demy) | ১৭½ ইঞ্চি | × ২২½ ইঞ্চি |
| রয়াল (Royal) | ২০ ইঞ্চি | × ২৬ ইঞ্চি |
| ইম্পিরিয়াল (Imperial) | ২২ ইঞ্চি | × ৩০ ইঞ্চি |

আজকাল ছাপাখানায় একসঙ্গে অনেকগুলো ফর্মার ছাপাই হয় বলে কাগজের মাপও দ্বিগুণিত হিসেবে চলছে। যেমন, ডবল ডিমাই, ডবল ক্রাউন ইত্যাদি।

সাধারণ লেখার খাতা বা প্যাড তৈরির যে-কাগজ তার ৪৮০টি পাতায় এক রীম (Ream), আর যে-কাগজে বই ছাপানো হয় তার রীমের হিসেব ৫০০টি ক'রে। ভারতীয় হিসাবে কখনো কখনো এর ব্যতিক্রম দেখি, এক রীমে ৫১৬টি অথবা ৫২৮টি কাগজও থাকে। তুলোটের আবার ৪৭২টিতে রীমের হিসেব। তবে ছাপাখানার হিসেবটা চলে ৫০০ 'তা ধরেই।

কাগজের আরেকটা হিসেবও আছে, ওজন দরের হিসেব। এই থেকে কাগজ পাতলা কি পুরু তা বোঝা যায়। ছাপাখানায় বই ছাপাতে দিলে শুধু কাগজের মাপই নয়, কত 'পাউণ্ড' ওজনের কাগজ তাও বলে দিতে হয়। যেমন, ১৬ পাউণ্ড ডিমাই বা ২০ পাউণ্ড এন্টিক, ইত্যাদি। কাগজ যখন তৈরি হয় তখন জমানো ক্কাথ ঢেলে পাকাপাকি ভাবে কাগজের পাত বানাবার সময়েই সমস্ত জিনিষটার ওজন ঠিক ক'রে নেওয়া হয়। কারণ একবার তৈরি কাগজ কল থেকে বেরিয়ে এলে আর তাকে পাতলা বা পুরু করার উপায় থাকে না। যদি বলি ১৬ পাউণ্ড 'ডিমাই' কাগজ, তা'র অর্থ ৫০০'তা ডিমাই কাগজের সমগ্র ওজন ১৬ পাউণ্ড। তেমনি ২০ পাউণ্ড 'বণ্ড' কাগজ বললে বুঝব ৪৮০'তা বণ্ড কাগজের সমগ্র ওজন ২০ পাউণ্ড। ওজন যত বেশি কাগজ তত পুরু।

এই হ'ল সংক্ষেপে কাগজের কথা। বইএর মূল্যায়নে কাগজের জাতি-প্রকৃতি বিচার শুধু প্রকাশকের নয়, গ্রন্থাগারিকের পক্ষেও স্বভাবতই প্রয়োজনীয়।

## কালি

কালি এক প্রকার তরল রঙীন পদার্থ যার মধ্যেকার রংটা অন্য পদার্থের উপরে ইচ্ছেমতো সংক্রামিত করা যায়। প্রায় ২৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে মিশর, চীন প্রভৃতি দেশে লিখবার জন্য ভুসার সঙ্গে আঠা মিশিয়ে কালি বানিয়ে নেওয়া হত। ভুসো কালির চলন বহু প্রাচীন আমল থেকে ভারতেও ছিল। ভুসা আর গঁদ জাতীয় আঠা মিশিয়ে শক্ত কাঠির মতো ক'রে নিয়ে সেটা জলে ডুবিয়ে

ডুবিয়ে নিয়ে লেখা হ'ত। তুলির কাজ চালাতে জল দিয়ে ঘসে নেওয়াও যেত, —চিত্রকরদের জন্য এখন যেমন জমাট-বাঁধা রং (Stick) পাওয়া যায়। এই জাতীয় কালির কাঠি নানা রকমের বনজ পদার্থ বা জন্তু জানোয়ারের রক্ত মিশিয়ে নানা রঙে রঙীনও করা হ'ত।

প্রাচীন পুথিতে কালি তৈরির পদ্ধতি সম্পর্কে শ্লোকের সাক্ষাৎ মেলে। যেমন:—

তিন ত্রিফলা শিমূল ছালা।
ছাগ দুগ্ধে দিয়া তেলা॥
লোহা দিয়া লাহাই ঘসি।
মসী বলে অকাট বসি॥

ত্রিফলার সঙ্গে শিমূলের ছাল মিশিয়ে ছাগলের দুধের মিশ্রণ ও লোহার গুঁড়ো দিয়ে তৈল প্রদান পূর্বক ঘসে কালি বানালে তা স্থায়ী হয়ে বসে।

আরেকটি শ্লোকে দেখা যাচ্ছে:—

লোধ লাহা লোহার গুঁড়ি।
অর্কাঙ্গার যবার কুঁড়ি॥
গাবের ফল হরিতকী।
ভৃঙ্গার্জুন আমলকি॥
বাবলা ছাল জাঁটির রস।
ডালিম ছেঁচে করিবে কষ॥
ভেলায় করা এক আলি।
চারি যুগ না উঠবে কালি॥

লোধ ফুলের রেণু, লোহার গুঁড়ো, অর্ক-অর্থাৎ আকন্দের অঙ্গার, জবা ফুলের কুঁড়ি, গাব ফল, হরতুকি, ভৃঙ্গ, অর্জুন, আমলকি, বাবলার ছাল, ঝাঁটিগাছের রস এবং ডালিমের কষ একত্রে করে (এবং আলি) জমাট রসে (ভেলা) পরিণত করলে যে কালি হবে তা চিরস্থায়ী।

কাগজে লিখবার জন্য যে কালি আমরা ব্যবহার করি তা'র গুণ এমন হওয়া দরকায় যা'তে লিখবার পরে কালিটা ধেবড়ে না যায় এবং এর মধ্যেকার জলটুকু চট ক'রে শুকিয়ে যায়। অবশ্য এটা কাগজের গুণাগুনের উপরেও নির্ভর করে। বেলে কাগজে যেমন কালিটা সহজেই ধেবড়ে যায় বণ্ড কাগজে তা যায় না। দেশজ প্রথায় হরিতকি প্রভৃতি ফল-মূলের নির্যাসের সঙ্গে ক্ষার

ইত্যাদি মিশিয়ে লিখবার কালি তৈরি করা যায়। আজকাল বাজারে যেসব কালি তৈরি হয় তা'র প্রধান উপাদান লৌহজ লবন ( Iron Salt )। নীল-কালো মেশানো প্রচলিত কালিতে লৌহজ গন্ধকসার সামগ্রী ( Ferrous Sulphate ) ব্যবহৃত হয়।

ছাপাখানার কালি তৈরির প্রণালী স্বতন্ত্র ধরণের। এবং রং তিষি বা রেড়ি জাতীয় তেলের মাধ্যমে বিকীর্ণ করা হয়। তার পরে শিরিষ বা অনুরূপ কোনো আঠা বা বার্নিশ প্রয়োগে চটচটে করে তোলা হয়। এভাবে তৈরি কালি অবশ্য উচু দরের ছাপাইএর কাজে লাগে। সংবাদপত্রে ব্যবহারের কালো বা অন্য রঙের কালি পাওয়া যায় খনিজ তেল থেকে। লিথোগ্রাফ বা টিনের উপরে বিজ্ঞাপনী (Signboard) লেখার কালি অঙ্গারজ বার্নিশ দিয়ে তৈরি। সাময়িক পত্রাদির কালি তৈরী হয় পেট্রোলিয়াম জাতীয় এবং শিরিষ শ্রেণীয় সামগ্রীর মিশ্রণে। এইভাবে বিভিন্ন মাধ্যমের ছাপার কাজের জন্য উপযুক্ত উপাদানের রাসায়নিক মিশ্রণ করা হয় খরচ এবং সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে।

কালি এমনভাবে প্রস্তুত করা চাই যাতে ক্ষার, অম্ল. চর্বি, সুরা প্রভৃতি পদার্থের সংস্পর্শে এলেও ক্ষতি না হয়, ঘষলে বা সামান্য জল-টল লাগলে উঠে না যায়। লেখার বা ছাপার পর যাতে তাড়াতাড়ি জমে শুকিয়ে ওঠে এবং হাতের ঘষা লাগলেই ধেবড়ে না যায় তা'র জন্য নানাবিধ জারক পদার্থ প্রয়োগ করতে হয়। অবশ্য লিথোগ্রাফ বা ঐ জাতীয় লেখা বা ছবি ছাপাবার বেলায় এ সব উপাদান যতটা লাগে ততটা সাধারণ মুদ্রণের ক্ষেত্রে দরকার হয় না। কাগজের সূক্ষ্ম তন্তুতে কালির বাড়তি তরল অংশটুকু শুষে নেয়। হাওয়াতেও চটপট শুকোবার কাজে সহায়তা করে।

ছাপার কালি গুড়ের মতো চটচটে আঠালো না হ'লে হরফের উপরে সেটা চট করে বসে না, গড়িয়ে যায়। তার ফলে ছাপাই যায় ধেবড়ে অস্পষ্ট হয়ে। শিরিষ, গ্লিসারিন প্রভৃতি দিয়ে প্রস্তুত শক্ত অথচ মোলায়েম বেলুনির মতো গোলকে কালি লাগিয়ে বিন্যস্ত হরফের উপরে বুলিয়ে নিয়ে কাগজে ছাপ তোলা হয়।

## হরফ বা মুদ্রা

হরফগুলি (Type) তৈরি হয় শক্ত ধাতুর উপরে খোদাই ক'রে। এই ক্ষোদিত হরফকে বলে 'ম্যাট্রিক্স' (Matrix) বা গর্ভ, —সোজা কথায় ছাঁচ।

এই ছাঁচের উপরে সীসা, রাং ও বরনাগের (Lead, tin & antimony) মিশ্রিত গলিত ধাতু ঢালাই করে তৈরী হয় একেকটি হরফ। উক্ত তিন ধাতুর অনুপাত নির্ভর করে হরফের শ্রেণীর উপরে,—তার ব্যবহারিকতায়। তবে সাধারণ অনুপাত শতকরা হিসেবে সীসা ৬২ ভাগ, রাং ২৪ ভাগ ও বরনাগ ১৪ ভাগ। সীসা মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে, আদ্র্তা গুন না থাকায় এতে কখনো মরচে ধরে না। বরনাগ সীসার গলনাঙ্ক কমিয়ে দেয় এবং গুণগতভাবে ঠাণ্ডা হলে পর প্রসার লাভ করে। এর ফলে ছাঁচের সর্বত্র, —প্রতিটি কোণে গলিত ধাতু চারিয়ে যায়। রাং-এর গুন একাধারে নমনীয়তা এবং দার্ঢ্য, যার ফলে বরনাগের ভঙ্গুরতা দূর হয়। ছোট ছোট হরফ তৈরিতে কিছুটা তামাও (Copper) মেশানো হয় একটু বেশি শক্ত করার জন্য। অন্য ধাতুর সঙ্গে সহজে মিশ খায় না বলে মিশ্রণের পরিমাণ রাখা দরকার যৎসামান্য।

ছাঁচে ঢালাই হয়ে একটির পর একটি হরফ বেরিয়ে আসে। ছাঁচ খোদাই হয় সিধে দিকে। তাই ঢালাই হরফের থাকে উল্টো দিকে মুখ। এবং এই থেকে যখন ছাপ তোলা হয় তখন কাগজে সিধে ভাবেই পড়ে। হরফে কেবল মাত্র অক্ষর টুকুই তো থাকে না, আশে পাশে প্রচুর জায়গা বা অংশ থাকে। সবটা মিলিয়ে যে মাপ-মান তা বড় ছোট প্রতি হরফের ক্ষেত্রেই সমান। চতুষ্কোন একেকটি হরফের প্রস্থ অক্ষরের আকার অনুযায়ী ছোট বড় হলেও উচ্চতা সবগুলির বেলাতেই সমান,—প্রায় এক ইঞ্চি। একটি ছাঁচ থেকে একই হরফ প্রয়োজন মতো প্রচুর সংখ্যায় তৈরি করা যায়। হরফের বিভিন্ন অংশের আবার ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় জ্ঞাপক নাম আছে। সে সব নাম মুদ্রাকরদের কাজে লাগে। প্রধান অংশ মুখ বা 'ফেস' (face), অর্থাৎ যেদিকটা থেকে অক্ষরের ছাপ পড়ে কাগজে। আগেই বলেছি, হরফের এই অক্ষরের চারপাশে কিছু ফাঁক থাকে, তা নইলে ছাপানোর সঙ্গে সঙ্গে একটা অক্ষরের ঘাড়ে আরেকটা চেপে যাবে। সুতরাং 'ফেস'-এর আশে পাশে কিছু ফাঁকা অংশ থাকে। আবার অক্ষরটির ঢালাই-এ কিছুটা উচ্চতা থাকেই সেই উচু অংশ-টুকুকে বলে 'বেভেল' (bevel) বা ঢাল। হরফের নিম্নাংশের যে ঢল এবং যেটুকু ঢল প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত তাকে বলে 'বিয়ার্ড' (beard) বা দাড়ি। আর অক্ষরের তু'পাশের যেটুকু জায়গা তার গা থেকে প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত তাকে বলে 'শোলডার' (shoulder) বা কাঁধ। দেখা যাচ্ছে, হরফ যেন একটি মানুষ, এবং অংশগুলির নামও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিচয় বহন করছে। তাই

সমগ্র ধাতুখণ্ডটি—যার উপরে অক্ষর খোদিত, তার পরিচয় 'বডি' (body) বা দেহ। এই দেহের সামনের দিক, অর্থাৎ হরফের সোজা দিকে যে-পাশ, তাকে বলে 'বেলি' (belly) বা পেট, এবং উল্টো ধার 'ব্যাক' (back) বা পিঠ। নিচের দিকে একটি খাঁজ থাকে মাঝামাঝি জায়গা বরাবর। এই খাঁজ উৎপন্ন হয় যখন হরফ ঢালাই হবার পরে সেটিকে ছাঁচ থেকে ঠেলে বার করা হয় তখন। খাঁজের দু'পাশ হরফ—দেহের দুই পা (foot)। এছাড়া হরফ- দেহের সামনের দিকে, অর্থাৎ পেটের দিকে নিচু বরাবর আরেকটি খাজ থাকে, যাকে বলে 'নিক' (nick)। এই খাঁজটি মুদ্রাকরের হরফ বিন্যাসের পক্ষে অপরিহার্য্য, কেননা এটিকে হাতে অনুভব করে সে বুঝতে পারে হরফ সোজাভাবে সাজানো হচ্ছে কিনা।

হরফ বলতে কেবলমাত্র স্বর-ব্যঞ্জনাদি অক্ষরই বোঝায় না। কমা দাড়ি কোলন প্রভৃতি যতিচিহ্ন, গাণিতিক সংখ্যা, তারকা প্রভৃতি চিহ্ন, এক কথায় মুদ্রিতব্য যাবতীয় জিনিসই বোঝায়। মুদ্রণ পরিভাষায় এগুলিকে বলে সর্ট (sort)। এছাড়া হরফের মতো আরো কিছু অপরিহার্য ধাতুখণ্ড থাকে যেগুলিকে বলে 'স্পেস্' (space); এগুলির উচ্চতা হরফের চেয়ে কম, যে-মুখে কালি লাগানো হয় সেই অংশটুকু থাকে না। দুটি শব্দের মাঝখানে, একটি পংক্তি পৃষ্ঠার মাঝামাঝি এসে শেষ হয়ে গেলে, অথবা এক অনুচ্ছেদ শেষে আর এক অনুচ্ছেদ সুরু করার সময়ে এই 'স্পেস্' বা ছাড় দিয়ে ভরাট করে দিতে হয়। 'সর্ট এবং 'স্পেস্' এই দুই সমগ্র সম্ভার নিয়ে একেকটি হরফ-পরিবার, যাকে মুদ্রন-পরিভাষায় বলে 'সেট' (set)।

হরফের আকার বোঝাবার জন্য কতকগুলি নাম চালু আছে। যেমন পার্ল, পাইকা, বর্জাইস ইত্যাদি। তবে ছাপার কাজের সুবিধের জন্য গাণিতিক হিসেবের একটা মাপ তৈরি করে নেওয়া হয়েছে, যা'র নাম 'পয়েন্ট' (point) এর ফলে বিভিন্ন হরফ তৈরির কারখানার জন্য একটা সার্বজনীন ব্যবহারিক মাপ পাওয়া গেল, —যাতে বিভিন্ন মুদ্রালয়ের হরফের একই মাপ সম্ভব হয়। আগে বলেছি যে হরফের উচ্চতা প্রায় এক ইঞ্চি। যথার্থভাবে এই মাপ '৯১৮ ″ ইঞ্চি। এ-মাপ সমগ্র হরফ দেহের উচ্চতা সূচক। হরফের আকার বড় হোক বা ছোট হোক তা'র উচ্চতা সব সময়েই '৯১৮″ থাকবে। বদল হবে খালি হরফের অর্থাৎ অক্ষরের 'ফেস' বা মুখের মাপ, যে মুখের থেকে ছাপ উঠবে কাগজে। এই মুখের মাপই পয়েন্ট' পদ্ধতির

ভিত্তি। মাপ ধরা হয়েছে হরফের পেট থেকে পিঠ—অর্থাৎ 'বেলি' থেকে 'ব্যাক' পর্যন্ত। ২''ইঞ্চিকে ১৪৪ ভাগ করে কার্যকরী মাপটিকে $\frac{১}{৭২}$'' দাঁড় করানো হয়েছে, যথার্থভাবে এটা অবশ্য '০১৩৮৩৭'' ইঞ্চি। মাপটি ধরা হয়েছে ইংরেজিতে যাকে বলে 'এক্স-হাইট' (X-hight) অনুসারে, অর্থাৎ ইংরেজি 'একস্' হরফের আদর্শে—যেটির উপরে কোনো ইলেক বা নিচে কোনো লেজ নেই, যেমন 'এল্' বা 'এফ'এর আছে। মার্কিন পয়েণ্ট পদ্ধতি হালু হয় ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে, সেই ফরাসী হরফ বিশারদ ফ্রাঁসোয়া দিদো-র এক রীতি ধরে। যাই হোক পয়েণ্টের মাপ $\frac{১}{৭২}$'' ইঞ্চি দাঁড়ালো। সুতরাং কোনো হরফ-দেহের মাপ যদি হয় $\frac{১০}{৭২}$'' ইঞ্চি। সেটাকে মুদ্রণ পরিভাষায় বলি ১০ পয়েণ্ট। অর্থাৎ হরফ দেহের ৭২ ভাগের এক ভাগ হলে বলব ১ পয়েণ্ট, পাঁচ ভাগ হ'লে ৫ পয়েণ্ট। 'পাইকা নামে যে হরফ আছে তা'র মাপ ১২ পয়েণ্ট; সুতরাং ৬টি পাইকা হরফ এক ইঞ্চি জায়গা নেবে। 'পাইকা'-র এই সহজ মাপটা নানাভাবে মুদ্রকের কাজে লাগে।

মুদ্রণের বাজারে যে সকল হরফের নাম ও মাপ চালু আছে তার মধ্যে কতকগুলি পরিচয় জেনে রাখা ভাল।

| | | |
|---|---|---|
| জেম (Gem) | | ৪ পয়েণ্ট |
| পার্ল (Peail) | — | ৫ ,, |
| নন-পেরেল (Non-pareil) | | ৬ ,, |
| মিনিয়ন (Minior) | — | ৭ ,, |
| ব্রেভিয়ের (Brevier) | – | ৮ ,, |
| বরজাইস (Bourgeois) | – | ৯ ,, |
| লং প্রাইমার (Long Primer) | | ১০ ,, |
| স্মল পাইকা (Small Pica) | | ১১ ,, |
| পাইকা (Pica) | — | ১২ ,, |
| ইংলিশ (English) | — | ১৪ ,, |

এর আগে পিছে, অর্থাৎ ৪ পয়েণ্টের নিচে এবং ১৪ পয়েণ্টের উপরে আরো অনেক মাপ আছে। যেমন মিনিকিন (Minikin) ৩ পয়েণ্ট, কলম্বিয়ান (Columbian) ১৬ পয়েণ্ট, প্যারাগন (Paragon) ২০ পয়েণ্ট, বা ক্যানন (Canon) ৪৮ পয়েণ্ট—যে সব প্রাচীরপত্র (Poster) প্রভৃতি কাজে লাগে। আবার এ গুলির অন্তবর্তী কিছু মাপও আছে, যেমন ব্রিলিয়াণ্ট (Brilliant)

৩½ পয়েণ্ট, ডায়মণ্ড (Diamond) ৪½ পয়েন্ট, রুবি (Ruby ৫½ পয়েণ্ট, ইত্যাদি।

একই মাপের এবং একই গড়নের সমগ্র হরফ মালাকে বলে 'ফণ্ট' ( Font অথবা Fount )। একটি পুরো বই ছাপাতে একই 'ফণ্ট' ব্যবহৃত হয়। দু'রকমের হয়ে গেলে তা যেমন অনভিজ্ঞ মুদ্রাকরের লক্ষন। তেমনি বইএর অঙ্গসজ্জার পক্ষে পীড়াদায়ক। আজকাল মুদ্রাকরেরা নিজেদের হরফ আর নিজেরা বানিয়ে নেন না। হরফ ঢালাই এর স্বতন্ত্র কারখানায় নানান ছাঁদের হরফ তৈরি হয়, ছাপাখানার মালিকেরা পছন্দ করে কিনে আনেন। একেক প্রস্থ, অর্থাৎ একেক সেট ( Set ) হরফের সঙ্গে একই ছাঁদের ছোট বড় নানান মাপের এবং ছোট হরফ বড় হরফের সেট বা প্রস্থ তৈরি হয়। এ'কে হরফ-পরিবার ( Family of types ) বলা যায়। যেমন, বিশেষ ছাঁদের পাইকা হরফের সঙ্গে সেই একই ছাঁদের বর্জ-ইস, ইংলিশ ইত্যাদি হরফও তৈরি থাকে।

## মুদ্রা বিন্যাস বা হরফ গাঁথাই (Composition)

হরফ সংগ্রহের পরের ধাপে ছাপাখানার কাজ সেই হরফ বা মুদ্রাগুলিকে পাণ্ডুলিপি দেখে দেখে মুদ্রণের জন্য বিন্যাস। এজন্য প্রথমেই মুদ্রাকর স্থির করে নেন বইটি কোন মাপে ছাপানো হবে, —অর্থাৎ কয় ভাঁজের ডিমাই বা ক্রাউন বা রয়াল ইত্যাদি, কোন মাপের হরফ ব্যবহার করা হবে, —অর্থাৎ কত পয়েণ্টের, প্রত্যেক পৃষ্ঠায় কতগুলি ক'রে পংক্তি থাকবে, দুই পংক্তির মাঝখানে কতটা করে ফাঁক থাকবে, চারপাশে কতটা করে ছাড় বা 'মার্জিন' (Margin) থাকবে, ইত্যাদি। এই সকল বিষয় স্থির ক'রে নেবার পর হরফ গাঁথাই এর কাজ। হরফগুলি মুদ্রা বিন্যাসক বা 'কম্পোজিটার' ( Compositor ) সামনে একটি মুদ্রা থালিতে বা 'কেস্'-এ ( Case ) সজ্জিত থাকে। মুদ্রাথালি একটির উপরে আরেকটি আড়াআড়ি ভাবে থাকে উপরেরটি কিছুটা হেলানো ভাবে রাখা হয়। এগুলির মোটামুটি মাপ দৈর্ঘ্য ৩২½" ইঞ্চি, প্রস্থে ১৪½" ইঞ্চি, উচ্চতায় প্রায় দুই ইঞ্চি। উপরের ও নিচের আধার দুটিকে ছাপাখানার ভাষায় বলে 'আপার কেস' ( Upper Case ) ও 'লোয়ার কেস' ( Lower Case ) —ঊর্দ্ধথালি এবং নিম্নথাল। এ দুটিই খোপ যুক্ত। ঊর্দ্ধ থালির খোপে সাজানো থাকে বড় হরফ বা 'ক্যাপিটাল' ( Capital ) এবং 'স্মল ক্যাপিটাল'

হরফ, —৯৮টি খোপের মধ্যে। ছাপাখানার সংক্ষেপিত নাম 'ক্যাপ' ও 'স্মল ক্যাপ'। নিম্ন থালির খোপ সংখ্যা ৫৩টি, – নানান আকারের। তা'র মধ্যে সজ্জিত থাকে ছোট হরফ ( Small letters ) ; – এ গুলিই ছাপাইএর কাজে সবচেয়ে বেশি লাগে বলে হাতের কাছে নিচের আধারে রাখা হয়।

এই দুটি মুদ্রাথালিতে থাকে একই ছাঁদ বা ফণ্টের হরফ, – যার কথা আগে বলা হয়েছে। অক্ষর ছাড়াও আর যেসব হরফ এর মধ্যে থাকে সেগুলির পরিচয় ডিপথিং, লিগেচার, ফিগার, ফ্যাকশন এবং পয়েন্ট। ডিপথং (Dipthong) পরস্পর সংযুক্ত অক্ষর, – যা'র প্রচলন এযুগে বেশ কমে আসছে। লিগেচার (Ligature দুটি পরস্পর সংবদ্ধ অক্ষর, যেগুলি ডিপথঙের মতো মিশে যায় না, ঢালাইএর সময়ে সুবিধের জন্য তৈরি (যেমন fl, fi = fl, fi ইত্যাদি)। ফিগার (Figure) অর্থে গাণিতিক সংখ্যা। ফ্রাকশন (Fraction) এই সংখ্যারই ভগ্নাংশ। পয়েন্ট (Point) অর্থে কমা, দাড়ি, ফুলষ্টপ, ব্রাকেট, তারকা চিহ্ন ইত্যাদি। বাংলা হরফের ক্ষেত্রে এগুলির সঙ্গে কিছু বা মিল কিছু বা স্বাতন্ত্র আছে। যেমন যুক্তাক্ষর, স্বতন্ত্র আকার ইকার ইত্যাদি। দাড়ি বা দুই দাড়ি ইত্যাদি।

মুদ্রণের জন্য পৃষ্ঠায় যে মাপ নির্ধারিত হয়েছে সেই অনুযায়ী প্রথম মুদ্রা-বিন্যাস যে-আধারে করা হয় তাকে বলে গ্যালি (Gally)। কিন্তু সরাসরি গ্যালিতে বিন্যাস করা হয় না। কাজের সুবিধের জন্য তার আগে ছোট ছোট আধার, যেটিকে হাত-মুঠোয় ধরা যায়, তাইতে হরফ গাঁথা হয়। এই আধারটিকে বলা হয় কম্পোজিং ষ্টিক (Composing stick) মুদ্রাবিন্যাস আধার। একসঙ্গে পৃষ্ঠার পংক্তির মাপ অনুযায়ী তিন চার পংক্তি সাজিয়ে নিয়ে সেগুলিকে গ্যালিতে স্থানান্তরিত করা হয়। হরফ গাঁথার কাজ যেমন সহজ মনে হয় আসলে ব্যাপারটা তত সিধে নয়। এখানে পংক্তির মাপ হিসেব করে অক্ষর সাজাতে হয়। একেকটি বাক্যের শেষে এবং দুই পংক্তির মাঝখানে অথবা অনুচ্ছেদের শেষে ও প্রারম্ভে হরফ-ছুট সিসের খণ্ড বা 'স্পেশ' দিতে হয়, —যার কথা আগেই বলা হয়েছে। এই হরফ গাঁথাইএর একটা প্রচলিত মাপ আছে। হিসেব আছে।

মুদ্রাকরের হিসেবের এই মাপটিকে বলা হয় 'এম্' (em)। এবং তার অর্ধেক মাপকে বলে 'এন্' (en)। এ দুটি মাপের উদ্ভব ইংরেজি m এবং n হরফ থেকে, কেন না m অক্ষরটি দৈর্ঘে প্রস্থে সর্বাধিক ব্যাপ্ত, এবং n ঠিক

তার অর্ধেক। মুদ্রা বিন্যাসের আগেই হিসেব করে নিতে হয় কোন ধরণের হরফে এবং কোন মাপের কাগজে বইটি ছাপা হবে, এবং বইটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা কত দাঁড়াবে। নমুনা হিসেবে একটি পাণ্ডুলিপি কল্পনা করে নেওয়া যেতে পারে যার পৃষ্ঠা সংখ্যা একশো। তার প্রতি পংক্তিতে গড়ে যদি ১০টি শব্দ থাকে এবং প্রতি পৃষ্ঠায় যদি ২০টি পংক্তি থাকে, তাহলে সাকুল্যে শব্দ সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে কুড়ি হাজার। এখন এটিকে 'এম্' এর হিসেবে এনে ফেলা যাক। পাইকা হরফের হিসেব ধরলে আমরা জানি এক ইঞ্চিতে ৬টি হরফ ধরে, অথবা বলা যায়, এক ইঞ্চিতে ৬ 'এম্' পাইকা ধরে। এটাই আবার পয়েন্টের হিসাবে দাঁড়ায় এক ইঞ্চিতে ১২ পয়েন্ট হরফের ৬ 'এম্' ধরে। উপরোক্ত পাণ্ডুলিপির হিসেবে ফিরে আসা যাক। যদি মুদ্রিত পৃষ্ঠার প্রত্যেক পংক্তিতে ১০টি করে পাইকা হরফ ধরে এবং প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ২৫টি করে পংক্তি ধরে তাহলে প্রতি পৃষ্ঠায় থাকবে ২৫০টি শব্দ এবং কুড়ি হাজার শব্দের সমগ্র বইটি ছাপাতে লাগছে ৮০ পৃষ্ঠা। ১৬ পৃষ্ঠার ফর্মা হিসেবে ধরে ৫ ফর্মা। 'এম' হিসেবে গড়ে প্রতি শব্দে যদি ৩ এম্ লাগে তাহলে একেক পৃষ্ঠায় ধরছে ৭৫০ 'এম্'। পাইকা এক 'এম্' এক ইঞ্চি ছয় ভাগের এক ভাগ, ৬ 'এম্' এক ইঞ্চি। সুতরাং এইভাবে মুদ্রাকর সহজ মাপ পেয়ে যায়।

কত পাতার পাণ্ডুলিপিতে কত মুদ্রিত পৃষ্ঠা হবে তার আরেকটি যথার্থতর হিসাব করেন মুদ্রক। 'এন্'-এর মাপে। একেকটি শব্দ ছাপাবার জন্য গড়-পড়তা হিসাবে ৪½ অথবা ৫ 'এন'-এর স্থান লাগে। পাণ্ডুলিপির কয়েকটি পুরা পংক্তির শব্দ সংখ্যা গুণে অনায়াসেই 'এন' একটা গড়পড়তা হিসাব বার করা চলে। এই 'এন' সংখ্যাকে সমগ্র পাণ্ডুলিপির পংক্তি সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে সমগ্র পাণ্ডুলিপির 'এন' সংখ্যার হিসাব মিলবে। এভাবে প্রাপ্ত সমগ্র এন্-সংখ্যাকে প্রতি পৃষ্ঠার পংক্তি ও ,এন্' সংখ্যার গুণক দিয়ে ভাগ করলে সমগ্র পৃষ্ঠা বেরিয়ে আসবে।

নমুনা হিসাবে ৯০,০০০ শব্দ সংখ্যার একটি পাণ্ডুলিপি নেওয়া যাক, ধরে নেওয়া যাক, একটিশব্দের জন্য ফাঁক বা 'স্পেস' সমেত লাগছে ৫ 'এন', এক পৃষ্ঠায় গড় পংক্তি-সংখ্যা ৩৫, প্রতি পংক্তিতে গড়ে লাগবে ৫৬ 'এন', বইটি ছাপানো হবে ১২ পয়েন্ট হরফে, —তাহলে, ছাড় বা মার্জিন-এর জন্য শতকরা ৫ 'এন্' হিসাবে যোগ করে পাণ্ডুলিপির মুদ্রণ পত্র সংখ্যা হবে ২৪১ হিসাবটা নিম্নরূপ :—

$$\frac{৯০,০০০ \times ১০৫ \times ৫}{৩৫ \times ৫৬ \times ১০০} = ২৪১$$

যদি ১০ পয়েন্ট হরফে ছাপানো হয় তাহলে হিসাব নিম্নরূপ :—(এখানে উল্লেখনীয়, ১২ পয়েন্ট হরফই মুদ্রণের হিসাবের মান বলে ধরা হয়—যে কথা পূর্বেও বলা হয়েছে)

$$\frac{৯০,০০০ \times ১০৫ \times ৫ \times ১০}{৩৫ \times ৫৬ \times ১০০ \times ১২} = ২০১$$

এইবারে মুদ্রা বিন্যাস, অর্থাৎ গাঁথাই-এর আধারে কম্পোজিংষ্টিকে হরফ গাঁথার কাজ। আগে বলা হয়েছে যে গ্যালিতে সরাসরি বিন্যস্ত না করে হরফগুলিকে আগে কম্পোজিংষ্টিকে গেঁথে নেওয়া হয়। এটি পিতলের তৈরি ছোট আধার, বাঁ হাতে ধরে রেখে ডান হাত দিয়ে চিমটায় করে বা আঙ্গুলে হরফ তুলে তুলে সাজানো এবং বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে আঁট করে বসানো হয়। মুদ্রা থালিতে হরফগুলি সাজানো থাকে এবং বিন্যাসক সাধারণত সেগুলি দেখে দেখে না তুলে অন্ধভাবেই তুলে যান, যেমন টাইপিষ্ট আঙ্গুলের সাহায্যেই অন্ধভাবে টাইপ করে যান। এই সময়ে হরফের 'নিক' (Nick) নামক খাঁজটি কাজে লাগে, এই খাঁজে আঙ্গুল বুলিয়ে মুদ্রাবিন্যাসক বুঝে নেন হরফটি সোজা দিকে বসানো হল কিনা। পংক্তির নির্দিষ্ট মাপ মতো ষ্টিকের প্যাচ ঘুরিয়ে এঁটে নিয়ে হরফ গাঁথা সুরু করে।

এখানে একটি সূক্ষ্ম হিসাব স্থির করে নিতে হয় বিন্যাসককে। কেন না ছাপার পংক্তিগুলি পৃষ্ঠার মধ্যে এমনভাবে ধরানো দরকার যাতে পংক্তির শেষে এসে কোন শব্দের ভগ্নাংশ না হাজির হয় অথবা শব্দ শেষ হবার পরেও পংক্তির শেষ দিকে ফাঁক থেকে না যায়। এ জন্য শব্দগুলিকে প্রয়োজন মতো সরিয়ে সরিয়ে হিসেবে করে বসাতে হয়। প্রতিটি পংক্তির 'এম' একই মাপের না হলে ছাড় বা মার্জিন অসমান হয়ে পড়বে। এই প্রক্রিয়ার মুদ্রণ পারিভাষিক নাম জাষ্টিফিকেশন (Justification)। এ কাজে যিনি যত নিখুঁত তিনি তত কুশলী কম্পোজিটার।

উপরোক্ত কাজে 'স্পেস্' (Space) বা অমুদ্রিত হরফ সুষ্ঠুভাবে ব্যবহৃত হয়। দুই পংক্তির মাঝে, অনুচ্ছেদ শেষে ফাঁকা অংশে, মার্জিনে সর্বত্র স্পেস্ প্রয়োজন। হরফ গাঁথার কাজে স্পেস-এর সুষম ব্যবহার মুদ্রিত পৃষ্ঠার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে। পৃষ্ঠার মধ্যে যদি সংবাদপত্রের স্তম্ভাদির মতো আড়াআড়ি ফাঁক থেকে

যায় তাহলে দৃষ্টিকটু হয়। বিন্যাসক দক্ষতার সঙ্গে এসব 'জাষ্টিফাই (justify) করে নেন। স্পেস নানান মাপের হয়, সাধারণত পাঁচ রকম। 'থিন' (Thin) মিডল' (Middle), 'থিক' (Thick), আধ 'এম' (half 'em' বা 'n'), এক 'এম্'। আর বড় বড় ফাঁক ভরাট করবার অন্য আছে 'লেড' [Lead]' 'কোয়াড' (Quad), 'কোটেশন' (Quotation), এবং 'রেগলেট' (Reglet). 'লেড' ব্যবহৃত হয় দুই পংক্তির মাঝখানের ফাঁক ভরাট করবার জন্য, অর্থাৎ দু'টি পংক্তির মাঝে অমুদ্রিত ফাঁক রাখবার জন্য। 'লেড একটু বেশি চওড়া হলে তাকে বলে 'ক্লাম্প' (Clump)। অনুচ্ছেদের প্রারম্ভে বা শেষে অনেকখানি ফাঁক রাখবার জন্য যে বড় স্পেসের ব্যবহার তাকেই বলে 'কোয়াড'। আর অতিরিক্ত ফাঁক রাখবার জন্য অনেক সময়ে সিসের বদলে কাঠের বড় স্পেস ব্যবহৃত হয়, যাকে বলে 'রেগলেট'। 'কোটেশন' বৃহৎ ধাতুর স্পেস যেগুলিকে ফাঁপা ভাবে ঢালাই করা হয়। এর ব্যবহার পরিচ্ছেদ ইত্যাদির শেষে, যেখানে পৃষ্ঠার অনেকটাই সাদা রাখবার দরকার হয়।

মুদ্রণে এর পরের ধাপ উপস্থাপন, অর্থাৎ পৃষ্ঠার অনুপাতের হিসেবে বিন্যাস। যাকে বলে 'ইম্পোজিশন' (Imposition)। আগেই বলা হয়েছে কম্পোজিং ষ্টিক ভর্তি হয়ে গেলে বিন্যস্ত পংক্তি কটি 'গ্যালি'-তে চালান করা হয়। গ্যালি লম্বা মাপের আধার, যাতে অন্তত তিন পৃষ্ঠার মতো বিন্যস্ত পংক্তি ধরে। প্রুফ দেখার প্রাথমিক পর্যায়ের ছাপাই এই থেকেই টানা হয়। গ্যালির কাজ শেষ হলে পর পৃষ্ঠা হিসেবে ছাপাবার জন্য গ্যালি থেকে বিন্যাস্ত মুদ্রা চালান যায় মুদ্রণ শিলার (Imposing stone) উপরে। ছাপাখানার আদি যুগে এটি মসৃন প্রস্তর খণ্ডই ছিল, এখন এটি ইস্পাতের টেবিল। এখানে মুদ্রিতব্য সামগ্রী (Matter) পৃষ্ঠার আকার অনুযায়ী সাজানো হয়। মুদ্রাযন্ত্রের চাপে হরফগুলি যাতে নড়ে চড়ে না যায় সেজন্য খুব শক্ত করে বেঁধে দিতে হয়। প্রথমে এটে রাখা হয় ইস্পাতের কাঠামো দিয়ে, মুদ্রণ পরিভাষায় যাকে বলে 'চেজ' (Chase)। এই 'চেজ' এবং সজ্জিত হরফের মধ্যেও কিছু ফাঁক-ফোঁকর থেকে যায়, সেগুলিকে কাঠের পাত দিয়ে ভরাট করে নিতে হয়, যা'কে বলে 'ফারনিচার' (Furniture)। কিন্তু এভাবে আঁট-সাঁট করেও নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না, তবু কিছুটা আল্‌গা থাকে। তাই 'কয়েন' Quoin) নামে এক প্রকার গজালের মতো খাঁজ-কাটা পিতল বা ইস্পাতের পাত দিয়ে 'চেজ'-এর চারপাশ মুড়ে হাতুড়ি দিয়ে ঘা মেরে আটকে দিতে হয়। এইভাবে বজ্র আঁটুনি

দেবার পর এটিকে মুদ্রাযন্ত্রে চড়িয়ে তারপরে মুদ্রণের পালা।

## উপস্থাপন (Imposition) প্রসঙ্গ

'গ্যলি' থেকে মুদ্রণ-শিলায় মুদ্রণ-সামগ্রী চালান দেবার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আজকাল বই ছাপাবার জন্য একটির পর একটি করে পৃষ্ঠা ছাপানো হয় না, একসঙ্গে অনেকগুলি পৃষ্ঠা ছাপানো হয়, অর্থাৎ একসঙ্গে এক পত্রগুচ্ছ বা ফর্মা (Forma)। এবং পৃষ্ঠার দুই দিকই এভাবে একযোগে ছাপানো হয়। তাই পৃষ্ঠা হিসেবে মুদ্রিতব্য সামগ্রী মুদ্রণ-শিলায় সাজাবার কায়দা আছে যাতে ঠিকমতো পারম্পর্য অনুযায়ী ভাঁজ করে ফর্মা খাড়া হয়। একেক ফর্মায় আট, বারো, ষোলো, বত্রিশ এমন কি চৌষট্টি পৃষ্ঠাও ধরে। পৃষ্ঠা বলতে আমরা পাতার একদিক বুঝি, অর্থাৎ দুই পৃষ্ঠায় এক 'পাতা'। ইংরেজিতে 'পেজ' (page) ও 'লিফ' (leaf)। লিখবার খাতা তৈরি করতে আমরা যদি এক তা কাগজ নিয়ে দু' ভাঁজ করি তাহলে পাই দুই পাতা বা চার পৃষ্ঠা চার ভাঁজ করলে পাই চার পাতা বা আট পৃষ্ঠা। আট ভাঁজে ষোলো পৃষ্ঠা। ভাঁজের সময়ে লক্ষ্য রাখলে দেখা যাবে যে প্রথম পৃষ্ঠা কাগজের যে-পিঠে পড়ছে, দ্বিতীয় পৃষ্ঠা পড়ছে তার উল্টো দিকে। চার পৃষ্ঠা হিসেব করলে দেখা যাবে প্রথম আর চতুর্থ পৃষ্ঠা কাগজের যে দিকে পড়ছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পৃষ্ঠা পড়ছে তার উল্টো পিঠে। এইভাবে আট পৃষ্ঠার হিসেব নিলে দেখা যাবে যে কাগজের এক দিকে পড়ছে ক্রম অনুযায়ী ৮, ১, ৫, ৪ পৃষ্ঠা এবং অপর পিঠে পড়ছে ২, ৭, ৩, ৬ পৃষ্ঠা। সমগ্র কাগজটিকে সমান্তরালে ধরলে এই হিসেব পাব, আর চার ভাঁজ করে নিলেই যথাক্রমে পেয়ে যাব ১ থেকে ৮ পৃষ্ঠা এইভাবে ছাপানো কাগজের প্রথম পিঠকে বলে বহির্ভাগ, 'আউটার ফর্মা' (outer forma), এবং ভিতরের পিঠকে অন্তর্ভাগ, 'ইনার ফর্মা (inner forma)। বহির্ভাগের আরম্ভ প্রথম পৃষ্ঠা দিয়ে, অন্তর্ভাগের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়। ১২ পৃষ্ঠার গুচ্ছে বহির্ভাগে থাকবে ক্রমানুযায়ী ১, ১২, ৩, ১০, ৫, ৮ পৃষ্ঠা। অন্তর্ভাগে ১১, ২, ৯, ৪, ৭, ৬, পৃষ্ঠা। ১৬ পৃষ্ঠার গুচ্ছে বহির্ভাগে ১, ১৬, ১৩, ৪, ৮, ৯, ১২, ৫ পৃষ্ঠা। অন্তর্ভাগে ২, ১৫, ১৪, ৩, ৭, ১০, ১১, পৃষ্ঠা। বিন্যস্ত মুদ্রা সামগ্রী এই ক্রম ধরে মুদ্রণ-শিলায় উপস্থাপন করতে হয়।

## বই-এর মাপ

এই থেকে আমরা ছাপানো বই-এর মাপ কী দাঁড়াচ্ছে জানতে পারি। এর আগে কাগজের মাপের কথা বলা হয়েছে। এখন জেনে নেওয়া যাক কোন মাপের কাগজ কী ভাবে ভাঁজ করলে কোন আকারের বই দাঁড়ায়।

প্রথমে ভাঁজের কথা। কাগজকে, তা সে যে কোনো মাপেরই হোক, একবার ভাঁজ করলে পাই দু'পাতা (চার পৃষ্ঠা), যাকে বলে 'ফোলিও' (folio)। অবশ্য পুরোনো আমলের ফোলিও সংস্করণ বই বলতে বড় আকারের বই-ই বোঝায়, তবে সে ইতিহাস স্বতন্ত্র। 'ফোলিও'র পরে 'কোয়ার্টো (quarto) মাপ মেলে কাগজকে দুবার ভাঁজ করলে, পাই চার পাতা (আট পৃষ্ঠা)। চারবার ভাঁজ করলে পাই আট পাতা (ষোল পৃষ্ঠা), যার নাম-পরিচিতি 'অক্টেভো' (Octavo)। ছয় ভাঁজ করলে 'ডুওডেসিমো' (duodecimo) বারো পাতা (চব্বিশ পৃষ্ঠা)। আটবার ভাঁজে ষোল পাতা (বত্রিশ পৃষ্ঠা) —'সেক্সটোডেসিমো' (sexto-decimo) ইত্যাদি। আজকাল বইএর ব্যাপারে কাগজের মাপ না ধরে বইটা ঠিক যে মাপে এসে দাঁড়ায়—ছাটাই-এর পরে—সেই আনুমানিক মাপ ধরা হয়। মুদ্রাকরের ভাষায় এর কতকগুলো সংক্ষেপিত নাম আছে। যেমন—

| | | | |
|---|---|---|---|
| ফোলিও | — | ৩০ সেন্টিমিটারের বেশি | (১৫ ইঞ্চি) লম্বা |
| কোয়ার্টো | — | ৩০ সেন্টিমিটার | (১২ ইঞ্চি) লম্বা |
| অক্টেভো | — | ২৫ সেন্টিমিটার | (৯¾ ইঞ্চি) লম্বা |
| ডুয়োডেসিমো | — | ২০ সেন্টিমিটার | (৭¾ ইঞ্চি) লম্বা |
| সেক্সটো-ডেসিমো | | ১৭½ সেন্টিমিটার | (৬¾ ইঞ্চি) লম্বা ইত্যাদি |

ইংরেজিতে সংক্ষেপিত ভাবে বলে ফোলিওর জন্য F, তার পরে ক্রমানুসারে 4to, 8vo, 12mo, 16mo, 24mo, 32mo, ইত্যাদি। বাংলাতে মুদ্রাকরের মুখে এগুলির বিচিত্র মিশ্রিত নামোল্লেখ, —চার পেজি, আট পেজি, বারোপেজি, ষোল পেজি ইত্যাদি। অবশ্য এর আগে কাগজের মাপটা জুড়ে নিতে হয়। যেমন ডিমাই আট পেজি, রয়াল বারো পেজি, ক্রাউন ষোল পেজি, ইত্যাদি। ইংরেজিতে ডিমাই অক্টেভো, রয়াল ডুয়োডেসিমো বা 12mo, ক্রাউন সেক্সটো-ডেসিমো বা 16mo ইত্যাদি।

উপরোক্ত মাপের বাইরে আরো কয়েকটি অপ্রচলিত মাপও আছে। যেমন

| | | |
|---|---|---|
| ডবল এলিফেন্ট ফোলিও | — | ৫০ ইঞ্চি লম্বা |
| অ্যাটলাস ফোলিও | — | ২৫ ইঞ্চি লম্বা |
| এলিফেন্ট ফোলিও | — | ২৩ ইঞ্চি লম্বা |
| ৩২ মো — | — | ৫ ইঞ্চি লম্বা |
| ৪৮ মো — | — | ৪ ইঞ্চি লম্বা |
| ৬৪ মো — | — | ৩ ইঞ্চি লম্বা |

বহুল প্রচলিত কয়েকটি বইএর মাপ জেনে রাখা দরকার।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ফুলস্কেপ | ৪ পেজি | ৮ ১/২ ইঞ্চি × ৬ ৩/৪ ইঞ্চি ; | ৮ পেজি | ৬ ৩/৪ ইঞ্চি × ৪ ১/৪ ইঞ্চি |
| ক্রাউন | ৪ ” | ১০ ” × ৭ ১/২ ” ; | ৮ ” | ৭ ১/২ ” × ৫ ” |
| ডিমাই | ৪ ” | ১১ ১/৪ ” × ৮ ৩/৪ ” ; | ৮ ” | ৮ ৩/৪ ” × ৫ ৫/৮ ” |
| রয়াল | ৪ ” | ১২ ১/২ ” × ১০ ” ; | ৮ ” | ১০ ” × ৬ ১/৪ ” |
| | | | ১৬ ” | ৬ ১/৪ ” × ৫ ” |
| ইম্পিরিয়াল | ৪ ” | ১৫ ” × ১১ ” ; | ৮ ” | ১১ ” × ৭ ১/২ ” |
| | | | ১৬ ” | ৭ ১/২ ” × ৫ ১/২ ” |

উপরোক্ত এই সকল মাপ আবার আমাদের দেশের প্রচলিত মাপের সঙ্গে মেলে না। হিসাবের গরমিল নিম্নোক্ত রূপ —

| কাগজের নাম | কাগজের মাপ | ৪ পেজি ফর্মার মাপ | ৮ পেজি ফর্মার মাপ |
|---|---|---|---|
| ফুলস্কেপ | ১৩ ১/২ ইঞ্চি × ১৭ ইঞ্চি | ৮ ইঞ্চি × ৬ ৩/৪ ইঞ্চি | ৬ ৩/৪ ইঞ্চি × ৪ ইঞ্চি |
| ডিমাই (১) | ১৮ ” × ২২ ” | ১১ ” × ৯ ” | ৯ ” × ৫ ১/২ ” |
| ডিমাই (২) | ১৭ ১/২ ” × ২২ ১/২ ” | ১১ ১/৪ ” × ৮ ৩/৮ ” | ৮ ৩/৮ ” × ৫ ৫/৮ ” |
| রয়াল (১) | ২০ ” × ২৫ ” | ১২ ১/২ ” × ১০ ” | ১০ ” × ৬ ১/৪ ” |
| রয়াল (২) | ২০ ” × ২৬ ” | ১৩ ” × ১০ ” | ১০ ” × ৬ ১/২ ” |
| ইম্পিরিয়াল (১) | ২২ ” × ৩০ ” | ১৫ ” × ১১ ” | ১১ ” × ৭ ১/২ ” |
| ইম্পিরিয়াল (২) | ২২ ” × ৩২ ” | ১৬ ” × ১১ ” | ১১ ” × ৮ ” |
| ক্রাউন | ১৫ ” × ২০ ” | ১০ ” × ৭ ১/২ ” | ৭ ১/২ ” × ৫ ” |

এই হিসেব থেকে ১৬ পেজি ফর্মার হিসাব বার করে নিতে অসুবিধা হবে না। এই সব কাগজ যখন মাপে আরো বড় থাকে, অর্থাৎ ছাপানোর সুবিধে ও খরচ কমানোর জন্য বড় বড় কাগজের তা নেওয়া হয়, যেমন 'ডবল ডিমাই', 'ডবল ক্রাউন' ইত্যাদি, তখন ফর্মাগুলিও দ্বিগুণিত হয়ে যায়, — ১৬ পৃষ্ঠার

জায়গায় ৩২ পৃষ্ঠা বা ৬৪ পৃষ্ঠা করে বেরোয়। আজকাল অধিকাংশ মুদ্রণালয়ে এটাই চালু।

## দপ্তরচিহ্ন বা সিগনেচার (Signature)

বই তো লম্বা চওড়া কাগজে একসঙ্গে অনেকগুলো ক'রে পৃষ্ঠা ছাপানো হল, এখন দপ্তরীকে দিতে হবে বাঁধানোর জন্য। দপ্তরী সেগুলিকে ফর্মা হিসেবে ভাঁজ করে নেবে। তারপরে একটার পরে আরেকটা ফর্মা পরম্পরা অনুযায়ী সাজাবে বাঁধানোর জন্য। কিন্তু এই কাজে যাতে ভুল চুক না হয় পুরো বইটি পৃষ্ঠা পরম্পরায় ঠিকমতো সাজানো যায় সেজন্য প্রত্যেকটি ফর্মার সুরুতে মুদ্রক একটি ক'রে সংকেত চিহ্ন ছাপিয়ে দেন। এই চিহ্নকেই বলে 'সিগনেচার' (Signature)। বাংলাতে বলতে পারি 'দপ্তরচিহ্ন'। এই চিহ্ন ফর্মার প্রারম্ভ পৃষ্ঠার নিচের মার্জিনে মুদ্রিত হয় এবং পরের পর চিহ্ন মিলিয়ে দপ্তরী ফর্মা সাজান। যুগে যুগে এই চিহ্নের রকমারি প্রয়োগ এবং বিবর্তন লক্ষ্য করবার মতো। পুস্তক গ্রন্থণের আদিযুগে পাতার কোণে ফুটো করে সংকেত রাখা হ'ত। সাজিয়ে বাঁধাবার পর সেই অংশ ছাঁটাই হয়ে যেত, বইটি দেখাত পরিচ্ছন্ন। তারপর দেখা যায় রোমক সংখ্যা চিহ্ন, গাণিতিক সংখ্যা চিহ্ন, তারকা চিহ্ন প্রভৃতি। আজকাল দেখতে পাই গাণিতিক চিহ্ন বা ব্যঞ্জনবর্ণ প্রভৃতি। অথবা গাণিতিক সংখ্যার সঙ্গে বইএর নামের আদ্যাক্ষর। পুস্তক গ্রন্থণের আদিযুগে পত্রসংখ্যার প্রচলন ছিল না। পরে যখন পত্রসংখ্যা চালু হল, তখন স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে দপ্তর চিহ্নের আর কী প্রয়োজন। কিন্তু দপ্তরীর পক্ষে পৃষ্ঠা মিলিয়ে বই বাঁধা কিছুটা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, এমন কি দপ্তরী নিরক্ষরও হতে পারেন। তাই চিহ্ন থাকলে তাঁর পক্ষে ফর্মা সাজানোর কাজ সহজতর হয়।

## যান্ত্রিক মুদ্রা বিন্যাস

হরফ খোদাই ও ঢালাই হাতের বদলে যন্ত্রে করবার কয়েকটি পদ্ধতি বেরিয়েছে। এতে একই সঙ্গে হরফ তৈরি ও বিন্যাসের কাজ চলছে, যার

ফলে মুদ্রণের কাজ হয়েছে অনায়াস আর দ্রুত। এর মধ্যে প্রধান মনোপাইপ ও লাইনোটাইপ।

## মনোটাইপ (Monotype)

মনোপাইপ যন্ত্র আবিষ্কার করেন টলবার্ট লেন্স্টন ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। এই যন্ত্রের সাহায্যে প্রতিটি হরফ ঢালাই এবং শেষে পংক্তি বিন্যাস দুই কাজই হয় চাবি টিপে। এই যন্ত্রের দুটি অংশ, চাবি বা 'কী-বোর্ড' (key-board)। এবং ঢালাই বা 'কাসটিং মেশিন' (Custing machine)। কোনো হরফের জন্য চাবি টিপলে এই যন্ত্রে হরফ বেরোয়না বা হরফের ছাপ পড়ে না। হরফের বদলে লাটাই এ জড়ানো কাগজ থাকে এবং চাবি টিপলে হরফের মাপ মতো ফুটো তৈরি করে দেয় কাগজের মোড়কে। এই কাগজ যন্ত্রের মাথায় গোল করে মোড়া থাকে এবং ফিতের মতো বেরিয়ে আসে। এক এক প্রস্থ কাগজে চল্লিশ হাজার পর্যন্ত অক্ষর ফোটান যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ঐ অক্ষর ফোটানো কাগজ যায় ঢালাই যন্ত্রে। এই যন্ত্রের সাহায্যে ফুটোগুলির মধ্যে বাতাসের চাপে গলিত সিসে বেরোয় এবং হরফ তৈরি করে। তারপরে নল বেয়ে সেই হরফ গিয়ে জড় হয় মুদ্রাথালিতে। ছাপানোর কাজ চুকে গেলে গেলে পর ঐ হরফের সিসে গালিয়ে আবার নতুন হরফ তৈরির কাজে লাগানো যায়। মনোটাইপ যন্ত্রটি জটিল হলেও সুবিধে অনেক। বিশেষত বই ছাপানোর কাজে। এই যন্ত্রে হরফ গাঁথার জাষ্টিফিকেশনের কাজ সুচারুভাবে হয়, কাগজের পাশে এজন্য ফুটো রেখে সেই ব্যবস্থা করা আছে। দ্বিতীয়ত প্রত্যেকটি হরফ আলাদাভাবে তৈরি হয় বলে সংশোধনের প্রয়োজন ঘটলে সেই অক্ষরটি বদলাতে হয়। তৃতীয়ত, বইএর একাধিক সংস্করণের প্রয়োজনে হরফের ফুটো-যুক্ত কাগজের মোড়কটির পাশে গ্রন্থের পরিচয় লিখে তুলে রেখে দিলেই চলে। বই ছাপানোর কাজ তাড়াতাড়ী করতে হলে একাধিক ঢালাই যন্ত্র সহজেই ব্যবহার করা চলে। লাইনোটাইপ বা অন্য ক্ষেত্রে এ কাজের জন্য বিন্যস্ত সামগ্রী রেখে দিতে হলে প্রচুর জায়গা যেমন লাগে তেমনি প্রচুর পরিমান সিসেও আটকে থাকে। এই যন্ত্রে হরফগুলিকে বেশ পোক্ত করে ঢালাই করা যায়। যে কাজ লাইনোটাইপে হয় না। মনোটাইপ যন্ত্রটি ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হলেও ব্যবহৃত হতে হতে তের বছর পার হয়ে যায়

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ছাপাইএর জন্য চালু হয় এটি। লাইনোটাইপ পরে আবিষ্কৃত হয়েও ব্যবহৃত হয় এর এগারো বছর আগে থেকেই।

## লাইনোটাইপ (Lino-type)

লাইনোটাইপ যন্ত্রের উদ্ভাবক অটমার মেরগ্যান থেলার, উদ্ভব হয় ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে। আজকাল ছাপার কাজে, বিশেষত সংবাদপত্র মুদ্রণে এই যন্ত্র অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। লাইনো টাইপে ঠিক টাইপ রাইটার যন্ত্রের মতো চাবি বা 'কীবোর্ড' থাকে। পাণ্ডুলিপি দেখে এই অক্ষর মালার চাবিতে চাপ দিলে একটি করে ছাঁচ ( matrix ) বেরিয়ে আসে মুদ্রাভাণ্ড থেকে, এবং গিয়ে হাজির হয় সংযোজন থালি বা 'এসেম্বলি বক্সে' (Assembly Box) যেটিকে বলা যায় লাইনোর কম্পোজিংষ্টিক। এই ভাবে একটির পর একটি অক্ষর এবং যথাবিহিত অক্ষর ছুট—হরফ বা 'স্পেস' গিয়ে বই এর নির্দিষ্ট মাপ অনুযায়ী একটি পুরো পংক্তি রচনা করে। জাষ্টিফিকেশনের জন্য পংক্তির দুই 'এম' মতন জায়গা বাকি থাকতেই একটা ঘণ্টা বাজে—টাইপরাইটারের মতো। তখন মুদ্রাকর হিসেব করে হয় বাকি অংশে কিছু হরফ ঢুকিয়ে দেন নয়তো পংক্তিটি ভেঙ্গে আবার নূতন করে মাপমতো রচনা করেন। এবারে এই রচিত পংক্তি চলে যায় গালাই প্রকোষ্ঠ বা 'মোল্ড্ হুইলে' ( Mould wheel ), এবং তার পাশের গলিত সিসের পাত্র থেকে সিসে এসে ছাঁচ থেকে ছাপ তুলে নেয়, তৈরি হয়ে যায় এক পংক্তি হরফ—যাকে বলা হয় 'স্লাগ' (slug)। এই হরফের পাত বা স্লাগ তখন চলে যায় মুদ্রাকরের হাতের কাছের গ্যালিতে। আর এই ঢালাইএর কাজ সেরে ছাঁচগুলি যন্ত্রের সাহায্যে আপনা থেকেই এসে আবার জড় হয় যার যার ভাণ্ডারে এবং ছাপানোর কাজ শেষ হয়ে গেলে হরফের পংক্তিগুলি গালাই যন্ত্রে ফেলে দিলেই আবার ব্যবহারে লেগে যায়। লাইনোটাইপে খুব তাড়াতাড়ি মুদ্রণের কাজ হয়। বলতে গেলে একই সঙ্গে যেন তিন পংক্তির কাজ হয়ে যায়। এক পংক্তি ছাঁচ যখন গেল এসেম্বলি বক্সে তখন মোলড থেকে আরেকটি পংক্তির স্লাগ তৈরি হচ্ছে এবং আরেকটি পংক্তির ছাঁচ ফিরে যাচ্ছে ভাণ্ডারে। দ্বিতীয়ত, একজন মাত্র মুদ্রাকর সবটা কাজ করে যাচ্ছে, যে কাজে অন্য ক্ষেত্রে চারজন লাগত। তবে এর অসুবিধে পংক্তি যোজনায় ভুলের ক্ষেত্রে, তখন সবটা আবার ভাঙ্গতে হয়।

সুতরাং খুব সতর্ক মুদ্রাকরের প্রয়োজন। তাছাড়া সংস্করণের প্রয়োজনে মুদ্রণ সামগ্রী জমিয়ে রাখা যায় না। যন্ত্রের সাহায্যে ঢালাই ও ছাপাইএর কাজ চালু হওয়াতে একটা মস্ত সুবিধে এই যে সব সময়েই টাটকা হরফে কাজ করা যায়, মুদ্রণ হয় পরিপাটি।

বাংলা মুদ্রণের ক্ষেত্রে লাইনোটাইপের প্রবর্তন হওয়াতে অনেক সুবিধে হয়েছে। আকার ইকার হ্রস্ব দীর্ঘ—যুক্ত অর্ধ প্রভৃতি নানান চিহ্ন ও অক্ষরে বাংলা বর্ণমালা এমনিতেই বেশ জটিল। এর ফলে মুদ্রাথালিতে হরফের সংখ্যা প্রচুর। লাইনোতে এই সংখ্যাকে অর্ধেকে এনে দাঁড় করানো সম্ভব হয়েছে। এই সূত্রে সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে পথিকৃত হিসেবে। তারও আগে বাংলা মুদ্রণ ও হরফ শোধনের ক্ষেত্রে এবং নানাবিধ মুদ্রণের প্রয়োগ সূত্রে স্মরণীয় নাম উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী।

## ষ্টিরিওটাইপ (Stereotype)

বিন্যস্ত হরফ. অর্থাৎ মুদ্রাসামগ্রী থেকে পুরো ছাঁচ তুলে নিয়ে তাই থেকে সামগ্রিক একটি করে ঢালাই করা ধাতুর ছাঁচ তৈরি করে নিলে মুদ্রণের কাজে সুবিধে হয়। সংবাদপত্র সাময়িক পত্রাদির ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি খুব কাজে লাগে। বিশেষত যেখানে লাইনো বা মনোটাইপ যন্ত্রের অভাব। এর ফলে ছাপার কাজ খুব তাড়াতাড়ি হয়, এবং প্রয়োজনের পক্ষে তুলেও রাখা চলে এই হালকা সামগ্রী, যদিচ খুব বেশিবার ব্যবহার করা চলে না,—মুখগুলো ভোঁতা হয়ে যায়।

ষ্টিরিওটাইপ পদ্ধতির উদ্ভাবক উইলিয়াম গেড, ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে। ব্লটিং, টিস্যু প্রভৃতি কাগজ ভিজিয়ে প্রায় মণ্ড মতন করে নেওয়া হয়, যাকে বলে ফ্লং (flong)। এই ভেজা ফ্লং বিন্যস্ত হরফের ফর্মার উপরে কয়েক পরত বিছিয়ে বুরুশ দিয়ে পিটিয়ে বসাতে হয়। এই ফ্লং শুকিয়ে গেলেই দেখা যাবে তাতে হরফের ছাপ ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ এই ফ্লংই হয়ে গেল ফর্মার ছাঁচ। এই ছাঁচে গলিত সিসে জাতীয় ধাতু ঢেলে দিলেই ফর্মার হরফ তৈরী হয়ে গেল।

## ইলেক্‌ট্রোটাইপ (Electrotype)

নকল ছাঁচ তৈরীর আরেকটি পদ্ধতি ইলেক্‌ট্রোটাইপ। এই পদ্ধতিতে ষ্টিরিও থেকে সময় এবং খরচ দুইই বেশি লাগে। বিন্যস্ত হরফের ফর্মার

উপরে প্রথমে এক পরত সিসে ঢেলে বা ছড়িয়ে দিয়ে তার উপরে গলিত মোম ঢেলে দেওয়া হয়। এটা শুকিয়ে যে মোমের ছাঁচ তৈরি হল তার থেকে তড়িৎ-বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় (electrolysis) তামার গুঁড়ো জমিয়ে নকল ফর্মা পাওয়া যায়।

এই সব প্রক্রিয়ার ফলে একই ফর্মার একাধিক নকল ছাঁচ নিয়ে একই সামগ্রী একাধিক মুদ্রণ যন্ত্রে ফেলে ছাপার কাজ দ্রুততর করা সম্ভব হয়েছে। এ যুগের আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আরো একধাপ এগিয়ে গিয়েছে। মুদ্রণে আলোকচিত্রের ব্যবহার যেন যুগান্তর এনে দিয়েছে। পেয়েছি ফোটো অফসেট (photo-offset) মুদ্রণ।

## ফোটোকম্পোজিং (Photo-composing) এবং ফোটো-অফসেট লিথোগ্রাফি (Photo-offset lithography)

সংক্ষেপে ফোটো-অফসেট বা ফোটো লিথোগ্রাফি বললেও ব্যাপারটা বোঝা যায়। লাইনো বা মনোটাইপ যন্ত্রেরই মতো পদ্ধতি এটি। কেবলমাত্র গলিত সিসে দিয়ে হরফ ঢালাই-এর বদলে থাকে আলোকচিত্রণের যন্ত্রপাতি যার সহায়তায় ফোটোগ্রাফিক প্লেট তৈরি হয়ে যায়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে হরফ বিন্যাস হয় ধাতুর বদলে হরফের আলোকচিত্রে। এবং এই থেকে ছাপানোর কাজ চলে আলোকচিত্রনেরই লিথোগ্রাফিতে। পরবর্তী 'চিত্রণ'—অধ্যায়ে লিথোগ্রাফ সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে। অফসেট লিথোগ্রাফিতে পাথরের পরিবর্তে নেওয়া হয় ধাতুর পাত। এই পাতে জিলেটিনের (gelatin) আস্তরণ লাগিয়ে তার উপরে হরফ-চিত্রের নিগেটিভ রেখে আলোয় ধরলেই জিলেটিন হরফের ক্ষীণতা বা পুরুত্ব অনুযায়ী শক্ত হয়ে যায় সেই পাত থেকে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে মুদ্রণ চলে। ফোটোর সাহায্যে রঙীন হরফ বা নক্সা থেকেও সহজে রঙীন ছাপ তোলা যায়।

## জেরোগ্রাফি (Xerography)

মুদ্রণের উন্নতিকে আরো একধাপ এগিয়ে এনেছেন চেস্টার কার্লসন তাঁর আবিষ্কৃত জেরোগ্রাফ পদ্ধতিতে মুদ্রিতব্য সামগ্রীর ফোটো নিগেটিভ তৈরি

করে তড়িৎ শক্তির সাহায্যে একটি পাতের উপরে ফুটিয়ে তুলে তার উপরে ছাপাকালির গুঁড়ো ছড়িয়ে সেটির প্রতিলিপি কাগজে তুলে নেওয়া হয়। কিছুক্ষণ আলোয় থাকলেই কাগজের উপরে হরফ-ছাপ শুকিয়ে বসে যায়। আজকাল গ্রন্থাগারে অথবা দপ্তরে সাইক্লোস্টাইল যন্ত্রের মতো, বা তার বদলে জেরক্স (xerox) যন্ত্র অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। কোনো বিরল বইএর পুরো নকল অতি সহজে সুষ্ঠুভাবে কম সময়ের মধ্যে এই যন্ত্রের সাহায্যে করা যায়।

## ছাপার ভুল শোধরানো : প্রুফ দেখা

নকল করতে গেলেই ভুল হয়ে যাবার ভয় থাকে। ভুল এড়ানো কঠিন হয়ে পড়ে অনেক ক্ষেত্রে। সেকালে পুথি নকল করতে গিয়ে ঠিকমতো পড়বার ভুলে বা অন্যমনস্কতায় অথবা অকারণ পাণ্ডিত্য দেখাবার চেষ্টায় নানান ভুল যুগের পর যুগ ধরে চলে এসেছে। সেইসব প্রক্ষিপ্ত অংশ নিয়ে গবেষকরা মাথা ঘামান। এযুগে ছাপাখানার কাজে ভুলচুক হওয়া অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। একেকটা ভুল এমন অদ্ভুত ধরণের হয় যে মাথামুণ্ডু খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই 'ছাপাখানার ভূত' (printer's devil) নামকরণ হয়েছে এই ভ্রান্তির। বই ছাপানোর প্রাথমিক পর্যায়ে এই সব ভুল সংশোধন করে দেওয়া হয়, কেননা ছাপার হরফে ভুল থাকাটা বড়ই কলঙ্কজনক। গ্যালি থেকে যে ছাপাই টানা হয়, সংশোধনের কাজ করা হয় তার উপরে। কিন্তু সংশোধক যদি ভুল শব্দ বা হরফ কেটে আবার নতুন করে সেগুলি বসাতে যান তাহলে আবার নূতন করে সেই ভুলই হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই সংশোধনের বা প্রুফ দেখার কতকগুলো সংকেত আছে। গ্রন্থাগারিকের পক্ষে মোটামুটিভাবে সেগুলি জেনে রাখা ভাল। চিহ্নগুলির পরিচয় নিম্নরূপ :—

⌒ ক্লোজ-আপ (close-up) : দুটো হরফ গায়ে গায়ে না থেকে যদি তফাতে হয়ে যায় তাহলে এই চিহ্ন ব্যবহার্য। (যেমন ব⌒ক)

∧ কোনো হরফ বাদ পড়ে গেলে এই চিহ্ন প্রযোজ্য। (যেমন-- গ্রন্থা∧রিক — গা)

∠ দুটো হরফ বা শব্দের মাঝে ফাঁক কমাবার সংকেত।

[ ] ডাইনে বা বাঁয়ে সরাবার নির্দেশ।

⌐ ⌙ উপরে বা নীচে সরাবার নির্দেশ।

ꝺ কোনো হরফ উল্টো বসানো হ'লে তা'কে সিধেভাবে বসাবার নির্দেশ চিহ্ন যেমন প্রগৌলেৄর

# দুই হরফ বা শব্দের মাঝখানে আরো ফাঁক রাখার সংকেত।

ডিলিট (delete): কোন হরফ বা শব্দ ইত্যাদি বাদ দেবার নির্দেশ।
যেমন— বর্ক

¶ নূতন প্যারাগ্রাফ করার নির্দেশ।

no ¶ প্যারাগ্রাফ বাতিল করার নির্দেশ।

Stat ভুল করে কোনো অংশ বাদ দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়ে গেলে সেটি পুনর্বহাল রাখার নির্দেশ।

Tr ট্রান্সপোজ (transpose): শব্দগুলি যথাস্থানে বসাবার নির্দেশ।
( যেমন—আমি করব ঠিক - Tr.

× ভাঙ্গা হরফ পাল্টাবার নির্দেশ চিহ্ন।

w. f, (wrong font) ভুল মাপের হরফ; অর্থাৎ পরিবর্ত্তন এবং পুনর্বিন্যাসের নির্দেশ।

উপরের অংশ সংশোধনের সংকেত চিহ্ন।
( যেমন— হাঁসপাতাল- ˙ চন্দ্রবিন্দু তুলে দিতে হবে।)

নিচের অংশ সংশোধনের সংকেত চিহ্ন।
(যেমন— পুনরায় ্ হসন্ত তুলে দিতে হবে)

/// পংক্তি বেঁকে গেলে সেটি সোজা করার জন্য চিহ্ন।

## মুদ্রণ যন্ত্র

হরফ সাজিয়ে মুদ্রাথালি প্রস্তুত করে নেবার পরে তার উপরে কালি বুলিয়ে কাগজ চাপিয়ে ছাপ বা মুদ্রণ তোলার যন্ত্রই 'প্রেস' (Press) বা মুদ্রণযন্ত্র। উপরোক্ত তিন প্রক্রিয়া পর পর এই যন্ত্রের সাহায্যে সম্পন্ন হয়। আজকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুদ্রণের কাজ হয় তড়িৎ শক্তির সহায়তায়। তবে হস্তচালিত যন্ত্রের প্রচল সারাদেশে অসংখ্য। হস্তচালিত মুদ্রণযন্ত্র বা হ্যাণ্ড প্রেসই (Hand Press) মুদ্রণের আদিমতম পদ্ধতি, এবং 'মেসিন প্রেস' ( Machine Press ) এই ভিত্তিতেই প্রস্তুত, —যদিচ মুদ্রণের উন্নতিতে একে স্বতন্ত্র এক ব্যাপার বলেই মনে হবে। মুদ্রণের মূল ব্যাপার হরফ মালার উপরে

সমানভাবে কালি বুলিয়ে তার উপরে কাগজ চাপিয়ে এমনভাবে চাপ দেওয়া যাতে সবদিকের চাপ সমান হয় এবং কাগজের উপরে ছাপাই সর্বাংশে সমভাবে পরিস্ফূট হয়।

হ্যাণ্ড প্রেসের গঠনে প্রধান দুটি খাড়া পোক্ত কাঠ বা লোহা, যে দুটিকে বলে 'চীক' (cheek)। এই দুই কাষ্ঠ বা লৌহখণ্ডের উপরের দিকে আরেকটি সমান্তরাল কাঠ বা লোহা আটকে দেওয়া হয়। যেটিকে বলে 'ক্যাপ' (cap)। এবং অনুরূপ আরেকটি সমান্তরাল খণ্ড থাকে নিচের দিকে—যাকে বলা হয় 'উইণ্টার' (winter)। এইভাবে তৈরি হল মুদ্রাযন্ত্রের শক্ত-পোক্ত কাঠামোটি। উপরের কাঠের মাঝ বরাবর থাকে যে যন্ত্রটি সেটির নাম 'স্পিণ্ডল' ((spindle) —স্ক্রু-বিশিষ্ট লৌহদণ্ড, যার নিচে একটি লোহার পাত বা 'প্লাটেন' (platen) সংলগ্ন থাকে। এই লোহার পাতটি উপরোক্ত হাতলের সাহায্যে নিচে নামিয়ে ছাপ তোলার জন্য চাপ দেবার কাজে লাগে। হ্যাণ্ড প্রেসের নিচের অংশে আছে একটি কাঠামো যার উপর দিয়ে মুদ্রাথালির আধার সামনে পিছনে আনাগোনা করতে পারে। আধারটি থাকে পোক্ত কাঠের একটি পাতের উপরে, এবং এই পাতটিই কাঠামোর উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় প্লাটেনের নিচে চাপ দিয়ে ছাপ তোলার জন্য। পাতের উপরে একটি পাথর থাকে মাপ মতো যার উপরে বিন্যস্ত হরফ সামগ্রী রাখা হয়। কিন্তু সরাসরি কাগজের উপরে চাপ দিলে কাগজ ফুটো হয়ে যেতে পারে বলে এবং হরফের মুখগুলি জখম হবার ভয় থাকে বলে একটি বনাতে মোড়া পাতের উপরে কাগজটিকে বসানো হয়। এই পাতটিকে বলে 'টিম্পান' (tympan)। বনাতের বদলে ভেলম বা পার্চমেন্ট দিয়েও এটি মোড়া চলে। আসলে মুদ্রণ যন্ত্রের এই অংশটিতে একসঙ্গে দুটি পাত কব্জা দিয়ে লাগানো থাকে। অর্থাৎ টিম্পানের সঙ্গে আরেকটি সমান মাপের কাঠামো থাকে। এই কাঠামোটিকে বলা হয় 'ফ্রিস্কেট' (firsket)। এটির মাঝখানটা ফাঁকা রাখা হয় এবং ছাপানোর ফর্মা অনুযায়ী মোটা কাগজের বা পার্চমেন্টের খাজ কাটা থাকে—যার ফলে হরফগুলি ছাড়া অন্য অংশ থেকে কোনো কালির ছাপ কাগজের উপরে না আসতে পারে। প্রকারান্তরে এটি মার্জিনের কাজও করে। টিম্পানের উপরে কাগজ বসিয়ে তার উপরে ফ্রিসকেট চাপিয়ে এটিকে নিয়ে প্লাটেনের নিচে হাজির করা হয় এবং ছাপ তোলা হয়। একটির পর আরেকটি কাগজ যাতে ঠিক একই জায়গায় পড়ে সেজন্য কাগজের উপরে নিচে পিন

ফুটিয়ে রেখে পরের পর কাগজ সেই পিনের মধ্যস্থলে এনে হাজির করা হয়। বিশেষ করে কাগজের দুই পিঠে ছাপানোর সময় এই সাবধানতাটুকু অপরিহার্য।

হাতলের সাহায্যে এইভাবে যে ছাপাই যন্ত্রের ব্যবহার তাকে বলে প্লাটেন যন্ত্র (Platen Press)। হাতের বদলে পায়ের সাহায্যে চাকা চালিয়ে ছাপাইএর কাজ দ্রুততর করবার জন্য যে মুদ্রণযন্ত্রের প্রবর্তন হয়েছে তার নাম 'ট্রেডল্' যন্ত্র (Treadle Press)। প্লাটেনের বদলে গোলকের সাহায্যে ছাপাই-এর জন্য আবিষ্কৃত হয়েছে 'সিলিণ্ডার যন্ত্র' (Cylinder Press)। এই যন্ত্রে গোলক বা সিলিণ্ডারে কাগজ জড়ানো থাকে এবং সমান্তরাল অথবা হেলানভাবে বিন্যস্ত মুদ্রা থালির উপরে ঘুরে ঘুরে এসে ছাপ তুলে নেয়। আজকাল অধিকাংশ মুদ্রণযন্ত্রই চলে তড়িৎ শক্তির সাহায্যে। মুদ্রণে ঘূর্ণ্যমান গোলকের ব্যবহার নবযুগ নিয়ে এসেছে। রোটারী যন্ত্র (Rotary Machine) আবিষ্কৃত হয় লণ্ডনে ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম নিকলসন কর্তৃক। এই যন্ত্র ক্রমিক উন্নতির শিখরে ওঠে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে, যখন টাইম্স্ পত্রিকা এই পদ্ধতিতে ছাপানো স্বরু হয় 'ওয়ালটার প্রেস' নামক যন্ত্রে। সিলিণ্ডার প্রেস পদ্ধতিতেই এই যন্ত্র চলে। তবে এখানে বিন্যস্ত হরফ থাকে একটি গোলকে আটকানো, এবং অপর এক গোলকে থাকে কাগজ—যেটি ঘুরে ঘুরে প্রথম গোলক থেকে ছাপ তুলে নেয়। সংবাদপত্র ছাপানোর জন্য এই যন্ত্র খুবই উপযোগী। এই জাতীয় যন্ত্রের প্রয়োজনে কিভাবে বিন্যস্ত হরফের ছাপ তুলে নিয়ে সেটিকেই মুদ্রাথালি হিসেবে ব্যবহার করা হয় সেকথা আগে বলা হয়েছে।

## (২) চিত্রণ

কেবলমাত্র শব্দ রচনার মাধ্যমেই মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করেছে তাই নয়, চিত্র রচনার সাহায্যেও প্রকাশ করেছে ভাবধারা। বস্তুত পক্ষে একথা বলা কঠিন এ দুয়ের মধ্যে কোন মাধ্যম সে প্রথম ব্যবহার করেছে। হয়ত বা চিত্রই এসেছে অক্ষরের আগে। হয়ত সেজন্তই প্রাচীনতম হরফের চেহারা ছবির মতন। পৃথিবীর সর্বত্রই প্রাচীন পুথিতে আমরা লেখার সঙ্গে ছবিও দেখতে পাই। খ্রীষ্টজন্মের অন্তত দেড় হাজার বছর আগেকার পেপিরস গ্রন্থ 'বুক অফ দি ডেড' (Book of the Dead) চিত্রালঙ্কৃত হয়েছিল। হোমার, ভার্জিল প্রভৃতির গ্রীক ও লাতিন ভাষার প্রাচীন পুথিতেও দেখা যায়

অলঙ্করনের সৌকুমার্য। চিত্রনের কাজ প্রসার পায় ভেলম আবিষ্কারের পরে, কেননা এর গায়ে সোনারূপার কাজের চেকনাই বেশ খোলতাই হ'ত, এবং টিকে থাকত বহুকাল। মুসলমান সভ্যতায় কোরান প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ খুব উঁচুদরের চিত্রনে অলঙ্কৃত হত। লিখনশৈলী ( Calligraphy ) এই আমলে খুব উন্নত দেখতে পাই। বাংলা, ওড়িয়া প্রভৃতি পুথিও নানা ভাবে চিত্রিত ও অলঙ্কৃত হ'ত। এমনকি পুথি যে দু'টি পাটার মধ্যে আবদ্ধ থাকত সেগুলিও মনোহর চিত্রে শোভিত দেখা যায়।

চিত্রণের কাজ তিন রকম পদ্ধতিতে সম্পন্ন হ'তে দেখি। অলঙ্করণ (Decoration), চিত্র-শোভন ( Illustration ) এবং বর্ণাঙ্কন ( Painting ) অলঙ্করণ ও চিত্রণে কিছু পার্থক্য আছে। প্রথমটি পুথির সৌন্দর্য বৃদ্ধির কাজ করে, দ্বিতীয়টি পুথির অন্তর্গত বিষয়কে পরিস্ফুট বা ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করে। অলঙ্করণে ঔজ্জ্বল্য আনবার জন্য হরফে বা পাতায় সোনা বা রূপার জলে চিত্রিত করার কাজকে বলা হয় 'ইলুমিনেশন' ( Illumination ), — বাংলায় বলতে পারি— জ্যোতিচিত্রণ। এই হিসাবে আমরা তিন রকমের চিত্রণ পদ্ধতি পাই।

প্রথম, রুব্রিকেশন (Rubrication) ; পুথির বড় হরফগুলি (Capital-letters) অথবা অনুচ্ছেদের প্রথম অক্ষর বা কোনো বিশেষ পংক্তি বা চিহ্ন লাল এবং নীল রঙে আঁকা হত। দ্বিতীয় ধরণ, ইলুমিনেশন (Illumination) উপরোক্ত অক্ষর ইত্যাদি রূপা ও সোনার জলে এঁকে উজ্জল করে তোলা হ'ত। তৃতীয় আরেক ধরণে দেখতে পাই খুদে খুদে বর্ণাঙ্কন বা বর্ণ চিত্রনে পুথির পাতা অলঙ্কৃত করা অথবা ঐ চিত্রগুলি লিখিত বিষয়ের ব্যাখা হিসাবেই অঙ্কিত করা।

পুথিপত্রের যুগের এই সকল অলঙ্করণ এযুগে মুদ্রণের সাহায্যে সম্পন্ন হয়ে থাকে একথা বলাই বাহুল্য। নানাবিধ উদাহরণ থেকে সুরু করে উচ্চস্তরের শিল্পচিত্রও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ছাপানো হচ্ছে। মানচিত্র, রেখাচিত্র, সাদা-কালোয় বা রঙীন চিত্র মুদ্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি। আধুনিক চিত্রণেরও তিনটি ধারা।

প্রথম, 'রিলিফ' (Relief) বা 'লেটার প্রেস' (Letter-Press) পদ্ধতি যা'কে বলতে পারি অভিক্ষেপন প্রক্রিয়া। এতে ছবির খোদাই এর কাজ উপর দিকে উৎকীর্ণ থাকে, অর্থাৎ যে অংশে কালি দিয়ে ছাপ তোলা হবে সেই অংশ সমতল থেকে উপরের দিকে অভিক্ষিপ্ত অবস্থায় রাখা হয়। সাধারণ

হরফের ছাপ এই পদ্ধতিতেই নেওয়া হয়।

দ্বিতীয়, 'ইন্টাগ্‌লিও' (Intaglio) পদ্ধতি, অথবা অবক্ষেপন প্রক্রিয়া। এতে ছবির খোদাইএর কাজ থাকে সমতল থেকে নিচের দিকে অবক্ষিপ্ত অবস্থায়, যেমন ভাবে নালি কাটা হয় সেই ভাবে। এই নালিতে কালি লাগিয়ে সমতল অংশের কালি মুছে দেওয়া হয়, —মুছে দেবার জন্য 'ডক্টরস্‌-ব্লেড' (Doctor's blade) নামক একটি পাত ব্যবহার করা হয়। নকশার উপরে কাগজ রেখে জোরে চাপ দিয়ে ছাপ তোলা হয়। এবং কালির দাগ কাগজের উপরে একটু উচু হয়ে বসে।

তৃতীয়, 'প্লেনোগ্রাফিক' (Planographic) বা 'সারফেস' (Surface) পদ্ধতি, অর্থাৎ সমতল প্রক্রিয়া। এই পদ্ধতিতে ছবি খোদাই করার দরকার হয় না, ছবি এঁকে তারপরে যে অংশে কালির ছাপ পড়বে সেটুকু বাদ দিয়ে বাকি অংশ মোম বা মোম জাতীয় তরল পদার্থ দিয়ে লেপে দিতে হয়।

এই পদ্ধতিতে ছাপ তোলার কাজ এ তাবৎকাল সরাসরি প্রক্রিয়াতেই চলছিল। বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে এবং আলোকচিত্রের বিচিত্র ব্যবহারের ফলে চিত্রণ প্রক্রিয়াও উন্নত হয়েছে। তবু স্বভাবতই দ্বিবিধ প্রক্রিয়াই চালু আছে। এই দুই প্রক্রিয়াকে বলা যায় 'অটোগ্রাফিক' (Autographic) বা প্রতিচিত্রায়ণ; এবং 'ফটো মেকানিকেল' (Photo Mechanical) বা আলোক চিত্রায়ন। এই দুই প্রক্রিয়ায় চিত্রণের মূল তিন পদ্ধতিকে নিম্নোক্ত-ভাগে ভাগ করা যায় :—

১। রিলিফ বা অভিক্ষেপন পদ্ধতি :—

ক) প্রতিচিত্রায়ন—কাঠ খোদাই ( Wood-cut ), চিত্রতক্ষন( Wood-engraving )।

খ) আলোক চিত্রায়ন—জিনকোগ্রাফি বা লাইন-ব্লক (Zincography or line-block), হাফটোন (Half-tone)।

২। ইন্টাগ্‌লিও বা অবক্ষেপন পদ্ধতি :—

ক) প্রতিচিত্রায়ন · একোয়াটিন্ট (aquatint), মেজোটিন্ট (mezzotint), তাম্র খোদাই (Copper-engraving), এচিং (etching)।

খ) আলোক চিত্রায়ন—ফটোগ্রেভিয়োর (Photogravure)।

৩। সমতল বা প্লেনোগ্রাফিক পদ্ধতি :—

ক) প্রতিচিত্রায়ন—লিথোগ্রাফিক (Lithography)।

খ) আলোক চিত্রায়ন – ফটো লিথোগ্রাফি ( Photo-lithography ), কোলোটাইপ (Collotype)।

এবারে একে একে এই চিত্রণ পদ্ধতিগুলির প্রক্রিয়া মোটামুটি ভাবে কেমন তার পরিচয় নেওয়া যাক।

## কাঠ খোদাই

কাঠ খোদাই বা উড কাট পদ্ধতিতে চিত্রণ শিল্প বহু প্রাচীন। সেকালের পুঁথিতে যে সকল ছবি দেখা যায় তা এই প্রক্রিয়ার। কাঠের ফলকে ছবি এঁকে নিয়ে তার পরে যে অংশগুলি সাদা থাকবে, অর্থাৎ কালির ছাপ পড়বেনা, সেই অংশগুলি কাঠ থেকে চেঁছে বাদ দিয়ে দিতে হয়। এর ফলে অঙ্কিত নক্সা উদ্গতভাবে থাকে। এবারে বেলুনিতে কালি লাগিয়ে সেটি ফলকের উপরে বুলিয়ে তার উপরে কাগজ চাপিয়ে চ্যাপ্টা কোনো কিছুর সাহায্যে চাপ দিয়ে ছবির ছাপ তুলে নেওয়া হয়। এতে ছবির রেখাগুলি কালো—অর্থাৎ কালির রঙে ফুটে উঠে। হরফ থেকে ছাপ ওঠে এই একই পদ্ধতিতে।

## চিত্র তক্ষণ

চিত্রতক্ষণ বা উড এনগ্রেভিং প্রক্রিয়াও কাঠ খোদাই পদ্ধতির মত। উপরোক্তটির সঙ্গে এর প্রভেদ এই যে এখানে অঙ্কিত চিত্রের রেখাগুলি থাকে নালি-কাটার মতো এবং বাকি অংশ—যাতে ছবি আঁকা হয়নি—তা উদ্গতভাবে থাকে। কালি বুলিয়ে নিলে অঙ্কিত ছবির রেখায় কালি লাগে না। অন্য অংশে লাগে। ফলে কাগজে ছাপ নেবার পর ছবিটি কালোর উপরে শাদায় ফুটে উঠে। এই প্রক্রিয়ায় ইচ্ছে করলে সাদার সঙ্গে কালো রেখাও ফুটিয়ে তোলা যায় এবং ছবিতে সৃষ্টি করা যায় সৌকুমার্য। অষ্টাদশ শতকের শেষে কাঠ খোদাই এর বদলে চিত্রতক্ষণ শিল্প প্রধান হয়ে ওঠে।

## জিনকোগ্রাফি বা রেখাচিত্র

এই পদ্ধতিতে আলোকচিত্রের সাহায্যে কালোয় সাদায় রেখাচিত্র তৈরি হয়। ব্লক তৈরির কাজে জিনক্ বা দস্তা ব্যবহৃত হয় বলে এর নাম জিনকো-

গ্রাফি। তবে সূক্ষ্ম কাজ ফুটিয়ে তুলতে তামারও ব্যবহৃত হয়। উনবিংশ শতাব্দির অষ্টম দশকে এবারহার্ড নামক এক ব্যাভেরিয়াবাসী এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। রেখাচিত্রে রঙের হালকা ঘনত্ব ফুটিয়ে তোলার জন্য এই পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভব। প্রক্রিয়ার প্রথমে অঙ্কিত চিত্রের এ ঃটি আলোকচিত্র নেওয়া হয়। এই নিগেটিভটিকে 'লাইন-নিগেটিভ' (line-negative) বলে। এটি মূল চিত্রের সমান মাপের বা তার চেয়ে ছোট হতে পারে। আমরা জানি আলোকচিত্রের নিগেটিভে মূল চিত্রের ছাপ উল্টোভাবে পড়ে এবং কালো অংশ শাদা ও শাদা অংশ কালো হয়। তাই লাইন ব্লক পদ্ধতিতে ছবিটিকে সোজা ভাবে নিয়ে আসার জন্য প্রিজম্-এর(prism) সহায়তায় আবার নিগেটিভ তৈরি করা হয় ছাপ তোলার প্রয়োজনে। এজন্য একটি দস্তার (zine) পাত নিয়ে তার গায়ে 'এলবুমেন' (albumen) বা ডিমের শ্বেতাংশ এবং 'এমোনিয়াম বাইক্রোমেট' (ammonium bichromate) মিশ্রিত রাসায়নিক নির্যাস লাগিয়ে আগুনের উপরে ধরে শুকিয়ে নেওয়া হয়। তারপরে এটির উপরে পূর্বপ্রস্তুত নিগেটিভটি রেখে আলোয়—সূর্যের আলো বা বিশেষ ধরনের দীপের আলোয় ধরলে ছবিটির যেসব স্বচ্ছ অংশ দিয়ে বেশী আলো ঢুকছে সেই অংশগুলি দস্তার পাতের উপরের রাসায়নিক প্রলেপকে কঠিন করে, এবং নিগেটিভ অস্বচ্ছ কালো অংশগুলির মধ্য দিয়ে আলো ঢুকতে পারে না বলে রাসায়নিক প্রলেপেরও নির্দিষ্ট অংশগুলির কোনো পরিবর্তন হয় না। এভাবে গাঢ় রেখা এবং কম গাঢ় রেখায় কাঠিণ্যের তারতম্য ঘটে। এবারে তেলতেলে কালি বুলিয়ে পাতটি জলের ধারায় ধরলে নরম রাসায়নিক প্রলেপ ও তৎসংলগ্ন কালি ধুয়ে যাবে। কঠিন অংশটি অপরিবর্তিত থাকবে। এর পরের প্রক্রিয়া এচিং, অর্থাৎ পাতটি নাইট্রিক এসিডে ডুবানো। যাতে কঠিন অংশটুকু এসিডে খেয়ে না যায় সে জন্য ভেজা অবস্থাতেই রজনচূর্ণ ছড়িয়ে তার পরে এসিডে ডুবালে রেখাচিত্রাংশ বাদে পাতের বাকি অংশ খেয়ে যাবে এবং চিত্রটি উচু ভাবে ফুটে উঠবে। এই এচিং প্র ক্রয়া চিত্রের রেখার ঘনত্বের তারতম্য অনুযায়ী ধাপে ধাপেওকরা চলে।

## হাফ টোন Half-tone)

চিত্রণের এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেন ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে জর্জ মেইসেনবাখ

(George Meisenbach)। জিনকোগ্রাফি পদ্ধতিতে সমানভাবে কালি লাগানো হয় বলে ছাপ সরাসরি কালো বা সাদায় ফুটে ওঠে, অন্তর্বতী হালকা বা ধূসর কোনো ক্রমানুবর্তী রং তোলা যায় না। হাফটোন পদ্ধতি গাঢ় থেকে ক্রমিক হালকা বর্ণান্তর ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করে। প্রক্রিয়ার মূল নীতি ছবির অংশগুলিকে 'ভেঙ্গে দিয়ে' অসংখ্য ছোট বড় ফুটকিতে পরিণত করা, যার ফলে মুদ্রিত ছবিটি দৃষ্টি বিভ্রমের সৃষ্টি করে এবং আলো-ছায়ার স্তরিত সমন্বয়ে রূপায়িত হয়। আলোকচিত্র গ্রহণের সময়ে আতস কাচের (lens) সামনে একটি রেখাঙ্কিত কাচের পর্দা রেখে উক্ত ভগ্নাংশের সৃষ্টি করা হয়। এই পর্দা দুটি কাচ দিয়ে তৈরী। গুটিতেই সমান্তরাল ভাবে রেখা এঁকে এচিং প্রক্রিয়ায় খাইয়ে নিয়ে তার পরে কালো রং দিয়ে রেখাগুলি আবার আঁকা হয়। এবারে কাচ দুটি একটির উপরে আরেকটি আড়াআড়ি ভাবে রেখে আঠা দিয়ে চিটিয়ে দেওয়া হয়। ফলে রেখাগুলি সমকোণ সৃষ্টি করে এবং চৌখুপিতে বিভক্ত আকার নেয়। ছবি তুলবার সময়ে এই পর্দাটি কোনাকুনি ভাবে রাখা হলে ফল ভালো মেলে। তাহলে পর্দাটি দাঁড়াচ্ছে কতকগুলি স্বচ্ছ চৌখুপির সমষ্টি যেগুলি অস্বচ্ছ রেখার দ্বারা বিভক্ত। প্রতিটি চৌখুপি সমান মাপের এবং প্রতি রেখাও চওড়ায় সমান হওয়া দরকার। ছবির ধরন অনুযায়ী সূক্ষ্ম বা সাধারণ ছাপাইএর জন্য এই পর্দায় প্রতি ইঞ্চিতে পঞ্চান্ন থেকে একশো পচাত্তরটি রেখা থাকে। ফাঁকগুলি যত বড় হবে, অর্থাৎ রেখার সংখ্যা যত কম হবে, কাজও হবে চলন সই, —যেমন সংবাদপত্রের ছবির ক্ষেত্রে ইঞ্চিতে পঞ্চান্নটি রেখাই যথেষ্ট, সাধারণ বই পত্রের ছবির জন্য একশো কুড়ি একশো তেত্রিশটি রেখা হলেই বেশ সুন্দর কাজ হয়। আরো সূক্ষ্ম কাজের জন্য রেখার সংখ্যা অধিক হওয়া প্রয়োজন, অর্থাৎ ফাঁকগুলি ছোট-ছোট হলে ছবিটি প্রায় মূলের মতোই ছাপানো যায়। জালিবদ্ধ কাচের পর্দার মধ্য দিয়ে আলো গিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই ছবির অংশগুলিকে ফুটকিতে রূপান্তরিত করে এবং বর্ণস্তরের তারতম্য অনুযায়ী হয় তার চেহারা। এবারে এই নিগেটিভ থেকে মুদ্রণের জন্য ব্লক তৈরির কাজ জিনকোগ্রাফিরই অনুরূপ। দস্তা, তামা বা ম্যাগনেশিয়ামের পাতের উপরে রাসায়নিক সামগ্রি প্রয়োগ এবং তার উপরে ছবিটি তুলে এসিডে ডুবিয়ে এচিং করে নেবার ফলে ফুটকিগুলো উদ্গতভাবে থাকে। এবং যথারীতি ছাপ তোলা হয়। ছবির রঙের গাঢ়ত্ব অনুযায়ী ফুটকির ছাপ ছোট বড় হবার দরুন স্তরিত বর্ণের চিত্র মুদ্রিত হয়ে ওঠে।

## একোয়াটিন্ট (Aquatint)

এই অবক্ষেপন বা নালিকাটা খোদাই পদ্ধতির প্রয়োগ জল-রং ছবির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এতে 'টোন' বা ছবির বর্ণস্তরের মোলায়েম ছাপ ফোটানো সম্ভব। অষ্টাদশ শতাব্দির শেষার্ধে, —১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ সম্ভবত, জঁা ব্যাপ্‌টিস্ট ল্য প্রিন্স (Jean Baptiste Le Prince) এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এবং এতে রঙীন ছবির ছাপ তোলার গৌরব সমসাময়িক ফ্রাঁসোয়া জেনিনেট (Francois Janinet)-এর। তামার পাতকে এসিড প্রয়োগে খাইয়ে বর্ণস্তর ফুটিয়ে তোলা হয়। এসিড প্রতিরোধক হিসেবে ব্যবহৃত হয় রজন। তামার পাতটিকে ছিদ্রবহুল চেহারা দেবার জন্য এর উপরে রজনের গুঁড়ো ছড়িয়ে দেওয়া হয়। গুঁড়ো যাতে পাতের উপরে সেঁটে বসে সেজন্য দুরকক্ষের প্রক্রিয়ার প্রচল। গুঁড়ো রজন পাতের উপর ছড়িয়ে দিয়ে, অথবা স্পিরিটের সহায়তায় সেঁটে দিয়ে। প্রথম প্রক্রিয়ায় একটি বাক্সের মধ্যে পাতটিকে রেখে তাতে হাওয়ার সঙ্গে রজনগুঁড়ো ছড়িয়ে দিলে পাতের উপরে সমান ভাবে তা ছড়িয়ে পড়ে। তখন পাতটিকে একটু গরম করলেই গুঁড়ো সেঁটে বসে যায়। দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায় রজন-গুঁড়ো স্পিরিটে গুলে নিয়ে পাতের উপরে তুলি দিয়ে সমান ভাবে লাগিয়ে দেওয়া হয়। তারপরে স্পিরিট উবে গেলেই রজন পাতের উপরে সেঁটে বসে যায়। এই ভাবে পাতটি তৈরি করার পর যদি এসিডে ডুবানো যায় তাহলে রজন-লিপ্ত অংশগুলি এসিড প্রতিরোধ করবে এবং রজন-ছুট অংশ এসিডে খেয়ে নেবে। কেননা রজন চূর্ণ অবলিপ্ত হলেও সূক্ষ্ম দানার মধ্যে সূক্ষ-ফাঁকও থেকে যায়। এইভাবে অজস্র ফুটকি সম্বলিত পাতটিতে কালি লাগিয়ে ছাপ তুললে স্তরিত ছাপ পড়বে। ছবি ফুটিয়ে তুলবার জন্য অঙ্কিত চিত্রের যে অংশ পুরো শাদা রাখা দরকার সেই অংশে এসিড প্রতিরোধক নির্যাস লাগিয়ে এসিডে ডুবালে বাকি অংশ এসিডে খেয়ে যাবে। যতখানি খেয়ে গেলে পরবর্তী স্তরের হালকা রং আনা যাবে বলে শিল্পী মনে করবেন ততখানি খাইয়ে নিয়ে শেষে ঐ অংশে আবার প্রতিরোধক লাগিয়ে বাকি অংশ এসিডে খাইয়ে নিলে সেই অংশে রং আরো গাঢ় হয়ে ফুটে উঠবে। এইভাবে পর্যায়ক্রমে পাতটিকে শাদা থেকে ক্রমে গাঢ় রঙের জন্য তৈরি করে নিয়ে শেষে কালি লাগিয়ে ছাপ তুললেই বর্ণের স্তরগুলি চিত্রায়িত হয়ে উঠবে। কেননা যেসব জায়গায় বেশি করে এসিডে

খাওয়ানো হয়েছে সেইসব স্থানে কালিও বেশি করে ধরবে। পরিণামে জলরঙের আলোছায়ার মুদ্রণ হবে যথাযথ।

## মেজোটিন্ট (Mezzotint)

অবক্ষেপন পদ্ধতির এই চিত্রণে আলোছায়ার রূপ স্পষ্টতর হয়ে ফুটে ওঠে। তেলরং, বা তৈলচিত্রের ছাপ নেবার পক্ষে এটি উপযোগী। একোয়াটিণ্ট যেক্ষেত্রে স্বচ্ছ বা হালকা রং মোলায়েম ভাবে মুদ্রিত করে, এক্ষেত্রে মুদ্রণ হয় বলিষ্ঠতর। এই পদ্ধতিতে চিত্রণের প্রথম গৌরব উটরেখট্ শহরের লাড্উইগ ভন সিয়েগেন (Ludwig Von Siegen)-এর ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে চিত্রণ প্রক্রিয়ায় তামা অথবা ইস্পাতের পাত নিয়ে তার মসৃন তলটিকে করাতের মতো দাঁত-ওয়ালা বাঁকানো একটি কুরুনির সাহায্যে সমান ভাবে কুরে নিতে হয়। এর ফলে পাতটি সূক্ষ্ম গর্তবহুল হয়ে যায়, এবং সেই গর্তগুলির চারপাশে আলের মতো আকার নেয়। কালি বুলিয়ে ছাপ নেবার সময়ে ঐ আলের মতো ধারগুলি কাগজের উপরে কথঞ্চিৎ কেটে ব'সে একটা মখমলের মতো ঘন আভার সৃষ্টি করে। স্তরিত বর্ণ ফুটিয়ে তোলার জন্য প্রথমে চিত্রসমেত কুরে নেওয়া পাতের ছাপ নিয়ে গাঢ় বর্ণ মুদ্রিত করে নিয়ে শেষে অপেক্ষাকৃত কম গাঢ় রঙের জন্য আলের মতো ধারগুলি কিছুটা চেঁছে নিয়ে আবার ছাপ নেওয়া হয়। একেবারে শাদা অংশ তৈরির জন্য প্রতিরোধক প্রলেপ লাগিয়ে নিলেই সেই অংশে আর কালি ধরবে না। মেজোটিণ্ট পদ্ধতিতে শিল্পী গাঢ়-রং থেকে সুরু ক'রে ক্রমিক পর্যায়ে হালকা রঙের ছাপ তুলে রং-ছুট পর্যায়ে আসেন। একোয়াটিণ্ট পদ্ধতিতে প্রক্রিয়া এর বিপরীত।

## কপার এনগ্রেভিং (Copper-engraving) বা তাম্রতক্ষণ

এই পদ্ধতির প্রয়োগ পঞ্চদশ শতাব্দিতেও দেখা যায়, তবে ষোড়শ সপ্তদশ শতকেই কালে নিদর্শন মেলে। এই প্রক্রিয়াকে লাইন এনগ্রেভিং (line engraving) বা রেখালি খোদাই—এমনকি শুধুমাত্র এনগ্রেভিং ব'লেও বোঝানো যায়। তামার পাতের ব্যবহার জনিত এর নাম তাম্রতক্ষণ। পরে

উনবিংশ শতাব্দিতে এর চেয়ে শক্ত পাত হিসেবে ইস্পাতের ব্যবহার প্রচলিত দেখি। এবং কখনো স্বাতন্ত্র্য বোঝাতে ষ্টিল এনগ্রেভিং (Steel engraving) বা ইস্পাত খোদাইও বলা হয়। তামা বা ইস্পাতের মসৃণ পাত নিয়ে সেটিকে প্রদীপের উপর ধরে কালো করে, অথবা এক পরত মোম মাখিয়ে রাখা হয়। মূল চিত্রটি কাগজের উপরে এঁকে তার পিছন দিকে শাদা চক মাখিয়ে নিয়ে সেটি ঐ পাতের উপরে রেখে ছবির রেখাগুলির উপরে পেনসিল বা অন্য কিছু বুলিয়ে নিলে তার ছাপ উক্ত পাতের উপরে পড়বে। স্বচ্ছ কাগজে নকশা এঁকে প্রতিছাপ নেওয়া চলে। এর পরে পাতের উপরকার ঐ রেখা ধ'রে তীক্ষ্ণাগ্র যন্ত্র দিয়ে ছবিটি পাতের উপরে খোদাই করা হয়। খোদাই এর ফলে ধাতুর যে অংশ আলোর মতো ধার সৃষ্টি করে সেগুলি চেঁছে ফেলে দিলে পরিচ্ছন্ন রেখা ফুটে বেরোবে। এবারে পাতের উপরে কালি বুলিয়ে বেশ ক'রে মুছে নিতে হয়, যা'র ফলে খোদিত রেখার মধ্যেই শুধু কালি থাকবে। কালি লাগাবার আগে অবশ্যই প্রদীপের ভুসো বা মোম তুলে ফেলতে হবে। ছাপ তোলার জন্য কাগজ সামান্য ভিজিয়ে পাতের উপরে চাপ দেবার ফলে চিত্র-রেখায় কাগজটা একটু দেবে যায় এবং তার উপরে কালির ছাপ কিছুটা উচু হয়ে থাকে প্রায়শই। বিশেষ ক'রে এই পদ্ধতিতে হয়ফ খোদাই ক'রে ইচ্ছে ক'রেই উদ্গত ভাব আনা হয় সুন্দর দেখাবে ব'লে। নামাঙ্কিত চিঠির কাগজ, অর্থাৎ লেটার প্যাডে এর প্রয়োগ দেখা যায়।

## ড্রাইপয়েন্ট (Drypoint)

এটি পূর্বকথিত এনগ্রেভিঙেরই অনুরূপ। এখানে তীক্ষ্ম শলাকা দিয়ে তামার পাতের উপরে ছবিটি খোদাই করা হয়। এই খোদাই এর ফলে নালি-রেখার পাশে কর্তিত তামার সরু আল (furrow) ফুটে বেরোয়। এই উচু ধারগুলিকে চেঁছে ফেলে না দিয়ে যদি তার উপরেই কালি বুলিয়ে পূর্বকথিত উপায়ে ছাপ তোলা যায় তাহলে মখমলের মতো বিশিষ্ট চেহারা ফুটে ওঠে ছবিটির। তবে ধারগুলি শীঘ্র ভোঁতা হয়ে যায় বলে বেশি ছাপ তোলা যায়না। এই প্রক্রিয়ায় চিত্রকর রেমব্রান্ট (Rembrandt) (সপ্তদশ শতাব্দি) উচুদরের কাজ করেছেন। ড্রাইপয়েন্ট অবশ্য স্বতন্ত্র প্রক্রিয়ার পরিবর্তে এচিঙের সঙ্গে প্রয়োগ করতে দেখা যায়।

## এচিং ( Etching )

অবক্ষেপন চিত্রের এই পদ্ধতি পাতের উপরে খোদাইএর বদলে ক্ষয়িত প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ চিত্রের রেখাগুলিকে এসিডের প্রয়োগে খাইয়ে নেওয়া। ধাতব পাতের উপরে মোম, আঠা এবং রজনের মিশ্রিত গলিত প্রলেপ লাগাতে হয়। লাগানোর কাজটা গলিত মিশ্রনটি পাতের উপরে সমান ভাবে ঢেলে নিয়ে করা যায়, অথবা রেশমি পুঁটুলির মধ্যে মিশ্রণটি রেখে পাতটিকে গরম করে নিয়ে তার উপরে বুলিয়ে বুলিয়ে করা চলে। এই ভাবে ভিং তৈরি ক'রে প্রদীপের ভুসো লাগিয়ে মোম লাগানো পাতটিকে কালো ক'রে নিয়ে তার উপরে তক্ষণ-ছুঁচ (etching needle) দিয়ে মোম কেটে ছবিটি আঁকা হয়। ছুঁচ এমন ভাবে চালাতে হবে যাতে কেবলমাত্র মোম-টুকুই কেটে বসে, পাত যেন না কাটে। এবারে পাতটির ধারে ও পিছনে, অর্থাৎ সবটুকু খোলা জায়গায় এসিড প্রতিরোধক বার্নিশ লাগিয়ে নিয়ে সমগ্র পাতটিকে নাইট্রিক এসিডের পাত্রে ডুবিয়ে দিলে অঙ্কিত রেখাগুলি ক্ষয়ে যাবে। যেসব রেখা শিল্পী অগভীর বা সূক্ষ্মভাবে ফুটিয়ে তুলতে চান সেই অংশ সামান্য খাইয়ে নেবার পর পাতটিকে এসিড থেকে তুলে নিয়ে প্রতিরোধক প্রলেপ লাগিয়ে আবার ডুবিয়ে নিলে অনাচ্ছাদিত রেখা গভীর ভাবে খেয়ে যাবে। রেখার কাজ সূক্ষ্ম, মাঝারি বা গভীর—যেমন ইচ্ছা তেমনি ভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য পর্যায়ক্রমে প্রতিরোধক লাগানো এবং এসিডে ডোবানোর কাজ করে যেতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় ছবিতে আলো-ছায়ার ভাব ফুটিয়ে তোলা অনেকাংশেই সম্ভব। ক্ষয়ক্রিয়া শেষ হয়ে যাবার পর পাতটিকে পরিষ্কার ক'রে নিয়ে কালি বুলিয়ে মসৃণ অংশ থেকে কালি মুছে নিয়ে কাগজের উপরে ছাপ তোলার কাজ। এচিঙের ছাপার জন্য সাধারণত দুটি বেলনের ( roller ) মধ্যে ব্লকটিকে রেখে চাপ দেওয়াই বিধি। চাপের কৌশলে ক্ষয়িত-নালির কালি কাগজের উপরে বসে যায়।

## ফটোগ্রেভিয়োর ( Photogravure )

আলোক চিত্রায়ন প্রক্রিয়ায় অবক্ষেপন চিত্র মুদ্রণ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে

পত্র পত্রিকা প্রভৃতি পুরো বই ও মুদ্রিত করা চলে। এটি আবিষ্কার করেন ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে আরনাই-বাসী কার্ল-ক্লিক (Karl klic of Arnau)। এই পদ্ধতি বর্ণাঢ্য তেল রং বা আলোকচিত্র বা ডাকটিকিট প্রভৃতি সূক্ষ্ম কাজের পক্ষে উপযোগী, যার ফলে চিত্রের বর্ণ-বৈভব এবং গভীরতা ও বর্ণস্তর ফুটে ওঠে। চিত্রণ প্রক্রিয়ায় প্রথমে ছবির 'নেগেটিভ' থেকে একটি স্বচ্ছ ছাপ বা 'পজিটিভ' তৈরি করে নেওয়া হয় এবং একটি কাচের উপরে সেঁটে রাখা হয়। এবারে পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য দুটি আনুষঙ্গিকের প্রয়োজন। প্রথমত, জিলাটিন (Gelatine) প্রলিপ্ত একটি কারবন টিস্যু (Carbon tissue) — যেটিকে পটাসিয়াম বাইক্রোমেট (potassium bickromate) প্রয়োগে আলোক প্রতিক্রিয়াশীল ক'রে রাখা হয়। দ্বিতীয়, একটি পর্দা (Photo-gravure screen), অর্থাৎ অস্বচ্ছ কাচের খণ্ড যাতে আড়াআড়ি ভাবে রেখা টানা থাকে। এই পর্দা অনেকাংশে হাফটোন পর্দার অনুরূপ, কিন্তু এখানে রেখাগুলি স্বচ্ছ এবং ফাঁকগুলি থাকে অস্বচ্ছ। উপরন্তু রেখাগুলি চতুষ্কোন ফাঁকের চেয়ে কম চাওড়া থাকে, —যেখানে হাফটোনে এগুলি থাকে সমান মাপের। প্রতি ইঞ্চিতে রেখার সংখ্যা থাকে ১৫০ বা ১৭৫টি, তবে সূক্ষ্ম কাজের জন্য এই সংখ্যা দ্বিগুনেরও বেশি হয়ে থাকে, যেমন ডাকটিকিট প্রভৃতির মুদ্রণের জন্য ইঞ্চি প্রতি ৪০০ রেখাও থাকে। চেহারা ছাড়াও ব্যবহারিকতায়ও এই পর্দা হাফটোন পর্দার থেকে স্বতন্ত্র। হাফটোনে পর্দার ব্যবহার প্রতিচ্ছবিকে 'ভেঙ্গে' দেবার জন্য. গ্রেভিয়োরে এটি মুদ্রণ প্রক্রিয়ারই এক আবশ্যিক অংশ।

মুদ্রণ-প্রক্রিয়ায় প্রথমেই কারবন টিস্যুর উপরে গ্রেভিয়োর পর্দাটির ছাপ নিয়ে নেওয়া হয় আলোক-সম্পাত প্রক্রিয়ায়। ফলে পর্দার রেখাগুলির মধ্যে দিয়ে আলো গিয়ে টিস্যুস্থ জিলাটিনকে শক্ত করে তোলে। অস্বচ্ছ ফাঁকগুলির মধ্য দিয়ে আলো যায় না ব'লে সে-অংশগুলির জিলাটিন অপরিবর্তিত থাকে। মুদ্রণ প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় ধাপে এবারে টিস্যুর মধ্য দিয়ে মূল চিত্রের পজিটিভটিতে আলোক-সম্পাত করা হয়। ফলে চিত্রস্তরের মধ্য দিয়ে আলো স্তরিত পর্যায়ে পূর্বে অপরিবর্তিত জিলাটিনে বিচ্ছুরিত হয়ে আলোছায়ার ক্রমপর্যায়ে তার অংশগুলিকে কাঠিন্য দেয়। এবারে এইভাবে প্রাপ্ত পর্দার ও পজিটিভের প্রতিচ্ছাপ সম্বলিত কারবন টিস্যুটিকে উপুড় করে তামায় মোড়া একটি বেলন বা সিলিণ্ডারে জড়িয়ে গরম জলের পাত্রে ডুবালে কাঁচা জিলাটিন ধুয়ে যাবে।

এছাড়াও এর যেসব অংশ সাদা রাখা হবে সেখানে এসিড প্রতিরোধক লাগিয়ে তারপরে ক্ষয়ক্রিয়া, অর্থাৎ এচ্ করা হয়। এচিং প্রক্রিয়া চলে ক্রমিক পর্যায়ে, বিভিন্ন শক্তির ফেরিক ক্লোরাইড ( ferric chloride ) ঢেলে ঢেলে। এর ফলে তামা ক্ষয়ে গিয়ে ছবিটি তার উপরে বসে যায়। ক্ষয়ের তারতম্য ঘটে টিস্যুস্থ জিলাটিনের কাঠিন্যের তারতম্য অনুযায়ী। এসিড প্রথমে নরম অংশে ঢুকবে অর্থাৎ সেই অংশের রং হবে সবচেয়ে গাঢ়। এভাবে নরম থেকে ক্রমিক পর্যায়ে শক্ত অংশে ঢুকে তামার পাতের উপরে বিভিন্ন গভীরতার অসংখ্য কোষ তৈরি হয়ে যায়। ক্ষয়ক্রিয়ার শেষে টিস্যু সরিয়ে তামার উপর থেকে জিলাটিন তুলে ফেললে দেখা যাবে যে মূল চিত্রের বিভিন্ন গভীরতার কোষায়িত প্রতিচ্ছবি তার উপরে মুদ্রিত হয়েছে। এখন মুদ্রণের জন্য কালি লাগালে কোষের গভীরতা অনুযায়ী কম বা বেশি কালি ধরবে, ছাপ নিলে স্তরিত চিত্র ফুটে উঠবে। বলাবাহুল্য কালি লাগানোর পরে অবক্ষেপন পদ্ধতির নিয়ম অনুযায়ী অনাবশ্যক অংশের কালি ডক্টর ব্লেড প্রয়োগে মুছে ফেলতে হবে।

## লিথোগ্রাফি (Lithography)

বহুল এবং বহুকাল যাবত প্রচলিত প্রস্তরাঙ্কন ও সমতল মুদ্রণ পদ্ধতি। এটি আবিষ্কার করেন ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আলোয়া সেনেফেল্ডার (Alois Senefelder)। তেলে আর জলে মিশ খায়না, —এই নীতি লিথোগ্রাফির ভিত্তি। পাথরের উপরে ছবি এঁকে এমন প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হয় যার ফলে কেবলমাত্র অঙ্কিত ছবির রেখাতেই কালি ধরবে, বাকি অংশে কালি প্রতিহত হবে। চুনাপাথর (lime stone)-এর পাটার উপরে তেল চিটচিটে কালি অথবা তেলতেলে খড়ির পেনসিল বা ক্রেয়ন (lithographic crayon) দিয়ে ছবিটি আঁকা হয়। এই চিত্রাঙ্কিত তৈলাক্ত রেখায় কালি বসবে, কিন্তু জল প্রতিহত হবে। লিথোগ্রাফি মুদ্রণের জন্য বিশেষ ধরণের কালি ব্যবহৃত হয়। মুদ্রণের প্রস্তুতি পর্বের সুরুতে চিত্রাঙ্কিত জমিটিকে তৈরিকরে নেবার জন্য পাথরটির উপরে ক্ষয় নির্যাস বা এচ্ (etch) হিসেবে কম শক্তির নাইট্রিক এসিডের প্রলেপ দিলে তৈলাক্ত চিত্র-রেখা অটুট রেখে বাকী অংশের পাথর সামান্য

খেয়ে যাবে। উপরন্তু, এই প্রলেপ চিত্রের রেখাগুলি থেকে তেল ছাপ ছড়িয়ে পড়তে দেবে না। এর পরের পর্ব রেখাগুলির বাড়তি তৈলাক্ত রং তুলে ফেলা। এজন্য প্রথমে আঠা ও জলের মিশ্রিত প্রলেপ লাগিয়ে দেওয়া হয় পাথরটির উপরে। এবং পরে তারপিন দিয়ে ধুয়ে বা মুছে দিলে ক্রেয়ন উঠে যাবে। এই অবস্থায় কিছুক্ষণ রেখে তারপিন (turpentine) উবে গেলে পর আঠাটুকুও পাথরের গা থেকে মুছে তুলে দিতে হয়। এই সব প্রক্রিয়ার ফলে অঙ্কিত চিত্র থেকে রং সাফ হয়ে যায়। কিন্তু তেলতেলে রেখাগুলি পাথরের সূক্ষ্ম ছিদ্রগুলির মধ্যে থেকে যায়। এই অবস্থায় কালি লাগালে উক্ত তেলতেলে রেখাগুলিতে কালি বসে যাবে। কিন্তু তাবৎ সিক্ত অংশগুলিতে কালি ধরবেনা। এবারে ছাপ তুলবার জন্য এর উপরে ভেজা কাগজ রেখে চাপ দিলেই ছবির মুদ্রণ ফুটে উঠবে। এই চাপ দেবার জন্য বিশেষ ধরণের লিথোগ্রাফিক প্রেস আছে।

লিথোগ্রাফির কাজ সাধারণত পাথরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। বিশেষত শিল্পীরা এই প্রথাতেই কাজ করেন। সেযুগে দমিয়ের, হার্ডিং, মেনজেল, গয়া প্রভৃতি শিল্পীর দক্ষতা স্মরণীয়। তবে মুদ্রণের প্রয়োজনে দস্তা (zinc) বা এলুমিনিয়ামের পাত ব্যবহৃত হচ্ছে। পাত মসৃণ থাকলে কালি ধরেনা, ছাপ ওঠেনা। তাই পাতকে বালি বা পাথরকুচি দিয়ে ঘসে খসখসে বা ছিদ্রবহুল (porous) করে নিতে হয়। ধাতব পাত ব্যবহারের আরেকটি সুবিধে এটিকে সিলিণ্ডারে জড়িয়ে নিয়ে রোটারি যন্ত্রের সাহায্যে মুদ্রিত করা যায়।

## ফটো-লিথোগ্রাফি (Photo-lithography)

এটি আলোকচিত্র ও লিথোগ্রাফের যুগ্ম পদ্ধতি। চূনা পাথরের পরিবর্তে দস্তা .(zinc) -বা এলুমিনিয়ামের পাত ব্যবহার করা হয়। পাতটিকে যান্ত্রিক প্রথায় ঘষে অমসৃন .করে নেওয়া হয় যাতে এর উপরে জল ধরতে পারে। এবারে আলোক চিত্রণের জন্য এই পাতটিকে লাগানো হয় এলবুমেন এবং এমোনিয়াম বাইক্রোমেট-এর মিশ্রিত প্রলেপ। তারপরে মুদ্রিতব্য সামগ্রীর আলোকচিত্র তুলে যে নেগেটিভ তৈরি করা হয় সেটিকে উক্ত পাতের উপরে রেখে আলোক সম্পাত করলে নিগেটিভের স্বচ্ছ অংশের মধ্য দিয়ে আলো গিয়ে রাসায়নিক প্রলেপের সেই অংশগুলিকে শক্ত করে তোলে, বাদ-

বাকি অংশের প্রলেপ নরমই থেকে যায়। 'মুদ্রিতব্য সামগ্রী' বলা হল এই জন্য যে চিত্র ছাড়াও মুদ্রিত অমুদ্রিত গ্রন্থের পৃষ্ঠাগুলিরও লিথো-ছাপ এভাবে নেওয়া সম্ভব। সে যাই হোক, এবারে উক্ত পাতটিতে কালি লাগিয়ে ঠাণ্ডা জলের ধারায় ধুয়ে ফেললেই আলো-ছুট নরম অংশের প্রলেপ গলে যাবে, এবং আলোপ্রাপ্ত শক্ত অংশগুলি উন্নতভাবে ফুটে উঠবে। এর পরের ধাপে ক্ষয়ক্রিয়া বা এচিং পূর্বোক্ত লিথোগ্রাফ প্রক্রিয়ারই অনুরূপ। মুদ্রণ পদ্ধতিও একই রকমের।

স্তরিত বর্ণের, অর্থাৎ 'টোন' tone) যুক্ত চিত্রের কাজও এই পদ্ধতিতে করা সম্ভব। তবে এ ক্ষেত্রে হাফ-টোন পদ্ধতির অনুরূপ একটি পর্দা ক্যামেরায় সংযুক্ত করে নিগেটিভকে ফুটকিতে রূপান্তরিত করে নিতে হয়। রেখাচিত্র, নক্সা, মানচিত্র প্রভৃতির মুদ্রণে এই পদ্ধতি খুবই উপযুক্ত। আলোকচিত্রাদির মুদ্রণ এই প্রথায় সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়।

## ফটো-লিথো-অফসেট Photo-letho offset)

এই মুদ্রণ পদ্ধতি পূর্বোক্ত দুই পদ্ধতির চেয়ে উন্নত ও সুবিধাজনক। 'অফসেট মুদ্রণ' বললেই ফটো-লিথো অফসেট বুঝে নিতে কষ্ট হয়না। ১৯০৩-০৪ খ্রীষ্টাব্দে ইরা রুবেল (Ira W. Rubel) নামক এক মার্কিন পদ্ধতিটির আবিষ্কার করেন। আবিষ্কারটি আকস্মিক। লিথোগ্রাফ পাত থেকে সিলিণ্ডার প্রেসের সহায়তায় যখন তিনি কাগজের পরে কাগজ চড়িয়ে ছাপ তুলছিলেন, তখন দৈবাৎ একটি কাগজ তাঁর হাত ফসকে পড়ে যায়। পাতটির ছাপ কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই সিলিণ্ডারের উপরে এসে পড়ে এবং পরবর্তী কাগজটির দু'পিঠেই ছাপ পড়ে যায়। তিনি লক্ষ্য করলেন সিলিণ্ডার থেকে যে ছাপটি পড়েছে সেটি পাত থেকে ওঠা ছাপের চেয়ে পরিচ্ছন্ন ও উন্নত। এই থেকে অফসেট মুদ্রণের হল উদ্ভব। লিথোগ্রাফ পদ্ধতিতে পাথরের উপরে ছবিটি উলটো করে আঁকতে হয়, নয়তো কাগজে ছবি এঁকে সেটিকে পাথরের উপরে চাপিয়ে কাগজের উল্টো পিঠে চাপ দিয়ে তার ছাপ পাথরে তুলে নিতে হয়। ফটোলিথোগ্রাফিতে এই উলটে নেবার কাজ ক্যামেরাতেই সম্পন্ন করে নেওয়া হয়। কিন্তু অফসেট যেহেতু মূল চিত্রের

ছাপ দ্বিতীয় এক পাতে তুলে পরে সেটির থেকে মুদ্রণের কাজ করা হয়, সেহেতু ছবিটি পাতের উপরে সোজা ভাবে এঁকে নিলেই চলে।

অফসেট পদ্ধতিতে সিধেভাবে আঁকা ছবি বা লেখা সামগ্রীর, অর্থাৎ পজিটিভ থেকে পুরু রবারের পাতের উপরে উল্টো ছাপ নিয়ে সেটি থেকে কাগজের উপরে, অথবা বই বাঁধাবার কাপড় টিনের পাত প্রভৃতির উপরে মুদ্রণ তুলে নেওয়া হয়। অফসেট মুদ্রাযন্ত্রে তিনটি সিলিণ্ডার থাকে। প্রথমটিতে মুদ্রিতব্য সামগ্রির প্রতিচিত্রায়িত বা আলোকপ্লেট সিলিণ্ডার (plate cylinder)। দ্বিতীয়টি পুরু রবারের পাতে জড়ানো সিলিণ্ডার (rubber-blanket cylinder) যার উপরে প্রথমটির থেকে ছাপ তুলে নেওয়া হয় ব্লকের বিকল্প হিসেবে। তৃতীয়টি মুদ্রণ সিলিণ্ডার (impression cylinder) যা'তে কাগজ জড়ানো থাকে, অথবা কাগজের পরিবর্তে অন্য কোনো মুদ্রণ মাধ্যমে। তিনটি গোলক পর পর ঘুরে গিয়ে পাত থেকে রবারে এবং রবার থেকে কাগজে মুদ্রণ-ক্রিয়া সমাপ্ত করে। আধুনিক আবিষ্কারের কাগজটি আর এক সিলিণ্ডারের মধ্য দিয়ে গিয়ে কাগজের দু'দিকেই মুদ্রণ তুলে নেয়। সাম্প্রতিক রোটারি অফসেট মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রণ খুব দ্রুত সম্পন্ন হয়। ঘন্টায় সাত হাজার ছাপ প্রস্তুত হয়ে যায়। পত্রিকাদি এভাবে ছাপানো সুবিধাজনক। এই পদ্ধতির আরো সুবিধা রবারের মতো স্থিতিস্থাপক অভঙ্গুর মাধ্যম ব্যবহার হয় বলে চাপ জোরে পড়ে না, এবং নানান ধরনের- এমন কি শস্তা ধরনের কাগজও ব্যবহার করা চলে।

## কোলোটাইপ ( Collotype )

আলোক চিত্রায়ন পদ্ধতির যাবতীয় মুদ্রণের মধ্যে কোলো টাইপ পদ্ধতির মুদ্রণই মূল চিত্রের সব চেয়ে কাছাকাছি ধরণের প্রতিলিপি তৈরি করতে পারে। বর্ণস্তরের সূক্ষ্মতা এবং আলোছায়ার বিন্যাস সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলে কোলোটাইপ মুদ্রণ। হাতের লেখা, মুদ্রা প্রভৃতির অবিকল প্রতিরূপ (facsimile), মাইক্রোগ্রাফ (micrograph)। ডাকটিকিট প্রভৃতি হুবহু নকল করতে সক্ষম এই পদ্ধতি। বিশেষ ধরনের পাত (plate) তৈরি করতে খরচ পড়ে বেশ। সেজন্য ব্যয়সাপেক্ষ এই পদ্ধতির প্রয়োগ সাধারণ ছাপাইএর কাজে বড় একটা হয় না। জলরঙের বা অন্যান্য শিল্পকৃতির এত চমৎকার

প্রতিলিপি কোলোটাইপে করা যায় যে বাঁধিয়ে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখলে অনেক সময়ে আসলে নকলে প্রভেদ ধরা যায় না।

মূল চিত্রের একটি নরম নিগেটিভ তৈরি করে সেটিকে বিশেষ রাসায়নিক দ্রব্য সম্পৃক্ত কাচের পাতের উপরে প্রতিফলিত করে ব্লক প্রস্তুত হয়। কাচের পাতের উপরিভাগ ঘসে অমসৃণ করে নিয়ে তার উপরে বাইক্রোমেট-যুক্ত জিলাটিনের প্রলেপ লাগিয়ে সাবধানে উনুনের উপরে গরম করা হয়। এর ফলে প্রলেপটি কাচের উপরে সূক্ষ্ম জালি রেখা সৃষ্টি করে, কেননা উপরিস্থ জিলোটিন গরমে সংকুচিত হয় যার ফলে ফাটল ধরে উক্ত জালের রেখা ফুটে ওঠে। জিলোটিনের জাল একাধারে একোয়াটিনটের জমি এবং হাফটোন বা গ্রেভিয়োরের পর্দার কাজ করে। কোলেটাইপের মুদ্রণ হয় এই জিলাটিন থেকে। অন্যান্য পদ্ধতির মতো ধাতু-তল থেকে নয়। কাচের পাতটিকে এবারে মূল চিত্রের নিগেটিভের নিচে রেখে আলোক সম্পাত করলে নিগেটিভের আলোর তারতম্য অনুযায়ী জিলাটিন শক্ত বা নরম হয়ে যায়। এবারে প্রস্তুত কাচটিকে ঘন্টা দুয়েক ঠাণ্ডা জলের পাত্রে ডুবিয়ে রাখলে নরম জিলাটিন জলে গলে যাবে, শক্ত অংশ বজায় থাকবে। জল থেকে তুলে পাতটিকে বেশ কয়েক ঘণ্টা শুকিয়ে নিয়ে শেষে মুদ্রণের পূর্বে জল, গ্লিসারিন ও এমোনিয়া মিশ্রিত পাত্রে মিনিট কুড়ি ডুবিয়ে রাখতে হয়। এরফলে নরম অংশগুলি একটু ফুলে-ফেঁপে ওঠে, কড়া অংশগুলি কিছুটা কম ফোলে। সুতরাং কালিও বসে কম বা বেশি, এবং উচ্চাবচ সমতলের জন্য ছাপানো ছবিতে আসে বর্ণস্তর (tone)এবং গভীরতা (depth)।

মুদ্রণের যন্ত্র ও লিথোগ্রাফ প্রথার অনুরূপ। তবে জিলাটিনেই সিক্ততা থাকে বলে গোলক ভিজিয়ে নিতে হয় না। দুই প্রস্থ গোলক (roller) ব্যবহৃত হয়; একটি গাঢ় অংশগুলিতে ঘন কালি নিয়ে, অপরটি হালকা অংশে পাতলা কালি প্রয়োগ। বর্ণান্তর এইভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় সিক্ততার ভেদাভেদ, কালি বসবার তারতম্যে। আজকাল কাচের বদলে ধাতুর পাত্রে ব্লক করে রোটারি যন্ত্রে মুদ্রণের কাজ হচ্ছে। যার ফলে পাতের আয়ু যেমন বেড়েছে তেমনি বেড়েছে মুদ্রণের সংখ্যাও। ঘন্টায় দুশো চল্লিশটির জায়গায় বারোশ'।

## মুদ্রণে বর্ণ প্রয়োগ

এ পর্যন্ত যে সকল চিত্রণ পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে সেগুলি শাদায়-

কালোয় মুদ্রিত ছবির জন্য। আলোক চিত্রণের উন্নত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রঙীন ছবির মুদ্রণ সম্ভব হয়েছে। এই ছবি সাধারণ লাইন ব্লকেও যেমন হয় তেমনি হাফটোন, গ্রেভিয়োর, কোলোটাইপ প্রভৃতিতেও হয় উচ্চ মানের। বহুবর্ণের ছবি তৈরি করতে হলে প্রত্যেকটি রঙের জন্য স্বতন্ত্র মুদ্রণ দরকার, এবং সেজন্য প্রয়োজন প্রত্যেকটি রঙের জন্য স্বতন্ত্র ব্লক। দৃষ্টি শক্তির সীমাবদ্ধতা যেহেতু মূলধন, — যেমন হাফটোন প্রভৃতি ব্লকের ফুটকি তৈরির সূত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি, যেহেতু কয়েকটি মাত্র রঙের সহায়তায় সব রঙের কাছাকাছি মুদ্রণ তুলে ধরা যায়। এই পদ্ধতির মূলে আছে বর্ণবিভাজন। যে সাতটি রং নিয়ে আমাদের বর্ণসমারোহ তার পিছনে বৈজ্ঞানিক ব্যাপারটা হল মূলত তিনটি রং নিয়ে। হলদে, লাল, নীল। হলদের সঙ্গে লালরং মেশালে কমলা রং পাই, লালের সঙ্গে নীল মিশলে হয় বেগুনি, হলদে আর নীলে মিশে সবুজ। আর একসঙ্গে তিনটির মিশ্রণে পাই কালো রং। সুতরাং একটির সঙ্গে অপর রং মিশিয়ে, অথবা মিশ্রিত বর্ণ থেকে বিভাজকের সহায়তায় রং-গুলিকে আলাদা করে নিয়ে রঙীন ছবির কাজ সম্পন্ন হয়।

রঙীন ছবির ব্লক তৈরি করতে হ'লে তাই ছবিটির থেকে রংগুলিকে আলাদা ক'রে নিয়ে স্বতন্ত্র ব্লকের কাজ করতে হয়। এজন্য মূল চিত্র থেকে ব্লক তৈরির জন্য নিগেটিভ ক'রে নেবার সময়ে ক্যামেরার সামনে পরিশ্রাবক (filter) লাগাতে হয়। পরিশ্রাবকের মূল নীতি কোনো বিশেষ রঙের কাচ অন্যান্য রং শোষণ ক'রে স্বকীয় রংটি বিচ্ছুরিত করে। যদি আমরা সবুজ কাচ চোখে লাগিয়ে লাল-রঙা কোনো ছবি দেখি তাহলে লাল অংশকে দেখি কালো। ঠিক তেমনি ভাবেই সবুজ ফিলটার লাগিয়ে ঐ ছবির নেগেটিভ নিলে লালের জায়গায় পাব কালো, অর্থাৎ লালের জায়গাটি নিগেটিভের উপরে স্বচ্ছ হ'য়ে ফুটে উঠবে। এই ভাবেই কমলা রঙের পরিশ্রাবক আমাদের দেবে নীল রঙের নিগেটিভ পাত (Plate), বেগুনি রঙের ব্যবহারে পাব হলদে।

লাইন ব্লকের প্রয়োজনে পরিশ্রাবকের সাহায্যে স্বতন্ত্রভাবে তিনটি প্লেট প্রস্তুত করতে হবে, হলদে, লাল আর নীল। অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকটি প্লেটে হলদে, লাল আর নীলের অংশ রেখে বাকি অংশগুলিকে এসিড খাইয়ে বাদ দিতে হবে। এবারে এই তিনটি ব্লক তৈরি হলে একটির পরে আরেকটি ছাপাতে হয়। প্রথমে হলদে, তারপরে লাল, শেষে নীল। অবশ্য এটা হল ত্রিবর্ণ চিত্রের কথা। দু'রঙা ছবিতে একটি রং স্বভাবতই বাদ পড়বে।

যত বেশি মিশ্রিত রঙের ছবি হবে তত বেশি প্লেট-ব্লক করতে হবে এবং খরচ স্বভাবতই বেশি পড়বে।

হাফটোন প্রভৃতি স্তরিত বর্ণের চিত্র ব্লক করতে হ'লে ফিলটারের পরে একটি পর্দা (Screen) হাফটোন, গ্রেভিয়োর প্রভৃতির বিশেষ পর্দা রাখতে হয়, যাতে পরিশ্রুত রঙের চিত্রটি প্রয়োজনীয় ফুটকিতে রূপান্তরিত হতে পারে। ঘনসন্নিবদ্ধ এই ফুট্‌কিগুলোর রঙীন মুদ্রণেই পুরো রঙের চেহারা দেখতে পাই চোখে। নানারঙের ফুটকি যাতে একসঙ্গে মিশে রঙের ডামাডোল সৃষ্টি না করে সেজন্য পর্দাটিকে প্রতিটি রঙের জন্য নির্ধারিত বিশেষ কোনে ঘোরানো হয়। ত্রিবর্ণ চিত্রের জন্য যে কোণ ব্যবহৃত হয় তার মাপ হলদে ৭৫ ডিগ্রি, লাল ১৫ ডিগ্রি, নীল ৪৫ ডিগ্রি। চতুর্বর্ণ চিত্রের জন্য – যেখানে গভীর ছাপের প্রয়োজনে কালো রং ব্যবহার করা হয় তার কোণ হলদে ৯০ ডিগ্রি, লাল ১৫ ডিগ্রি. নীল ৭৫ ডিগ্রি এবং কালো ৪৫ ডিগ্রি। বর্ণ মুদ্রণের ক্রমিক পর্যায় হলদে, লাল, নীল, কালো, – অথবা, মুদ্রাকরদের পরিচিতি অনুযায়ী হলদে, ম্যাজেন্টা ( magenta ), সিয়ান ( Cyan ), কালো। এছাড়াও অনেক সময়ে বহুবর্ণ চিত্রের জন্য ধূসর, মভ্ (mauve) প্রভৃতি বর্ণের প্রয়োজনে বাড়তি প্লেট তৈরি করতে হয়। বিশেষত লিথোগ্রাফ মুদ্রণে এ জাতীয় রঙের প্রচলন।

প্লেট তৈরি করার পর সেটিকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পূর্বোক্ত পদ্ধতি-গুলির মতনই ব্লক তৈরি করে বিশেষ ধরণের কালিতে ঐ একই প্রথায় মদ্রিত করা হয়।

## (৩) গ্রন্থন

ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত চিত্রিত বই'এর ফর্মা এবং চিত্রসম্বলিত স্বতন্ত্র পাতা ইত্যাদি সব এপারে চলে যাবে দপ্তরীর কাছে। তার কাজ বইটিকে বাঁধায় বাজারের জন্য তৈরী করে দেওয়া। পুস্তক প্রকাশের এইটিই শেষ পর্যায়। বই এর গঠন সৌকর্যের প্রধান একটি অংশ বাঁধাই। চটকদার বাহ্যিক সৌন্দর্য যেমন অনেকটাই নির্ভর করে দপ্তরীর উপরে তেমনি বইটিকে শক্ত-পোক্ত টেঁকসই ক'রে তুলবার দায়িত্বও তাঁ'রই।

ছাপানো ফর্মাগুলিকে পত্রসংখ্যা ও দপ্তরচিহ্ন ধ'রে ভাঁজ ক'রে ফেলে দপ্তরী। কেমন ক'রে ভাঁজ করতে হয় তা'র কায়দা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু ভাঁজ ক'রে পুরো বইটিকে গ্রথিত করে তোলার কাজ সম্বন্ধে জেনে নেবার আগে বই এর বিভিন্ন অংশ এবং তাদের পারম্পর্য সম্বন্ধে জেনে রাখা একান্ত আবশ্যক।

## বই-এর বিভিন্ন অংশ

ফর্মা হিসেবে মূল বই ছাপানো হলেই পুরো বই এর কাজ শেষ হয়না। আরো অনেক অংশ বা ভগ্নাংশ মিলে তবে বই সম্পূর্ণ হয়। মূল বই এর উপরে বা নিচে থাকে পৃষ্ঠাসংখ্যা, থাকে বইয়ের নাম এবং অধ্যায়ের আখ্যা। সুরুতে এবং শেষে, আখ্যাপত্র থেকে আরম্ভ ক'রে নির্ঘণ্ট পর্যন্ত অনেককিছু জুড়ে দিতে হয়। এসবের হিসেব গ্রন্থাগারিকের জেনে রাখা দরকার। পাঠকদের পক্ষেও এগুলির গুরুত্ব অনুপেক্ষণীয়।

মোটামুটিভাবে একটি বইয়ের চারটি প্রধান অংশ। (১) বাঁধাই, বা মলাট; (২) প্রারম্ভিক পত্রগুচ্ছ; (৩) মুল পাঠ্যাংশ; (৪) সমাপ্তি পত্রগুচ্ছ। একে একে এগুলির পরিচয় নেওয়া যাক।

(১) বাঁধাই (Binding) মুদ্রিত পৃষ্ঠাগুলিকে যে-প্রক্রিয়ায় একসঙ্গে ধ'রে রাখা হয় সেটাই বাঁধাই। এর কাজ বইটিকে অক্ষত রাখা এবং অনায়াস ব্যবহারযোগ্য ক'রে তোলা। এর প্রধান অংশ মলাট এবং পুস্তানি (end paper)। মলাটের পিঠের দিকটিকে বলে পুট (spine), এখানে বইএর নাম, লেখকের নাম, প্রকাশকের নাম লেখা থাকে। গ্রন্থাগারিক এখানেই লেখেন গ্রন্থাংক নাম বা গ্রন্থসংলেখ। মলাটের উপরে নকসা, বই ও লেখকের নাম ছাপানোর রীতি। পুস্তানির কাজ বইটিকে সেলাই সমেত আরো শক্ত ক'রে এবং সুদৃশ্য ভাবে ধ'রে রাখা। পুস্তানির উপরে নানান রঙ দিয়ে বা নকসা এঁকে সুন্দর যেমন করা হয় তেমনি মানচিত্র, রেখা-চিত্র, বিবরণী প্রভৃতি প্রয়োজনীয় তথ্য ছাপিয়ে কাজেও লাগানো যায়।

মলাটের উপরে অধিকাংশ বইতেই একটি করে বাড়তি কাগজের মোড়ক বা আবরণ থাকে। এটিকে বলা যায় অলগ্নমলাট (jacket ; dust-

cover)। প্রকাশকরা এই মোড়ক বইএর পরিচিতি হিসেবেও কাজে লাগায় বলে একে publisher's blurb নামেও অভিহিত করা হয়। এটি মূল মলাটকে ধূলো বা আঘাত থেকে আড়াল করে, এবং বই এর সৌন্দর্যও বাড়ায়। মোড়কের উপরে বই এর নামগোত্র লেখা থাকে. পুটাংশে থাকে বই এর নাম ইত্যাদি, পিছনের দিকে সংশ্লিষ্ট বই অথবা প্রকাশকের অন্যান্য প্রকাশিত বই এর বিজ্ঞপ্তি, মোড়কের যে অর্দ্ধাংশ ভাঁজ করে মলাটের ভিতরের দিকে রাখা হয় সেখানে থাকে সাধারণত বইটির পরিচয়, বই সম্পর্কে অভিজ্ঞদের মন্তব্য, লেখকের পরিচয় হয়ত বা ছবি সমেত। অলগ্ন মলাট থেকেই ক্রেতা বা অন্য যে কেউ বইটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা ক'রে নিতে পারে।

(২) প্রারম্ভিক পত্রগুচ্ছ (Preliminaries) : নামে প্রারম্ভিক হলেও মুদ্রিত হয় সাধারণত সকলের শেষে। তবে কোনো বই এর হুবহু পুর্নমুদ্রনের বেলায় বইটি সরাসরি আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত একনাগাড়ে একই পত্রাঙ্ক পর্যায়ে ছাপানো যেতে পারে। এই পর্যায়ে বই এর প্রবেশক হিসেবে নানারকমের মুদ্রিত পাতা স্থান পেতে পারে। এর সব কটিই যে আবশ্যিকভাবে প্রত্যেকটি বই-এ থাকবে এমন কোনো কথা নেই। তবে বই এর আঙ্গিক বিচারে পূর্ণাঙ্গ রূপ এই রকমের।

(ক) অমুদ্রিত পত্র (fly leaf)। বই সুরু হবার আগে, পুস্তানির ঠিক পরেই, একটি ক'রে শাদা পাতা দেবার রীতি আছে। আরম্ভকে আচ্ছাদন করাই এটির যোগ্যতা।

(খ) গ্রন্থনাম পত্র (half-title page ; bastard title)। শাদা পাতাটির পরেই, আখ্যা-পত্রের আগে এই পাতাটি সন্নিবেশিত থাকে। আখ্যা-পত্রটিকে ক্ষয়-ক্ষতির থেকে রক্ষা করার কাজ ও এতে হয়। এখানে শুধুমাত্র বই এর নাম মুদ্রিত থাকে। কোনো গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত বই হ'লে (যেমন বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ, সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ইত্যাদি) গ্রন্থমালার Series) নাম, অথবা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত ধারাবাহিক বই হলে তার গ্রন্থসংখ্যা বা খণ্ডসংখ্যাও এখানে মুদ্রনের বিধি।

(গ) সম্মুখচিত্র (frontis piece)। আখ্যাপত্রের পূর্বে সাধারণত বাঁদিকের পৃষ্ঠায় (স্বতন্ত্র পৃষ্ঠা) বই এর বিষয়ানুকূল চিত্র ছাপানোর রীতি আছে।

(ঘ) আখ্যাপত্র (title page) এইটিই 'বই' এর প্রথম, এবং অন্যতম প্রধান মুদ্রিত পাতা। এর পত্রমুখ সোজা দিকে (recto) থাকে (১) পুস্তকের আখ্যা বা নাম (title); (২) উপ-আখ্যা বা নাম-ব্যাখ্যান (sub title),—এর প্রয়োজনীয়তা বই এর নামটিকে আরেকটু বিশদভাবে ব্যাখ্যান.; (৩) লেখকের নাম এবং তাঁর খেতাব, উপাধি, পরিচয় ইত্যাদি; (৪) ক্ষেত্রবিশেষে সম্পাদক, অনুবাদক, রেখাচিত্রী প্রভৃতির নাম, ভূমিকা লেখকের নাম; (৫) সংস্করণের উল্লেখ,—সাধারণ, প্রথম সংস্করণ উল্লিখিত হয়না, পরবর্ত্তী সংস্করণের উল্লেখ থাকে, অনেক সংস্করণ হয়ে থাকলে কেবল শেষতম সংস্করন উল্লিখিত হয়; (৬) মুদ্রণ তথ্য অথবা প্রকাশন বিবরণ (imprint), অর্থাৎ প্রকাশের স্থান, প্রকাশকের নাম এবং প্রকাশের তারিখ কেবলমাত্র প্রকাশবর্ষ।

আখ্যাপত্রের উল্টোদিকে বা পত্রপৃষ্ঠে (verso) থাকে মুদ্রণের বিবিধ তথ্যাদি, যেমন, (১) তারিখসহ স্বত্বাধিকারীর নাম (copyright; (২) বিবিধ সংস্করণ পঞ্জী এবং পুনর্মুদ্রন পঞ্জী; (৩) গ্রন্থপ্রকাশের সম্ভাব্য ইতিবৃত্ত বা বিবৃতি; (৪) অনুবাদের ক্ষেত্রে মূল গ্রন্থ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য; (৫) পূর্বে অন্য অধ্যায় বা অন্য প্রকাশনে বইটি ছাপানো হয়ে থাকলে তার উল্লেখ; (৬) মুদ্রাকরের ও মুদ্রণালয়ের নাম; (৭) দপ্তরীর নাম; (৮ প্রচ্ছদলিপীর নাম, ইত্যাদি।

(ঙ) উৎসর্গ পত্র—আখ্যাপত্রের পরেই বইটি যা'কে উৎসর্গ করা হচ্ছে তার নাম থাকে।

(চ) মুখবন্ধ (Preface)—এই অংশে লেখক তাঁর বই এর উদ্দেশ্য, লেখরীতি বিষয়ের ব্যাপ্তি বা সীমবদ্ধতা প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য রাখেন। পুস্তক রচনায় এবং প্রকাশে যাঁদের সহযোগিতা পেয়েছেন তাঁদের নাম স্বীকৃতি উল্লেখ করেন। বইটি কিভাবে সাজিয়েছেন, কোন কোন সংকেত চিহ্ন অথবা সংক্ষেপিত শব্দ ব্যবহার করেছেন তা লিপিবদ্ধ করেন। আখ্যাপত্র যেমন প্রকাশকের পৃষ্ঠা, মুখবন্ধ তেমনি গ্রন্থকারের।

(ছ) ভূমিকা (Introduction)—এই অংশে সাধারণত আলোচ্য বিষয়ের কোনো বিশিষ্ট পণ্ডিত গ্রন্থের পরিচয় এবং লেখকের যোগ্যতা সম্পর্কে কিছু লেখেন।

(জ) সূচীপত্র (Contents)।—অধ্যায়বিভাগ এবং পরিচ্ছেদ পরিচয়

পৃষ্ঠাসংখ্যা সমেত লিপিবদ্ধ হয় সূচীপত্রে। এই অংশ সংক্ষিপ্তও হতে পারে, আবার বিস্তৃতভাবে বইটির খসড়া-পরিচয়ের কাজও করতে পারে।

(ঝ) চিত্র সূচী – গ্রন্থ মধ্যে যে সকল চিত্র অথবা নকশা সংযুক্ত হয়েছে তার তালিকা,—পৃষ্ঠাসংখ্যা সমেত।

(ঞ) শুদ্ধিপত্র ও সংযোজন তালিকা—ছাপার ভুলগুলির পৃষ্ঠা ও পংক্তি সংখ্যা সহ শুদ্ধরূপ, এবং গ্রন্থশেষে বা মধ্যে কোনো সংযোজন হয়ে থাকলে তার উল্লেখ।

(৩) মূল পাঠ্যাংশ (body of the book) অর্থাৎ পুস্তকের প্রধান অংশ,—অধ্যায়ক্রমে, অথবা লেখকের সজ্জিত ক্রম অনুযায়ী বিন্যস্ত। পরিচ্ছেদ শিরোনাম এবং সার-সংকলন সংকলিত মুদ্রিত বিষয়বস্তু ব্যতিরেকেও এই অংশে থাকে চিত্র, মানচিত্র, নক্সা প্রভৃতির স্বতন্ত্র পত্র। এছাড়াও এই অংশে লক্ষণীয় প্রতি পৃষ্ঠার বাঁ দিকের মাথায় বই এর নাম,—ক্রমায়ত গ্রন্থনাম (running title), এবং ডানদিকে অধ্যায় শিরোনাম অথবা আলোচিত বিষয়ের আখ্যা। এবং প্রতি পৃষ্ঠার উপরে বা নিচে পৃষ্ঠাসংখ্যা।

(৪) সমাপ্তি পত্রগুচ্ছ (subsidiaries) এই অংশে পরিশিষ্ট এবং বিবিধ গ্রন্থসহায়ক অংশ লিপিবদ্ধ হয় যেমন, [ক] পরিশিষ্ট; একটি বা কয়েকটি পরিশিষ্ট থাকতে পারে একই গ্রন্থের। সাধারণত এমন সব প্রসঙ্গের অবতারণা এখানে গ্রন্থকার করেন যেগুলির উল্লেখ মূল গ্রন্থাংশে থাকলেও বিশদ ব্যাখ্যা নেই। অথবা এমন কোনো বিষয় যা গ্রন্থসংশ্লিষ্ট। [খ] টীকা; বিষয় টীকা অথবা শব্দটীকা গ্রন্থশেষে সংযোজনের বদলে অনেক ক্ষেত্রে প্রতি অনুচ্ছেদের শেষেও দেওয়া হয়। এবং সাধারণত পুস্তকে ব্যবহৃত হরফের চেয়ে ছোট হরফে ছাপানোর রীতি। [গ] গ্রন্থপঞ্জী; গ্রন্থপঞ্জী দু'রকমের হতে পারে, —যেসব বই গ্রন্থকার ব্যবহার করেছেন তা'র তালিকা, এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে তাবৎ গ্রন্থতালিকা, —অর্থাৎ আরো যেসব বই পড়লে আলোচিত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান বর্ধিত হবে তারই লেখক নির্দেশিত তালিকা। [ঘ] অনুক্রমনিকা, নিঘণ্ট (Indexes); এই অংশে গ্রন্থ সংক্রান্ত ও গ্রন্থে ব্যবহৃত বিষয়সূচী। শব্দ তালিকা ইত্যাদির সন্নিবেশ হয়। মূল রচনায় ব্যবহৃত বিশেষ বিশেষ প্রসঙ্গের শব্দ তালিকা লিপিবদ্ধ হয় পৃষ্ঠার উল্লেখ সমেত। কালানুক্রমিক সূচী, পারিভাষিক সূচী ইত্যাদিও এই অংশে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। [ঙ] সমাপ্তি

সংকেত [finis] ; বইটি সমাপ্ত হ'ল, তাও অনেক গ্রন্থে মুদ্রিত থাকে। বিশেষ করে প্রাচীন পুস্তকাদিতে এর উল্লেখ ছিল নিয়মিত। এমনকি বইএর আরম্ভে ও অথারম্ভ [incipit] লেখা হ'ত।

উপরোক্ত অংশগুলিকে যথানুক্রমে সাজিয়ে বাঁধানোর কাজ সুরু হয়। এই সূত্রে আরো কয়েকটি জ্ঞাতব্য তথ্য জেনে রাখা ভাল। দপ্তরীর প্রয়োজনে না হ'লেও গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজনে।

## পুস্তকের সংজ্ঞা বা পরিচয় কী

দুই পাশে দুই মলাটের মধ্যে গ্রথিত মুদ্রিত বা অমুদ্রিত সামগ্রীকেই আমরা বই বলি। পুস্তক এবং পুস্তিকা—অর্থাৎ বই এবং ইস্তাহার জাতীয় বই এর মধ্যে প্রভেদ লক্ষনীয়। খুব চটি বই ও যেমন পুস্তক, তেমনি মোটা গ্রন্থও পুস্তক। প্রভেদ মূলত তার অন্তর্নিহিত বিষয় নিয়ে। খুব চটি বইও যেমন গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে রচিত হতে পারে, তেমনি আবার বৃহৎ কলেবরের ইস্তাহারও বিরল নয়। পাতলা বই গ্রন্থাগারের তাকে রাখা অসুবিধা জনক, কিন্তু 'অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্যাম্ফলেট' বা 'সাহিত্য সাধক চরিত-মালা' জাতীয় বই পাতলা হলেও গ্রন্থাগারের পক্ষে বর্জনীয় নয়। এক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিক বিচার করে দেখেন কোন বই তাঁর গ্রন্থাগারে রাখবেন, কিভাবে রাখবেন, কোনটি পুস্তক হিসাবে মঞ্চে যাবে, কোনটি পুস্তিকা হিসাবে থাকবে স্বতন্ত্র কোনো বন্দোবস্তে। নিজ নিজ গ্রন্থাগারের ওজন ও প্রয়োজন বুঝে চলতে হয় গ্রন্থাগারিকদের। কত পৃষ্ঠার সমষ্টি হ'লে সেটি বইএর মর্যাদা পাবে তা'র হিসেব একেক দেশে একেক রকমের। ইউনেস্কো [UNESCO] একটা হিসেব বেঁধে দিয়েছে, ৪৯ পৃষ্ঠার কম হ'লে সেটি বই ব'লে গণ্য না হয়ে পুস্তিকা [pamphlet] শ্রেণীভুক্ত হবে। কানাডা, আমেরিকা প্রভৃতি কোনো কোনো দেশ এই হিসেব মোটামুটি মেনে চলে। ইংরেজদের হিসেব আবার অন্যরকম, যা'র দাম ৬ পেনি সেটিই বই। ভারতবর্ষে এখনো তেমন স্পষ্ট কোনো নিয়ম বা নীতি চালু হয়নি। পুস্তিকাও অনেক ক্ষেত্রেই বইএর মর্যাদা পাচ্ছে। ৪৯ পৃষ্ঠার নিয়ম মানতে গেলে বহু কবিতার বই-ই গ্রন্থাগারে ঠাঁই পাবে না।

## সংস্করণ ( Edition )

পুস্তকের বিভিন্ন অংশের কথা বলতে গিয়ে সংস্করণের উল্লেখ করা হয়েছে। 'সংস্করণ' কাকে বলে তার বিস্তারিত টীকা প্রয়োজন। 'সংস্করণ' শব্দটির দু'রকম অর্থ হতে পারে। প্রথম, যে আকৃতিতে এবং যে প্রকৃতিতে বইটি প্রকাশিত হয়। আকার গত ও ফর্মার হিসেবে বলা যেতে পারে -রাজসংস্করণ, গ্রন্থাগার সংস্করণ (Library edition), কাগজের মলাট ( paper back ) সংস্করণ, চিত্রিত সংস্করণ (illustrated edition), ফোলিও সংস্করণ folio-edition) ইত্যাদি। বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে হ'তে পারে মৌলিক, সংশোধিত, পুনর্বিন্যস্ত, পরিবর্ধিত ইত্যাদি সংস্করণ।

দ্বিতীয়, একটিমাত্র বিন্যস্ত মুদ্রাবলী থেকে যে-পরিমাণ পুস্তক একযোগে ছাপানো হয়। পুনর্বিন্যস্ত মুদ্রাবলী থেকে ছাপালে সেটিকে ভিন্ন সংস্করণ হিসেবে গণ্য করা হয়।

সংস্করণ (edition) এবং মুদ্রণ (impression) এক নয়। বিষয়বস্তু অপরিবর্তিত রেখে যদি দ্বিতীয় তৃতীয়াদি দফায় বই ছাপানো হয় তাহলে সেটি সংস্করণের মর্যাদা পায়না, সেটি হয় পুনর্মুদ্রণ। যখন বিষয়বস্তু যে কোনো ভাবেই হোক পরিবর্তিত হয়ে আবার ছাপানো হয় তখন হয় নূতন সংস্করণ। এবং এই নূতন সংস্করণের জন্য নূতন ক'রে 'গ্রন্থস্বত্ব' (Copyright) স্থির করতে হয়।

## গ্রন্থস্বত্ব ( Copyright )

গ্রন্থস্বত্ব কথাটির মধ্যে যদি 'কপিরাইট' শব্দের বিবৃত অর্থ ধরতে হয় তাহলে একে বলা উচিত 'মুদ্রণস্বত্ব'। এই স্বত্ব কোনো লিখিত, অঙ্কিত অথবা গীত শিল্পের সুর-স্বরলিপি বিরচন, এবং অনুরূপ অন্যান্য রচিত সামগ্রীর প্রকাশ, উদ্ধৃতি, অনুবাদ এবং বিক্রয়ের একমাত্র 'স্বত্বাধিকার'। লেখক বা শিল্পী মাত্রেরই তাঁর কৃতীর উপর স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির মতো পূর্ণ অধিকার থাকা উচিত। তা'না হ'লে একজনের জিনিষ নিয়ে দশজনে ব্যবসা খুলে বসবে, পরের ধনে পোদ্দারি করবে। সুতরাং স্বত্বাধিকারীর অনুমতি ছাড়া এসবের প্রকাশ, বিক্রয়, পুনর্মুদ্রণ, পুনঃসম্প্রচার, অনুবাদ, অবাধ উদ্ধৃতি প্রভৃতির যথেচ্ছাচার রোধ করবার জন্য মুদ্রণস্বত্ব আইনের (Copyright act)

সৃষ্টি। বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন শর্ত আরোপিত হ'তে দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশকাল থেকে ২৮ বছর পর্যন্ত এই স্বত্ব বলবৎ থাকে, এবং তারপরে আরো ২৮ বছর পর্যন্ত পুনরায় প্রবর্তনের অধিকার থাকে। ইংলণ্ডে লেখকের মৃত্যুর পর ৫০ বছর পর্যন্ত তাঁর ওয়ারিশরা এই অধিকার ভোগ করতে পারে। আজকাল গানের সুর, বক্তৃতা প্রভৃতির ক্ষেত্রেও স্বত্বাধিকারের প্রয়োগ সুরু হয়েছে। ভারতবর্ষের নিয়মেও লেখকের মৃত্যুর পরে ৫০ বছর পর্যন্ত তাঁর ওয়ারিশদের গ্রন্থস্বত্ব বজায় থাকে।

গ্রন্থস্বত্ব আইন অনুযায়ী আমেরিকায় লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস প্রমুখ গ্রন্থাগারে, ইংলণ্ডে ব্রিটিশ মিউজিয়াম প্রমুখ গ্রন্থাগারে, ফ্রান্সে বিবলিওতেক নাসিওনেল প্রমুখ গ্রন্থাগারে, এবং অন্যান্য দেশেও অনুরূপ ভাবে স্বীকৃত কিছু গ্রন্থাগারে প্রত্যেক মুদ্রিত পুস্তকের একটি সংখ্যা জমা দিতে হয়। ভারতবর্ষেও এই আইন অনুযায়ী (Delivery of Books Act) প্রকাশিত তাবৎ পুস্তকের চার প্রস্থ দেশের চার গ্রন্থাগারে, অর্থাৎ কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে, দিল্লির লোকসভা গ্রন্থাগারে, মাদ্রাজের কোনেমারা জন-গ্রন্থাগারে এবং বোম্বাই-এর কেন্দ্রীয় রাজ্য গ্রন্থাগারে জমা পড়ে। ব্রিটিশ আমলে দু'টি করে বই দিতে হ'ত ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে, তা'র একটি চলে যেত লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে। প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থাদি এদেশের তুলনায় ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে বা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বেশি দেখা যায়। কেননা অত্যন্ত পরিবর্তনশীল বন্দোবস্তের মধ্যে এবং ইংরেজদের গ্রন্থ লোলুপতার ফলে সংরক্ষণ দৃঢ় হয়নি। এই কারণেই ভারতের প্রত্নসামগ্রীও বিদেশাভিমুখী হয়েছে।

গ্রন্থস্বত্ব আইনের সূচনা ইংলণ্ডে এবং আমেরিকায় অষ্টদশ শতাব্দি থেকেই। মুদ্রণের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে স্বত্ব সংরক্ষণও বহুল প্রচলিত হয়েছে। সম্প্রতি এই আইন আন্তর্জাতিক সমঝোতায় স্বীকৃত। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেটব্রিটেনে প্রথম তৈরি হয়েছিল আন্তর্জাতিক গ্রন্থস্বত্ব আইন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বার্ণ সম্মেলনে (Berne Convention) বিশদ ভিত্তিতে এটির পরিচালনার ব্যবস্থা হয়। এই সম্মেলনে আন্তর্জাতিক স্বত্ব সদস্য হিসেবে পৃথিবীর যে সকল দেশ যোগ দিয়েছে তাদের স্বত্ব সংরক্ষণের স্বাভাবিক ক্ষমতা দেওয়া হয়। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে রোমে অনুষ্ঠিত সভাতে, এবং পরে ব্রাসেল্‌স্ প্রভৃতি স্থানের সভায় পুনরীক্ষণের ফলে অভিনয় এবং নানান অনুষ্ঠান থেকে সুরু করে আলোকচিত্র ছায়াচিত্রাদিও এর আওতায় এসে যায়। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে

বিশ্বস্বত্ব সম্মেলনে (Universal Copyright Convention) আহুত হয় জাতিসঙ্ঘের ইউনেস্‌কো শাখার পরিচালনায়। এখানে স্থির হয় কোনো সদস্য দেশের রচয়িতা অনুরূপ সুবিধা না পেলে স্বত্বসংরক্ষণের দাবীতে বাঁধা থাকতে নাও পারে. তবে স্বত্বশর্তাদি তৌলিক ভাবে বজায় রেখে এক দেশ অপর দেশকে অন্তত সাত বছরের কড়ারে রচনার অনুবাদ-স্বত্ব দিতে বাধিত থাকবে। এইখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সম্প্রতি ইংরেজি বইএর অনুবাদ অথবা ভারতীয় সংস্করণ প্রস্তুতের ব্যাপারে ভারতের সঙ্গে ইংলণ্ডের বোঝাপড়া নিয়ে গোলমাল লাগে, এবং শেষোক্ত দেশের দাবীর আতিশয্যে ভারত বিড়ম্বিত বোধ করে। অপর দিকে পাকিস্তানে ভারতীয় পুস্তক মুদ্রণের কাজ চলছে অবাধভাবে, —আন্তর্জাতিক স্বত্ব আইন লঙ্ঘন ক'রে। আন্তর্জাতিক আদালতের এ নিয়ে কী করবার আছে সেটাও এক প্রশ্ন। আরেকটি সমস্যা যথাযথ মুদ্রণ বা অনুবাদ ব্যতীত ভাবানুসরণ জাতীয় রচনা নিয়ে। এক্ষেত্রে নৈতিক দায়িত্ব বা নৈতিক স্বত্বাধিকারের প্রশ্ন ওঠে। এভাবে চলতে চলতে স্বভাবতই স্বত্বসংরক্ষণের পরিমণ্ডল বৃদ্ধি পাবে।

## গ্রন্থনের সেকাল ও একাল

গ্রন্থন, অর্থাৎ বই বাঁধাই পুস্তক সংরক্ষণেরই অন্যতম পদ্ধতি। পাতাগুলি যা'তে আলগা হয়ে বা ছিঁড়ে না যায় সেজন্য পোক্ত রকমের আবরণ লাগানো। পুরাকালে যখন পেপিরসে বই লেখা হত, তখন সেগুলো রাখা হ'ত গোল করে গুটিয়ে। দু'দিকে দুটি কাঠের লম্বা খণ্ড (roller) লাগিয়ে পুথিটি গোল করে গুটিয়ে একটি সুতো দিয়ে বেঁধে দেওয়া হ'ত। গোলকের উপরে পুথির নাম লেখা থাকত। এই ছিল সেযুগের সরল বাঁধাই। কিন্তু ক্রমে এর রূপ বদল হয়। কেননা পুথি ব্যবহার করতে হ'লে বারবার খোলা আর গুটানো এক ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার ছিল। কোনো অংশবিশেষ পড়বার প্রয়োজন হ'লেও সমগ্র পুথিটি খুলতে হ'ত। তাই ক্রমে ব্যাপারটাকে সহজ করে নেবার জন্য সুরু হল ভাঁজ ক'রে রাখার চেষ্টা। লেখার কলম (Column) ধরে ফেলা হ'ত ভাঁজ-গুলি। ক্রমে সেই ভাঁজের নিদেন ধ'রে কাগজের শাদা পিঠ আঠা দিয়ে জুড়ে দেবার পন্থা দেখা দিল। এর ফলে যখন ভাঁজগুলি খোলা হ'ত তখন কেবলমাত্র লেখার পিঠটাই বেরিয়ে আসত। এবারে আরেক ধাপ এগিয়ে

ভাঁজ ধ'রে সেখানে ফুটো ক'রে সুতো দিয়ে বাঁধা সুরু হ'ল।

আমাদের দেশেও দেখি যে প্রাচীন আমলে তালপাতার পুথি বা তুলোট কাগজে লেখা পুথি ছিল স্বতন্ত্র পৃষ্ঠার। একেকটি পাত বা পাতার মাঝখানে ফুটো ক'রে তার মধ্যে সুতো চালিয়ে বাঁধা হত। পুথির মলাট হিসাবে কাঠের পাত ব্যবহৃত হ'ত। এই কাঠের মাঝখানেও ফুটো থাকত এবং পুথির সুতোটি এর মধ্য দিয়ে নিয়ে বেঁধে রাখা হ'ত।

পরবর্ত্তী যুগে পাশ্চাত্য দেশে যখন চামড়ার, —বিশেষ ক'রে ভেলমের (Vellum) চল হল তখন পূর্বোক্ত প্রথায় পুথি বেঁধে রাখার ব্যবস্থা 'টিঁকলনা। চামড়ায় ঐভাবে ফুটো ক'রে বাঁধবার কাজটা দেখা গেল অসুবিধা জনক। পুথির, বা ছাপানো বই এর পাতাগুলিকে দু'ভাঁজ করে নেওয়ার প্রথা চালু হয়ে গেল। ভেলমের পাতগুলি মাপমতো কেটে মাঝামাঝি ভাঁজ ক'রে একটির মধ্যে আরেকটি ভ'রে গুচ্ছ (Gathering) তৈরি হতে লাগল। এই গুচ্ছ-গুলিকে, অথবা বলা যায় দিস্তা (quire) গুলিকে ভাঁজের খাঁজে ফুটো করে উপর থেকে নিচে পর্যন্ত লম্বালম্বি ভাবে সুতো চালিয়ে গ্রথিত করা হতে লাগল। ক্রমে যখন দেখা গেল একই বইএর একাধিক গুচ্ছ ছাপানো হচ্ছে, তখন গুচ্ছগুলিকে একটার উপরে আরেকটা রেখে পরম্পরা ক্রমে সাজিয়ে নিয়ে পাশের সেলাই এর মধ্য দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে একটি ফিতে বা পটি (Band) ভ'রে, —অর্থাৎ ঐ ফিতের উপর দিয়েই সেলাইটাকে চালিয়ে নিয়ে সমগ্র গুচ্ছ গুলিকে একসঙ্গে বেঁধে পুরো গ্রন্থ (Volume প্রস্তুত সুরু হয়ে গেল। এবং গ্রন্থটি যাতে দুমড়ে মুচড়ে না যায় সেজন্য এর নিচে একটি উপরে একটি কাঠের পাটা দিয়ে পটির সাহায্যে গ্রন্থের সঙ্গে বেঁধে রাখা হ'ল। এবং কালক্রমে এই বন্ধন, বা গ্রন্থন আরো উন্নত রাখার জন্য গ্রন্থের পিঠের এই পটিকে শক্ত মোটা চামড়া দিয়ে ঢেকে দেবার কাজ সুরু হ'ল। এর ফলে পিঠের দিকটা সুন্দরও যেমন দেখাত তেমনি পটিটাও নষ্ট হয়ে যাবার হাত থেকে রক্ষা পেত। এবং আরো পরের যুগে এই চামড়াটিকে পটির সাহায্যে কাঠের পাটার সঙ্গে এঁটে দেবার কাজ সুরু হল। গ্রন্থন শিল্পের বিবর্তনের মোটামুটি এই ইতিহাস।

সেকালে তাকের উপরে বই খাড়াভাবে না রেখে শুইয়ে রাখার রীতি ছিল, —সে রীতি চীনা বই এর, বিশেষত সেকেলে বই এর ক্ষেত্রে এযুগে পর্যন্ত দেখা যায়। বাঁধানো বই এর মলাট যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য ধাতব গাঁট (knob) সংযুক্ত হত কাঠের বা চামড়ার পাটায়।

পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এ রীতি চালু ছিল। চারুশিল্প হিসেবে অতি সুন্দর বাঁধানোর কাজ দেখা যায় পঞ্চম শতাব্দি থেকে বাইজেনটাইন (byzentine) সভ্যতার সংস্পর্শে। লিখিয়েরা এবং দপ্তরীরা বইটিকে উৎকৃষ্ট শিল্প নিদর্শন হিসেবে হাজির করার জন্য নানাভাবে কারুমণ্ডিত করতেন। এই শিল্প-কৃতিকে বলত অলঙ্করণ (ornamentation)। সোনা এবং রূপা ব্যবহার করা হ'ত নকসা আঁকার কাজে।

মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে যখন বই এর সংখ্যা যখন বাড়তে লাগলো তখন তাকের জায়গা বাঁচাবার জন্য এবং ব্যবহারের সুবিধার জন্য বইগুলোকে খাড়াভাবে রাখার রেওয়াজ হল। এর ফলে, এবং ব্যব-হারের আধিক্যে বইগুলোর উপর আর নিচের দিকের বাঁধাই জখম হতে লাগল ভিতরের দিকে ঝুলে পড়তে লাগল বইগুলো। তখন বাঁধাই এর মাথায় এবং নিচে পটি লাগানোর পদ্ধতি চালু হল। যাতে মলাটের সঙ্গে বইটিকে পোক্তভাবে আটকে রাখা যায়।

পুথির যুগে লিখিয়ে আর বাঁধিয়ে ছিল পৃথক ব্যক্তি; কিন্তু মুদ্রণের আদি যুগে মুদ্রাকরদের, অথবা—বলতে পারি প্রকাশকদের নিজস্ব দপ্তরখানা ছিল, কিম্বা ছিল স্বতন্ত্রভাবে নিযুক্ত দপ্তরী। কেননা তাঁরা বাঁধানো বই বিক্রি করতেন,—এমন কি বিভিন্ন মূল্যে ভিন্ন ধরণের বাঁধানো একই বইও বিক্রি করতেন। ১৫৪৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'দি বুক অফ কমন প্রেয়ার' গ্রন্থটির বাঁধানো এবং আবাঁধা দুই রকমের সংস্করণ দুই রকম দামে বিক্রি হয়েছিল দেখা যায়। ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'দি গ্রেট বাইবেল' গ্রন্থের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যাপার পরিদৃষ্ট হয়। ক্রমে পুস্তক বিক্রেতার সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বতন্ত্র দপ্তরখানা গড়ে উঠল। মুদ্রনালয়ের সঙ্গে আর যুক্ত রইল না। এবং সম্ভবত ছাপাখানা থেকে বই এর ফর্মাগুলি সরা-সরি আলগাভাবেই প্রকাশকের কাছে চলে যেত, প্রকাশক বা পুস্তক-বিক্রেতা রুচি অনুযায়ী বই বাঁধিয়ে নিতেন।

প্রকাশকের বাঁধাই সুরু হয় ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ। সপ্তদশ শতাব্দির শেষ নাগাদই বাঁধাই এর বিশিষ্টতা ক্রেতা সাধারণ– বিশেষ করে গ্রন্থপ্রিয় ব্যক্তিদের আকৃষ্ট করতে লাগল। তাঁরা নিজেদের পছন্দ বা রুচি অনুযায়ী বই বাঁধাতে সুরু করলেন। ঊনবিংশ শতাব্দিতে কাপড়ের বাঁধাই চালু হয়ে গেল, এবং সোনার জলে নাম লেখার প্রথাও হয়ে

উঠল ব্যাপক। তারপরে আধুনিক যুগে তো আমরা কত রকমের কত গড়নের বাঁধাই দেখছি। সস্তা কাগজের মলাট থেকে সুরু করে দামী সামগ্রী আর নকসা।

## বই বাঁধাই : দপ্তরীর কাজ

বাঁধাই এর গোড়ার কথা বই এর পাতাগুলো শক্ত ক'রে গেঁথে মলাট লাগিয়ে পোক্ত করা,—যা'তে কোনো পাতা আলগা বা অসমানভাবে বিন্যস্ত না থাকে, শীত গ্রীষ্ম বর্ষা নির্বিশেষে, অর্থাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তনেও বাঁধাই এর কোনো ক্ষতি না হয়, এবং বাঁধাই টেঁকসই হয়। আজকাল যেসব চকচকে ঝকঝকে বই বাজারে বেরিয়ে লোকচিত্ত লুব্ধ করছে তার অধিকাংশই টেঁকেনা। মলাট ছিঁড়ে হাড়-পাঁজরা বেরিয়ে পড়ে। সুতরাং গ্রন্থাগারিকের পক্ষে,—যেখানে পাঠকরা ক্রমাগত বই নাড়াচাড়া করবে, পড়বে, সেক্ষেত্রে একটু দেখেশুনে বিবেচনা ক'রে বই কিনবার প্রয়োজন হয়। গ্রন্থাগার থেকেও প্রায়ই বই বাঁধাবার জন্য দপ্তরীর কাছে পাঠাতে হয়। তাই বই বাঁধাবার মূল সূত্রগুলি জেনে রাখা গ্রন্থাগারিকের পক্ষে আবশ্যিক। পাতলা রোগা বই যেমন চামড়া দিয়ে পুরু করে না বাঁধানোই ভাল, জীর্ণ বই এর সেলাইটা যেমন বুঝেশুনে করা উচিত, দুর্মূল্য দুষ্প্রাপ্য বই সংরক্ষণের জন্য কিভাবে জোড়াতালি দিয়ে বাঁধানো দরকার,—এসব বিবেচনা করে দেখা এবং দপ্তরীকে সেইমতো নির্দেশ দেওয়ার কর্তব্য গ্রন্থাগারিকের।

বাঁধাই এর কাজে চারটি বিশিষ্ট দিকে নজর রাখা দরকার।

[১] নমনীয়তা (flexibility) ; অর্থাৎ বইটি যাতে সহজে পুরোটা খুলে রাখা যায়। বাঁধাই আঁট হলে বইটিকে শুইয়ে রেখে ব্যবহার করা চলে না—আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। এজন্য জোড়গুলির দিকে নজর রেখে বাঁধাতে হয়। পুট যেন শক্ত না করা হয়, এবং পুস্তানির বুনোট যেন আড়াআড়ি ভাবে না পড়ে সেদিকে নজর রাখতে হয়—আড়াআড়িভাবে লাগালে মলাট কুঁকড়ে যাবার ভয় থাকে। কোন ধরনের আঠা ব্যবহার করতে হবে সেটিও ঠিক ক'রে নেওয়া উচিত। আঠার

দোষেও অনেক সময়ে বই কুঁকড়ে যায়। [২] স্থায়ীত্ব (durability); অর্থাৎ বাঁধাই যাতে টেকসই হয়, ক্রমাগত খোলা আর বন্ধ করার ধকল যেন সহ্য করতে পারে, অল্পবিস্তর হাত ফসকে পড়ে গেলেও যেন ক্ষতি না হয়, আবহাওয়ার অদল বদলে যেন জখম না হয়ে যায় এমন সামগ্রী ব্যবহার করতে হয়। সেলাই এর সুতো খুব মজবুত হওয়া দরকার, মলাটের মালমসলা হওয়া চাই উঁচু দরের। [৩] দার্ঢ্য (solidity); বাঁধাবার পর বইটির চেহারা হবে পীনদ্ধ পদার্থের মতো। ফেলে রাখলে ইটের মতো থাকবে বেঁকে যাবেনা। এজন্য শক্ত মলাট পরিচ্ছন্ন পুট-ক্রিয়া এবং সমান ভাবে চাপ দিয়ে সকল অংশের সমতা আনতে হয়। [৪] সর্বশেষ গুনটিকে বলা চলে যথাযথতা, অর্থাৎ যেমনভাবে বইটিকে রাখার ইচ্ছে হবে তেমন ভাবেই যেন খাড়া থাকে। ঠিকমতো দৃঢ়বদ্ধতার ফলেই এটা সম্ভব। বইটিকে মাথার দিকে, নিচের দিকে পাশের দিকে যেভাবেই রাখা হোক না কেন পড়ে যাবেনা বা হেলে পড়বেনা।

দপ্তরীর কাজের প্রথম ধাপ প্রস্তুতিপর্ব। ইংরেজিতে অনেক ক্ষেত্রে Pre-forwarding বলা হয়। ছাপাখানা থেকে ফর্মাগুলো দপ্তরীর কাছে এলে পর সেগুলিকে উপস্থাপন দৃষ্টে ভাঁজ করে দপ্তরচিহ্ন মিলিয়ে সাজিয়ে এবং ছবির পাতা থাকলে জায়গামতো সেগুলিকে বসিয়ে নেওয়া হয়। শুধু দপ্তরচিহ্নই নয়। একটার পর একটা গুচ্ছ রেখে দপ্তরী তার প্রত্যেকটির পুটের দিকে চিহ্ন দিয়ে নেন, তা নইলে হয়তবা বাঁধাবার সময়ে বারবার দপ্তরচিহ্ন মেলাবার ঝামেলা পোয়াতে হবে। পৃষ্ঠা মিলিয়ে দেখে বাঁধানোও দপ্তরীর কাজের পক্ষে অসুবিধাজনক। এই পর্বে গোলমালের ফলে আমরা প্রায়ই এমন সব বই দেখতে পাই যার ফর্মা ওলট পালট হয়ে গিয়েছে, বা দ্বিগুনিত হয়েছে কিম্বা বাদ পড়ে গিয়েছে। যদি পুরোনো বই হয় তাহলে দপ্তরী মলাট থেকে বইটি আলগা করে নেন এবং সেলাইগুলো খুলে ফেলেন। কোনো পাতা জখম থাকলে সেগুলো সরিয়ে নেন। তারপরে সমস্তটা উপরোক্ত পদ্ধতিতে আবার সাজিয়ে নেন।

দ্বিতীয় ধাপে সেলাই (sewing)। উপরোক্ত ভাবে পত্রগুচ্ছ সাজানোর পরে ধারাবাহিক ভাবে একটির পর একটি গুচ্ছের মধ্যে সুতো ফুঁড়ে

সেলাই করার কাজ কয়েক রকমে সম্পন্ন হ'তে পারে। বাঁধাইকে নমনীয় বা সম্প্রসারণশীল করবার জন্য যে কায়দায় সেলাই করা হয় তা'কে দপ্তরীর বলেন 'জুস' বা 'তশমা' সেলাই। ইংরেজিতে kettle stitch প্রচলিত। আমরা কাগজ কিনে ভাঁজ করে যে ভাবে খাতা সেলাই করি প্রায় সেই ধরনের সেলাই। ছুঁচের মধ্যে লম্বা সুতো পুরে নিয়ে এককেটা করে ফর্মা সাধারণত ছয় ফোঁড় দিয়ে সেলাই করা হয়। একটা ফর্মা সেলাই হয়ে গেলে সেই একই সুতো চালিয়ে পরবর্তী ফর্মা সেলাই করা হয়। এইভাবে সবগুলি ফর্মা একই সুতোতে বাঁধা হয়ে সামগ্রিক আকার নেয়। সেলাই চালানোর আগে বইয়ের পুটের (spine দুই ধার থেকে সমান দূরত্ব রেখে আড়াআড়ি ভাবে দুই টুকরো দড়ি বা পাকানো মোটা সুতো রেখে তার উপর দিয়ে সেলাই চালানো হয়। দড়ির বদলে ফিতেও দেওয়া হয়। এই ফিতের খণ্ডকে দপ্তরীরা বলেন 'তশমা'; যে জন্য এই সীবন পদ্ধতিকে বলে তশমা সেলাই। এই তশমার কাজ মলাটের সঙ্গে বইটিকে এঁটে রাখা। যদি তশমা হিসেবে দড়ির খণ্ড ব্যবহৃত হয় তাহলে সেলাই এর কাজ দু'রকমের হয়ে থাকে। প্রথমটির সম্প্রসারণশীলতার গুন বেশি। এক্ষেত্রে দড়িটি পুটের বাইরে উঁচু হয়ে বেরিয়ে থাকে এবং বাঁধাবার পরে কয়েকটি গাঁটের মতো তৈরি হয় পুট জুড়ে। গাঁট যাতে না পড়ে তার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে দপ্তরীরা পুটের গুচ্ছগুলির যেখানে যেখানে তশমার দড়ি থাকে সেখানে সেখানে আড়াআড়িভাবে করাত চালিয়ে সামান্য কেটে দেন, যাতে দড়িটি গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখা যায়। এভাবে সেলাই করলে পুট মসৃন হয়, কিন্তু পাতাগুলি কিছুটা জখম হয়। উপরন্তু কোনোরকমে যদি একটি সুতো কেটে যায় তবে সবটাই সহজে খুলে যেতে পারে। তবে বই এ নাম খোদাই করতে এবং বর্তুলাকার পুট প্রস্তুতিতে এটি উপযোগী।

তশমার কাজ যদি ফিতে দিয়ে করা হয় তাহলে তজ্জনিত পুটের উচ্চতা, অর্থাৎ গাঁটের ভাবটা কমে যায়। ফিতের উপর দিয়ে সেলাই চালানো হয়, এবং এই তশমার বাঁধাই খুব মজবুত হয়।

বই বাঁধাই এর আরেক রকম সেলাই প্রচলিত আছে, যা'কে বলে 'লেপটা' (stabbing)। যেসব বই এর ভাঁজের দিকে, অর্থাৎ পুটের দিকের কাগজ জীর্ণ হয়ে যাবার জন্য বা অন্য কোনো কারণে 'জুস'

সেলাই এর অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে সেগুলির উপর থেকে নিচে ফোঁড় দিয়ে সেলাই করতে হয়। এই পদ্ধতিতে তশমার কাজ করে বাড়তি সুতো, কেননা ভিতের দিকে সেলাই থাকেনা বলে কাপড়ের টুকরো ধরে রাখার উপায় থাকেনা। এই প্রক্রিয়ায় বাঁধানো বই স্বচ্ছন্দভাবে খুলে রেখে কাজ করা যায় না, জোর করে খুলে ধরবার ফলে সেলাই বা কাগজ ছিঁড়ে যাবার ভয় থাকে। ফলে বিশেষ টেঁকসই হয়না। তবে প্রতিটি গুচ্ছের বা পাতার পিঠে কাগজ সেঁটে নিয়ে 'জুস' সেলাই করা যেতে পারে, – বিশেষত পুরোন বই এর ক্ষেত্রে।

সীবনকর্মের পরের ধাপকে বলতে পারি গ্রন্থনের পরিপূরক পর্ব (forwarding)। এর প্রথমেই গ্রথিত গ্রন্থের সামনে ও পিছনে পুস্তানি (end papers) লাগানোর কাজ। বেশ শক্ত ও ছেঁড়েনা এমন কাগজই পুস্তানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর সাহায্যে সেলাই এর কঙ্কালটা যেমন ঢাকা পড়ে তেমনি তশমাকেও শক্ত ভাবে ধরে রাখে। নূতন বই এর বাহার আনবার জন্য প্রকাশকরা আজকাল এই পুস্তানিকে কেবলমাত্র সুদৃশ্যই করেন না বই এর অঙ্গ হিসেবেও কাজে লাগান। কেউ বা প্রকাশন সংস্থার নামই নকসা করে ছাপান। কেউ বা বিষয়বস্তুর সহায়ক মানচিত্র, রেখাচিত্র, তথ্য তালিকা ইত্যাদিও এখানে মুদ্রিত করেন। এরপরে বইটিকে চাপযন্ত্রে রেখে বা হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে পোক্ত করা হয়। তার পরে বই এর উপর নিচ ও পাশের দিকের বাড়তি অসমান কাগজের অংশগুলিকে ছেঁটে দিয়ে পুটের দিকটা উপরে রেখে দু'পাশ থেকে চেপে ধ'রে পাতলা করে আঠা লাগানো হয়। আঠা এমনভাবে লাগানো উচিত যাতে তার কিছুটা প্রত্যেক গুচ্ছের ফাঁকে ঢুকে পড়ে, কেননা এতে বাঁধাই এর কাজ আরেকটু পোক্ত হয়ে ওঠে। আঠা যখন প্রায় শুকিয়ে এসেছে তখন সুরু হয় পরবর্তী ধাপের ক্রিয়া।

পরবর্তী প্রক্রিয়া গ্রন্থ পুটের বর্তুলীকরণ (rounding) এবং পুট পেষন (backing)। পরিপূরক পর্কের এই দুই সমাপ্তি প্রক্রিয়া গ্রন্থনের সুচারু রূপায়ণে বিশেষ প্রয়োজনীয়, এবং এর নৈপুণ্য প্রণিধানযোগ্য। বর্তুলীকরণের জন্য বইটিকে টেবিলের উপরে শুইয়ে রেখে বাঁ হাত দিয়ে পত্রগুচ্ছগুলিকে বই এর খোলা ধারের দিকে আকর্ষন করতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পুটের দিকেও হাল্কা ভাবে হাতুড়ির ঘা মেরে যেতে

হয়। এভাবে বই এর দুই ধারেই ঘা মেরে দিলে পুটের চেহারাটা হয় গোলাকৃতি; শুধু পুটেরই নয়, অপর দিকেরও পুটটি উত্তল (Convex) এবং ধারটি অবতল (Concave) আকার নেয়। এর ফলে বাঁধানো বইটিকে খোলা ও বন্ধ করার কাজ সহজ হয়, পত্রগুচ্ছে কোনোরকম চোট লাগেনা। এই বর্তুলতা বই এর পুরুত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে করাটাই দপ্তরীর নিপুনতা। পুট-পেষণের কাজও এরই পরিপূরক। এজন্য বইটির দু'পাশে মাটাম লাগিয়ে পুটের দুধার পিটিয়ে ঢালু করে নেওয়া হয়। মাটাম দুপাশে লাগিয়ে চাপযন্ত্রে রেখে পুটের মাঝামাঝি জায়গা থেকে হাতুড়ি. পিটিয়ে পিটিয়ে পাশ পর্যন্ত নিয়ে আসতে হয়। যার ফলে পুটের দুই ধার কানার মতো উঁচু হয়ে পাশের দিকে ঝুঁকে পড়ে। পুটের বর্তুলতা যাতে স্থায়ী হয় সেজন্যই এই পেষণের কাজ। এবং এই অবস্থায় মলাটের পাটা লাগালে সেটি উপরোক্ত কাণার খাঁজে বসে যায়। বাঁধাইকে জখম করে না।

এবারে মলাটের পাটা (    ) লাগাবার কাজ। বই এর যা মাপ তার চেয়ে পাটা সামান্য বড় হয়,—উপর, নিচ ও পাশে একটু বাড়তি অংশ থাকে। এই বাড় কতটুকু রাখা শোভন তারও আন্দাজ আছে,—পাটা যতটা পুরু বাড়ও প্রায় সেটুকুই রাখা হয়। মোটাসোটা বই বাঁধাবার জন্য খুব পুরু পাটা নিলে পর অনেক সময় এই বাড় অংশটুকু ঢালু (bevel) ক'রে দেওয়া হয়। পাটা লাগাবার কায়দা সেলাই এর ধরণের উপরে নির্ভর করে। যদি দড়ির তশমা হয় তাহলে পুটের দিক থেকে আধ ইঞ্চি এবং পৌনে এক ইঞ্চি মতন দূরত্বে পাটার মধ্যে দুটি ফুটো করা হয় সমান্তরাল ভাবে, এবং পুট থেকে প্রথম ফুটো পর্যন্ত হালকা ভাবে খাঁজ কেটে দেওয়া হয়। তারপরে দড়িটি পুট থেকে পাটার বাইরের দিক দিয়ে নিয়ে ঐ খাঁজ বরাবর প্রথম ফুটোর মধ্যে ঢুকিয়ে সেটিকে টেনে ভিতর দিক দিয়ে দ্বিতীয় ফুটোর মধ্যে দিয়ে পার করে বেশ করে চেপ্টে নিয়ে আঠা দিয়ে লেপ্টে দিতে হয়। এবং হালকা হাতুড়ির ঘা মেরে যথা সম্ভব মসৃণ করে দেওয়া হয়।

তশমা যদি ফিতের হয় তাহলে সাধারণ নিয়মে পুটের দিকের পাটায় ফিতের অবস্থান অনুযায়ী ফেঁড়ে দিয়ে তার মধ্যে ফিতাটি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। পাটার চওড়া দিকের এক তৃতীয়াংশ মতো দূরত্ব পর্যন্ত

এই ফাঁড় চালানো হয়ে থাকে। ফিতেটি এর মধ্যে পুরে আঠা দিয়ে চেপে এঁটে দিতে হয়।

গ্রন্থন পর্ব সমাপ্ত করতে এবারে চামড়া, কাপড়, কাগজ বা রেক্সিন দিয়ে পাটা মুড়ে দেবার কথা। কিন্তু তার আগে আরো কয়েকটি বিশেষ ক্রিয়া আছে। তার মধ্যে ছোটখাট একটি হল পুটের মাথার আর নিচের দিকে শিরজা (band, —head band, tailband) লাগানো। চামড়ার বাঁধাই-এর ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন বেশি। পাতলা একখণ্ড চামড়াকে কাপড় দিয়ে—বিশেষ ক'রে সুদৃশ্য রঙীন রেশমের বস্ত্রখণ্ড দিয়ে মুড়ে পুটের মাথায় এবং নিচে বাঁধাইএর সঙ্গে সেলাই ক'রে লাগিয়ে দেওয়া হয়। শিরজা সাধারণত মূল বইএর থেকে একটু বেরিয়ে থাকে, —বাঁধাইএর ডগা পর্যন্ত। শিরজা লাগানোর ফলে শুধু যে পুটাগ্রভাগ দেখতে সুন্দর হয়,শুধু যে পুটাভ্যন্তর আড়াল করে সৌন্দর্য বিধান করে তাই নয়, এর ফলে বাঁধাই পোক্ত হয়। তাক থেকে আঙ্গুলে করে বই টেনে বার করতে গেলে বাঁধাইটা ছিঁড়ে যাবার ভয় থাকেনা।

এত সব কাণ্ড কারবার করবার পরে, জোড়াতালি লাগাবার ফলে পুটের চেহারাটা বেশ এবড়ো-খেবড়ো হয়ে যায়। তাই প্রয়োজন অনুযায়ী এক বা একাধিক পাতলা কাগজ আঠা দিয়ে সেঁটে দেওয়া হয় পুটের পিঠে। তারপরে বাঁধাইএর সমাপ্তি পর্ব, —মলাটের আবরণ লাগানো।

পুটের পিঠে তিন প্রকার পদ্ধতিতে মলাট মোড়া যায়। প্রথম প্রক্রিয়ার ফলে পাই নমনীয় বা সম্প্রসারণশীল (flexible) পৃষ্ঠ। এই প্রক্রিয়ায় পুটের আস্তরণ (lining) পুরোপুরি বইএর গায়ে সেঁটে দেওয়া হয়। মলাট চামড়ার না হ'লে এই পদ্ধতি কার্যকর হয় না। বই খোলা বন্ধ করার ব্যাপারে এটি সবচেয়ে সুবিধের, ইচ্ছেমতো যে কোনো পাতা সম্পূর্ণ খুলে রাখা যায়, পুটও এর ফলে জখম হয় না। টেঁকসই হ'লেও এই প্রথার ফলে বই এর আকৃতি অসুন্দর হয়ে যেতে পারে, কেননা খোলা অবস্থায় পুটের চেহারা হয় অবতল। এবং এরই ফলে পুট পৃষ্ঠে নাম খোদাই করা হ'লে তাও নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

দ্বিতীয়, ফাঁপা (hollow) অথবা মুক্ত (open) পুট-পৃষ্ঠের বাঁধাই। এই পদ্ধতিতে সম্প্রসারণ শীলতার গুণও থাকে এবং নাম খোদাই করবার উপযোগীতাও আছে। খুব শক্ত কাগজ দিয়ে, —পুট-প্রস্থের তিনগুণ মতো শক্ত পাল্লার কাগজ দিয়ে এই আবরণ তৈরি ক'রে পুটের দুই প্রান্তে এমন ভাবে লাগানো হয় যাতে ফাঁপা নলের মতো আকার নেয়। বইটি খুললে বইএর

গুচ্ছগুলি অবতল সৃষ্টি করে, আবরণ অনেকটা উত্তল ভঙ্গিতে থাকে। পূর্বোক্ত পদ্ধতির মতো আবরণ ভাঁজ হয়ে যায় না বলে পুটের খোদাই (tooling) অক্ষত থাকে।

তৃতীয়, আঁট বা জমাট পুট-পৃষ্ঠের (tight back) বাঁধাই। বাঁধাই হিসেবে সবচেয়ে নিকৃষ্ট, কেননা এর নমনীয়তা গুণ প্রায় শূন্যের কোঠায়, তবে জলজলে হয়ে থাকে অক্ষত খোদাই করা নাম। এতে বইএর পিঠ-জুড়ে আঠা লাগিয়ে পুটে-পিঠে এক ক'রে জুড়ে দেওয়া হয় আবরণ সমেত। ফলে বই পোক্ত হয় কিন্তু খুলতে পড়তে অসুবিধে, যা'র ফলে টানাটানির চোটে সেলাই ছিঁড়ে যেতে পারে।

বাঁধাই এর শেষ ধাপ মলাট লাগানো। মলাট বা পাটা ঢাকবার আবরণ সাধারণত কাপড়ের বা চামড়ার হয়ে থাকে। পাটাটিকে মসৃণতা দেবার জন্য প্রথমে এর উপরে কাগজ সেঁটে দেওয়া হয়। তারপরে চামড়া বা বস্ত্র খণ্ড উভয় পাটা এবং পুট সমেত মাপ অনুযায়ী কেটে নেওয়া হয়। পাটার চেয়ে আবরণ মাপে কিছুটা বাড়তি রাখা হয়, কেননা এটিকে পাটার ভিতরের দিকে মুড়ে দিতে হবে। এই ভাবে আবরণ আঠা দিয়ে লাগিয়ে তারপরে ভিতরের দিকে যেটুকু মোড়া হয়েছে সেটুকু সমেত পাটার ভিতরের দিকটা পুস্তানি দিয়ে ঢেকে সেঁটে দেওয়া হয়। এর ফলে পাটার অভ্যন্তরভাগ যেমন হয়ে ওঠে মসৃন তেমনি আবরণকে ধ'রে রাখে বইএর সঙ্গে। বাঁধানো বইএর পাটা ও পুটের সংযোগস্থলে একটি খাঁজ থাকে, এই খাঁজ থাকবার ফলে পাটা পুটের উপরে চাপ সৃষ্টি না ক'রে সহজে খুলে ধরা চলে। এই জোড় French joint নামে পরিচিত। আবরণ লাগানো হবার -পরে আঠা শুকিয়ে যাবার আগেই উক্ত সংযোগে একটি সুতো ক'সে বেঁধে দেওয়া হয়। আঠা শুকিয়ে যাবার পর সুতোটি খুলে ফেলে বইটিকে চাপ-যন্ত্রে রাখা হয়। চাপ দিলে পর বইটির ফুলে-ফেঁপে ওঠা বন্ধ হয়ে যায়।

বইএ নাম খোদাই, অর্থাৎ সোনার জলে নাম খোদাই (Gold tooling করার সহজ পদ্ধতি ডিমের শ্বেতাংশ জলে অথবা, সির্কায় (Vinegar) ফেটিয়ে নিয়ে সেই প্রলেপ বইএর পিঠে--যেখানে নাম লেখা হবে সেখানে লাগিয়ে নিয়ে তা'র উপরে সোনার পাত এঁটে দিতে হয়। লিখিতব্য অক্ষর, — মুদ্রণের হরফের মতো ধাতব অক্ষর গরম ক'রে ঐ সোনার পাতের উপরে চাপ দিলে বইএর গায়ে মুদ্রিত হয়ে যায়।

আজকাল পুস্তক প্রস্তুতির অন্যান্য পর্বের মতো বই বাঁধাবার জন্যও যন্ত্রের আবিষ্কার হয়েছে। ফর্মা ভাঁজ করা থেকে সুরু ক'রে সেলাই, মলাট লাগানো প্রভৃতি পর্ব-যন্ত্রের সাহায্যে সম্পন্ন হচ্ছে।

## মলাটের মাল মশলা

মলাটের আবরণের প্রধান উপকরণ কাপড় এবং চামড়া, —বিশেষত পুরোনো ছেঁড়া বই বাঁধাবার ব্যাপারে। তবে প্রকাশকরা, বিশেষ ক'রে বিদেশী প্রকাশকেরা আজকাল পাটায় বাঁধানো বইএর উপরে কাপড়ের মলাটই ব্যবহার করছেন। আজকাল কাপড়কে নানান রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উন্নত মানের ক'রে তোলা হচ্ছে। এমনকি কোনো কোনোটি চামড়ার কাছাকাছি যেতে পারে। রেক্সিন এর মধ্যে অন্যতম। 'বাক্‌রাম' (Buckram) কাপড় 'কেম্বিস' (Canvas) কাপড়ের মতো শক্ত হয়।

বাঁধাইএর চামড়ার জন্য শূকর এবং ভেড়া বা ছাগলের চামড়াই ব্যবহৃত হয় বেশি। সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত মরক্কো (Morocco) চামড়া নাইজেরিয়ার ছোটখাট ছাগলের চামড়া। তুর্কী ছাগলের চামড়াও স্বাভাবিক ভাবে দানাদার হয়ে থাকে ব'লে একাজে বিখ্যাত। চামড়ার মরক্কো নামটাই সাধারণ ভাবে চলে এসেছে কেননা মধ্যযুগ থেকেই ছাগলের চামড়া মরক্কো থেকে ইউরোপে চালান যায়। শূকরের চামড়া সবচেয়ে বেশি টেঁকসই, কিন্তু রং লাগলেই তা'র এই গুণ চলে যায়। তাছাড়া খুব কড়া আর শক্ত হয় বলে অধিক ব্যবহারে ভেঙ্গে বা ফেটে যেতে চায়। তবে মোটা মোটা বই বাঁধবার পক্ষে এটি উপযুক্ত। এবং রঙ-ছুট অবস্থায় রাখলেও এর স্বাভাবিক রংটাই দেখতে মন্দ লাগেনা, অনাড়ম্বর আভিজাত্যের একটা ছাপ যেন থাকে।

গরু বা বাছুরের চামড়া ছাগলের চামড়ার মতো টেঁকসই হয় না ব'লে এর প্রচলন বড় বেশি নেই। তবে এই চামড়া খুব মসৃন হয় বলে নাম খোদাই চমৎকার হয় – যে গুণ শূকরের চামড়ার নেই। ভেলমের চলনও সীমিত, কেবলমাত্র শখের বা পোশাকী বাঁধানোর জন্যই এর যা কিছু সমাদর। এটি খরচ সাপেক্ষ ব্যাপার। শক্ত করবার জন্য স্বতন্ত্র আস্তরন লাগাতে হয়, সোজা-ভাবে থাকে না কুঁকড়ে যেতে চায়, তাই কোণাগুলি শক্ত করতে হয়। তাছাড়া বেশি আলোবাতাস লাগালেই ভঙ্গুর হয়ে যায়।

ভেড়ার চামড়া খুব নরম এবং মসৃন। টেঁকসইও হয় মন্দ না। নাম খোদাই এর কাজও হয় ভাল। তবু এটি গ্রন্থন জগতে বিশেষ চালু নয়।

কাপড় বা চামড়া যা'তেই বাঁধানো হোক না কেন, তা'তে মলাটের কতটা ঢাকা পড়বে তার হিসেব আছে। দপ্তরীদের ভাষায় পুরো আধা বা আট-আনি, পৌনে বা বারো-আনি, সিকি বা চার-আনি বাঁধাই। পুরো চামড়ার (Full leather) বাঁধাই অর্থে সমগ্র বইটিই মুড়ে দেওয়া হবে চামড়ায়। ঠিক তার অর্ধেক চামড়া ব্যবহার করলে হবে আধা বা আট-আনি চামড়ার (Half leather) বাঁধাই। এর অর্থ কিন্তু এই নয় যে একটা দিক সবটাই চামড়ায় আবৃত থাকবে। আরেকটা দিক হবে চর্ম-ছুট। বাঁধাই বলতে পুট ঢাকা থাকবে চামড়ায়, এবং দুদিকের মলাটেরই সাকুল্যে চারটি কোণও মোড়া থাকবে চামড়ায়। এই সবটুকু মিলে পুরো মাপের অর্ধেক চামড়া। ঠিক তেমনি হিসেব হবে বারো-আনি (three quarter) চামড়ার ক্ষেত্রে, —যেখানে চারটি কোণা ছাড়াও পুটের আবরণ হবে একটু বেশি চামড়ায়। চার-আনি বা সিকি (quarter) চামড়ার বাঁধাইএ শুধু পুটটুকুই চর্মাবৃত হবে উক্ত মাপমতো, কোণাগুলি থাকবে চর্ম-ছুট। আজকাল বোধকরি পৌনে, সওয়া, সিকি এই সকল আখ্যা লোপ পেয়ে যাবে। বারো আনি, আট আনির ও সেই একই হাল হবে। সুতরাং অর্ধ, তিন-চতুর্থাংশ, এক-চতুর্থাংশ ইত্যাদি উক্তিই বোধকরি প্রযোজ্য।

সংরক্ষণের জন্য বই বাঁধাবার সঙ্গে সঙ্গে বই সারাবার দরকার হবেই। বাঁধাই খুলে ফেলে আবরণ আর সেলাই সব ফেলে দিয়ে নূতন করে না হয় লাগানো গেল, কিন্তু পাতাগুলিতো বদলানো যাবেনা, —সেগুলো রাখবার জন্যইতো বাঁধাবার প্রয়োজনীয়তা। ছেঁড়াপাতা, ঝুরঝুরে পাতা, আলগা হয়ে আসা পাতা ছবি,—এসব সারাতে হয়, অথচ লক্ষ্য রাখতে হয় যেন অক্ষরগুলি ঠিক মতো বজায় থাকে। এজন্য পাতলা স্বচ্ছ কাগজের প্রয়োজন। এ কাগজ বাছাই করে নিতে হয়, সব স্বচ্ছ কাগজেই কাজ হয় না। একটু তেলতেলে ভাব থাকলে ভাল। নচেৎ হাওয়া পেয়ে কুঁকড়ে পাতাটাকেই নষ্ট করে দেবে। এই কাগজ কোন আঠা দিয়ে লাগানো হবে তাও বেছে নেওয়া আবশ্যক। গঁদ জাতীয় আঠা দিয়ে লাগালে কাগজ কুঁকড়ে যাবে। ময়দার আঠা পাতলা করে লাগলে কাজ চলে, দেখা গিয়েছে। তবে পুরানো পাতায় কেবলমাত্র ছিন্ন অংশে বিচ্ছিন্নভাবে

তাপ্পি লাগালে ফল খারাপ হয়, ছেঁড়া এবং পুরো অংশগুলির তাগদে অসামঞ্জস্য এসে যায়। পাতা ঝুরঝুরে বা ভঙ্গুর হয়ে গেলে সংরক্ষণের জন্য সমগ্র পাতাটির দু'ধারেই স্বচ্ছ কাগজ সেঁটে দিতে হয়। এই অবলেপন পাতার গোড়া পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া আবশ্যক,—যাতে সেলাইএর ফোঁড়ও তালি দেওয়া কাগজের উপরেই পড়ে। বিশেষ প্লাষ্টিক কাগজের স্তরে আজকাল এই মেরামতির কাজ নিপুনভাবে করা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়াকে ইংরেজিতে বলে 'ল্যামিনেশন' (Lamination)। আমেরিকা প্রভৃতি দেশে একাজের জন্য বিশেষ ধরণের আঠা লাগানো কাগজের তা কিনতে পাওয়া যায়।

এতক্ষণ যেসব বাঁধাই এর কথা বলা হল তা গ্রন্থাগারের প্রযোজনেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু বাজারে প্রথম যখন বই বেরোয় তখন প্রকাশক একরকম করে বাঁধিয়ে বিক্রি করেন। প্রকাশকের বাঁধাই এর পদ্ধতিও মূলত অভিন্ন। তবে এর উপরের আবরণ,—তা কাগজের হোক বা কাপড়ের হোক,—নক্সা বা ছবি সমেত মুদ্রাযন্ত্রে ছাপা হয়ে দপ্তরীর কাছে যায় ফর্মাগুলিরই মতো। আজকাল বেশির ভাগ বই বিশেষ করে বাংলা ভাষায় লেখা,—এবং ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী রাজ্যেও, —স্রেফ কাগজের মলাটে, কাগজের আবরনীতে এবং কাগজেরই পুট পৃষ্টে বাজারে বেরোচ্ছে। এসব বইএর চটক আছে। কিন্তু দু'দিনেই ছিঁড়ে খুঁড়ে যায়,—হাড় পাঁজরা সব বেরিয়ে পড়ে। অবিলম্বে আবার বাঁধাতে হয়। এইভাবে প্রকাশক মহল গ্রন্থাগারের উপরে অনিবার্য বাড়তি খরচের বোঝা চাপিয়ে দেন। দ্বিতীয় আরেক ধরনের শস্তা বই এ বাজার ছেয়ে গিয়েছে। কাগজের মলাট (Paper back) সংস্করণের বই। সর্বসাধারণের পকেটের অনুকূল এই বই এর আবির্ভাব উনবিংশ শতাব্দিতেই ঘটে। এখন এর প্রচার বহুল ও বিচিত্র ধরণের। এই বই গ্রন্থাগারের পক্ষে অনুকূল না হলেও সংগ্রহ করতেই হয়। এর গ্রন্থনে সেলাই থাকেনা। যন্ত্রের সাহায্যে মুদ্রিত পত্রগুচ্ছগুলির পুট পৃষ্ঠ কেটে প্রত্যেক পাতাকে স্বতন্ত্র করে বিশেষ ধরনের আঠা লাগিয়ে কাগজের মলাট সেঁটে দেওয়া হয়। এ বই এর জোড় খুলে গেলে বাঁধানোর সমস্যা দেখা দেয়। লেপটা সেলাইএ গুচ্ছ করে বাঁধানো চলে। অথবা আবার আঠা দিয়ে সেঁটে দেবার ব্যবস্থা করাও অসম্ভব হয়না। বস্ত্র খণ্ড দিয়ে পুট তৈরী করে

নিয়ে বাঁধানোও চলে ক্ষেত্রবিশেষে। বিংশ শতাব্দির পুস্তক প্রকাশন বিচিত্রতর হয়ে উঠেছে। স্বতন্ত্র পাতার গুচ্ছে আঠা না লাগিয়ে সেলাই না করে তার বা প্লাষ্টিকের পাত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বই গ্রথিত হচ্ছে। এগুলি যখন ব্যবহারে ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে তখন লেপটা সেলাই করে বাঁধানো ছাড়া গত্যন্তর থাকেনা।

## (খ) বইএর বিষয় মূল্য বা রসরূপ

এতক্ষন যেসকল কথা বলা হ'ল তা' বই এর বহিরঙ্গের কথা। বইটা সাজিয়ে গুছিয়ে তৈরী হয়ে এল পাঠকের হাতে। বিভিন্ন ধরণের এবং বিচিত্র রকমের বিষয় নিয়ে লেখা সব বই। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, -কল্পনার বিচিত্র চিত্র, ব্যবহারিকতার রকমারি সমাবেশ। এত কথা মানুষ কেন লেখে, কার জন্য লেখে ভাবতে গেলে খেই হারিয়ে যায়। বই-পত্তর না লিখলে—না পড়লে মানুষের কি চলতনা? আদিম যুগের মানুষের কি দিন কাটত না? এখনো পৃথিবীর অ-স্বাক্ষর ব্যক্তিরা কি অ-সার্থক? তাহলে খেয়ে পরে বেঁচে থাকাই যদি উদ্দেশ্য, অথবা প্রধান ব্যাপার তবে আর এত সমস্যা হাজির করা কিসের জন্য? 'নেই কাজ তো খই ভাজ,'—মানুষ বুঝি অপরিহার্য কোনো কাজ নেই বলে সময় কাটাবার জন্য রাজ্যের যত কাজ জুটিয়ে নিয়েছে। আসলে মানুষ জন্মেছে একটা মগজ নিয়ে; মাথাটা শুধু ধড়ের উপরে বজায় রেখেই সে নিশ্চিন্তভাবে দিন কাটাতে পারছে না। তাই একটার পর একটা কৌতূহল মিটিয়ে চলে সে, জটিল পথে পা বাড়ায় আর স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনের রাস্তা খুঁজতে থাকে।

ব্যক্তি হিসেবে স্বতন্ত্র হয়ে মানুষ কেন পশুরাও বাঁচতে পারেনা। যুথবদ্ধ হয়ে চলে,—তা যে কারণেই হোক। যুথবদ্ধ মানুষ গোষ্ঠীর সৃষ্টি করেছে সমাজের সৃষ্টি করেছে, সার্বিক উন্নতির জন্য চিন্তা করেছে, সে উন্নতি আত্মিক, ব্যষ্টিক এবং সামগ্রীক। এই চেষ্টা থেকেই সে বিশ্বরহস্যের মীমাংসা করছে, ভগবানের কাছাকাছি গিয়ে পৌছাচ্ছে। আকাশ, বাতাস, জল—সবকিছুকে কাজে লাগাচ্ছে, গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে পাড়ি দিচ্ছে। অন্যান্য প্রানীর হয়তো বুদ্ধি থাকে। মনেও থাকে, কিন্তু

মানুষের মতো বুদ্ধি আর মনকে মিলিয়ে ধারাবাহিক চিন্তার,—সেই চিন্তাকে রূপ দেবার ক্ষমতা থাকেনা। মানুষ চিন্তা দিয়ে যুক্তি দিয়ে বুঝে শুনে পথ চলে। একজনের অভিজ্ঞতার ফল জেনে নিয়ে বহুজন পথ চলবার নিশানা পায়। কেবলমাত্র খাওয়া পরার স্বাচ্ছন্দ্য নিয়েই মানুষ তৃপ্ত নয়। তার পেট ভরে তো মন ভরেনা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু সে জানতে চায়, সব কিছুকে জয় ক'রে নিতে চায়। ভগবানকে ছুঁতে চায়, ভগবানের সমকক্ষ হয়ে উঠতে চায়। আত্মার উন্নতি,—সার্বিক উন্নতি তার লক্ষ্য। তাই তার জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত সীমাহীনভাবে মহাবিশ্বের রহস্য জানতে গিয়ে বিজ্ঞানের সৃষ্টি করছে। আত্মার রহস্য জানবার জন্য সৃষ্টি করেছে দর্শনের, সাহিত্যের। বস্তুকেন্দ্রিক জ্ঞান আহরণের সঙ্গে সঙ্গে অতিবাস্তব রহস্য উদ্ঘাটনের চিন্তাও তাকে অধিকার করেছে। এইভাবেই সৃষ্টি হয়েছে জ্ঞানের দুই বাহুর। প্রজ্ঞান ও বিজ্ঞান একদিকে ধর্ম, দর্শন, সমাজনীতি, ভাষা ও সাহিত্য, অন্যদিকে গণিত জ্যোতিষ, রসায়ন, প্রভৃতি বিজ্ঞান শাস্ত্র। একটিতে তার আত্মার বিকাশ, চিন্তার স্পর্ধা, অন্যটিতে তারই ব্যবহারিক প্রয়োগ।

মানুষ নিজের চিন্তার প্রয়োগে এবং অভিজ্ঞতা প্রসূত জ্ঞানে যা করে তা আর পাঁচজনকে জানাতে চায়, পাঁচজনকে তার ভাগ দিতে—পাঁচজনকে নিয়ে ফল ভোগ করতে চায়। পুরাকালে এই জানা এবং জানানোর একমাত্র উপায় ছিল মুখেমুখে প্রচার,—স্মৃতি শক্তির উপরে নির্ভরতা। তারপরে যখন ভাষার লিখিত রূপের সৃষ্টি হ'ল তখন থেকে একের লিপিবদ্ধ জ্ঞান অনেকের কাজে লাগল। এযুগে বই এর কল্যানে পৃথিবীর যেকোনো অঞ্চলের মানুষের চিন্তালব্ধ ফল অনায়াসেই ছড়িয়ে পড়ছে সারা পৃথিবীতে।

কিন্তু লেখকের চিন্তায় যাকিছু উদয় হয় তাই কি তিনি লিখবেন,—প্রচার করবেন? না কি যা লিখবেন তাই সকলে পড়বে, মেনে নেবে? লেখক নিজের মনে যা খুশি চিন্তা করতে পারেন, এমনকি নিজের তৃপ্তির জন্যে যাখুশি লিখতেও পারেন, কিন্তু সেই লেখা ছাপাবেন, পাঁচজনের সামনে তুলে ধরবেন, তখন পাঁচজনের গ্রহণযোগ্যতার কথা, গ্রহণের ঔচিত্যের কথা, মঙ্গলের কথা,—অর্থাৎ সমাজের কথা মনে রাখতে হবে। এই ভাবে লেখকের সঙ্গে সমাজের যোগ। লেখকমাত্রেই তাই সমাজসেবী। লেখক

যেমন সমাজের কথা চিন্তা করেন, সমাজকে গ'ড়ে তোলার দায়িত্ব বহন করেন সমাজও তেমনি লেখককে গ'ড়ে তোলে। সমাজ তার পরিবেশ দিয়ে লেখককে পোষণ করে। সমাজ নিঃশব্দ দাবীতে লেখকের মুখাপেক্ষী। লেখক বিজ্ঞান বা দর্শন শিল্প বা সাহিত্য যে বিষয় নিয়েই লিখুন না কেন, তার মূল ধারা সমাজমুখী। জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক এই সমাজবোধ তাঁর মধ্যে কাজ করে। তাঁর নিজস্ব উপলব্ধির সঙ্গে সমাজের যোগ, কেননা সে নিজেও সমাজেরই অংশ।

এবং এই একই সমাজবোধ বা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গ্রন্থাগারিক তার গ্রন্থাগারস্থ গ্রন্থরাজি ব্যক্তিবিশেষের জন্য স্তরে স্তরে বিন্যস্ত করে রাখেন। গ্রন্থাগার ব্যক্তিকে মর্যাদা দেয়, ব্যক্তির বিকাশের সহায়ক গ্রন্থসম্ভার নিয়ে তার কাছে উপস্থিত থাকে। গ্রন্থাগার ছাড়া এমন আর কোনো প্রতিষ্ঠান নেই যা সামাজিক এবং ব্যক্তিক চিন্তার সমগ্র খোরাক জনসাধারণের দরবারে এনে হাজির করে।

## (১) জ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ (Classification of knowledge)

বিভিন্ন বই এর স্বরূপ বিচার করে বিষয়ানুযায়ী তার শ্রেণীবিভাগের চেষ্টা বহুকালের। সুপ্রাচীন যুগ থেকেই পণ্ডিতেরা সমগ্র জ্ঞানমণ্ডলকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করবার চেষ্টা করে এসেছেন। আমাদের শাস্ত্রে বলেছে বিদ্যার দুই বিশদ শ্রেনী, পরাবিদ্যা এবং অপরাবিদ্যা। পরাবিদ্যা শ্রেষ্ঠবিদ্যা, যেমন ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি। অপরাবিদ্যা প্রাকৃতবিদ্যা বিবিধ পার্থিব বিষয় সংক্রান্ত। তার পরের ব্যাখ্যানে শাস্ত্রকারেরা বললেন ত্রিবর্গ জ্ঞানের কথা,—ধর্ম, অর্থ, কাম বা কলা। পরে এর সঙ্গে আরেকটি জ্ঞান বর্গ অর্থাৎ মোক্ষ জুড়ে হল চতুর্বর্গ জ্ঞান। চতুর্বিধ এই জ্ঞানমার্গের মধ্যে আমাদের যাবতীয় বিদ্যা বিবৃত। পাশ্চাত্য দেশে বেকন জ্ঞানের ত্রিসীমা নির্ধারণ করেছিলেন,—স্মৃতি (Memory), কল্পনা (Imagination) এবং যুক্তি (Reasor)। ফরাসী দার্শনিক কোঁৎ (Compte) বৈজ্ঞানিক বিভাজন সূত্র প্রয়োগে জ্ঞানের যে ত্রিস্তর নির্ধারণ করেছিলেন তা নিম্নরূপ :—

(১) ভৌতিক বিজ্ঞান (জড়পদার্থ সংক্রান্ত, যেমন পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ভূবিদ্যা

ইত্যাদি)।
(২) জৈব বিজ্ঞান (প্রাণ সংক্রান্ত, যেমন জীববিদ্যা উদ্ভিদবিদ্যা প্রাণীতত্ত্ব ইত্যাদি )।
(৩) নীতিবিজ্ঞানাদি (মানবিকবিদ্যা)।

## পুস্তকের শ্রেণীবিভাগ ( Classification of books )

জ্ঞান বা বিদ্যার শ্রেণীবিভাগের এই সূত্র ধরে আধুনিক কালের গ্রন্থবর্গীকরণ, পদ্ধতির সূচনা। বিভিন্ন শ্রেণীতে বইগুলিকে সাজিয়ে রাখার প্রধান উদ্দেশ্য প্রয়োজনীয় বইটি যাতে সহজে বার করে নেওয়া যায়। গ্রন্থাগারে বই থাকে ব্যবহারের জন্য, সেই ব্যবহারেব পথ সুগম করে তোলাতেই গ্রন্থাগারে সার্থকতা। এই কাজ সহজ করবার জন্যই গ্রন্থের শ্রেণীবিভাগ ও বর্গীকরণ, বইগুলোকে সুষ্ঠুভাবে সাজানো ও পরিচিত করা। তবে দার্শনিক অথবা পণ্ডিতদের পূর্বোক্ত জ্ঞান বা বিদ্যার শ্রেণীকরণ সর্বাংশে গ্রন্থাগারের কাজের পক্ষে উপযোগী নয়। জ্ঞানের শ্রেণীভাগের সঙ্গে সঙ্গে তথ্য সমৃদ্ধ নানাধরণের বই শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজাতে হয়।

যেকোনো ব্যাপারেই শ্রেণীবিভাগের সাধারন নিয়ম একেক ধরনের বা গড়নের জিনিস একসঙ্গে রেখে ভিন্ন ধরনের বা গড়নের জিনিস গুলিকে আলাদা করা। অর্থাৎ সাদৃশ্য সম্পন্ন সামগ্রীগুলিকে গুচ্ছে গুচ্ছে ভাগ করে আলাদা কয়ে রাখা। সাধারণ জীবনেও আমাদের মনের মধ্যে আহারে বিহারে রুচিতে পছন্দে মেলামেশায় ক্রমাগত এই বাছাই এর প্রক্রিয়া চলছে। ব্যক্তিগত বই এর সংগ্রহকেও আমরা প্রয়োজন বা সুবিধে অনুযায়ী কোনো না কোনো পদ্ধতিতে সাজিয়ে রাখি। গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেও ঐ একই প্রক্রিয়ায় পুস্তক বিন্যাস চলে। এই বিন্যাস প্রক্রিয়া, অর্থাৎ তাকের উপরে বই সাজানোর কায়দা হ'তে পারে হরেক রকমের। হ'তে পারে বইএর মাপ অনুযায়ী, মলাটের রং অনুয়ায়ী, বর্ণানুক্রমিক ভাবে বইএর নাম বা লেখকের নাম অনুসারে; হ'তে পার ভাষাভিত্তিক, কিম্বা রচনাশৈলী অনুযায়ী – অর্থাৎ কাব্য প্রবন্ধ নাটক ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে। আবার বিষয় অনুযায়ী শ্রেণী বিন্যাস

হ'তে পারে, — যেমন দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য ইত্যাদি ক্রম। এখন এই সকল পদ্ধতির তুলনামূলক বিচার ক'রে দেখা যাক এ গুলির সুবিধা অসুবিধা বা কার্যকারিতা কেমন।

গ্রন্থের শ্রেণী বিন্যাসের উদ্দেশ্য কী? সুসম্বদ্ধ শ্রেণী বিভাগ ও গ্রন্থসজ্জার সেখানেই সার্থকতা যখন পাঠক, গবেষক, এবং গ্রন্থাগার কর্মীরাও অনায়াসে বই গুলিকে খুঁজে পান ও ব্যবহারে লাগাতে পারেন। 'ব্যবহারে' লাগানোর অর্থে নির্দিষ্ট অধ্যয়ন প্রসঙ্গের অনুকূলে প্রয়োগ করা। সেজন্যই অধ্যয়নের ধারার সঙ্গে গ্রন্থবিন্যাসের যোগ বা সম্পর্ক। বইএর মঞ্চাবস্থান নির্ণয়, অর্থাৎ খুঁজে পাবার ব্যাপারটা যা'তে সহজ ও ত্বরিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে শ্রেণী-বিন্যাস করা প্রয়োজন। মঞ্চসজ্জায় চোখ বুলিয়েই যেন জানা যায় কোন শ্রেণীর বা কোন বিষয়ের বই গ্রন্থাগারে কী পরিমাণে আছে। বিন্যাস পদ্ধতি সরল এবং সুসম্বদ্ধ হ'লে প্রয়োজন মতো কোনো বিশেষ বিষয়ের বা শ্রেণীর বই আলাদা ক'রে নিয়ে প্রদর্শনী বা তালিকা প্রণয়ন বা পরিসংখ্যান প্রভৃতির কাজে লাগানো যায় সহজেই। সর্বোপরি দেখা দরকার শ্রেণী বিন্যাস পদ্ধতি যেন পাঠক ও কর্মীদের সময় বাঁচায়, ঠিক বইটি ঠিক পড়ুয়ার হতে ঠিক সময়ে আসে।

আকার বা মাপ অনুযায়ী যদি বই সাজানো যায় তা'হলে তাকের চেহারাটা বেশ সুন্দর দেখায় সন্দেহ নেই। কিন্তু নূতন করে কোনো বই বাঁধানো হ'লে সেটার মাপ বদল হয়ে যায় স্বভাবতই। তা'ছাড়া বহু বই এরই নতুন সংস্করণে আকার আলাদা হয়ে যায়। তখন তাকেও জায়গা বদল হয়ে যায়, একটি বিশিষ্ট স্থান বরাবরকার জন্য নির্দিষ্ট করা যায় না, যা'র ফলে কাজের অসুবিধার সৃষ্টি হয়। বইয়ের বর্ণ অনুযায়ী সাজালেও ঐ একই অসুবিধায় পড়তে হয়, —নব কলেবরে নতুন রং হয়ে যায়। তা'ছাড়া রঙের রকমও সীমাবদ্ধ, বিভিন্ন ধরণের বইএর রং একই রকমের হয়ে যায়, — যা'র ফলে ঠিক বইটি খুঁজে বার করতেও সময় লেগে যায়। সুতরাং এই বিন্যাস পদ্ধতিতে ধারাবাহিকতা পাওয়া যাচ্ছে না। উপরন্তু একই লেখকের একই ধরণের বই, অথবা একই বিষয়ের বিভিন্ন বই একটার থেকে আরেকটা অনেক দূরে পড়ে যচ্ছে। বর্ণানুক্রমিক ভাবে লেখকের অথবা বইএর নাম অনুযায়ী সাজালে এর মধ্যে একটা অসুবিধা দূর হয় বটে, তবে বিষয় সাম্য থাকেনা। আমরা সাধারণত লেখক নির্বিশেষে বই পড়িনা, পড়ি বিষয় অনুসারে। কেউ

সাহিত্য, কেউ দর্শন, কেউ বা বিজ্ঞান বা অন্য বিষয়ে অধ্যায়ন করি। কখনো কবিতা পড়তে চাই। কখনো গল্প, কখনো বা বৈষ্ণব ধর্ম বা পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি। অথচ একই লেখক অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বই লেখেন, ফলে কোনো বিশেষ বিষয়ের বইএর জন্য পুস্তক মঞ্চের সব তাকই হাতড়াতে হয়। যদি পুস্তক বিন্যাস ভাষার ভিত্তিতে হয় তাহলেও এই অসুবিধা থেকে যায়। রচনা শৈলী অনুযায়ী সাজালে এই অসুবিধা কতকটা দূর হয় বটে, তবে বিবিধ বিষয় মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। উপশ্রেণী, উপবিভাগ ক'রে এই অসুবিধা কিছুটা দূর করা গেলেও মূল সমস্যার সমাধান হবেনা। সুতরাং সবদিক বিচার ক'রে দেখলে বিষয় অনুযায়ী বই সাজানোর প্রথাই আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে সর্বাধিক অনুকূল মনে হয়। বিদ্যা অর্জনের ব্যাপারে বিষয়-বৈভবই মুখ্য, লেখকের স্থান আপাত গৌন। তাই শ্রেণী বিভাগের বেলায় বিষয়কে প্রধান শর্ত হিসেবে গণ্য ক'রে তার পরে লেখক, ভাষা প্রভৃতি অন্যান্য অঙ্গ অনুক্রমে উপশ্রেণী, উপবিভাগ ইত্যাদি পরম্পরায় যদি সাজানো যায় তাহলে কার্যকারিতা গুণ পাই নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বেশি।

## বর্গীকরণ ও সূচীকরণ

গ্রন্থাগারের প্রয়োজনে গ্রন্থের এই শ্রেণীবিভাগকেই বলে বর্গীকরণ (Library Classification)। কিন্তু বিষয় অনুযায়ী বর্গীকৃত গ্রন্থরাজি মঞ্চের উপরে থরে থরে সাজানো থাকলেই তো কাজ শেষ হলনা, পাঠককে নির্দিষ্ট কোনো বই বা'র করতে হ'লে তাকের পরে তাক হাতড়ে বেড়াতে হবে। তার উপরে আবার এমন কাণ্ডও হয় যে একই বই এর মধ্যে একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাই বর্গীকরণের সহায়ক বা পরিপূরক হিসেবে সূচীকরণ (Library cataloguing) প্রথার সৃষ্টি। এই সূচী তালিকা থেকে আমরা প্রতিটি বই এর লেখক, আখ্যা, বিষয় ইত্যাদি সম্পর্কে সব সংবাদ জানতে পারি।

গ্রন্থের শ্রেনীকরণের দুই ধারা বা অঙ্গ। একটির সাহায্যে আমরা বইগুলিকে পর্যায়ক্রমে মঞ্চের উপরে সাজিয়ে রাখি, আরেকটির সাহায্যে আমরা সেই গ্রন্থরাজির সূচীতালিকা লিখিতভাবে সাজিয়ে রাখি। প্রথমটি বর্গীকরণ, দ্বিতীয়টি সূচীকরণ।

## পুস্তক বর্গীকরণ ( Classification )

আমাদের স্বাভাবিক প্রবণতা থেকেই আমরা কোনো কিছু সাজানোর সময়ে সাদৃশ্য সম্পন্ন সামগ্রীগুলিকে এক গুচ্ছে জড়ো করি। বর্গীকরণের ভিত্তিও সামগ্রী সমূহের এই পারস্পরিক সামঞ্জস্য বোধ। সামঞ্জস্য বিচারের কার্যকর সূত্রগুলি স্বাভাবিক হতে পারে, কৃত্রিমও হতে পারে। যেমন এক ঝুড়ি আমের মধ্য থেকে যখন আমরা হিমসাগর আমগুলিকে বাছাই করে একদিকে জড়ো করি. ল্যাংড়াগুলিকে আরেকদিকে, ফজলিগুলিকে অপর পাশে রাখি তখন এই শ্রেণীবিভাগকে বলব স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা যদি ঝুড়ির মধ্যেকার যাবতীয় ছোট আমগুলিকে একদিকে রাখি, বড় গুলিকে আরেকদিকে. কিম্বা যদি সবুজ রঙের, হলদে রঙের আর লাল রঙের আম গুলিকে আলাদা আলাদা ভাগে রাখি তাহলে এই শ্রেনী-বিভাগকে বলব কৃত্রিম। কৃত্রিম শ্রেনীবিভাগের একটা সুবিধা আছে,—সুপ্রকট বৈশিষ্ট্য—নির্ভর হয় বলে ভাগগুলিকে চট করে চেনা যায়। এর মিলের মধ্যে আছে আকস্মিকতা। কিন্তু পূর্বোক্ত শ্রেনীবিভাগের মূল ভিত্তি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ল্যাংড়া আম সবুজ অবস্থাতেও ল্যাংড়া, হলদে হয়ে গেলেও ল্যাংড়া। কিন্তু সবুজ আর হলদে রঙের ভিত্তিতে ভাগ করলেও সবুজটা দু'দিন বাদেই রং পালটে হলদের দলে চলে যাবে।

শ্রেনীবিভাগ বা বর্গীকরণের মূল সূত্র বা পদ্ধতি বর্গীতব্য সামগ্রীর পরিচয়ের বা অন্তর্নিহিত বৈশিষ্টের বিস্তৃতি থেকে সংক্ষিপ্তিকরণ, অধিকতর ব্যাপকতা থেকে ন্যূনতর ব্যাপকতার দিকে ক্রমশ এগিয়ে আসা। অর্থাৎ কোনো জিনিসের মোটামুটি শ্রেনীকরণ থেকে উপশ্রেনী, ভাগ, বিভাগ উপবিভাগ ইত্যাদি ক্রমানুসারে তার মূল পরিচয়ের সন্ধান দেওয়া। শ্রেনী হিসেবে এর ব্যাপকতর পরিচয় (extension) থেকে বিশিষ্টতর পরিচয় (Intension) এর দিকে যেমন এগিয়ে আসছে, অথবা বলতে পারি, বস্তুপরিচয় (denotation) থেকে ভাব পরিচয় (connotation) এর দিকে এগিয়ে আসছে, তেমনি ক্ষুদ্রতম ভাগের পরিচয় জানাবার জন্য আমরা এগিয়ে যাচ্ছি ভাবরূপ থেকে বস্তুরূপের দিকে। পূর্বোক্ত ল্যাংড়া আমের উদাহরণই নেওয়া যাক। ল্যাংড়া একধরনের আম। আম একরকম ফল যা'র শাস আছে এবং খেতে মিষ্টি, ইত্যাদি। তাহলে ল্যাংড়ার শ্রেনী-

বিচারে প্রধান শ্রেনী হিসেবে পাই 'ফল'। এর বৈজ্ঞানিক বা স্বভাবগত শ্রেনীবিভাগ হতে পারে নিম্নরূপ :—

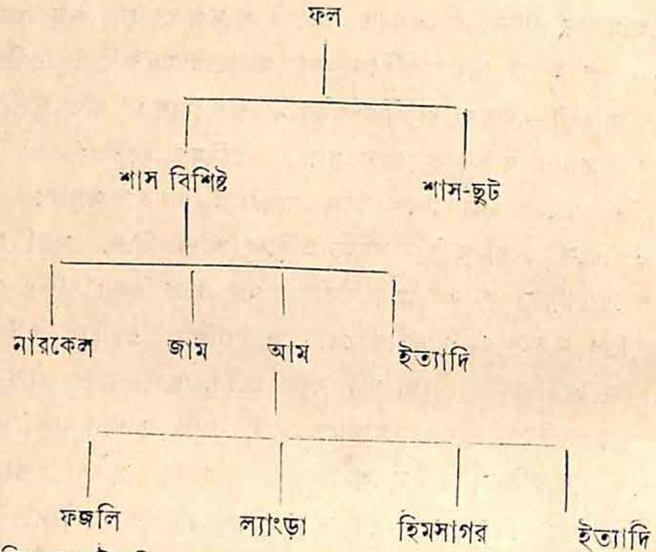


ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এর আরেকরকম শ্রেণীবিভাগও হ'তে পারে, যা'র মধ্যে কৃত্রিম গুণ আরোপিত। যেমন, – আম – সবুজ, হলদে, লাল, ইত্যাদি ; অথবা, আম – গোল, লম্বা, বড়, ছোট, ইত্যাদি। তাহলেই দেখা যাচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্যে একই জিনিসকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়। প্রতিটি শ্রেণীবিচারের পিছনেই বিশেষ কোনো যুক্তি কাজ করে। পুস্তকের শ্রেণী বিভাগের ক্ষেত্রেও এবম্বিধ যুক্তির প্রয়োগ লক্ষনীয়।

বর্গীকরণের কতকগুলি পরম্পরা থাকে। সেই ধারায় এনে বর্গীতব্য জিনিসটিকে ফেলতে হয়। যখন বলি, আম—ল্যাংড়া আম, ফজলি আম, ইত্যাদি, তখন পরিচয় জ্ঞাপক শব্দগুলিকে বলব নাম বা আখ্যা (Term), বর্গ-বিভাগের পুরো ধারাটিকে বলব তালিকা বা ছক ( Schedule ), ফল-পরিচায়ক শব্দটিকে (অর্থাৎ আম) বলব শ্রেণী (Class), এবং ল্যাংড়া, ফজলি, ইত্যাদি আখ্যায়িত হবে তার উপশ্রেণী, ভাগ, বিভাগ, উপবিভাগ অনুক্রমে।

ক্রমিক বর্গ নির্ধারণের কাজ কয়েকটি বিধেয় বা স্বভাব মেনে নিয়ে অগ্রসর হয়। প্রথমেই তার জাতি (Genus) —যা'র একাধিক শ্রেণীবিভাগ সম্ভব ; দ্বিতীয়ত, শ্রেণী (Species)—জাতির বিভিন্ন ভাগ বা অংশ ; তৃতীয়ত, প্রকার ভেদ বা গুণভেদ difference) সেই বৈশিষ্ট্য যা'র প্রয়োগে জাতিকে

ভাগ করা যায় শ্রেণী পর্যায়ে ; চতুর্থত, গুণ বা বিশেষত্ব (property) – যা'র দ্বারা জিনিসটিকে চেনা যায়, চেনানো যায় ( আমের বিশেষত্ব যেমন তা'র নরম মিষ্টি পদার্থ ) ; পঞ্চমত, দৈব উপাদান (accident) – জাতিগত স্বভাব নির্দেশক না হয়েও ঘটনা চক্রে যে বৈশিষ্ট্য থাকে প্রতিটি জিনিসের, (যেমন, আমের সবুজ বা হলদে রং, ছোট বা বড় আকার, গোল বা লম্বা গড়ন )।

এইবারে একটি পূর্ণাঙ্গ উদাহরণ নিয়ে বিষয়টির ব্যাখ্যা করা যাক। 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' বলতে আমরা পঞ্চভূতে গঠিত রূপে রসে গুণে সমন্বিত এক ঋষিকল্প ব্যক্তিকে বুঝি। তেমনি মহাত্মা গান্ধী বা সুভাষচন্দ্র বসুর বেলাতেও। এই ব্যক্তিদের উদ্ভব বৈজ্ঞানিক বিচারে হতে পারে নিম্নোক্ত রূপ।

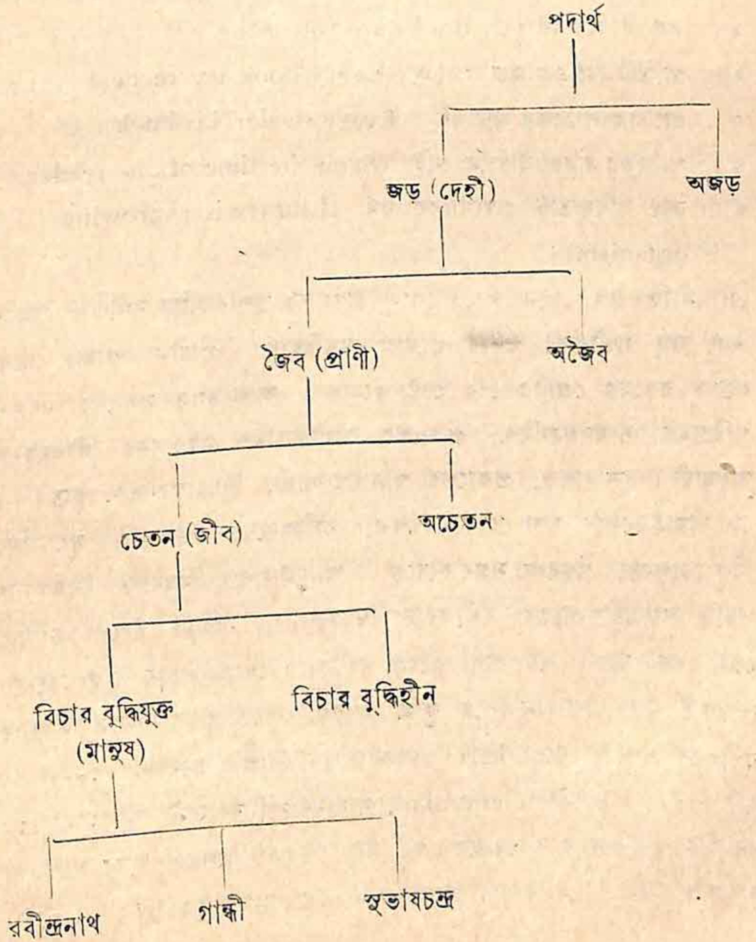

পরম্পরা ক্রমে পদার্থ থেকে রবীন্দ্রনাথে উপনীত হতে আমরা যেসকল বিধেয় আরোপ করে থাকি সেগুলো সাজালে পাচ্ছি—পদার্থ+দেহভাব +প্রাণ+চেতনভাব+যুক্তিবোধ+ব্যক্তিবিশেষ। অর্থাৎ প্রতি পর্যায়ে কিছু গুণভেদ বা গুণভাব গ্রহণ ও বর্জন করে শ্রেনী থেকে বিশেষে এসে পৌঁছাই। এই গুণগুলি বিষয়ভেদে বস্তুগত বা দৈবগত বা চরিত্রগত হতে পারে।

বইএর বর্গীকরণও এই নীতি মেনে চলে। গ্রন্থাগারের সংগ্রহ সুবিন্যস্ত শ্রেনীতে রাখবার উদ্দেশ্য প্রত্যেক পাঠকের হাতের কাছে প্রয়োজন মতো বইটিকে যুগিয়ে দেওয়া। রঙ্গনাথন-কৃত পাঁচটি সূত্রে গ্রন্থাগারের ক্রিয়াপর্বের ব্যাখ্যা আছে।

১। বই ব্যবহারের জন্য (Books are for use)

২। প্রতিটি বইএর জন্য পাঠক (Every book its reader)

৩। প্রত্যেক পাঠকের জন্য বই Every re der his book)

৪। পাঠকের সময় বাঁচানো চাই (Save the time of the reader)

৫। ক্রম বর্ধিষ্ণুতাই গ্রন্থাগারের ধর্ম (Library is a growing organism)।

এই নীতিপঞ্চক মেনে চলতে গেলে গ্রন্থগারে সুপরিকল্পিত বর্গীকরণ পদ্ধতি এবং সুষ্ঠু সূচীকরণ প্রথার প্রয়োগ অপরিহার্য। প্রাচীন আমল থেকে হরেক রকমের শ্রেনীকরণের চেষ্টা হয়েছে। আকৃতিগত মলাটের বর্ণগত পরিগ্রহণ সংখ্যানুক্রমিক প্রকাশের কালানুক্রমিক গ্রন্থকারের জীবৎকাল অনুযায়ী। ভাষাগত, প্রকাশের স্থান অনুযায়ী, বিষয়ানুক্রমিক, ইত্যাদি। যে ধারাই মেনে চলা হোক না কেন, বর্গীকরণের কতকগুলি মূল সূত্র ঠিক রেখে তবে গ্রন্থসজ্জা সম্ভব হয়েছে। আধুনিক যুগে বিষয়গত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুযায়ী গ্রন্থের বর্গীকরণে আন্তর্জাতিক সংগতি রেখে চলবার চেষ্টা দেখা যায়। যে প্রথা ধরেই বর্গীকরণ হোক, তার অঙ্গ হিসেবে কয়েকটি মূল উপাদান নিয়ে কাজ আরম্ভ করতে হয়। উন্নত ধরনের বর্গীকরণ পদ্ধতির মধ্যে পাঁচটি কার্যকরী সূত্র থাকা প্রয়োজন :—

(১) সাধারনী (Generalia), সাধারণ সার্বিক শ্রেনী, যার মধ্যে এমন সব বই বর্গীকৃত হবে যেগুলোকে অন্য কোনো বিশেষ বিষয়ের আওতায় আনা যায় না। যেমন সাধারণ অভিধান, কোষগ্রন্থ, সংগ্রহ গ্রন্থ ইত্যাদি।

(২) আকারগত শ্রেনী (Formclass)—আকার বা রচনাশৈলী অনুযায়ী শ্রেণীভুক্তি, যেমন কাব্য, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদির আকারে রচিত বই।
(৩) প্রকারগত বিভাগ (Form division)—কোন প্রকারে অর্থাৎ কোন দৃষ্টিকোন অবলম্বনে রচিত সেই অনুযায়ী বিভাগ, যেমন কোনো বিষয়ের দার্শনিক ব্যাখ্যা, ঐতিহাসিক বিচার, অভিধান ইত্যাদি।
(৪) প্রতীকচিহ্ন (Notation) বইটির বিষয় অনুযায়ী শ্রেনী নির্ণয়ে ব্যবহৃত বিশেষ চিহ্নাবলী। এই চিহ্ন ধরেই বইটিকে সনাক্ত করা হয়। প্রতীক চিহ্নের সাধারণত দুটি ভাগ থাকে; বই এর শ্রেণীগত চিহ্ন (Class No) এবং পুস্তকবিশেষের রচয়িতা কেন্দ্রিক—গ্রন্থগত চিহ্ন (Book No)। এই দুই অংশ মিলে গ্রন্থ সংলেখ (Call No) সম্পূর্ণ হয়। গ্রন্থকার চিহ্নের জন্য ইংরেজিতে কাটার-কৃত গ্রন্থকার সূচী (Cutter's Author Index) বহুল ব্যবহৃত। বাংলাতে প্রমীলচন্দ্র বসু 'গ্রন্থকার নামা' প্রস্তুত করেছেন।

সুষ্ঠু প্রতীকচিহ্নের কতকগুলি বিশেষ গুন থাকা দরকার। (ক) সম্প্রসারণশীলতা (flexibity),—যার ফলে সরল প্রকরণে ভাগ বিভাগ উপভাগ উপবিভাগ অন্তর্ভুক্ত করে নিতে অসুবিধা হয়না। জ্ঞানের পরিধি এবং তার আকার ও প্রকার ক্রমেই বাড়ছে, তাই ক্রমবর্ধমান বিষয়গুলিকে একই প্রতীকের অন্তর্ভুক্ত করে নেবার মতো ফাঁক থাকা প্রয়োজন। (খ) স্মরনীয়তাগুণ (Mnemonie value)—অর্থাৎ প্রতীকচিহ্ন সহজ, সরল জটিলতামুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়, যাতে সহজেই মনে রাখা যায়। প্রতীকে এমন শব্দ, সংখ্যা বা অংশ ব্যবহার করা বিধেয় যার ইঙ্গিত অপরিবর্তনীয়' যা একটা স্থায়ী সংকেত রেখে চলে। শ্রেনী, ভাগ, উপবিভাগ প্রভৃতির বিন্যাসে ধারাবাহিক ভাবে সঙ্গতি রেখে চলতে পারে এমন প্রতীকের ব্যবহারে সহজ স্মরনীয়তা-গুন-থাকে। (গ) সংক্ষিপ্ততা (brevity),—প্রতীক যথাসম্ভব ছোট ও অনাড়ম্বর হ'লে পর সংলেখের জটিলতা কমে, সহজে লেখা ও মনে রাখা যায়। প্রতীকে অক্ষর বা সংখ্যা যাই ব্যবহৃত হোক না কেন, সংক্ষিপ্ততার দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। সংক্ষিপ্ত করবার জন্য ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত প্রতীকের অংশ যত লম্বা হবে, প্রতীক তত ছোট হবে,--কেননা একটি বর্ণ ব্যবহারেই চিহ্নের কাজ চালানো গেলে স্বভাবতই প্রতীক সংক্ষিপ্ত হবে। এজন্য গাণিতিক সংখ্যার চেয়ে বর্ণমালার অক্ষরের উপযোগীতা বেশী। (ঘ) সরলতা (Simplicity), অর্থাৎ ধারা বা পদ্ধতির পরিচ্ছন্নতা

থাকা দরকার। প্রতীকচিহ্নের ক্রম এমন হওয়া উচিত যাতে একটির পর আরেকটি ধাপ সরল ধারায় চলে আসে। প্রতীক মিশ্র এবং অবিমিশ্র দুরকমেরই হতে পারে, অর্থাৎ কেবলমাত্র সংখ্যা বা অক্ষরের সমষ্টি, অথবা এ দু'য়ের মিশ্রিত রূপ। তৃতীয়, কতকগুলি সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করার রীতিও লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু তাতে জটিলতা বাড়ে, স্মরনীয়তা গুনও কমে যায়।

(৫) বিষয় তালিকা বা বিষয় সূচী (Index)—বর্গীকরণের ক্ষেত্রে মূল শ্রেনীবিভাগের ছক (Schedule) থেকে চট করে খুঁজে বার করবার জন্য, অর্থাৎ সঠিক বিষয়ের সঠিক শ্রেণী নির্ণয়ের সূত্র হিসেবে বিস্তারিত বিষয় সূচী। এই সূচী বিষয়— সম্বন্ধযুক্ত বা আপেক্ষিক (relative) হ'তে পারে, আবার বর্গ বৈশিষ্টাযুক্ত বা সুনির্দিষ্ট (Specific) হতে পারে। আপেক্ষিক সূচীতে বিষয় নির্দেশক মূল চিহ্নের সঙ্গে তার প্রতিশব্দাবলী, আনুষঙ্গিক এবং পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বিষয়াবলীরও চিহ্ননির্দেশ থাকে। সুনির্দিষ্ট সূচীতে বিষয় নির্দেশক একটিমাত্র সংকেত চিহ্নের নির্দেশ থাকে,—প্রতিশব্দাবলী সমেত। আপেক্ষিক সূচীর সুবিধা এটি স্বয়ং সম্পূর্ণ, সরল বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকে বলে ব্যবহার করা সহজ, কোনো বিষয়ের সম্ভাব্য ভিন্নতর দৃষ্টি-কোণের ইঙ্গিত পাওয়া যায় বলে যুক্তিবিচারের গুনে গুনান্বিত, বিষয়গত চিহ্ননির্দেশে ভুল—চুক হবার আশঙ্কামুক্ত। তবে বিশ্বজ্ঞানের বিশালতার পরিপ্রেক্ষিতে স্বভাবতই শ্রেনী বিন্যাসের বিস্তৃতি কিছু পরিমানে সীমিত এবং নির্বাচিত হতে বাধ্য, সেজন্য ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণের তারতম্যে একই বিষয় দুই ব্যক্তির হাতে দু'রকমে চিহ্নিত হয়ে যেতে পারে। এটির অপর দোষ, আকারে বিরাট হয়ে গিয়ে ব্যবহারিক অসুবিধার সৃষ্টি করে।

পক্ষান্তরে, সুনির্দ্দিষ্ট সূচী কোনো বিষয়ের জন্য একটিমাত্র স্থান নির্দেশ করে বলে একই ধারার মধ্যে ব্যক্তিভেদেও ভুল চিহ্ন বসবার আশঙ্কা কম। তাছাড়া আকারে ছোট বলে ব্যবহারের পক্ষেও সুবিধাজনক। তবে দৃষ্টিকোনের ক্ষেত্রে যুক্তি প্রয়োগের স্বাধীনতা না থাকার দরুন চিহ্ন ক্রমের মধ্যে ব্যবধান থেকে যেতে পারে। উপরন্তু অনিবার্য ভাবে বর্ণানুক্রমিক হবার দরুন পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বিষয়কেও স্বতন্ত্র পর্যায়ে চিহ্নিত করায় আশঙ্কা থাকে।

## বিভিন্ন বর্গীকরণ পদ্ধতি

দেশে বিদেশে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের প্রয়োজন এবং সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন গ্রন্থবর্গীকরণ পদ্ধতি তৈরি হয়েছে। কয়েকটি বিশিষ্ট ধারা প্রচলিত থাকলেও অধিকাংশ গ্রন্থাগারই নিজের মতো করে কোনো বিশেষ পদ্ধতির ব্যবহারিক রূপটাকে ঢেলে সাজিয়ে নিয়েছে,—অন্তত বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। তবে বর্গীকরণকে একটা আন্তর্জাতিক রূপ দেবার চেষ্টা বারেবারেই হয়েছে। এবং কতকগুলি বর্গীকরণ পদ্ধতি ব্যাপকভাবে গৃহীতও হয়েছে। তবু কোনো পদ্ধতিই সর্বত্র স্বীকৃত হয়নি। হওয়া সম্ভবও নয়। দেশভেদে পদ্ধতির প্রভেদ যেমন অবশ্যম্ভাবী তেমনি গ্রন্থাগারের চরিত্রভেদেও তা অনিবার্য।

আধুনিক যে সকল বর্গীকরণ পদ্ধতির বিশেষ প্রচলতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির পরিচয় নেওয়া যাক।

(১) মেল ভিল ডিউই প্রবর্তিত 'দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতি' (Dewey Decimal classification)।

(২) ব্রাউন কৃত বিষয়ানুক্রমিক বর্গীকরণ পদ্ধতি (Brown's Subject Classification)।

(৩) কাটার কৃত প্রসারশীল বর্গীকরণ পদ্ধতি (Cutter's Expensive Classification)

(৪) ব্লিস্ কৃত গ্রন্থবৃত্ত বর্গীকরণ পদ্ধতি (Bliss's Bibiliographic Classification)

(৫) লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস প্রবর্তিত পদ্ধতি (Library of Congress Classification Scheme)।

(৬) সার্ব দশমিক বর্গীকরণ (Universal Decimal Classification)

(৭) রঙ্গনাথন কৃত দ্বিবিন্দু বর্গীকরণ পদ্ধতি (Colon Classification)।

ভারতীয় বিদ্যাসম্ভার বর্গীকরণের জন্য এদেশের গুনীরাও কয়েকটি পদ্ধতির সৃষ্টি করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাশীর সতীশ চন্দ্র গুহ কৃত 'প্রাচ্য বর্গীকরণ পদ্ধতি'; শান্তিনিকেতনের প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কৃত 'বাংলা গ্রন্থবর্গীকরন পদ্ধতি' ( দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতির ধারা অনুসারী; কুড়ালকারের 'মারাঠী পুস্তক বর্গীকরণ পদ্ধতি; বরোদার বোর্ডের-কৃত বর্গীকরণ

পদ্ধতি ; ইত্যাদি। এর মধ্যে কয়েকটি পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক।

## ডিউই দশমিক বর্গীকরণ ( Decimal Classification )

যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার নাগরিক এবং বিশিষ্ট গ্রন্থাগার সেবী মেলভিল ডিউই (Melville Dewey) ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সৃষ্ট দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতি প্রকাশ করেন। মেলভিল ডিউই [১৮৫১—১৯৩১ খ্রীঃ] বিচিত্র কর্মা ব্যক্তি ছিলেন। দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতি তৈরি করেন মাত্র ২৫ বছর বয়সে। এছাড়াও তাঁর কৃতিত্ব মার্কিন ইংরেজি বানান সংস্কারের জন্য সমিতি স্থাপন। তাঁর বর্গীকরণ গ্রন্থটিতে তিনি আনুপূর্বক এই নূতন ধারার বানান ব্যবহার করেছেন। আমেরিকান লাইব্রেরি এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতাও তিনি, এবং সুবিখ্যাত 'লাইব্রেরি জার্ণাল' পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাও হয় তাঁরই হাতে। এছাড়াও আরো অনেক সংস্থার তিনি ছিলেন মধ্যমনি বা প্রবর্তক।

ডিউই সমগ্র জ্ঞান ভাণ্ডার বা বিষয়গুলিকে মূল নয়টি ভাগে ভাগ করেন, এবং সেই সঙ্গে আরেকটি ভাগ জুড়ে দেন সাধারণ জ্ঞান শ্রেণীর জন্য। এই বিষয় বিভাজনের প্রতীক হিসেবে তিনি গাণিতিক সংখ্যা ব্যবহার করলেন। ফলে মূল শ্রেণীবিভাজন দাঁড়ালো নিম্নোক্ত রূপ। :—

০ সাধারণী [গ্রন্থপঞ্জী, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান, সাংবাদিকতা, প্রদর্শশালা ইত্যাদি সমেত]

১ দর্শন [মনোবিদ্যা সহ]

২ ধর্ম

৩ সমাজবিজ্ঞান [পরিসংখ্যান ও রীতিনীতি সমেত]

৪ ভাষাবিজ্ঞান

৫ বিজ্ঞান

৬ ফলিত বিজ্ঞান [চিকিৎসা শাস্ত্র, কৃষিবিদ্যা, ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি সমেত]

৭ ললিত কলা ও বিনোদন [স্থাপত্য, আলোকচিত্র, সংগীত ইত্যাদি সমেত]

৮ সাহিত্য

৯ ইতিহাস, ভূগোল, জীবনী

এই দশটি ভাগকে বিভাগে ও উপবিভাগে সাজাবার জন্য প্রথম কল্পে তিনটি ক'রে সংখ্যার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। যথা :—

০০০—০৯৯ সাধারনী ; যে সকল বিষয়কে বিশেষ কোনো ভাগে ফেলা যায়না।

১০০—১৯৯ দর্শন ; দর্শন সংক্রান্ত বিষয়।

২০০—২৯৯ ধর্ম ; ধর্মমত সমূহ, পূজা-পার্বন, গীর্জা-মন্দির-মসজিদ ইত্যাদি।

৩০০—৩৯৯ সমাজ বিজ্ঞান ; অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, আইন, পরিসংখ্যান, আচার-বিচার ইত্যাদি।

৪০০—৪৯৯ ভাষাবিজ্ঞান ; বিবিধ ভাষাতত্ত্ব।

৫০০—৫৯৯ বিজ্ঞান ; গণিতশাস্ত্র ও যাবতীয় বৈজ্ঞানিক বিষয়।

৬০০—৬৯৯ ফলিত বিজ্ঞান ; পূর্তবিদ্যা, কৃষি, চিকিৎসা শাস্ত্র, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি।

৭০০—৭৯৯ ললিতকলা ; চারুশিল্প, কারুশিল্প, সংগীত ও নৃত্য, আলোকচিত্র, ক্রীড়া ও বিনোদন, শিকার ইত্যাদি।

৮০০—৮৯৯ সাহিত্য ; বিবিধ ভাষায় সাহিত্য রচনা।

৯০০—৯৯৯ ইতিহাস, ভূগোল, ভ্রমণ, জীবনী।

দ্বিতীয় কল্পের বিস্তারে এই বিভাগগুলির রূপ দাঁড়ায় নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| ০০০ | সাধারণ জ্ঞান, পুস্তক। | ১০০ | দর্শন শাস্ত্র। |
| ০১০ | গ্রন্থাদির নির্ঘন্ট। | ১১০ | আধ্যাত্ম বিদ্যা। |
| ০২০ | গ্রন্থাগার বিজ্ঞান। | ১২০ | বিশেষ আধ্যাত্ম প্রসঙ্গ। |
| ০৩০ | সাধারণ কোষ গ্রন্থাদি। | ১৩০ | দেহ ও মন। |
| ০৪০ | বিবিধ রচনা সংগ্রহ। | ১৪০ | দার্শনিক মতবাদ। |
| ০৫০ | সাময়িক পত্র। | ১৫০ | মনোবিজ্ঞান। |
| ০৬০ | পরিষৎ। সংগ্রহশালা। | ১৬০ | তর্কশাস্ত্র। |
| ০৭০ | সাংবাদিকতা। | ১৭০ | নীতিশাস্ত্র। |
| ০৮০ | বিশিষ্ট গ্রন্থ সংগ্রহ। | ১৮০ | প্রাচীন দার্শনিক। |
| ০৯০ | দুর্লভ গ্রন্থাদি। | ১৯০ | আধুনিক দার্শনিক। |

২০০ ধর্মশাস্ত্র
২১০ প্রাকৃতিক ধর্ম
২২০ বাইবেল
২৩০ মতামত ও বিশ্বাস
২৪০ ভক্তি, উপাসনা
২৫০ ধর্ম-প্রচারাদি
২৬০ উপাসনা মন্দিরাদি
২৭০ ধর্ম প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস
২৮০ গীর্জা, খ্রীষ্ট সম্প্রদায়
২৯০ অখ্রীষ্টিয় ধর্মসমূহ

৩০০ সমাজবিজ্ঞান
৩১০ পরিসংখ্যান
৩২০ রাষ্ট্রনীতি, রাজনীতি
৩৩০ অর্থনীতি
৩৪০ আইন
৩৫০ শাসন ব্যবস্থা, সৈন্যবিভাগ
৩৬০ সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদি
৩৭০ শিক্ষা
৩৮০ ব্যবসা, ব্যাণিজ্য, যোগাযোগ
৩৯০ আচার ব্যবহার, লৌকিক জীবন
৪০০ ভাষাবিজ্ঞান
৪১০ তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান
৪২০ ইংরেজি ভাষা
৪৩০ জার্মান ভাষা
৪৪০ ফরাসী ভাষা
৪৫০ ইতালীয় ভাষা
৪৬০ স্পেনীয় ভাষা
৪৭০ লাতিন ভাষা
৪৮০ গ্রীক ভাষা
৪৯০ পৃথিবীর অন্যান্য ভাষাবর্গ
৫০০ বিজ্ঞান
৫১০ গণিত শাস্ত্র
৫২০ জ্যোতিষ শাস্ত্র
৫৩০ পদার্থ বিদ্যা
৫৪০ রসায়ণ শাস্ত্র
৫৫০ ভূতত্ত্ব
৫৬০ প্রত্নতত্ত্ব
৫৭০ জীব বিজ্ঞান
৫৮০ উদ্ভিদ বিদ্যা
৫৯০ প্রাণীতত্ত্ব
৬০০ ফলিত বিজ্ঞান, ব্যবহারিক শিল্পাদি
৬১০ চিকিৎসা বিদ্যা
৬২০ পূর্তবিদ্যা, যন্ত্রবিদ্যা
৬৩০ কৃষি বিজ্ঞান
৬৪০ গার্হস্থ বিজ্ঞান
৬৬০ যোগাযোগ, ব্যবসায়
৬৬০ রাসায়নিক শিল্প
৬৭০ উৎপাদন শিল্প
৬৮০ নির্মান শিল্প
৬৯০ বাস্তু বিদ্যা
৭০০ ললিত কলা
৭১০ উদ্যান নগর সজ্জা
৭২০ স্থাপত্য
৭৩০ ভাস্কর্য
৭৪০ অঙ্কন, অলঙ্করন
৭৫০ চিত্রশিল্প
৭৬০ তক্ষণ শিল্প
৭৭০ আলোক চিত্র

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৭৮০ | সংগীত | ৮৯০ | পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্য |
| ৭৯০ | বিনোদন, ক্রীড়া | ৯০০ | ইতিহাস |
| ৮০০ | সাহিত্য | ৯১০ | ভূগোল, ভ্রমণ কাহিনী |
| ৮১০ | মার্কিন সাহিত্য | ৯২০ | জীবনী |
| ৮২০ | ইংরেজি সাহিত্য | ৯৩০ | প্রাচীন ইতিহাস |
| ৮৩০ | জার্মান সাহিত্য | ৯৪০ | ইউরোপীয় ইতিহাস |
| ৮৪০ | ফরাসী সাহিত্য | ৯৫০ | এশীয় ইতিহাস |
| ৮৫০ | ইতালীয় সাহিত্য | ৯৬০ | আফ্রিকার ইতিহাস |
| ৮৬০ | স্পেনীয় সাহিত্য | ৯৭০ | উত্তর আমেরিকার ইতিহাস |
| ৮৭০ | লাতিন সাহিত্য | ৯৮০ | দক্ষিণ আমেরিকার ইতিহাস |
| ৮৮০ | গ্রীক সাহিত্য | ৯৯০ | ওশেনিয়া, মেরুপ্রদেশ |

দশমিক বর্গীকরণের মূল কাঠামোটি তুলে ধরা গেল। তৃতীয় কল্পের বিশদ বিস্তারে প্রত্যেক ভাগের বিভিন্ন বিভাগ উপবিভাগ প্রভৃতি অনুক্রম পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বর্গীকৃত হয়েছে। এবং এই বিস্তারে উপরোক্ত তিন গাণিতিক সংখ্যার পরে একটি করে দশমিক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। এবং এই দশমিক চিহ্নের পরে পুনরায় গাণিতিক সংখ্যাক্রমে ভাগচিহ্ন বর্ধিত হয়ে পুস্তকের সঠিক বিষয় নির্ধারিত হয়েছে। দশমিক চিহ্নই সূক্ষ্ম বিভাজনের মূল চিহ্ন ব'লে এই পদ্ধতির নাম দশমিক বর্গীকরণ। এই বিভাজন ধাপের পর ধাপ কেমন করে এগিয়ে চলে তা দু'একটি নমুনার সাহায্যে বোঝা যাবে।

| | |
|---|---|
| ৯৪০ | ইউরোপের ইতিহাস |
| ৯৪১ | স্কটল্যাণ্ড |
| ৯৪১.৫ | আয়ারল্যাণ্ড |
| ৯৪২ | ইংল্যাণ্ড |
| ৯৪২.১ | লণ্ডন |
| ৯৪২.১৫ | পূর্বলণ্ডন |

অথবা :—

| | |
|---|---|
| ৩৭০ | শিক্ষা |
| ৩৭১ | শিক্ষক, শিক্ষাবিধি |
| ৩৭১.৩ | শিক্ষকতার বিধি ও ধারা |

৩৭১.৩৩ বক্তৃতা, মৌখিক ও চাক্ষুষ উদাহরণাদি
৩৭১.৩৩১ চাক্ষুষ উদাহরণ ; চিত্রপ্রদর্শন
৩৭১.৩৩৫২ নানাবিধ ছবি দেখানো
৩৭১.৩৩৫২৩ চলচ্চিত্র প্রদর্শন

এইভাবে একটি সাধারণ বিভাগ থেকে উপবিভাগে, এবং সেই থেকে আরো স্পষ্টতর ভাগানুভাগ বিচারে পুস্তকের বিশিষ্ট বিষয়টি নির্ধারিত হয়ে যায়। তখন গ্রন্থসংলেখটি দেখলেই কোন বিষয়ের বই তা বুঝে নিতে অসুবিধা হয়না।

বর্গীকরণ প্রক্রিয়া বই এর বিষয় প্রতীক হিসেবে কাজ করে বলে এটি সংক্ষিপ্ত, সরল, এবং সহজ-স্মরণ যোগ্য হওয়া দরকার। এর কার্যকরতা এবং ভালমন্দ নির্ভর করে স্মরনীয়তা বা সহজে মনে রাখবার গুণের উপরে। এবং এমন কতকগুলি সূত্রের উপরে যেগুলি সকল শ্রেণী ও বর্গেই সমানভাবে প্রযোজ্য। দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতির এই গুণ আছে এর সংখ্যাগুলি অমিশ্র, পরিমিত ও সংক্ষিপ্ত। একবার বিষয় নির্বাচন ক'রে ফেলতে পারলে তা'র বিভাগ উপবিভাগ গুলি সহজেই গাণিতিক হিসাবে বেরিয়ে আসে। দৃষ্টিকোণ বিচারে এই পদ্ধতিতে প্রকারগত বিভাগের (form division) জন্য নয়টি গাণিতিক সংখ্যার ব্যবহার যে-কোনো শ্রেণীর পক্ষেই একরকমের,—সব বর্গভাগের সঙ্গেই প্রয়োগ করা চলে। প্রকারগত বিভাগগুলি প্রধান শ্রেণীভাগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলে বলে মনে রাখতেও কষ্ট হয়না। এগুলি নিম্নোক্তরূপ :—

০১ যে কোনো বিষয়ের তাত্ত্বিক রূপ বা দর্শন
( Philosophy and outline)
০২ যে কোনো বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার বা সাধারণ আলোচনা
(Handbooks and outlines)
০৩ যে কোনো বিষয়ের কোষ গ্রন্থাদি
(Dictionaries and encyclopaedias)
০৪ যে কোনো বিষয়ের প্রবন্ধাদি ও বক্তৃতা
(Essays and lectures)
০৫ যে কোনো বিষয়ের পত্রপত্রিকা
(Periodicals)

০৬ যে কোনো বিষয় সংক্রান্ত সমিতি বা প্রতিষ্ঠান
(Organizations and societies)
০৭ যে কোনো বিষয়ের শিক্ষা ও অধ্যয়ন
(Study and teaching)
০৮ যে কোনো বিষয়ের বিশেষ সংগ্রহ
(Collections and polygraphy)
০৯ যে কোনো বিষয়ের ইতিহাস
(History)

এই সংখ্যাগুলি যে কোনো শ্রেণীতেই ক্ষেত্র অনুযায়ী দশমিক প্রযুক্ত বা দশমিক ছুট ভাবে ব্যবহার করা যায়। যেমন—

১০০ দর্শন ১০১ দার্শনিক তত্ত্ব
১০৩ দর্শন অভিধান ১০৫ দর্শনের পত্রিকা
১৫০.১ মনোবিদ্যা সংক্রান্ত তত্ত্ব ও সাধারণ নীতি
১৫০.৭ মনোবিদ্যার শিক্ষাধারা
১৫০.৯ মনোবিদ্যার ইতিহাস
১৫৪.০১ স্মৃতিবিষয়ক সাধারণ তত্ত্বাদি
১৫৪.০৭ স্মৃতি বিষয়ক শিক্ষাধারা ও অধ্যয়ন

এইভাবে ইংরেজি সাহিত্যে'র অভিধানের চিহ্ন হবে ৮২০.৩, ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাস ৮৪০.৯ ইত্যাদি।

আকারগত শ্রেণীর (form class) জন্যও দশমিক পদ্ধতিতে একই ধরণের সংখ্যার ব্যবহার নির্দ্দিষ্ট আছে। লক্ষ্য রাখতে হয় যে প্রকারগত বিভাগের প্রয়োগে গাণিতিক 'শূন্য' সংখ্যাটি নির্দেশক হিসেবে আগে বসছে। আকারগত শ্রেণীর গাণিতিক সংখ্যা শূন্য-ছুট। আকারগত বিভাগ নিম্নোক্তরূপ :—

১ কাব্য ( Poetry )
২ নাটক ( Drama )
৩ গল্প উপন্যাস ( Tiction ),
৪ প্রবন্ধ ( Essays )
৫ বক্তৃতা ( Oratory )
৬ চিঠিপত্র ( Letters )

৭ শ্লেষ, বিদ্রূপ (Sative, humour)

৮ বিবিধ রচনা (Miscallauy)

৯ ইতিহাস (History)

এগুলির প্রয়োগের নমুনা :—

৮২১ ইংরেজি কাব্য ৮৪২ ফরাসী নাটক

৮৩৩ জার্মান উপন্যাস ৮৫৪ ইতালির প্রবন্ধ

লক্ষনীয়। ৮২১ চিহ্নে যেখানে ইংরেজি কাব্য হচ্ছে. ৮২০·১ চিহ্নে হবে ইংরেজি সাহিত্যতত্ত্ব, ৮২১১ চিহ্নে হবে প্রাচীন যুগের ইংরেজি কাব্য।

আবার দশমিক বর্গীকরণের এই সহজ প্রয়োগশীল সূত্রের সাহায্যে স্থানবাচক বিভাগ করা যায় নিম্নোক্তরূপে :—

৯৭৩ আমেরিকার ইতিহাস

৩৩০·৯৭৩ আমেরিকার অর্থনৈতিক ইতিহাস

৯৫১ চীনের ইতিহাস

৩৩০·৯৫১ চীনের অর্থনৈতিক ইতিহাস

এই সূত্রেই ভাষাগত বিভাগের প্রক্রিয়া হবে নিম্ন-রূপ :—

৪৪০ ফরাসী ভাষা

৩৩০ ৯০০০৪ ফরাসী ভাষায় লেখা অর্থনৈতিক ইতিহাস

এই প্রক্রিয়ার মধ্যে শূন্যের প্রয়োগ লক্ষণীয়। ভাষা প্রভৃতি আকারগত সাধারণ বিভাগের জন্য ডিউই শূন্যের সাহায্য নিয়েছেন ০০০—অর্থাৎ তিন শূন্যের প্রয়োগে সৃষ্টি হবে নানাপ্রকার সাধারণ বিভাগের। যেমন উপরোক্ত এই ক্ষেত্রে ভাষা বিভাগ বোঝাতে ০০০৪ ব্যবহৃত হয়েছে। তেমনি ভাবেই পারস্পরিক সম্বন্ধ বোঝাবার জন্য হয়েছে ০০০১ সংখ্যার নমুনা :—৫৩০·০০০১১ = পদার্থ বিজ্ঞানের এবং দর্শনের সম্বন্ধ। দৃষ্টিভঙ্গি বোঝাবার জন্য ০০-দুই শূন্যের ব্যবহার। নমুনা :—৫৩০·০০৩ = অর্থ নৈতিক দৃষ্টিতে পদার্থবিজ্ঞান। প্রকারগত এই বিভাজন চিহ্নের চাল নিম্নরূপ :—

০০০১ সম্বন্ধ নির্ণায়ক

০০০২ উৎপত্তি নির্দেশক

০০০৩ পরিচালনা সংক্রান্ত

ইত্যাদি—

০০১ উদ্দেশ্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি

০০২ উপলব্ধিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি

০০৩ অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ

০০৪ ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ

ইত্যাদি—

ডিউই দশমিক বর্গীকরণ দোষমুক্ত নয়। বস্তুতপক্ষে কোনো বর্গীকরণ পদ্ধতিই সর্বদেশের সর্বকালের সর্ববিষয়ের অবিসংবাদিত প্রকরণ নয়। ডিউইর সমালোচনায় বলা যায়, প্রথমত ছক অনুযায়ী বিষয়গুলি পারম্পর্য-যুক্ত নয়। যেমন, ভাষাবিজ্ঞান (৪০০) ও সাহিত্য (৮০০) পাশাপাশি না থেকে দূরে প'ড়ে গিয়েছে। ভাষা ও সাহিত্য এমনভাবে পরস্পর সম্পৃক্ত যে এ দুটির একজোট হয়ে থাকাই উচিত। তেমনি ঘটেছে সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাস অথবা দর্শন এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও। কেবলমাত্র মূল শ্রেণীবিভাগেই নয়, একেকটি বর্গবিভাগের মধ্যেও পারম্পর্য ব্যাহত হয়েছে। যেমন সমাজ বিজ্ঞান (৩০১) থেকে সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদি (৩৬০) দূরে পড়ে গিয়েছে, বিশ্ব ইতিহাস (৯০০) এবং বিশেষ দেশের ইতিহাস (৯৪০ থেকে সুরু) —এই দুই এর মাঝখানে চলে এসেছে ভূগোল (৯১০) এবং এবং জীবনী (৯২০)।

দ্বিতীয় বর্গীকরণের মূল সূত্র হিসেবে দশকের পৌনঃপৌনিক ধারা দেখি। বিষয়গুলি দশটি শ্রেণীতে বিভক্ত, প্রত্যেক শ্রেণীর দশটি করে ভাগ, প্রত্যেক ভাগের দশটি ক'রে বিভাগ, বিভাগগুলি আবার দশটি উপবিভাগে বিভক্ত। ডিউইর মতে শূন্য সংখ্যা কেবলমাত্র নির্দেশক। সুতরাং বাকি নয়টি ভাগের মধ্যে বিষয়গুলির বিভাজন করতে হয়। নয়টির বেশি হলেই ডিউই প্রথমআটটিকে পুরো বিভাজক হিসেবে রেখে ৯ সংখ্যাটির মধ্যে বাড়তিগুলিকে ফেলছেন। এর ফলে সংখ্যা অনাবশ্যক-বৃদ্ধি পায় এবং স্মরণীয়তা গুন কমে আসে।

তৃতীয়ত, প্রকারগত বিভাগের বেলায় আমরা দেখেছি ০ সংখ্যাটি প্রকার নির্দেশক হিসেবে ব্যবহৃত। যেমন গণিতের অভিধান ৫১০·৩, বীজগণিতের অভিধান ৫১২·০৩। কিন্তু ০ সংখ্যাটি সর্বত্র অবিসংবাদিত ভাবে প্রকার নির্দেশ করেনা। কখনো কখনো অন্যরূপ পর্ববিভাগ ও সূচিত করে। যেমন ইতিহাস শ্রেণীতে ০ এর ব্যবহার রচনা ধারা নির্দেশক হিসেবে।

চতুর্থত, মিশ্র বিষয়ের বর্গীকরণে অনেক সময়েই ছকের একাধিক ভাগে একই বিষয়ের স্থান নির্দেশ করা যায়। সাহিত্যিকের জীবনী আমরা জীবনী বিভাগে দিতে পারি, আবার সাহিত্য বিভাগেও রাখতে পারি। একই বিভাগের মধ্যেও এরকম ঘটতে পারে। যেমন 'শিশুগ্রন্থাগারে সূচীকরণ' ০২৫.৩ এবং ০২৭.৬২৫ উভয় বর্গেই দেওয়া যায়।

পঞ্চমত, ছকের বর্গসংখ্যা খুবই সরল ভিত্তিক হওয়াতে, অর্থাৎ কেবলাত্র দশটি গাণিতিক সংখ্যার সাহায্যে চিহ্নিত হওয়াতে সূক্ষ্ম বিষয় বিভাজনের বেলায় বর্গসংখ্যা বেশ বড় হয়ে যায়। এবং তা'র ফলে সংক্ষিকা গুন ব্যাহত হয়। যেমন, 'ভারতে চা ল উৎপাদন' বিষয়ের বর্গ সংখ্যা হয়ে যাচ্ছে ৬৩৩.১৮০৯৫৪। কিম্বা, পূর্বে উল্লিখিত 'শিক্ষায় চলচিত্র প্রদর্শন' বিষয়টির বর্গসংখ্যা দাঁড়ায় ৩৭১.৩৩৫২৩।

ডিউই-কৃত এই বর্গীকরণ যে বিশেষ ভাবে পশ্চিমভূভাগের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখেই রচিত তা বুঝতে বেগ পেতে হয়না। যেমন, ধর্ম বিষয়ক প্রকল্পের সবটাই জুড়ে আছে খ্রীষ্টিয় ধর্ম। অখ্রীষ্টিয় তাবৎ ধর্ম ২৯০ বিভাগের মধ্যে বিবৃত। এই একই অবস্থা সাহিত্য প্রভৃতি বিভাগের বিষয় ভুক্তিতে স্বভাবতই প্রতীকচিহ্নটি বৃহৎ হয়ে যাবে। তাছাড়া একটি দশকের মধ্যেই এণীয় প্রভৃতি বিষয়ের ভিড় হবে। এই অসুবিধা দূর করে এশিয়া ও ভারতের বিবিধ বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে ডিউই পদ্ধতির বিস্তার ও পরিবর্তন ক'রে একটি বর্গীকরণ সূত্র খাড়া করেছেন বিশ্বভারতীর আদি গ্রন্থাগারিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। বস্তুতপক্ষে, বিভিন্ন গ্রন্থাগারের চরিত্র অনুযায়ী ডিউইকে ঢেলে সাজিয়ে সম্প্রসারিত করে নেবার নজির প্রত্যেক দেশে—এমনকি আমেরিকাতেও আছে। একথাও সত্য যে বিষয় নির্ব্বিশেষে সর্বত্র একই পদ্ধতি চালু করার কাজ সহজ নয়। প্রভাতকুমার-কৃত পদ্ধতির অনুসরণে অন্যান্য দেশও নিজ বিষয়বর্গের মর্যাদাদানে প্রাধান্য দিয়ে ডিউই অনুসারী বর্গীকরণ চালু করতে পারেন। প্রভাতকুমারের পুনরীক্ষণে খ্রীষ্টধর্মের বিভাগগুলিকে সংকুচিত ক'রে ভারতীয় ও অন্যান্য ধর্মাদির স্থান করে নেওয়া হয়েছে। সাহিত্য বিভাগেও মার্কিন সাহিত্যের স্থলে ভারতীয় সাহিত্যকে স্থান দিয়ে পূর্বোক্তটিকে ইংরেজি সাহিত্যভুক্ত করা হয়েছে। এইভাবে ভারতীয় দর্শন, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, ইতিহাস প্রভৃতিরও বিস্তার ঘটিয়েছেন। এইসঙ্গে রঙ্গনাথন কৃত কোলন

বা দ্বিবিন্দু (:) চিহ্নটিও দশমিকের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে পারম্পরিক সম্পর্ক এবং ভাষা, দেশ প্রভৃতি প্রকারগত বিভাগের চিহ্নকরণও সহজ করে নিয়েছেন। এর ফলে প্রতীকচিহ্নের দৈর্ঘ্য কমে গিয়ে সংক্ষিপ্ত হয়েছে। এবং বিষয়ের সম্বন্ধগুলি বুঝবারও স্থবিধে হয়েছে। যেমন ডিউইতে 'অর্থ নৈতিক পরিসংখ্যানের' প্রতীক হয় ৩১১.০০০১৩৩, কিন্তু উপরোক্ত পদ্ধতিতে সহজেই আমরা ৩১১:৩৩ দিতে পারি।

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় কৃত এবং বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে ব্যবহৃত এই পরিশীলিত ডিউই বর্গীকরণের সংক্ষিপ্তসার নিম্নোক্ত রূপ :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৮২ | ভারতীয় দর্শন | ১৮৩.৩ | দেহ ও মন |
| ১৮২.০১ | ষড়দর্শন | ১৮৩.৩৩ | ইন্দ্রজাল, ভানুমতী |
| ১৮২.০২ | তুলনামূলক | ১৮৩.৩৭ | স্বভাব |
| ১৮২.১ | ন্যায়-অক্ষপদে গৌতম | ১৮৩.৪ | ভারতীয় দার্শনিক মতবাদ |
| ১৮২.২ | বৈশেষিক — কনাদ | ১৮৪ | ভারতীয় দর্শন সাম্প্রতিক |
| ১৮২.৩ | সংখ্যা — কপিল | ১৮৫ | বৌদ্ধ দর্শন |
| ১৮২.৪ | যোগ — পতঞ্জলি | ১৮৬ | জৈন দর্শন |
| ১৮২.৫ | মীমাংসা — জৈমিনী | ১৮৭ | মুসলিম দর্শন |
| ১৮২ ৬ | বেদান্ত, ব্রহ্মসূত্র বাদরায়ণ | ১৮৮ | প্রাচীন গ্রীক দর্শন |
| ১৮২.৭ | শৈব | ১৮৯ | প্রাচীন গ্রীষ্টিয় ও মধ্যযুগীয় দার্শনিক |
| ১৮২.৮ | শাক্ত | ১৯০ | আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন ইত্যাদি |
| ১৮২.৯ | বিবিধ | ২২০ | ভারতীয় ধর্ম |
| ১৮৩ | ভারতীয় দর্শন প্রসঙ্গ | ২২১ | বৈদিক ধর্ম |
| ১৮৩ ১ | অধিবিদ্যা | ২২২ | উপনিষদ |
| ১৮৩.১১ | তত্ত্বাদি বিদ্যা | ২২৩ | গীতা |
| ১৮৩ ১৩ | সৃষ্টি তত্ত্ব | ২২৪ | ভক্তিবাদ |
| ১৮৩.১৬ | জীব, অজীব | ২২৪,১ | ভাগবত |
| ১৮৩.২ | অধিবিদ্যা প্রসঙ্গ | ২২৫ | পুরাণ |
| ১৮৩ ২৩ | মুক্তি | ২২৬ | তন্ত্র |
| ১৮৩.২৮ | আত্মা | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২২৭ | স্তোত্র, ইত্যাদি | ২৫৯ | মধ্য এশীয় বৌদ্ধ |
| ২২৮ | পৌরাণিক কাহিনী | ২৬০ | জৈন ধর্ম |
| ২২৯ | ভারতীয় সমাজ বিন্যাস | ২৭০ | খ্রীষ্টধর্ম |
| ২৩০ | হিন্দুধর্ম প্রাচীন | ২৮০ | মুসলমান ধর্ম |
| ২৩১ | শৈব | ২৮১ | কোরান |
| ২৩২ | শাক্ত | ২৮৪ | সুফি সম্প্রদায় |
| ২৩৩ | সৌরগাণপত্য | ২৯০ | অন্যান্য আলোচনা |
| ২৩৪ | বৈষ্ণব—মধ্যযুগ | ২৯১ | তুলনামূলক |
| ২৩৫ | বৈষ্ণব ধর্ম | ২৯২ ৫ | জরথুস্ত্র |
| ২৩৬ | মধ্যযুগীয় ধর্ম সংস্কারক | ২৯৩ | অবলুপ্ত ধর্ম |
| ২৩৭ | শিখ | ২৯৪ | প্রাগৈতিহাসিক পৌরাণিক |
| ২৩৮ | দক্ষিন ভারতীয় সংস্কারক | ৩৫৪ | ভারতীয় সমাজ বিজ্ঞান |
| ২৩৯ | বিবিধ | ৩৫৪.১ | পরিসংখ্যান |
| ২৪০ | হিন্দুধর্ম আধুনিক | ৩৫৪.২ | রাষ্ট্রনীতি |
| ২৪১ | ব্রাহ্ম সমাজ | ৩৫৪ ৩ | অর্থনীতি |
| ২৪২ | আর্য সমাজ | ৩৫৪.৪ | গ্রামীন কৃষি বিজ্ঞান |
| ২৪৩ | রামকৃষ্ণ মিশন | ৩৫৪.৫ | প্রশাসন পরিচালনা |
| ২৪৪ | আধুনিক সম্প্রদায় | ৩৫৪.৬ | সমাজ কল্যান |
| ২৪৪.৮ | শ্রীঅরবিন্দ | ৩৫৪.৭ | কুটির শিল্প |
| ২৪৫ | উত্তর ভারতীয় সম্প্রদায় | ৩৫৪,৮ | শিল্প, বাণিজ্য |
| ২৪৬ | বোম্বাই সম্প্রদায় | ৩৭৪ | ভারতীয় শিক্ষা |
| ২৪৭ | গুজরাট সম্প্রদায় | ৩৭৪.১ | শিক্ষক, শিক্ষাধারা, শৃঙ্খলা |
| ২৪৮ | দক্ষিণ ভারতীয় সম্প্রদায় | ৩৭৪.২ | প্রাথমিক বিদ্যালয় |
| ২৪৯ | বিবিধ | ৩৭৪.৩ | মাধ্যমিক বিদ্যালয় |
| ২৫০ | বৌদ্ধধর্ম | ৩৭৪.৪ | পাঠশালা, চতুষ্পাঠী, মক্তব |
| ২৫১-৫৪ | বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রাদি | ৩৭৪.৫ | পাঠক্রম |
| ২৫৫ | উত্তর ভারতীয় বৌদ্ধ | ৩৭৪.৬ | স্ত্রীশিক্ষা |
| ২৫৬ | তিব্বতী, লামাতন্ত্র | ৩৭৪.৭ | শিক্ষক-শিক্ষণ |
| ২৫৭ | চীনা বৌদ্ধ | ৩৭৪.৮ | কারিগরী শিক্ষা, |
| ২৫৮ | জাপানী বৌদ্ধ | | বিশেষ শিক্ষাক্রম |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৪১০ | ভারতীয় ভাষা | ৮১১.৩ | কালিদাস |
| ৪১১ | সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব | ৮১২ | সংস্কৃত নাটক |
| ৪১১.১ | সংস্কৃতের উৎপত্তি | ৮১৩ | খণ্ড কাব্য |
| ৪১১.৫ | ব্যাকরণ | ৮১৪ | গদ্যকাব্য |
| ৪১২ | প্রাকৃত ভাষাতত্ত্ব | ৮১৫ | চম্পুকাব্য |
| ৪১৩ | পালি | ৮১৬ | কথা সাহিত্য |
| ৪১৫ | আর্য ভাষাবর্গ | ৮১৮ | প্রাকৃত সাহিত্য |
| ৪১৫.৩ | হিন্দি | ৮১৯ | অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্য |
| ৪১৫.৪ | বাংলা | ৮১৯.৩ | হিন্দি সাহিত্য |
| ৪১৫.৪৯ | অসমীয়া | ৮১৯.৪ | বাংলা সাহিত্য |
| ৪১৫.৫ | ওড়িয়া | ৮১৯.৪১ | বাংলা কাব্য |
| ৪১৬ | মুণ্ডা ভাষাবর্গ | ৮১৯.৪৯ | অসমীয়া সাহিত্য |
| ৪১৭ | তিব্বত-চীন ভাষাবর্গ | ৮১৯.৫ | ওড়িয়া সাহিত্য |
| ৪১৭.১ | তিব্বতী | ৮১৯.৮ | দ্রাবিড় সাহিত্য |
| ৪১৮ | দ্রাবিড় ভাষাবর্গ | ৮২০ | ইংরেজি সাহিত্য |
| ৪১৯ | অস্ট্রো-এশিয় ভাষাবর্গ | ৮৬৯ | পর্তুগীজ সাহিত্য |
| ৪১৯.৩ | খাসি | ৮৮০ | গ্রীক সাহিত্য |
| ৪২০ | ইংরেজি | ৮৯০ | অন্যান্য ইয়োরোপীয় |
| ৪৬৯ | পর্তুগীজ | ৮৯১ | পশ্চিম এশীয় |
| ৪৮০ | গ্রীক | ৮৯১.৫ | পারসিক |
| ৪৯০ | অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষাবর্গ | ৮৯৪ | মধ্য এশীয় |
| ৪৯১ | ইন্দো-ইউরোপীয় | ৮৯৫ | এশীয় |
| ৪৯৫.১ | চীনা | ৮৯৫.১ | চীনা |
| ৪৯৫.২ | জাপানী | ৮৯৫.২ | জাপানী |
| ৪৯৬ | আফ্রিকার ভাষা ইত্যাদি | ৮৯৬ | আফ্রিকার সাহিত্য |
| | | ৯৫৪ | ভারতীয় ইতিহাস |
| ৮১০ | ভারতীয় সাহিত্য | ৯৫৪.১ | প্রাচীন যুগ |
| ৮১১ | সংস্কৃত মহাকাব্য | ৯৫৪.২ | মধ্যযুগ, মুসলমান পর্ব |
| ৮১১.১ | রামায়ন | ৯৫৪.৩ | পরিবর্তন যুগ |
| ৮১১.২ | মহাভারত | ৯৫৪.৪ | ব্রিটিশ পর্ব |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৯৫৪.৫ | স্বাধীনতা সমর | ৯৫৪.১:৯০ | বৃহত্তর ভারত |
| ৯৫৪.৬ | স্বাধীন ভারত | ৯৫৪.১:৯১ | চীনে ভারতীয় সংস্কৃতি |
| ৯৫৪ ৯ | বিভিন্ন প্রদেশ | ৯৫৪ ১:৯৩ | মধ্য এশীয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতি |
| ৯৫৪.১ | প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা | | |
| ৯৫৪.১:১০ | সাংস্কৃতিক ইতিহাস | ৯৫৪.১১ | প্রাক বৈদিক ইতিহাস |
| ৯৫৪.১:২০ | ধর্মীয় ইতিহাস | ৯৫৪.১৩ | মৌর্য ইতিহাস |
| ৯৫৪ ১:৩০ | সামাজিক ইতিহাস | ৯৫৪.১৫ | গুপ্ত যুগ |
| ৯৫৪ ১:৪০ | ভাষাতাত্ত্বিক ইতিহাস | ৯৫৪.১৯ | দক্ষিণ ভারত |
| ৯৫৪.১:৫০ | হিন্দু বিজ্ঞান | | ইত্যাদি |
| ৯৫৪.১:৭০ | শিল্প ইতিহাস | | |

এইভাবে প্রভাতকুমার-কৃত ছকে প্রয়োজন মতো প্রতি বর্গে ভারতীয় ও এশীয় বিষয়ের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। লক্ষণীয়. সব ক্ষেত্রেই একটা সাধারণ সূত্র ব্যবহৃত হয়েছে, যা'তে স্মরণীয়তা গুণ ব্যাহত হয়নি। যেমন ৪১০ এবং ৮১০, অথবা ৩৫৪ এবং ৯৫৪ বিভাগে এটা সহজেই নজরে পড়ে।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ডিউই ভিত্তিক একটি বাংলা গ্রন্থবর্গীকরণের ছকও তৈরি করেছেন। তবে এখানে তিনি তিন গাণিতিক সংখ্যার পরিবর্তে দুই সংখ্যা ব্যবহার করেছেন। এটিকে ইচ্ছে করলে যে কোনো ভারতীয় ভাষার ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যায়।

সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞান' গ্রন্থে ডিউই বর্গীকরণকে সম্প্রসারিত করে ভারতীয় বিষয়ের জন্য বিস্তারিত কার্যকরী তালিকা প্রস্তুত করেছেন। তবে তিনি প্রভাতকুমারের মতো মূল শ্রেণীকে ভেঙ্গে নেননি, মূল ছককেই প্রসারিত করেছেন। সম্প্রতি ডিউইর গ্রন্থের নূতন সংস্করণে এশীয় বিষয়গুলির জন্য ব্যবহারিক তালিকা তৈরীর দিকে নজর দেওয়া হয়েছে।

যদিও ডিউই দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতি ব্যবহারিক দিক থেকে সরল এবং সর্ব-প্রযোজ্য, তবু দেখা যায় এর মধ্যে অনেক অপূর্ণতা বা ফাঁক থেকে গিয়েছে। কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর মেলেনা। বিশেষ করে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁদের কিছু অসুবিধা ভোগ করতে হয়। কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা যাক।

(ক) কোনো নির্দ্দিষ্ট বই সম্পর্কে জ্ঞাতব্য— (১) যখন গ্রন্থটির বিশেষ কোনো সংস্করণ প্রয়োজন। একথা সকলেরই জানা আছে যে কোনো বই এর যখন নূতন সংস্করণ হয় তখন লেখক নানাবিধ পরিবর্তন, পরিবর্জন, সংশোধন, সংযোজন ক'রে থাকেন। এটা অপরিহার্য হয়, কেননা ঐ সময়ের মধ্যে হয়ত অনেক নূতন সূত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। বিশেষত বিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে তা হয়েই থাকে, এবং এই অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে হয় গ্রন্থকারকে।

এছাড়াও আরো অনেক কারণে অদলবদল, গ্রহণ বর্জন অপরিহার্য হয়। অনেক সময়ে নূতন সংস্করণে পুরানো প্রবন্ধ বর্জিত হয়, নূতন গ্রথিত হয়। গবেষণার প্রয়োজনে নূতন চিন্তাগুলি যেমন প্রয়োজন তেমনি পুরানো প্রবন্ধও দেখবার দরকার পড়ে। তখন পুরোনো সংস্করণের খোঁজ করতে হয়। (যেমন, রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' গ্রন্থের নূতন সংস্করণে সংগীতের মুক্তি' প্রবন্ধটি বর্জিত হয়েছে।)

(২) কোনো বইএর শেষতম সংস্করণ চাই।

(৩) কোনো বই এর প্রথম সংস্করণ চাই।

(৪) কোনো বই এর বিশেষ অনুবাদ গ্রন্থ চাই।

(৫) কোনো বই এর যাবতীয় অনুবাদ গ্রন্থ চাই।

(৬) কোনো বই এর সবগুলি মূল সংস্করণ এবং সবগুলি অনুবাদ-সংস্করণ চাই।

(৭) কোন গ্রন্থাগারে বা কোন বিশেষ সংগ্রহে প্রয়োজনীয় বইটি পেতে পারি।

(খ) অনেক বই সম্পর্কে জ্ঞাতব্য—

(এক) কোনো বিশেষ বিষয় সংক্রান্ত বই :

১) বিজ্ঞান অথবা শিল্প। যেমন, পদার্থবিদ্যা, শিল্পকথা, ইত্যাদি।

(২) বিজ্ঞান বা শিল্পের অংশবিশেষ। যেমন চুম্বকের কথা, সূচীশিল্প ইত্যাদি।

(৩) ঐ সকল বিষয়ের যাবতীয় লিখিত বই।

(দুই) লেখক কেন্দ্রিক বই :

(১) বিশেষ কোনো লেখকের বই। যেমন, রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী।

(২) বিশেষ লেখকের বিশেষ বিষয়ের বই। যেমন, রবীন্দ্রনাথ রচিত শিল্প প্রবন্ধাবলী।

(৩) স্থানীয় লেখকের বই। যেমন, বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকদের রচিত গ্রন্থাবলী।

(তিন) কোনো নির্দ্দিষ্ট সময়ে লেখা বই :

(১) বিশেষ শতাব্দি সংক্রান্ত। যেমন, উনবিংশ শতকে রচিত গ্রন্থ।

(২) বিশেষ শতাব্দিতে রচিত বিশেষ বিষয়ের গ্রন্থ। যেমন, উনবিংশ শতাব্দিতে রচিত বিজ্ঞানের বই।

(৩) কোনো বিশেষ স্থানে রচিত বিশেষ শতাব্দির বই। যেমন উনবিংশ শতাব্দিতে বাংলাদেশে রচিত গ্রন্থ।

(৪) কেনো বিশেষ ভাষায় রচিত বিশেষ শতাব্দির বই। যেমন, উনবিংশ শতাব্দিতে রচিত বাংলা ভাষার বই।

(চার) মুদ্রন-স্থান সংক্রান্ত

(১) কোনো দেশে বা রাজ্যে মুদ্রিত বই। যেমন, ভারতে মুদ্রিত বই.

(২) কোনো স্থানে মুদ্রিত বিশেষ বই। যেমন, শ্রীরামপুরে মুদ্রিত বাংলা বই।

(৩) কোনে বিশেষ মুদ্রক বা প্রকাশকের বই। যেমন, বিশ্বভারতীর বই।

(পাঁচ) বিশেষ সংস্করণের বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত বই। যেমন জীবনস্মৃতির চিত্রসংবলিত সংস্করণ।

এইসকল প্রশ্নের উত্তর আমরা স্থচীকরণের সহায়তায় পেতে পারি। কিন্তু বর্গীকরণের মধ্যেও এই তথ্যকে যদি ধরে রাখা যায় তাহলে তা সার্থক ও বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। রঙ্গনাথনের দ্বিবিন্দু বর্গীকরণে অন্তত এই চেষ্টা দেখি।

## সার্ব-দশমিক বর্গীকরণ

উপরোক্ত প্রশ্নাবলীর সমাধান যাতে কিছু পরিমাণে বর্গীকরণের মধ্যে মেলে সেই প্রচেষ্টায় ব্রাসেল্স্-এর আন্তর্জাতিক গ্রন্থ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে সর্বজনীন বা সার্ব দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতির,—অর্থাৎ ইউনিভার্সেল ডেসিমেল ক্লাসিফিকেশন, অথবা সংক্ষেপে ইউ. ডি. সি (UDC) পদ্ধতির স্থত্রপাত

উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রথম সভায় ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে দুই বেলজিয়াম-বাসী, হেনরী লা ফঁতেইন (Henry La Fontain) এবং পল অটলেট (Paul Otlet) সূচনা করেন আন্তর্জাতিক গ্রন্থপঞ্জী প্রতিষ্ঠানের ( Institut International de Bibliographie। উদ্দেশ্য পৃথিবীর তাবৎ মুদ্রিত পুস্তক পুস্তিকা ও পত্রিকার গ্রন্থপঞ্জী প্রনয়ণ। এজন্য উপযোগী বর্গীকরণ প্রকল্প হিসেবে ডিউই দশমিক পদ্ধতিটি তাঁদের পছন্দ হয়, কিন্তু কিছুটা মেজে ঘষে নেবার প্রয়োজন অনুভব করেন। এরই ফলে সার্ব দশমিক পদ্ধতির উদ্ভব।

সার্বদশমিক বর্গীকরণ মূলত ব্যবহারিক পদ্ধতি, বিশেষ বিশেষ বিষয়ের পুস্তক পুস্তিকা ও নথিপত্রের সুনির্দ্দিষ্ট সংকেত দেওয়াই এটির প্রধান লক্ষ্য; বর্গীকরণের দার্শনিক ভিত্তি বা তাত্ত্বিক প্রয়োগ এক্ষেত্রে গৌন। সূচী বা পঞ্জী প্রণয়নেরই পক্ষে এটির উপযুক্ততা, বই এর পুটে বর্গনির্দেশ এর মূল উদ্দেশ্য নয়। প্রতীক চিহ্ন বৃহৎ ও জটিল হয়ে যায় বলে একদিকে সাধারণ পাঠক যেমন বিভ্রান্ত বোধ করতে পারেন, অন্যদিকে তেমনি বিশেষ পাঠক প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সঠিকতম নির্দ্দেশ পান। দশমিক পদ্ধতিকে যথাসম্ভব সম্প্রসারণশীল করবার জন্য তিন অঙ্কের বদলে দুই বা এক অঙ্ক ব্যবহৃত হয়েছে। তিন অঙ্কের শূন্য বাদ দিয়ে এটিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বিভাজনের প্রতীক ক্ষেত্রে। এবং তিন অঙ্কের বিলুপ্তির ক্ষেত্রগুলিতে বাকি অঙ্কগুলিকেও বিভাজন প্রতীকের প্রয়োগে ব্যপ্তি দেওয়া হয়েছে। রঙ্গনাথনের বিস্তারণ নীতিগুলিকেও মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এই প্রকল্পে। প্রসারশীলতা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খতা গুণই এই প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য।

সার্বদশমিক বর্গীকরণের মূল সূত্র হিসেবে দেখা যায় এটি দশমিক বর্গীকরণের শ্রেণীকরণ মেনে চলে, জ্ঞান সামগ্রীর বিভাজন দশটি শ্রেণীতে দ্বিতীয়ত, দশমিক চিহ্ন প্রয়োগে বিভাজনের রীতিই মেনে চলে। কিন্তু বিষয়গুলির নানান সম্বন্ধ-নির্ধারণ এবং দৃষ্টিকোণ ইত্যাদি অন্যান্য প্রসঙ্গ নিরূপনের জন্য কতকগুলি বাড়তি সংকেত চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

শ্রেণীবিভাগ ডিউইরই মতো দশটি, অর্থাৎ ০ থেকে ৯ পর্যন্ত। তবে ডিউই যেমন তিনটি সংখ্যা নিয়ে বিভাগ করেছেন, এক্ষেত্রে সেখানে দু'টি,—এমন কি একটি সংখ্যাতেই কাজ চলেছে। প্রকৃতপক্ষে, একবার বিভাগ নির্দেশ করে দেবার পর এই সংখ্যাগুলির আর বড় একটা কাজ

থাকেনা। ডিউইতে যেমন তিনটি সংখ্যার পর দশমিক চিহ্ন আসে, এখানে তা নয়। দশমিকের ব্যবহার প্রয়োজন মতো দুই বা ততোধিকবার হতে পারে। এর কাজ সূচীকৃত তালিকাপত্রগুলিকে ঠিকমতো বাক্সে সাজানো। প্রাথমিক দশটি বিভাগ ডিউইর মতো হলেও ব্যবহারের পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। যেমনঃ—

| ডিউই | ইউ ডি সি |
|---|---|
| ৯০০ ইতিহাস | ৯ ইতিহাস |
| ৯১০ ভূগোল | ৯১ ভূগোল |
| ৯১৩ প্রত্নতত্ত্ব | ৯১৩ প্রত্নতত্ত্ব |
| ৯২০ জীবনী | ৯২ জীবনী |

সার্বদশমিকে ইতিহাস শ্রেণীতে দেশ-অনুসারী বিভাগগুলি বন্ধনীর সাহায্যে চিহ্নিত। যেমন, —

| | |
|---|---|
| ৯ [৪২] | ইংলণ্ডের ইতিহাস |
| ৯১ [৪২] | ইংলণ্ডের ভূগোল, ভ্রমণ |
| ৯ [৭৩] | আমেরিকার ইতিহাস |
| ৯১ [৭৩] | আমেরিকার ভূগোল, ভ্রমণ |

এই পদ্ধতিতে বিষয়ের সূক্ষ্মতম বিভাগ উপবিভাগ করা যায়। তবে তার ফলে বর্গ সংখ্যা বড় হয়ে পড়ে। বড় হলেও ডিউইর তুলনায় ছোট ও সরল। যেমন :—

| | |
|---|---|
| ৫৫১.৩ | বহিঃস্তর ভূবিদ্যা |
| ৫৫১,৩১ | স্তরগত গঠন প্রকৃতি |
| ৫৫১.৩১১ | বায়বীয় ও প্রাদেশিক অবক্ষয় |
| ৫৫১.৩১১,১ | তাপজনিত অবক্ষয়ের রূপ প্রকৃতি |
| ৫৫১.৩১৪.১২ | হিমবাহ |
| ৫৫১.৩১১.১২১ | হিমবাহের উৎপত্তি ও প্রকৃতি |

দশমিক চিহ্ন ছাড়া আরো কয়েকটি চিহ্নপ্রতীক উপবিভাগের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা—

\+ যোগচিহ্ন। একই গ্রন্থে আলোচিত দু'টি বিষয় বোঝবার জন্য, যেমন, খনিবিদ্যা ও ধাতুবিদ্যা বিষয়ক বইএর সার্বদশমিক বর্গ সংখ্যা ৬৬২+৬৬৯ ডিউইতে উক্ত দু'টি বিষয়ের মধ্যে প্রধানতম অথবা প্রথমটি অনুযায়ী

বর্গ সংখ্যা বসাতে হয়। দ্বিতীয়টির জন্য সাহায্য নিতে হয় সূচীকরণের।

/ আড়াআড়ি দাগটি 'হইতে' চিহ্ন। কোনো গ্রন্থে যদি ধারাবাহিক ভাবে দুটির বেশী বিষয় আলোচিত হয়ে থাকে তখন এটি ব্যবহৃত হয়. যেমন, আবাসিক গৃহ ও তার উপকরণ ৬৪৩/৬৪৫, অর্থাৎ ৬৪৩+৬৪৪+৬৭৫; ক্রমিক প্রাণীবিদ্যা ৫৯২ ৫৯৯, অর্থাৎ ৫৯২ থেকে ৫৯৯ পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি।

: সম্বন্ধ জ্ঞাপক চিহ্ন। দুই বা ততোধিক বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ বিচার যে গ্রন্থে থাকে সেক্ষেত্রে এই কোলন চিহ্নের ব্যবহার। যেমন. কৃষি বিষয়ক পরিসংখ্যান ৬৩ : ৩১ ; কিন্তু যদি এতে পরিসংখ্যান বিষয়গত প্রাধান্য পেয়ে থাকে তবে বর্গ সংখ্যা ৩১ : ৬৩ হবে। কোলন চিহ্নের ব্যবহারে বিশ্লেষণকে অনেক দূর পর্যন্ত টেনে নেওয়া যায়, যেমন, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের পাঠক্রম ৩৭৩.৫ : ৩৭১.২১৪ : ৫।

[ ] কোলনের বদলে দ্বিতীয় বন্ধনী চিহ্নের ব্যবহার হ'তে পারে সেইসব গ্রন্থের ক্ষেত্রে যেখানে সম্বন্ধ সূচক দ্বিতীয় বিষয়টি অপ্রধান। যেমন, শিক্ষায় ধর্মপ্রসঙ্গ ৩৭ [২] ; এখানে ধর্ম শিক্ষা বিষয়ক আলোচনার পরিপূরক অংশ মাত্র।

= সমতাবাচক চিহ্ন। এর ব্যবহার ভাষা বিভাগের জন্য, যেমন. =২ অর্থে ইংরেজি ভাষার বই, =৩ অর্থে জার্মান ভাষার বই ; জার্মান ভাষায় লিখিত গ্রন্থ বিদ্যার বই ০:০=৩ ; জার্মান ভাষায় উদ্ভিদ বিদ্যার ইতিহাস ৫৮ (০৯)=৩। দুই ভাষার জন্য সংকেত =০০ ; বহু ভাষার জন্য =০৮৩।

(০) বন্ধনীর মধ্যে শূন্য, —আকারগত বিভাগের প্রতীক। ডিউইর ·০১—·০৯ এর মতো এর ব্যাবহার, কিন্তু তত্ত্ব ও শিক্ষণ উপবিভাগে ব্যবহার লক্ষনীয় ভাবে স্বতন্ত্র, —কোলনের পরে ১ বা ৩৭ দিয়ে এটি চিহ্নিত করা হয়। যেমন, ৫৮ (০৯) উদ্ভিদ বিদ্যার ইতিহাস, ৫৩ (০৩) পদার্থ বিদ্যার অভিধান। কিন্তু উদ্ভিদ বিদ্যার তাত্ত্বিক আলোচনা ৫৮ : ১, পদার্থ বিদ্যার শিক্ষা ও শিক্ষণবিধি ৫৩ : ৩৭।

( ) প্রথম বন্ধনী, —স্থানিক উপবিভাগ নির্দেশক। যেমন, ৩৮৫ (৪২) অর্থে ইংলণ্ডের রেলপথ, ৫৫ (৪৪) ফরাসী দেশের ভূবিদ্যা।

(=) বন্ধনীরভুক্ত সমতা চিহ্ন, —গোত্র ও জাতি নির্দেশক চিহ্ন। নৃতাত্ত্বিক ধারা নির্ধারণের জন্য এর ব্যবহার। যেমন ভারতীয় লোকসঙ্গীত

৭৮৪.৪ (=৫৪)।

" " উক্তি বোধক চিহ্ন কাল নির্বাচক। এর সহায়তায় সার্বদশমিক পদ্ধতি বছর, মাস ও দিন পর্যন্ত নির্ধারণ করার স্পর্ধা রাখে। যেমন "১৯৭৩·০৬·০২" ২রা জুন ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দ। বই এর কাল নির্দেশে যেমন, ৯৪২"১০৬৬" অর্থে নর্মান বিজয়কালের ইংলণ্ডের ইতিহাস।

·০০ দশমিক শূন্য শূন্য,—দৃষ্টিকোণ নির্দেশক। এর কতকগুলি ধারা নির্ণয় করা আছে। ·০০১ নির্দেশ তাত্ত্বিক বা বিশ্লেষণাত্মক ইত্যাদি জাতীয় দৃষ্টিকোণ. ·০০৩ আর্থনতিক বা বানিজ্যিক প্রভৃতি দৃষ্টিকোণ নির্দেশক, ·০০৭ কর্মী বা কর্ম সংক্রান্ত উপবিভাগ. ইত্যাদি। যেমন, ৬২২·০০৭ খনি কর্মী।

- হাইফেন এবং দশমিক শূন্য চিহ্নের ব্যবস্থার আন্ত-বিষয়ক উপবিভাগে ; বিভিন্ন শ্রেণীতে এটির ব্যবহারের বিভিন্ন ধারা।

·০ এই সকল চিহ্নের প্রয়োগে বিশদ বর্গীকরণ সম্ভব হলেও স্মরণীয়তা গুন ব্যহত হয়। প্রকরণের সংক্ষিপ্ততা ও সরলতাও কম। ফলে ব্যবহার বিধি জটিল মনে হওয়া স্বাভাবিক। তবে একবার আয়ত্ত করতে পারলে সার্বদশমিক পদ্ধতি গবেষণা ও গভীর সন্ধানের ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক।

## প্রসারশীল বর্গীকরণ ( Expansive Classification )

বিশিষ্ট মার্কিন গ্রন্থাগারিক চার্লস্ এমি কাটার (১৮৩৭-১৯০৩) ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রসারশীল বর্গীকরণের সূত্রপাত করেন। বিখ্যাত বার্টন এথেনিয়ামের গ্রন্থাগারিক ছিলেন তিনি। বেকনের দার্শনিক পুস্তক শ্রেণীকরণের ভিত্তিতে তাঁর পদ্ধতি গ্রথিত। ক্রমিক ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করার ফলে তাঁর শ্রেণীবিভাগ যুক্তিভিত্তিক হয়ে উঠেছে। অবশ্য ডিউই পদ্ধতির থেকে বেশী কিছু নূতন জিনিস এতে নেই। তবে তিনি দফায় দফায় এমনভাবে **এটি** রচনা করেছেন যে গ্রামের ছোট গ্রন্থাগার থেকে সুরু করে জাতীয় গ্রন্থাগার পর্যন্ত এর ফলে উপকৃত হবে বলে তিনি যে দাবী করেছেন তা হয়ত অযৌক্তিক নয়। গাণিতিক সংখ্যার পরিবর্তে ইংরেজি বর্ণমালার ব্যবহার মূল শ্রেণীকে বিস্তৃত ভিত্তি দিয়েছে। এর সঙ্গে উপবিভাগ নির্দেশের জন্য ০ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা

ব্যবহৃত হয়েছে। বিষয় বিন্যাস নিম্নরূপ :—

A সাধারণী
B দর্শন BR ধর্ম
C খ্রীষ্ট ও য়িহুদি ধর্ম
D গির্জা ও যাজক সংক্রান্ত ইতিহাস
E জীবনী
F ইতিহাস, বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ
G ভূগোল ও ভ্রমন
H সমাজ বিজ্ঞান
I লৌকিক সমাজবিদ্যা
J পৌরনীতি. রাষ্ট্রনীতি, ও শাসনতন্ত্র
K আইন সমাজবিধি
L বিজ্ঞান. ও প্রজ্ঞান,—সাধারণ
M প্রাকৃত বিজ্ঞান, ভূবিদ্যা, জীববিদ্যা
N উদ্ভিদ বিজ্ঞান
O প্রাণী বিজ্ঞান
P নৃতত্ব, নৃবিদ্যা PW নৃনীতি
Q চিকিৎসা বিদ্যা
R ব্যবহারিক শিল্প, প্রকৌশল
S পূর্তবিদ্যা, বাস্তশিল্প
T উৎপাদন শিল্প, কারু শিল্প
U সমর বিজ্ঞান, সামরিক বিদ্যা
V বিনোদন, ক্রীড়া, সংগীত ও নৃত্য উৎসব
W চারুশিল্প, চিত্রাঙ্কন
X ভাষাবিজ্ঞান
Y সাহিত্য YF উপন্যাস
Z পুস্তক শিল্প ZQ গ্রন্থাগার

প্রকারগত উপবিভাগের জন্য দশমিক চিহ্ন সমেত গাণিতিক সংখ্যার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। তালিকা নিম্নরূপ :—

·১ তত্ত্ব ও দর্শন

·২ গ্রন্থপঞ্জী

·৩ জীবনী

·৪ ইতিহাস

·৫ অভিধান, কোষ

·৬ বর্ষপঞ্জী, সারগ্রন্থ, নির্দেশক

·৭ সাময়িকী

·৮ সংস্থা, সমিতি, প্রতিষ্ঠান

·৯ সংগ্রহ, গ্রন্থাবলী

এর পরে আছে ভৌগলিক বিভাগের সংখ্যানির্দেশ, যার জন্য ছুটি করে সংখ্যার ব্যবহার,—১১ থেকে ৯৯ পর্যন্ত, এমনকি দশমিক প্রয়োগে এই সংখ্যাকে আরো প্রসারিত করা যায়। যেমন, ১১ পৃথিবী, ১২ ভ্রমন, ৩০ ইউরোপ, ৩৯ ফ্রান্স, ৪৫ ইংলণ্ড, ৪৭ জার্মানি, ৬০ এশিয়া, ৭০ আফ্রিকা, ৮০ আমেরিকা, ৮৩ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইত্যাদি। গ্রন্থবর্গীকরণের ব্যবহারিক কিছু নমুনা :—

ZQ গ্রন্থাগার ZQ·7 গ্রন্থাগার পত্রিকা

F ইতিহাস F 45 ইংলণ্ডের ইতিহাস

IU47 জার্মানির বিদ্যালয়

IU47·4 জার্মানির বিদ্যালয়ের ইতিহাস।

কাটার তাঁর এই বর্গীকরণ পদ্ধতি সুরু করেছিলেন ছোট ও সহজ সূত্র ধ'রে। ক্রমিক পর্যায়ে সাতটি শ্রেণী বিস্তারের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হন। প্রথমে যে বিভাগ তিনি করেন তা সংক্ষিপ্ত এবং সর্বানুকূল। মাত্র আটটি বর্ণ-সংবলিত বিভাগে সেটির চেহারা ছিল এইরকম :—

A সাধারণ শ্রেণী

B দর্শন ও ধর্ম

E ইতিহাস, ভূগোল, ভ্রমণ, জীবনী

H সমাজ বিজ্ঞান

L শিল্প ও বিজ্ঞান

X ভাষাবর্গ

Y সাহিত্য, গ্রন্থপঞ্জী, গ্রন্থশিল্প YF উপন্যাস

এই পদ্ধতি গ্রন্থাগারের ক্রমবর্ধমান আয়তন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ক্রমিক

বিস্তারে সপ্তম পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে ব'লে এটির নাম প্রসারশীল (expansive) বর্গীকরণ। এই পদ্ধতি খুব বেশী চালু না হলেও তাঁর নাম গ্রন্থাগারজগতে স্মরণীয় হয়ে আছে অপর দু'টি অবদানের জন্য.— তৎকৃত গ্রন্থকারাঙ্ক (author mark) এবং আভিধানিক সূচীকারন।

## বিষয়ানুক্রমিক বর্গীকরণ ( Subject Classification )

ইংলণ্ডের বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক জেম্‌স্ ডাফ ব্রাউন (১৮৬২—১৯১৪) ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বিষয়ানুক্রমিক বর্গীকরণের সূত্র প্রস্তুত করেন। আমেরিকার ডিউই পদ্ধতির মত ইংলণ্ডে ছিল এর মর্যাদা। ব্রাউন ছিলেন ক্লার্কেনওয়েল জন গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ। ম্যানুএল অফ লাইব্রেরি ইকনমি' গ্রন্থের জন্য ব্রাউনের নাম গ্রন্থাগার জগতে অমর হয়ে আছে।

বিষয়ানুক্রমিক বর্গীকরণ পদ্ধতির মূল উপাদান হিসেবে তিনি প্রত্যেক বিষয়ের জন্য একটি অপরিবর্তনীয় স্থান নির্দেশ ক'রে দিয়েছেন। ডিউই পদ্ধতির সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে দেখি, সেখানে খনিজবিদ্যার অর্থ নৈতিক প্রসঙ্গে এবং খনিজ পদার্থ যেমন স্বতন্ত্র বিভাগে বিবৃত, ব্রাউন পদ্ধতিতে তা নয়। ডিউই খনিজ পদার্থ হিসেবে কয়লা এবং কয়লার অর্থনৈতিক প্রভাব—এই দু'টিকে স্বতন্ত্র বর্গে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু ব্রাউন কয়লা-কেই প্রধান শ্রেণী হিসেবে গণ্য ক'রে তার মধ্যেই অর্থ নৈতিক প্রভাবেরও স্থান নির্দ্দেশ করেছেন। কয়লার খনি, কয়লার ব্যবসায় বা অর্থনীতিতে কয়লার স্থান একই শ্রেণীভুক্ত হওয়াতে কয়লা বস্তুটিই মূল বিষয় হয়ে উঠেছে। তেমনি 'গোলাপ' বিচার্য হয়েছে উদ্ভিদবিদ্যা, উদ্যান, ইতিহাস ভূগোল, গৃহসজ্জা, প্রতীক, পুষ্পপঞ্জী ইত্যাদি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। তাঁর মতে কোনো পাঠক যদি গোলাপ সম্পর্কে কিছু জানতে চান তবে 'গোলাপ' শ্রেণী থেকে সর্ববিধ দৃষ্টিকোণের উপযোগী বিবরণ পেলেই তাঁর সুবিধা, এবং এজন্য উদ্যান বা উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি বিষয় শ্রেণীর মধ্য থেকে গোলাপের প্রসঙ্গ বা'র করা জটিল ব্যাপার। পরন্তু, বিষয়ানুগ বর্গীকরণে গোলাপ বিষয়ক যাবতীয় বই একই সারিতে পাওয়া যায় বলে কাজ সহজ হয়। এইরকম শ্রেণীবিভাগের ফলে একদিকে যেমন অর্থনীতি তার ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে চ্যুত হচ্ছে, অথবা উদ্যান চ্যুত

হচ্ছে, উদ্ভিজ্য দৃষ্টিকোণ থেকে, তেমনি আবার একই বিভাগের মধ্যে কয়লা বা গোলাপ সংক্রান্ত যাবতীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মিলছে। ডিউইতে কয়লা বা গোলাপ শ্রেণী অনুযায়ী বারবার স্থানবদল করছে। ব্রাউনে তা'র বদলে শ্রেণীবিভাগ ঘুরে ফিরে আসছে বিষয়ের সঙ্গে। অন্যান্য বর্গীকরণে আমরা বিষয় থেকে বস্তুতে আসি এখানে বস্তুই হয়ে উঠেছে প্রধান বিষয়।

ব্রাউনের এই বিষয়ানুগ শ্রেণীবিভাগ সমগ্র বিদ্যধারার যুক্তিপূর্ণ পারম্পর্য অনুযায়ী সাজাবার চেষ্টা করা হয়েছে। এই শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি হিসেবে তিনি কয়েকটি বৈজ্ঞানিক রীতিবদ্ধ নীতি বা নিয়ম অনুসরণ করেছেন. ধারাবাহিক পর্যায়ে সেগুলি হল বস্তু ও বেগ, প্রাণ ও জীবন, মন ও চিন্তা, স্মৃতি ও বিবরণ। এই নীতির পিছনে ব্যুৎপত্তিগত দর্শন কাজ করেছে। শিল্প বা বিজ্ঞান উৎপন্ন বেগ ও বস্তুর অনুভূতি থেকে। এই অনুভূতির ফলে আসে প্রাণ বা জীবন, যার থেকে উৎপত্তি মন বা চিন্তার। এবং এই চিন্তাধারার ফলস্বরূপ পাই স্মৃতি এবং বিবরণ। বর্গীকরণের এই ভিত্তি অনুযায়ী,—এবং বর্গ প্রয়োজনে এর সঙ্গে সাধারণী বিভাগ যুক্ত করে শ্রেণীক্রম হয়েছে নিম্নরূপ :—

A — সাধারনী

বস্তু ও বেগ

B, C, D — প্রাকৃত বিজ্ঞান সমূহ

প্রাণ ও জীবন

E, F — জৈব বিজ্ঞান সমূহ

E 0 — জীববিদ্যা

E I — উদ্ভিদবিদ্যা

F 0 — প্রাণিবিদ্যা

G, H — নৃবিদ্যা, চিকিৎসা বিজ্ঞান

I — অর্থ-নৈতিক জীববিদ্যা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান

I 0 — কৃষি বিজ্ঞান

মন ও চিন্তা

J, K — দর্শন ও ধর্ম

L — সমাজ বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান

L 0 — সমাজনীতি
L 1 — রাষ্ট্রনীতি
L 4 — আইন

স্মৃতি ও বিবরণ

M — ভাষা ও সাহিত্য
N — লিখনশৈলী ( কাব্য, নাটক, ইং )
O থেকে W — ইতিহাস ও ভূগোল
X – জীবনী

এই ভিত্তিতে বিষয়-বিভাগ ক'রে নেবার পর উপবিভাগের বিস্তৃত বর্গচিহ্নের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে গাণিতিক সংখ্যা। যেমন, $M_1$ সাহিত্য, সাধারণ; $M_2$ আফ্রিকার ভাষা ও সাহিত্য; $M_5$ ইউরোপীয় ভাষা ও সাহিত্য; No উপন্যাস; $N_1$ কাব্য; $N_2$ নাটক; ইত্যাদি। উপবিভাগের প্রয়োজনে তিনটি গাণিত সংখ্যার ব্যবহার করা হয়েছে। উপবিভাগের বিস্তৃতির ধারা এই রকম, —$C_2$ যদি পদার্থ বিত্তার তাপ-বিভাগের চিহ্ন হয় তাহলে তিন সংখ্যার নিয়মে এটিকে $C_{200}$ ধ'রে নিয়ে তার বিস্তার দাঁড়ায় $C_{201}$ প্রজ্বালন, $C_{206}$ চুল্লী, $C_{270}$ বাষ্পীয় ইঞ্জিন, ইত্যাদি।

ডিউইর সাধারণ উপবিভাগের অনুরূপ ব্রাউনেও বিস্তারিত বিভাগ-নির্দেশ আছে। যেমন :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| ·০ | সাধারনী | ·০০ | তালিকা, সূচী |
| ·১ | গ্রন্থপঞ্জী | ·১০ | ইতিহাস |
| ·১৭ | সামাজিক ইতিহাস | ·১৮ | সামরিক ইতিহাস |
| ২ | অভিধান, কোষ | ·৩ | পাঠ্যপুস্তক |
| ·৪ | সাধারণ পাঠ | ·৪০ | মানচিত্র |
| ·৪১ | জীবনী | ·৪২ | বংশলতিকা |
| ·৫ | তত্ত্ব, দর্শন | ·৫০৭ | রোগ |
| ·৬ | সমিতি | ·৬০২ | পরিচ্ছদ |
| ·৭ | সাময়িকী, সমালোচনা | ·৭৬০ | অর্থনীতি |
| ·৮ | সংগ্রহ | ·৮৭ | যুক্তি |
| ·৯ | বিশেষ গ্রন্থকার | | ইত্যাদি ইত্যাদি। |

গ্রন্থ-বর্গীকরণের কয়েকটি নমুনা নিম্নরূপ :—

B 000 পদার্থ বিদ্যা
B 000·1 পদার্থ বিদ্যার গ্রন্থপঞ্জী
B 000.2 পদার্থ বিদ্যার অভিধান, পদার্থ কোষ
B 000.10 পদার্থ বিদ্যার ইতিহাস
S 600.10 জার্মানীর ইতিহাস
S 706.10 ফ্রেডারিক দি গ্রেটের সময়ের জার্মানীর ইতিহাস
S 725.10 বার্লিনের ইতিহাস

বিষয়ানুক্রমিক বর্গীকরণের প্রতীক চিহ্ন মিশ্রিত প্রকৃতির হওয়াতে এবং আকার ও প্রকারগত উপবিভাগ কিছু পরিমাণে জটিল হওয়ার জন্য কিছুটা অসুবিধা যে না হয় তা নয়। উপরন্তু বিষয় নির্দেশ সূচী অপরিবর্তনীয় এবং সম্বন্ধ-বিযুক্ত হবার জন্য আমরা একই বিষয়ের বিভিন্ন দিক-নির্দেশ পাইনা। যেমন, 'বৃক্ষ' এই বিষয়ের সঙ্গে এর বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের নির্দেশ ও থাকা উচিত ছিল। বিশেষত যখন দেখা যায় তিনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ( যেমন, খাদ্যের পুষ্টিকরতা ) আপেক্ষিক স্থানের উল্লেখ করেছেন।

## গ্রন্থবৃত্ত বর্গীকরণ ( Bibliographic Classification )

সুবিখ্যাত 'জ্ঞানের বিন্যাস' বা Organization of knowledge গ্রন্থের লেখক চিন্তাশীল মার্কিন গ্রন্থাগারিক হেন্‌রি ইভলিন ব্লিস্ ( ১৮৭০—১৯৫৫ ) ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 'গ্রন্থবৃত্ত বর্গীকরণ পদ্ধতির গোড়া পত্তন করেন। ব্লিস্ ছিলেন নিউ ইয়র্ক সিটি কলেজের গ্রন্থাগারিক। জ্ঞানের উৎস ও পারম্পর্য এবং বিভিন্ন বিষয় ও বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্কের ধারাবাহিকতাকে ভিত্তি ক'রে তিনি এই সুচিন্তিত সুপরিকল্পিত বর্গীকরণ পদ্ধতি প্রণয়ন করেন। তাঁর মতে সব জিনিসেরই ধারাবিন্যাস সম্ভব, এবং এই ধারাবিন্যস্ত সামগ্রীই জ্ঞানের শ্রেণীবদ্ধতার ভিত্তি। এই শ্রেণী-সংবদ্ধতা বিভিন্ন জ্ঞানীগুনীর জ্ঞান-কাণ্ডের ব্যবহার এবং উপযোগীতার উপরে নির্ভর করে. জ্ঞানকাণ্ডের বিভিন্ন শাখার সংবদ্ধতাই শ্রেণীকরণের প্রণালী নির্ণয় করে, এবং এই প্রণালীই গ্রন্থবর্গীকরণের মূল ভিত্তি। তিনি বলেন জ্ঞানের ধারা নির্ণয় করতে হবে বিজ্ঞানগত ও শিক্ষাগত ঐক্য সূত্রে। ব্লিস্-কৃত ছকের লক্ষনীয় সূত্রাবলী :

বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ক্রমনির্ণয় সাধারণ থেকে বিশেষ সঞ্চারন ; অনুক্রমিক নির্ভরতা—যুক্তিসম্মত, বিকাশগত ও শিক্ষাকেন্দ্রিক ; সর্বাধিক কার্যকরতা— পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত অধিক সংখ্যক বিষয়ের একত্র সন্নিবেশ। 'জ্ঞানের বিন্যাস' গ্রন্থে তিনি নিম্নোক্ত পাঁচটি প্রাথমিক পর্যায়ে জ্ঞানের শ্রেণী বিন্যাস করেছেন—

১। প্রাকৃতিক ধারা, —বস্তুর উৎপত্তি বা সংঘটন সংক্রান্ত ( তত্ত্বাদি বিচার সংক্রান্ত নয় )।

২। জ্ঞান-বিকাশ ধারা, —বিদ্যানুশীলনের ঐতিহাসিক বিকাশ সংক্রান্ত।

৩। শিক্ষা-বিজ্ঞানগত ধারা, —বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষা ও শিক্ষণের, জ্ঞানার্জনের ও বিশ্লেষণের ধারা সংক্রান্ত।

৪। ভানের যৌক্তিক ধারা, —বিশুদ্ধ প্রাকৃত বিজ্ঞানের ধারা অনুযায়ী জ্ঞানের বিস্তৃতি।

৫। বিশেষ ধারা, —বাস্তব অধ্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিস্তৃতি।

গ্রন্থবৃত্ত বর্গীকরণের মূল নীতি নিম্নরূপ :—

(১) ঐকাসূত্র (Consensus)। বিষয়াবলীর বিন্যাস ধারাই বর্গীকরণের ভিত্তি। এই বিন্যাস ধারার প্রাকৃতিক ভিত্তিই বৈজ্ঞানিক তথা শিক্ষাবিদদের সহায়ক, কেননা বিদ্যার্জন ও অধ্যায়নের ধারা ধ'রেই জ্ঞানের প্রকাশ। জ্ঞানের বিশদ শ্রেণীবিভাগ, তাদের পরিধি ও প্রসার এবং পারস্পরিক সম্বন্ধ এই ঐক্যসূত্রে বিধৃত। এই ঐক্য যে পদ্ধতিতে যত বেশি সেটি তত দৃঢ়, বিস্তার সাপেক্ষ এবং কার্যকরী।

(২) নির্ভরতা ( Subordination )। অর্থাৎ ন্যূনতর ব্যাপকতার সূত্র। পদ্ধতিটি এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে বিষয়ের বিশদতা থেকে বিশেষের দিকে সরলভাবে আসা যায়। এই সঙ্গে থাকা দরকার বিশেষত্বের ক্রমবিন্যাস সূত্র। ব্লিস্ বলেন, বিশেষ বিজ্ঞান সাধারণ বিজ্ঞানের উপরে নির্ভরশীল। যেমন, পদার্থবিদ্যা বস্তু ও বেগ সঞ্জাত, কিন্তু রসায়ণ শাস্ত্র আরেক ধাপ এগিয়ে মূর্ত সামগ্রীর বস্তুতত্ত্ব ও বেগ নিয়ে কারবার করে। সুতরাং রসায়ণ শাস্ত্র পদার্থ বিদ্যার চেয়ে বিষয় হিসাবে বিশেষ। তেমনি জ্যোতিবিদ্যা পদার্থ তথা রসায়ণ শাস্ত্র অপেক্ষা বিশেষ শ্রেণীর দাবী করতে পারে। এবং ভূবিদ্যা জ্যোতিবিদ্যার চেয়েও আরেক ধাপ প্রাগ্রসর।

(৩) বিন্যাস Collocation )। নিকট-সম্বন্ধযুক্ত বিষয় সমূহের কাছাকাছি

সন্নিবেশ। অর্থাৎ, সাদৃশ্যসম্পন্ন বিষয়গুলিকে একসূত্রে বাঁধা। পূর্ববর্তী সূত্রানুসারে বিষয়ের শ্রেণী-ক্রম এবং শৃঙ্খলা নির্ণীত হবার পরে এই পর্যায়ে এসে তার সমন্বয়সূত্র পাওয়া যায়। যেমন, ভাষা সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত যোগাযোগের মাধ্যম হ'লেও সাহিত্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। ব্লিস্ এ দু'টির একত্র বিন্যাস করেছেন। তেমনি ভাবেই, শিক্ষাকে সমাজ বিজ্ঞানের অঙ্গ হিসেবে গণ্য না ক'রে গুণবিচারে মনস্তত্ত্বের সঙ্গে সেটির বিন্যাস করেছেন। রাসায়নের শিল্পকে স্থান দিয়েছেন রসায়নের সঙ্গে।

(৪) বিকল্প প্রয়োগ (alternatives)— বিভিন্ন শ্রেণী ও বর্গীকরণ পদ্ধতির প্রাসঙ্গিকতা এবং বিকল্পতা ব্লিস পদ্ধতির আরেক বৈশিষ্ট্য। ঐক্য সূত্রের যুক্তিকতার সঙ্গে ব্যবহারিকতার সাযুজ্য সাধনের জন্য তিনি বিকল্প চিহ্ন প্রয়োগের স্বাধীনতা রেখেছেন। যেমন, বিমান শিল্প বা পোত শিল্পকে ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান থেকে সরিয়ে ব্যবহারিক শিল্পে উপস্থাপনের অথবা আন্তর্জাতিক আইনকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং আইন শ্রেণীতে উপস্থাপনের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।

(৫) প্রতীক (Notation)— প্রতীক চিহ্ন তিন নীতি নির্ভর; আপেক্ষিকতা, সংক্ষিপ্ততা ও সরলতা। ব্লিসের প্রতীকচিহ্ন আপেক্ষিক বা সহায়ক—ধারা নির্দেশক নয়। সংক্ষিপ্ততা সম্পর্কে তিনি বলেন, দৈর্ঘ তিন বা চার চিহ্নের (হরফ বা সংখ্যা বেশি হবেনা। তৃতীয়ত, তিনি বলেন, প্রতীক সর্বতোভাবে সরল সমন্বয় নীতি মেনে চলবে,—গঠনে এবং প্রয়োগে। এজন্য তিনি বিশেষ ধারাবাহিক তালিকা তৈরী করেছেন যৌগিক বিষয়াবলীর জন্য।

গ্রন্থবৃত্ত বর্গীকরণে ব্লিস পাঁচটি জ্ঞান শ্রেণীকে মূল ভিত্তি করেছেন, যথা,—দর্শন বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রকৌশল ও শিল্প। মূল বিভাজন প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে। বর্গীকরণ নিম্নরূপ :—

মূল শ্রেণীবিভাগ (Main classes)

A দর্শন ও সাধারণ বিজ্ঞান, —তর্কশাস্ত্র, গণিত, মাত্রাবিজ্ঞান ও পরিসংখ্যান সমেত।

B পদার্থবিজ্ঞান,—ফলিত পদার্থবিদ্যা ও ব্যবহারিক পদার্থশিল্পসমেত।

C রসায়ন বিজ্ঞান,—রাসায়নিক শিল্প ও খনিবিদ্যা সমেত

D জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূবিদ্যা, ভূগোল এবং প্রাকৃতিক ইতিহাস
E জীববিজ্ঞান,—জীবাশ্মবিদ্যা ও জৈবভূগোল সহ
F উদ্ভিদবিজ্ঞান,—জীবাণুতত্ত্বসহ
G প্রাণিবিজ্ঞান.—ভৌগলিক ও অর্থনীতিক প্রাণিবিদ্যা সমেত
H নৃবিজ্ঞান.—চিকিৎসাবিদ্যা, স্বাস্থ্যবিদ্যা, বিনোদন ইত্যাদি সমেত
I মনোবিজ্ঞান,—মনঃসমীক্ষণ সহ
J শিক্ষাবিজ্ঞান
K সমাজবিজ্ঞান
L ইতিহাস—সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আর্থনীতিক, ইতিহাস, ভূগোল সমেত।
M ইউরোপ
N আমেরিকা
O অষ্ট্রেলিয়া, এশিয়া, আফ্রিকা, দ্বীপসমূহ
P ধর্ম, ঈশ্বরতত্ত্ব, নীতি
Q ব্যবহারিক সমাজবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র
R রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রনীতি
S ব্যবহারশাস্ত্র ও আইন
T অর্থনীতি
U শিল্প, ব্যবহারিক শিল্প
V সুকুমার শিল্প, বিনোদন
W ভাষাবিজ্ঞান
X ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ব, ভাষাবর্গ এবং সাহিত্য
Y ইংরেজি ও অন্যান্য প্রথা ও সাহিত্য, ব্যাকরণ, নাট্য ইত্যাদি
Z গ্রন্থবিজ্ঞান, গ্রন্থবিদ্যা, গ্রন্থাগার

এই শ্রেণীবিভাগ থেকে একটা সূত্র বেরিয়ে আসছে, যা'তে লক্ষ্য করা যায় যে বিভাগগুলি নিম্নোক্তগুচ্ছে শ্রেণীবদ্ধ হয়েছে :—

A দর্শন ও সাধারণ বিজ্ঞান
B-D প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সমূহ
E-G জৈব বিজ্ঞান
H-I শরীর বিজ্ঞান

J-Z সামাজিক বিজ্ঞান সমূহ

বর্ণমালার ব্যবহারে মূল শ্রেণীবিভাগ ছাড়াও গাণিতিক সংখ্যার প্রয়োগে ব্লিস আরেক গ্রন্থ শ্রেণী তৈরী করেছেন যার নাম দিয়েছেন তিনি অগ্রবর্তী গাণিতিক শ্রেণী (Auterior Neumeral classes) যথা :—

১ তথ্য সহায়ক (reference) গ্রন্থ সংগ্রহ.—সাধারণ কোষগ্রন্থ, অভিধান, সূচী বা পঞ্জী ইত্যাদি

২ গ্রন্থবিদ্যা, গ্রন্থপঞ্জী, গ্রন্থাগার

৩ নির্বাচিত বা বিশেষ সংগ্রহ, সংরক্ষিত গ্রন্থ

৪ বিভাগীয় বা বিশেষ সংগ্রহ

৫ সরকারী বা সংস্থাদির নথি বা দলিল

৬ সাময়িকী

৭ বিবিধ

৮ ঐতিহাসিক, স্থানিক বা সংস্থাদির সংগ্রহ

৯ অপ্রচলিত বা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, ঐতিহাসিক সংগ্রহ

এর মধ্যে ১, ২, ৬ ও ৭ সংখ্যক বিভাগগুলি মূল শ্রেণীর Z বিভাগের বিকল্প হিসেবে কাজ করছে দেখা যায়। বাকিগুলিকে ডিউইর ০৯০ শ্রেণীরই সগোত্র বলা চলে।

উপরোক্ত শ্রেণীবিন্যাসের পরিপূরক কুড়িটি বিভিন্ন শ্রেণীর সহায়ক তালিকা গ্রন্থবৃত্ত বর্গীকরণের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করছে। তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান গাণিতিক উপবিভাগ,—যা'র সাহায্যে পাওয়া যায় আকারগত শ্রেণীনির্দেশ। যথা :—

১ তথ্যসহায়,—কোষ, অভিধান, মানচিত্র, নির্ঘণ্ট, ইত্যাদি

২ গ্রন্থপঞ্জী, সংক্ষিপ্তসার

৩ ইতিহাস,—ঐতিহাসিক বিচার

৪ জীবনী, বিভিন্ন বিষয়

৫ নথি বা দলিল,—বিবরণী, বার্ষিকী, তালিকা ইত্যাদি

৬ সাময়িকী

৭ বিবিধ,—প্রবন্ধ, বক্তৃতা ইত্যাদি

৮ অধ্যয়ন,—বিষয়গত অনুশীলন

৯ প্রাচীন,—প্রচলিত

এগুলির মধ্যে ১, ২ ও ৬ অপরিবর্তনীয় স্মারকসংখ্যা (mnemonics) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাকিগুলি ক্ষেত্রবিশেষে পরিবর্তনশীল। যেমন—

$M_3$ ইউরোপের ভৌগলিক বর্ণনা

$X_3$ ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন

দ্বিতীয় সহায়ক তালিকা ভৌগলিক উপবিভাগের জন্য। বর্ণমালার ছোট হরফের সাহায্যে এর প্রকাশ। উদাহরণ—

a আমেরিকা
d ইউরোপ
e ইংলণ্ড
f ফ্রান্স
k জার্মানি
o' এশিয়া
q ভারতবর্ষ
r চীন
s' জাপান
v' আফ্রিকা, ইত্যাদি।

লক্ষণীয়, কয়েকটি হরফের সঙ্গে ' ইলেক সংযুক্ত হয়েছে,—এর কারণ এগুলি যেন অন্য চিহ্নের অনুরূপ ব'লে ভ্রান্তিজনিত গোলমাল না ঘটায়।

তৃতীয় ও চতুর্থ সহায়ক তালিকা ভাষাগত এবং কালগত উপবিভাগের জন্য। ইংরাজি বর্ণমালার বড় হরফেই চিহ্ন প্রয়োগ, তবে প্রতি হরফের আরম্ভে একটি , কমা চিহ্ন দিয়ে উপবিভাগ তৈরী হয়।

উদাহরণ :—

,A প্রাচীন ভাষা
,C লাতিন
,F ফরাসী
,K জার্মান
,M ইংরেজি
,R রুশ
,U প্রাচ্য
,W চীনা
ইত্যাদি

,A প্রাচীন কাল খ্রীষ্টপূর্ব
,B মধ্যযুগ
,C আধুনিক (১৫ শতক)
,E ষোড়শ শতাব্দি
,K অষ্টাদশ শতাব্দি
,N ঊনবিংশ শতাব্দি
,R বিংশ শতাব্দি
ইতাদি

এছাড়াও বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে সংযুক্ত আরো ষোলটি সহায়ক উপবিভাগীয় তালিকা রয়েছে। গ্রন্থবৃত্ত পদ্ধতিতে পুস্তক বর্গীকরণের ব্যবহারিক কিছু নমুনা :—

$AM_1$ গণিত অভিধান

| | |
|---|---|
| $BOR_6$ | "বেতার জগৎ" পত্রিকা |
| DHIi | ইতালির আগ্নেয়গিরি |
| AD,R | আধুনিক রুশ দর্শন |
| MF,B | মধ্যযুগীয় ইতালির ইতিহাস |
| Y | ইংরেজি সাহিত্য |
| YH | ঊনবিংশ শতাব্দি |
| YHK | রোমান্টিক পর্ব |
| $YHK,S_3$ | শৈলী |
| $YHK.S_3,B$ | যুগবৈশিষ্ট্য |
| $YHK.S_3,B$—AAK | প্লেটোনিজম |

## দ্বিবিন্দু বর্গীকরণ ( Colon Classification )

দ্বিবিন্দু বর্গীকরণের প্রবর্তক শিয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথন (১৮৯২ – ১৯৭২) ছিলেন মাদ্রাজের বিশিষ্ট্য গ্রন্থাগারিক এবং ভারতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী হিসাবে অগ্রগণ্য। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর উপরে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের দায়িত্ব অর্পন করা হয়। বিলেতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিশেষ শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে এসে তিনি এদেশে গ্রন্থাগার প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সুরু ক'রে ক্রমাগত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কে বই লিখতে থাকেন এবং নিজের দেশে ও ভারতের সর্বত্র গ্রন্থাগারের মর্যাদা বৃদ্ধির ব্যাপারে সচেষ্ট হন। বিশিষ্ট গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি পৃথিবীর সর্বত্র আহূত ও সম্মানিত হয়। ভারতে তিনি এই বিষয়ের জাতীয় অধ্যাপকের সম্মান পান। বিদেশে অবস্থানকালে তিনি বিভিন্ন বর্গীকরণ পদ্ধতি নিয়ে চিন্তা করেন এবং উপলব্ধি করেন এগুলির সীমাবদ্ধতা। ক্রমে এ বিষয়ে গবেষণা ক'রে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন তাঁর দ্বিবিন্দু বর্গীকরণ পদ্ধতির প্রথম খসড়া। বিভাজন প্রক্রিয়ায় দ্বিবিন্দু বা কোলন বিশেষ স্থান নিয়েছে ব'লেই এর এইরূপ নামকরণ। বিশদ অথচ যৌগিক বর্গীকরণের প্রথম এবং প্রধান প্রচেষ্টা হিসেবে এটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছে। বিষয় গুলিকে বিস্তারিত ভাবে

বিচার করে নিয়ে উদ্দেশ্যের ও বক্তব্যের স্থির সিদ্ধান্তের পর যৌগিক ভাবে বর্গসংখ্যা দেওয়া হয় এই পদ্ধতিতে।

কোলন পদ্ধতিতে বর্ণমালার ব্যবহারই প্রধান, এবং যথাযথ ব্যবহারের গুণে বর্গীকৃত বইটির যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্যের পরিচয় মেলে বর্গ সংখ্যাটির থেকে। যদিচ ডিউইর তুলনায় গ্রন্থাঙ্কটি জটিলতর হবার ফলে মনে রাখতে অসুবিধা হয়, তবু বিশেষ পাঠক এবং গবেষকদের প্রয়োজনীয় সঠিক নির্দেশ পাওয়া যায় ব'লে কাজের পক্ষে সুবিধা হয়। অন্যান্য বর্গীকরণ সূত্রের মতো এতে কোনো গ্রন্থের জন্য নির্দিষ্ট বা অপরিবর্তনীয় বর্গসংখ্যা রাখা হয়নি। রঙ্গনাথন এই পদ্ধতিকে 'মেকানো' খেলার নির্মান প্রণালীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। নির্দিষ্ট কতকগুলি খণ্ডকে যথোপযুক্ত স্থানে সন্নিবিষ্ট ক'রে যেমন একেকটি জিনিষ গ'ড়ে ওঠে, তেমনিভাবে বিষয়-প্রতীকগুলি সাজিয়ে একটি গ্রন্থ সংলেখ তৈরি হয়।

দ্বিবিন্দু বর্গীকরণের প্রধান বিশেষত্ব বর্গ বিভাগ গুলিকে কয়েকটি দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ভাগ ক'রে নিয়ে সেই মতো প্রতীক প্রয়োগ। প্রথমে পর্ব বিভাজন ( phase ), —যা'তে বিষয়বস্তু প্রকাশ করে। একই গ্রন্থে একাধিক বিষয়ের আলোচনা থাকতে পারে, এবং সেগুলির সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা দরকার। দ্বিতীয়ত, পুস্তকের কোণিক বিচার ( facet ), — যা'তে প্রকাশ পায় বিশ্লেষণিক বৈশিষ্ট্য। তৃতীয়ত, বইএর কেন্দ্রস্থ বিষয়-চারিত্র্য বিচার ( focus )। এই ভাবে বিশ্লেষণ করার ফলে বইগুলির বৈশিষ্ট্য প্রকাশের সুবিধা হয়, যা অন্যান্য পদ্ধতিতে তত সহজে হয়না।

দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচারের একটা নমুনা দেখা যাক। যেমন, —গ্রন্থাগার। বিষয় হিসেবে গ্রন্থাগার কত রকমের হ'তে পারে সেই অনুযায়ী আগে ভাগ ক'রে নিয়ে তার পরে উপবিভাগ ইত্যাদি সংবলিত বর্গসংখ্যা নির্ধারিত হয়। গ্রন্থাগার মালিকানা স্বত্বের হ'তে পারে, —যেমন ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার, জন গ্রন্থাগার ; শিক্ষা সংক্রান্ত হ'তে পারে, —যেমন বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ; বিশেষ প্রতিষ্ঠানগত হ'তে পারে, —যেমন হাসপাতালের গ্রন্থাগার ; বিষয় কেন্দ্রিক হ'তে পারে, —যেমন রসায়ন বা চিকিৎসা বিভাগের গ্রন্থাগার ; ইত্যাদি। সুতরাং, মূল বিষয় 'গ্রন্থাগার'-এর সঙ্গে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি জ্ঞাপক চিহ্ন যোগ ক'রে তারপরে বর্গসংখ্যা নির্ধারন করলে আর গোলমাল থাকে না।

আবার ধরা যাক 'সাহিত্য'। সাহিত্য সংক্রান্ত কোনো বই এর বিচার

চারটি দৃষ্টিকোণ থেকে করা চলে, —বিষয়, ভাষা, গঠনভঙ্গি এবং লেখক। তেমনি ইতিহাসের বইএর বিচার হ'তে পারে তিনটি দিক থেকে, —ভৌগোলিক, কালানুক্রমিক এবং সমস্যা কেন্দ্রিক। এই সকল দৃষ্টিভঙ্গি আগে স্থির করে নিয়ে তবে বর্গ বিভাগের কাজ এগোয় দ্বিবিন্দু পদ্ধতিতে।

রঙ্গনাথন তাঁর পদ্ধতির মূল নীতি হিসেবে শ্রেণীবিভাগের পাঁচটি আঙ্গিক বা দৃষ্টিকোণ স্থির করেছেন। :— ব্যক্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্য (Personality ; 'P') ; বস্তুরূপ ( Matter ; –'M' ) ; উদ্যোগ বা ক্রিয়াশীলতা (Energy ; –'E') ; স্থান বা বিস্তার ( Space ; –'S' ) ; কাল ( Time ; –'T' )। এই পাঁচটি বিশেষত্ব থেকেই কোনো বইএর বৈচিত্র্য বা চরিত্র ফুটে ওঠে। উক্ত পাঁচটি দৃষ্টিকোণ পর্যায়ের মধ্যে কাল এবং বিস্তার সময় এবং স্থান বোঝায়। যেমন, ঊনবিংশ শতাব্দির বাণিজ্য ( ১৯শ শতকে সীমাবদ্ধতা বোঝায় ) এবং ভারতে নাট্যশিল্পের ইতিহাস ( সমগ্র কালের নির্দেশক )। উদ্যোগ বা ক্রিয়াশীলতা বোঝায় বিষয়ের কার্যক্রম, অন্তর্নিহিত ভাবাদি অনুষঙ্গ, সমস্যাসঙ্কুলতা ইত্যাদি গুণকে। যেমন, নৌশিল্প সম্পর্কিত গবেষণা, অথবা ঊনবিংশ শতকের সংস্কৃতি বিশ্লেষণ। বস্তুরূপ বলতে বিভিন্ন বিষয়ের পদার্থগত, প্রকৃতিগত প্রভৃতি গুণ বোঝায়। যেমন, নৌশিল্পে লোহার ব্যাবহার। এটি শিল্প বিজ্ঞান সংক্রান্ত স্থূল বিষয় প্রসঙ্গেই ব্যবহৃত। ব্যক্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্য সমগ্র বিষয়টির সেই গুণ যা'র ফলে স্বতন্ত্র্য পরিস্ফুট হয়। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে এর প্রতিফলন ভিন্ন ধরণের। যেমন, সমাজের সম্পদ সংক্রান্ত বিজ্ঞানকে অর্থনীতি বলে ; এখানে সম্পদ, —অথবা শিল্লাদি, —অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য প্রকাশক। এই ভাবেই ফসল কৃষিবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য।

একযোগে এই পাঁচটির একটি ব্যবহারিক উদাহরণ নেওয়া যাক। বিষয়টি যদি হয় ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় সাধারণ গ্রন্থাগারে সাময়িক পত্রের লেনদেন, তাহলে এরমধ্যে 'সাধারণ গ্রন্থাগার' গ্রন্থাগারের ব্যক্তিত্ব প্রকাশক, 'সাময়িক পত্র' গ্রন্থাগারের বস্তুরূপ জ্ঞাপক, 'লেনদেন. গ্রন্থাগার পরিচালনার উদ্যেগ নির্দেশক, 'কলকাতা' স্থানবাচক, '১৯৬৬' কালবাচক। বর্গ নির্ধারণে এর ক্রম হবে,—গ্রন্থাগার + সাধারণ + সাময়িক পত্র + লেনদেন + কলকাতা + ১৯৬৬।

দ্বিবিন্দু পদ্ধতির শ্রেণীবিভাগে মিশ্রিত প্রতীকচিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। উপরোক্ত নীতি অনুসারে এই প্রতীক অংশগত পর্যায়ে বিন্যস্ত ; যেমন,

চিকিৎসা বিষয়ের প্রতীক নির্ণয়ে প্রথমে শারীরিক অংশ বিচার এবং পরে তার রোগ বিচার ক'রে বর্গসংখ্যা তৈরী হয়। প্রতীকের গ্রহণ-যোগ্যতা গুণও বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য, যা'র ফলে বিষয়ের সূক্ষ্মবিচারগত বিভাগ সম্ভব হয়। রঙ্গনাথন বর্গসংখ্যার প্রতীক হিসেবে ০ থেকে ৯ পর্যন্ত গাণিতিক সংখ্যা, রোমান বর্ণমালার ২৬টি বড় হরফ, 'i' (আই) এবং 'o' (ও) বাদ দিয়ে রোমান বর্ণমালার ২৪টি ছোট হরফ, এবং গ্রীক বর্ণমালার ৮টি হরফ ব্যবহার করেছেন। অবশ্য গ্রীক বর্ণমালার কিছু বিকল্প দেখা যায়। শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি তৈরী করতে তিনি এগুলিকে মূল চারটি বর্গ-এলাকায় ভাগ করেছেন। সেগুলি নিম্নরূপ :—

১ম এলাকা—সাধারণী শ্রেণী—বর্ণমালার ছোট হরফ ব্যবহৃত।

২য় এলাকা—সাম্প্রতিককালে পরিজ্ঞাতবিষয় = শ্রেণী
—গাণিতিক সংখ্যা ব্যবহৃত।

৩য় এলাকা—প্রচলিত বিষয় শ্রেণী—রোমান বর্ণমালার বড় হরফ ব্যবহৃত।

৪র্থ এলাকা—নূতন উদ্ভাবিত প্রণালী ইত্যাদি
—বন্ধনীকৃত প্রতীক ব্যবহৃত।

সাধারণ উপবিভাগের জন্য ছোট হরফের ব্যবহার নিম্নরূপ :—

a গ্রন্থসূচী
b জীবিকা
c মানমন্দির, রসায়নগার
d যাদুঘর, প্রদর্শনী
e যন্ত্রাদি
f মানচিত্র
g নক্সা, চিত্র, সূচী
h প্রতিষ্ঠান
j সংগ্রহ, স্মারকগ্রন্থ
k অভিধান, কোষগ্রন্থ
l সংস্থা
m সাময়িকী
n বর্ষপঞ্জী, পঞ্জিকা
p সভা, সমারোহ
q আইন, বিধান
r সরকারী বিবৃতি, ইত্যাদি
s পরিসংখ্যান
t সমিতি
u ভ্রমণ,, জরীপ
v ইতিহাস
w জীবনি, চিঠিপত্র
x সংগ্রহ, গ্রন্থমালা
y তালিকা, ইত্যাদি
z সাধারণী, সংক্ষিপ্তসার ইত্যাদি।

আগেই বলা হয়েছে, বর্ণমালার মধ্যে 'i' এবং 'o' বাদ দিয়েছেন রঙ্গনাথন। 'z' হরফটি সর্বতোভাবে সাধারণী শ্রেণীর জন্য এই পদ্ধতিতে ব্যবহৃত। কিন্তু বিশদ উপবিভাগে দেখা যায় যে a, k, m, n, w, x, এবং z যথাক্রমে সাধারণ গ্রন্থপঞ্জী, কোষগ্রন্থ, সাময়িকী, পঞ্জী, জীবনী, সংগ্রহ ও সংক্ষিপ্তসার জাতীয় বিষয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিবিন্দু বর্গীকরণের নিয়ম অনুযায়ী এগুলির প্রতীক হওয়া উচিত ছিল za, zk, zm ইত্যাদি অনুক্রমে। কিন্তু যেহেতু উক্তবিষয়গুলি সাধারণ উপবিভাগ চিহ্নিত করে সেজন্য ঐগুলির আগে z হরফ যোগ না করলেও চলে। কোনও বিশেষ ভৌগলিক এলাকার জন্য z হরফের সঙ্গে ভৌগলিক উপবিভাগের প্রতীকচিহ্ন যোগ করা হয়। যেমন, z4 প্রাচ্য বিষয়বর্গ, z41 চীনবিদ্যা, z44 ভারতবিদ্যা ইত্যাদি। অনুরূপ প্রক্রিয়াতেই zG হয় গান্ধী চর্চা। zT হয় রবীন্দ্রচর্চা।

ভৌগলিক বিভাগের জন্য গাণিতিক সংখ্যার ব্যবহারের কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক। :—

| | |
|---|---|
| ১ পৃথিবী | ২ মাতৃভূমি |
| ৪ এশিয়া | ৪৪ ভারতবর্ষ |
| ৫ ইউরোপ | ৫৬ ব্রিটেন, আয়ার্ল্যাণ্ড |
| ৭ আমেরিকা | ৭৩ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র |
| ৮ অষ্ট্রেলিয়া | ৯ সমুদ্র, মহাসাগর |

দ্বিবিন্দু বর্গীকরণে ভাষাগত বিভাগ নিম্নরূপ—

| | |
|---|---|
| ১ ইন্দোইউরোপীয় | ২ সেমেটিক |
| ৩ দ্রাবিড় | ৪ এশীয় ভাষা |
| ৫ ইউরোপীয় ভাষা | ৬ আফ্রিকার ভাষা |
| ৭ আমেরিকার ভাষা | ৮ অষ্ট্রেলিয়ার ভাষা |
| ৯ সাগর দ্বীপাদির নানান ভাষা। | |

এবং সাধারণ বিভাগ নিম্নরূপ—

| | |
|---|---|
| ১ গ্রন্থপঞ্জী | ১ গ্রন্থাগার |
| ৩ অভিধান, কোষ | ৪ সমিতি, সংস্থা |
| ৫ পত্রিকা, সাময়িকী | ৬১ কংগ্রেস |
| ২ আয়োগ | ৬৩ প্রদর্শনী |
| ৭ জীবনী | ৮ বর্ষপঞ্জী, বার্ষিকী |

৯ প্রবন্ধ, বক্তৃতা ৯৮ গবেষণা

এবারে দ্বিবিন্দু বর্গীকরণের মূল শ্রেণীবিভাগের ছক, অর্থাৎ প্রচলিত বিষয় শ্রেণীর ছক নিচে দেওয়া হল :—

A বিজ্ঞান ( সাধারণ ) B গণিত শাস্ত্র
β ( গ্রীক হরফ বিটা ) গাণিতিক বিজ্ঞান সমূহ
Γ ( গ্রীক হরফ গামা ) পদার্থ বিজ্ঞান সমূহ
C পদার্থ বিদ্যা D পূর্ত বিদ্যা
E রসায়ণ শাস্ত্র F রসায়ণিক শিল্প
G জীববিদ্যা H ভূবিদ্যা
α ( গ্রীক হরফ এটা ) খনিবিদ্যা
I উদ্ভিদবিদ্যা J কৃষিবিদ্যা
K প্রাণীবিদ্যা L চিকিৎসা শাস্ত্র
λ ( গ্রীক হরফ লামডা ) পশুপালন বিদ্যা
μ ( গ্রীক হরফ মু ) মনোবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞানাদি
Δ ( গ্রীক হরফ ডেল্টা ) আধ্যাত্মিকতা, অতীন্দ্রিয়তা
ν ( গ্রীক হরফ নু ) মানব বিদ্যা
M ব্যবহারিক শিল্প N ললিতকলা
O সাহিত্য P ভাষা বিজ্ঞান
Q ধর্ম R দর্শন
S মনোবিদ্যা T শিক্ষা
Σ ( গ্রীক হরফ সিগমা সমাজ বিদ্যা
U ভূগোল V ইতিহাস
W রাষ্ট্রবিজ্ঞান X অর্থনীতি
Y সমাজ বিজ্ঞান Z আইন

দ্বিবিন্দু বর্গীকরণ পদ্ধতির পরিমর্জিত পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ সমূহে নানারকম বিবর্তন হয়ে কিছুটা সরল এবং বিকল্প পদ্ধতি দাঁড়িয়েছে। দেখা যায় যে মূল শ্রেণীতেও 'Z' হরফটির ব্যবহার বিচিত্র। যেমন, A Z গাণিতিক বিজ্ঞান সমূহ, B Z পদার্থ বিজ্ঞান সমূহ. M Z মানববিদ্যা ও সমাজ বিদ্যা সমূহ, M Z A মানব বিদ্যা, N Z সাহিত্য ও ভাষাবর্গ, P Z ধর্ম ও দর্শন, S Z সমাজ বিজ্ঞান, ইত্যাদি। আবার H X খনিবিদ্যা, L X ওষধিবিদ্যা,

P X যোগাযোগ তত্ত্ব, Y X সমাজসেবা, ইত্যাদি।

রঙ্গনাথন উদ্ভাবিত বর্গীকরণ পদ্ধতির চতুর্থ এলাকার সৃষ্টি নতুন নতুন ভাবধারা ও ক্রিয়াধারার সূত্রে। এই শ্রেণীবিভাগ মূল প্রতীক চিহ্নকে বন্ধনীর মধ্যে রেখে করা হয়েছে। কিছু নমুনা দেওয়া যাক।ঃ—

( ঃg ) মূল্যায়ন প্রণালী

( r ) পরিচালন বা প্রশাসন বিবরণ প্রস্তুত পদ্ধতি

( w ) জীবনী রচনা শৈলী

( x ) ব্যবস্থাপন বিজ্ঞান

দ্বিবিন্দু বা কোলন পদ্ধতিকে পুরোপুরি কোণিক বিচার পদ্ধতি বলা যায়। কোনো মিশ্র বা যৌগিক বিষয় নিলে দেখা যাবে তার বিশেষ একটি মূল বিষয় বা শ্রেণী আছে 'যেটি স্পষ্ট বা প্রত্যক্ষ অথবা অন্তর্নিহিত বা অপ্রত্যক্ষ। যেমন, কয়লা খনিবিদ্যা বিষয়টির মধ্যে খনিবিদ্যা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত। আবার, গো-সেবা বিষয়টিতে মূল শ্রেণী পশু-পালন অন্তর্নিহিত। এই সকল মূল বিষয়ের সঙ্গে বিশেষ ভাব অথবা প্রয়োগধারা যোগ করলে সেটি মিশ্র বিষয় হয়ে পড়ে। এই বিশেষ অনুসঙ্গগুলিকে রঙ্গনাথন বলেছেন Isolates, অর্থাৎ সত্তা-স্বতন্ত্র।

যে পাঁচটি নীতির আঙ্গিকে বর্গীকরণ নির্ধারিত, তার মধ্যে স্থান বা বিস্তার এবং কাল বা সময় সম্পর্কে বিস্তৃত ভাবে বলার কিছু নেই। এশিয়া বা কলকাতার মতন, কিম্বা আমেরিকা বা লণ্ডনের মতন স্থানবাচন নাম। এবং খ্রীষ্টপূর্ব বা খ্রীষ্টপর শতাব্দির মতো কাল বাচক আখ্যা সহজবোধ্য। উদ্যোগ বা Energy জ্ঞাপক সংজ্ঞা বিশদ, ব্যাপ্ত, গুপ্ত যে কোনো প্রচেষ্টা, অথবা জড় বা অজড় যে কোনো সামগ্রীর বেগ বা প্রকরণ, অথবা মন বা বুদ্ধিজাত যে কোনো ক্রিয়াশীলতা বোঝায়। বস্তু বা Matter সংজ্ঞায় যে কোনো পদার্থ এবং তার গুণ বা ধর্মকে বোঝায়। অর্থাৎ পদার্থ হিসেবে একটি চৌকি এবং তার উচ্চতা বা কাঠিন্য ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ব্যক্তিত্ব বা Personality জ্ঞাপক সংজ্ঞাটি একটু জটিল। কোনো যৌগিক বিষয়ের মধ্যে থেকে বস্তু, উদ্যোগ, স্থান বা কাল জ্ঞাপক সত্তাগুলিকে চিহ্নিত করার পর যা অবশিষ্ট থাকে তাই বিষয়টির ব্যক্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্য। অন্যদিক থেকে দেখতে গেলে বলতে পারি এটি বিষয় বিশেষের সেই চরিত্র বা অংশ যেটি না থাকলে পূর্ণতা আসেনা, বিষয়টিকে পুরোপুরি চেনা যায় না। ব্যক্তিত্ব

যেমন ব্যক্তি বিশেষকে স্বতন্ত্র্য দেয়, এও ঠিক তেমনি। যেমন, উনবিংশ শতাব্দিতে ইংলণ্ডের গ্রন্থাগার ভবনের স্থাপত্য' বিষয়টির মধ্যে উনবিংশ শতাব্দি কাল বাচক, ইংলণ্ড স্থান বাচক, স্থাপত্য উদ্যোগ বাচক, ভবন বস্তু বাচক, —কিন্তু গ্রন্থাগার ভবন বৈশিষ্ট্য বাচক—যাকে বলতে পারি ব্যক্তিত্ব বা চরিত্র।

আরেকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। অনেক সময়ে একই সময়ে একই বিষয়ের মধ্যে একাধিক উদ্যোগ জ্ঞাপক, বস্তু জ্ঞাপক অথবা ব্যক্তিত্ব জ্ঞাপক সত্তার দর্শন মেলে। এগুলিকে রঙ্গনাথন যথাক্রমে 1E, 2E, 3E, অথবা 1M, 2M, 3M, অথবা 1P, 2P, 3P এইভাবে চিহ্নিত করেছেন। যেমন, 'মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গণিত শিক্ষণ বিধি' বিষয়টির মধ্যে 'মাধ্যমিক বিদ্যালয়' প্রথম বর্গের ব্যক্তিত্ব জ্ঞাপক 'শিক্ষণ বিধি' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 'গণিত' বিষয়টি দ্বিতীয় বর্গের ব্যক্তিত্ব জ্ঞাপক। ব্যক্তির নির্দেশক পর্যায়গুলিকে $P_2$, $P_3$ এবং বস্তুনির্দেশক পর্যায়গুলিকে $M_2$' $M_3$ ইত্যাদি ক্রমে চিহ্নিত করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে মূল বিষয় 'সাহিত্য'-কে যদি ধরা যায় তাহলে এর প্রথম বর্গ ব্যক্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্যের চারটি পর্যায় পাওয়া যাবে, O, [P], [$P_2$], [$P_3$], [$P_4$]; এর মধ্যে P হচ্ছে ভাষাগত দৃষ্টিকোণ, $P_2$ আকারগত, $P_3$ গ্রন্থকার এবং $P_4$ বিষয় বা প্রকারগত দৃষ্টিকোণ।

বিবিধ বিষয়ের বিশ্লেষণ ক'রে রঙ্গনাথন ত্রিবিধ ধরনে সেগুলিকে ভাগ করেছেন,—সরল (Simple), যৌগিক (Compound) এবং জটিল বা মিশ্র (Complex) বিষয়। তুলনা করেছেন রাসায়নিকের ত্রিবিধ নিদানের সঙ্গে, মৌল, যৌগ ও মিশ্র বিষয়গুলির বিভিন্ন বিষয়াংশকে পর্ব বা পর্যায় (phase) বলেছেন, এবং পর্বের মধ্যে সম্পর্ক বোঝাবার জন্য ব্যবহার করেছেন কয়েকটি প্রতীক। প্রধান পর্ব-সম্বন্ধ জ্ঞাপক প্রতীক ইংরেজি O হরফ। বিষয় এবং সত্তা (isolate) সম্বন্ধ নির্ণয়ে এই হরফের সঙ্গে অন্যান্য ছোট হরফ যোগ ক'রে তৈরি হয়েছে একটা তালিকা। যেমন—

| সম্বন্ধ সংজ্ঞা (relation) | বিষয় পর্যায় (Subject phase) | একই দৃষ্টিকোণের সত্তা সম্বন্ধ | একই বিন্যাসের (array) মধ্যে সত্তা সম্বন্ধ |
|---|---|---|---|
| সাধারণ (general) | Oa | Oj | Ot |
| প্রবণতা (bias) | Ob | Ok | Ou |

| | | | |
|---|---|---|---|
| তুলনা (comparison) | Oc | Om | Ov |
| পার্থক্য (differance) | Od | On | Ow |
| প্রভাব (influence) | Og | Or | Oy |

উদাহরণ নেওয়া যাক কয়েকটি –

বিষয় পর্যায়ের সম্বন্ধ—W OaX – রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতি।

সত্তা পর্যায়ের সম্বন্ধ—Z,40; 5 – অন্যায় (tort) এবং অপরাধ (Crime) এর সম্পর্ক।

Q6 or 4 – খ্রীষ্টধর্মের উপরে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব

Y31 Ow 5—গ্রামবাসী ও নগরবাসীর মধ্যে পার্থক্য

দ্বিবিন্দু পদ্ধতির গ্রন্থসংলেখ (Call no) তৈরী হয় তিনটি অংশ নিয়ে। বর্গ সংখ্যা (Class no) পুস্তক সংখ্যা (Book no) এবং সংগ্রহ সংখ্যা (Collection no)। বর্গ সংখ্যা পূর্বোল্লিখিত বিষয়গত প্রতীক চিহ্ন দ্বারা গঠিত এর মধ্যে ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলিকে রঙ্গনাথন অষ্টক পর্যায়ে (Octavising digit) ব্যবহার করে বিস্তারশীলতা বজায় রেখেছেন। অর্থাৎ ১ থেকে আট পর্যন্ত ধীরানুক্রমে চলবার পর ৯ সংখ্যাটিকে আবার ৯১ থেকে ৯৯ পর্যন্ত, এবং পুনরায় ৯৯১ থেকে ৯৯৮ পর্যন্ত প্রয়োগ করেছেন। প্রয়োজন হলে z এবং Z হরফ দু'টি ও অনুরূপ অষ্টক পর্যায়ে ব্যবহৃত হতে পারে। মূলে কেবলমাত্র দ্বিবিন্দু : বা কোলন ব্যবহৃত হয়েছিল সংযোগ চিহ্ন হিসেবে। পরে সেটি ছাড়াও ব্যবহৃত হয়েছে ⟵ ⟶ O . , ; — চিহ্ন সপ্তকও।

পুস্তক সংখ্যা হিসেবে I এবং O ব্যতীত ২৪টি বড় রোমক হরফ; i, l এবং o ব্যতীত ২৩টি ছোট রোমত হরফ; ফুটকি, হাইফেন, সেমিকোলন ও কোলন ( . - ; : ) এই চারটি চিহ্ন, এবং ১০ গাণিতিক সংখ্যা ব্যবহৃত হয়েছে। উপরন্তু এই সংখ্যা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে ভাষাগত, আকারগত, বর্ষগত, তালিকা গত, খণ্ডগত প্রভৃতি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ জ্ঞাপক চিহ্নও ঐ সঙ্গে দেওয়া হয়। বর্ষগত বা শতাব্দি জ্ঞাপক চিহ্নের জন্য রোমক E হরফ থেকে সুরু ক'রে প্রতিটি হরফ একেক শতাব্দি চিহ্নিত ক'রে, এবং ঐ সঙ্গে দশকের অংশজ্ঞাপক সংখ্যা গুলি জুড়ে দিয়ে ঠিক বর্ষটি পাওয়া যায়। যেমন,— E 5 5 = ১০০৫ খ্রীষ্টাব্দ, M 0 0 = ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ, P 0 1 = ২১০১ খ্রীষ্টাব্দ। D হরফটিতে বোঝায় প্রথম শতাব্দি, C হরফে খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দি, B হরফে

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় থেকে দশম শতাব্দি। যেমন, —D 0 0 1 = ১ খ্রীষ্টাব্দ, D 0 1 0 = ১০ খ্রীষ্টাব্দ, D 5 4 1 = ৫৪১ খ্রীষ্টাব্দ, C 996 = ৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ, C 989 = ১০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ, C 499 = ৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।

তবে সাম্প্রতিক কালের গ্রন্থাগারের জন্য রঙ্গনাথন আরেকটি তালিকা তৈরি করেছেন।:—

| | |
|---|---|
| A ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ পূর্ববর্তী | B ১৮৮০ থেকে ১৮৮৯ |
| C ১৮৯০ থেকে ১৮৯৯ | D ১৯০০ থেকে ১৯০৯ |
| E ১৯১০ থেকে ১৯১৯ | --- --- --- --- --- |
| H ১৯৪০ থেকে ১৯৪৯ | J ১৯৫০ থেকে ১৯৫৯ |
| --- --- --- --- --- | N ১৯৯০ থেকে ১৯৯৯ |
| P ২০০০ থেকে ২০৯৯ | Z A ২১০০ থেকে ২১০৯ |
| ZB ২১১০ থেকে ২১১৯ | ইত্যাদি |

কোন পুস্তকের কয়টি সংখ্যা (copy) গ্রন্থাগারে আছে এবং একটি বিশেষ পুস্তক তার মধ্যে কোনটি তা বোঝাবার জন্য পুস্তক সংখ্যা চিহ্নে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থাদি সংখ্যার জন্য সেমিকোলন চিহ্ন প্রয়োগের পর ১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যা বসানো হয়। যেমন,—প্রথম সংখ্যাটির চিহ্ন যদি হয় N49, তাহলে দ্বিতীয় সংখ্যা হবে N49;1, তৃতীয় সংখ্যা N49;2 ১০ম সংখ্যা N49;9, শততম সংখ্যা N49;99, ইত্যাদি।

রঙ্গনাথন প্রবর্তিত পদ্ধতির আরেকটি বৈশিষ্ট্য সংগ্রহ সংখ্যা (Collection No.) নির্ণয়ের চিহ্ন। সংগ্রহ সংখ্যা বলতে বোঝায় বইটি কোন বিশেষ সংগ্রহে আছে, কোন গ্রন্থশালায় আছে, ইত্যাদি। এর নিয়ম নিম্নরূপ :—

ছোটমাপের বই হ'লে গ্রন্থাঙ্কের নিচে দাগ দিতে হবে। যেমন $\underline{\text{N49}}$

বড়মাপের বই হ'লে গ্রন্থাকের উপরে দাগ। যেমন $\overline{\text{N49}}$

শিল্প সামগ্রী ইত্যাদি পল্‌কা বই এর জন্য গ্রন্থাঙ্কের উপরে এবং নিচে দাগ। যেমন [N49]

কীটদষ্ট বা ভঙ্গুর বই হলে বৃত্তের মধ্যে। যেমন [N49]

বিরল (rare) গ্রন্থের জন্য লিখতে হবে RB

পাঠকক্ষে (Reading Room) রক্ষিত গ্রন্থের জন্য RR

পাঠ্যপুস্তকের (Text book) জন্য TC

সাময়িকী সংগ্রহ PC ইত্যাদি।

স্মরণীয়তা (Mnemonic) বজায় রাখতে গাণিতিক সংখ্যাগুলিকে উপবিভাগের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

১ সরলরেখা, একতা, ঈশ্বর, পৃথিবী ইত্যাদি
২ সমতল, গঠন, আকৃতি, অঙ্গসংস্থান, জ্ঞানসূত্র ইত্যাদি
৩ ত্রিকোণ, বিশ্লেষণ, ধারা, পদবিন্যাস ইত্যাদি
৪ রোগতত্ত্ব, যানবাহন, সমন্বয় ইত্যাদি
৫ তেজ, তরল পদার্থ, সমুদ্র, বিদেশ ইত্যাদি
৬ অতীন্দ্রিয়তা, অস্বাভাবিকতা, সম্পদ, বিবর্তন ইত্যাদি
৭ ব্যক্তিত্ব, মূল্য ইত্যাদি
৮ ভ্রমণ, সংস্থা, যোগ্যতা ইত্যাদি।

কাল ( T ), স্থান ( S ), উদ্যোগ ( E ), বস্তু ( M ) এবং ব্যক্তিত্ব ( P ) বোঝাবার সংযোগ চিহ্ন যথাক্রমে ' . : ; , দ্বারা নির্দিষ্ট। এগুলির ব্যবহার স্থান কালাদি সূত্রের স্তর অনুযায়ী নির্ধারিত। যেখানে একই সূত্র পরপর আসছে সেখানে অপরটির পূর্বে সংযোগ চিহ্ন বসছে। কার্যত পুস্তকের বর্গীকরণ কিভাবে হয়ে থাকে তার কিছু উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে।

কালিদাসের 'শকুন্তলা' বইটির বর্গসংখ্যা দ্বিবিন্দু পদ্ধতি অনুযায়ী O 15, 2 D 40, 3 হবে। এখানে O সাহিত্য বাচক শ্রেণী, 15 সংস্কৃত ( P ) ভাষা বাচক ব'লে কোনো সংযোগ চিহ্নের প্রয়োজন হলনা। 2 নাটক ( $P_2$ ) দ্বিতীয় স্তরের বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপক ব'লে তার আগে, কমা চিহ্ন বসেছে। D40 কালিদাস ( $P_3$ ) রচয়িতা বাচক চিহ্ন এবং 3 শকুন্তলা ( $P_4$ ) পুস্তকবাচক চিহ্ন ব'লে, কমা দিয়ে সংযুক্ত হয়েছে।

অনুরূপ ভাবে ১৯৫০ পর্যন্ত ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বইএর গ্রন্থনাম T2.44.N5 হবে। ১৯৫০ পর্যন্ত ভারতে সমবায় ব্যাঙ্ক পরিচালনা বিষয়টির বর্গসংখ্যা XM,62 : 8.44 N5 হবে।

দ্বিবিন্দু পদ্ধতিতে বর্গসংখ্যা আরো সরল করবার জন্য এমন ব্যবস্থা করা আছে যাতে বিশেষ বিশেষ গ্রন্থাগার তা'দের নির্বাচিত বিষয়ের জন্য যথোপযুক্ত প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করতে পারে। এর ফলে ইংরেজি সাহিত্য-প্রধান গ্রন্থাগার O 111,2 এর পরিবর্তে O—,2 চিহ্ন ব্যবহারে ইংরেজি নাটক বোঝানো যায়। তেমনি রেল-এর অর্থনীতি বোঝাতে X415 : 9 এর স্থলে

শুধু X—: 9 লিখলেই চলে।

যে পুস্তকের বর্গসংখ্যা O15w IN673.2-1 ; 2 : g সেটি হল এমন এক সমালোচনা গ্রন্থ যেটি সংস্কৃত ভাষায় কাব্য ছন্দে লিখিত, ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত, উক্ত গ্রন্থের চতুর্থ প্রস্থ (Copy), দ্বিতীয় খণ্ড (Volume), প্রথম পরিশিষ্ট, তৃতীয় প্রস্থ ( Copy )।

এ, সি, স্প্রাগ লিখিত 'শেক্সপীয়ার ও দর্শক' বইটির গ্রন্থনাথ O 111, 2 J 64 : 9 G 52 অথবা O—, 2 J 64 : 9 G 52 অথবা O : 2 J 64 : 9 G 52 হতে পারে। এখানে O সাহিত্য, O 111.2 অথবা O—, 2 অথবা O : 2 ইংরেজি নাটক ; J 64 শেক্সপীয়ার, - অর্থাৎ ইংরেজ নাট্যকার যাঁর জন্ম ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে, J 64 : 9 শেক্সপীয়ারের সমালোচনা, G 5 এখানে প্রকাশকাল বাচক (G = 193, G4 = 1935), G52 = গ্রন্থাগারে রক্ষিত ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত শেক্সপীয়ার সমালোচনার তৃতীয় প্রস্থ ( Copy )।

## লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস বর্গীকরণ

নাম থেকেই বোঝা যায় পদ্ধতিটি মার্কিন কংগ্রেস গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের যৌথ প্রচেষ্টায় প্রস্তুত। আমেরিকার কংগ্রেস গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে। স্বল্পসংখ্যক গ্রন্থ সংগ্রহের জন্য কোনো বিশেষ বর্গীকরণ পদ্ধতি ছিল না। বইএর আকার অনুসারে সাজানো থাকত সেকালের অনেক গ্রন্থাগারে মতো। গ্রন্থাগার ছিল ক্যাপিটল ভবনে। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সেনাদল উক্ত ভবনে আগুন লাগিয়ে দেয়, যার ফলে সংগ্রহের বহুলাংশ বিনষ্ট হয়। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে তত্রস্থ প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট টমাস জেফারসনের হাজার সাতেক গ্রন্থ কংগ্রেস গ্রন্থাগারের সামিল ক'রে এটিকে আবার চালু করা হয়। এবং জেফারসনের নিজস্ব বর্গীকরণ পদ্ধতি ক্রমেই গ্রন্থসজ্জা চলতে থাকে। গ্রন্থসংগ্রহ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত বর্গীকরণের প্রয়োজনীয়তা স্বভাবতই অনুভূত হয়। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে হার্বার্ট পুটনাম কংগ্রেস গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন, এবং তাঁরই প্রচেষ্টায় তদানীন্তন বিশ লক্ষ গ্রন্থের পুনর্বর্গীকরণ ঘটে। ১৯৩৯ এ অবসর নেবার আগেই তিনি উক্ত কাজ সমাধা করেন।

সংগ্রহের উপযোগী বর্গীকরণ পদ্ধতির খোঁজ ক'রে ডিউই বা কাটার প্রভৃতি কা'রো পদ্ধতিই তাঁদের কাছে কার্যকর বা গ্রহণযোগ্য মনে হলনা। কংগ্রেস গ্রন্থাগার স্থরু থেকেই মূলত গ'ড়ে উঠেছে মার্কিন প্রশাসনের প্রয়োজনে। তাই বিষয়কেই প্রধান না ক'রে তাঁরা প্রতিটি সংগৃহীত গ্রন্থকেই প্রধান বলে ধরতে চেষ্টা করেছেন ·বই এবং বিষয়ের মধ্যে প্রভেদ কিছু না থাকলেও হাতে আসা বইগুলির ভিত্তিতেই ক্রমে ক্রমে তাঁরা বর্গীকরণ প্রক্রিয়া চালিয়ে গেছেন। ফলে এই পদ্ধতি সাধারণ বর্গীকরণ পদ্ধতি না হয়ে কতকগুলি বিশেষ পদ্ধতির সমষ্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্রন্থাগারের বিশেষ ধরণের সংগ্রহ দ্বারা প্রভাবিত ব'লে বিশেষ শ্রেণীকরণ প্রক্রিয়ায় যোগফল। স্থায়ী নির্দেশের পরিবর্তে ক্রমিক নির্দেশ সংবলিত। তাই এখনো পর্যন্ত এই প্রক্রিয়ায় পরিসমাপ্তি ঘটেনি এ যাবত উক্ত বর্গীকরণ ছকের অনুন সাড়েসাত হাজার পৃষ্ঠা সংবলিত গুটি ত্রিশেক খণ্ড বেরিয়েছে।

কংগ্রেস গ্রন্থাগার বর্গীকরণের কাঠামো নিম্নরূপ :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | সাধারণী, সংগ্রহ | N | চারুশিল্প |
| B | দর্শন ও ধর্ম | P | ভাষাবিজ্ঞান |
| C | ইতিহাস। উপবিজ্ঞান | | ভাষা ও সাহিত্য |
| D | ইতিহাস ও ভুগঠন | Q | বিজ্ঞান |
| | (আমেরিকা ব্যতীত) | R | ওষধি। চিকিৎসা |
| E-F | আমেরিকা | S | কৃষি। পশুপালন |
| G | ভূগোল। নৃতত্ব | T | প্রকৌশল |
| | খেলামূলা | U | সামরিক বিজ্ঞান |
| H | সমাজ বিজ্ঞান। | V | নৌ-বাহিনীর বিজ্ঞান |
| | অর্থনীতি | Z | গ্রন্থবিদ্যা। |
| J | রাষ্ট্রবিজ্ঞান | | গ্রন্থাগার বিজ্ঞান |
| K | আইন | | |
| L | শিক্ষা | | |
| M | সংগীত | | |

লক্ষনীয়, এই ছক থেকে I, O, W, X, Y,—এই পাঁচটি হরফ বাদ পড়েছে। এগুলি রাখা হয়েছে ভবিষ্যৎ বিষয় বিস্তারের জন্য।

কংগ্রেস গ্রন্থাগার বর্গীকরণ প্রক্রিয়ায় শ্রেণী সমূহের বিভাগ ও

উপবিভাগ তৈরী হয়েছে বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থগুচ্ছের বিচারে। বিষয়ের তাত্ত্বিক বিচার প্রধান হয়ে ওঠেনি। সেজন্যই বিভাজন ক্রিয়া সূক্ষ্ম এবং বিশদ হয়ে উঠেছে। এর ফলে কোনো কোনো বিভাগ মূল শ্রেণীর থেকেও বিস্তৃততর বা জটিল হয়ে পড়েছে। শ্রেণীবিন্যাস, অর্থাৎ মূল শ্রেণীর অভ্যন্তরস্থ বিন্যাসনীতি যে ধারা ধরে হয়েছে সেগুলি নিম্নোক্ত পর্যায়ের—

(১) সাধারণ প্রকারগত বিভাগ, যেমন সাময়িকী, সংস্থা, সংগ্রহ, কোষগ্রন্থ ইত্যাদি।

(২) তত্ত্ব, দর্শন। (৩, ইতিহাস (৪) আলোচনা (৫) আইন, কানুন (৬) শিক্ষা ও গবেষনা (৭) বিশেষ বিষয়, যেগুলি সাধারণ থেকে বিশেষের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তারই যথা-সম্ভব পারম্পর্য অনুসরণ। অবশ্য এই ধারা পুরোপুরি মেনে চলা হয়নি। তবে শ্রেণীগুলির বিভাজনের নীতি কেমন তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় এর মধ্যে উপবিভাগগুলির জন্য বর্ণক্রম ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, QD181 = বিশেষ উপাদান। QD181,A4 = এলুমিনিয়াম, QD181'C1 = কার্বন সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি কিছু বিষয়ের বিভাগগুলি করা হয়েছে দেশ ভিত্তিক। বিভাজনের ধারায় প্রথমে এসেছে দেশ, তারপরে কাল, তারপরে বর্ণানুক্রমে ব্যক্তিবিশেষ।

সাধারণী শ্রেণীর বিন্যাস অনেকটা কাটার-কৃত পদ্ধতির মতো।

A সাধারণ গ্রন্থ
AC সংগ্রহ, গ্রন্থাবলী
AE কোষগ্রন্থ
AG সাধারণ তথ্যপুস্তক
AI নির্দেশিকা, সূচী
AM সংগ্রহশালা
AN সংবাদ পত্র
AP সাময়িকী
AS সংস্থা, সমিতি
AY বার্ষিকী, বর্ষপঞ্জী
AZ বিদ্যা ও জ্ঞানের ইতিহাস

লক্ষণীয়, এই তালিকায় দ্বিতীয় বর্ণের নির্বাচনে স্মরণীয়তা গুণ রয়েছে। (ইংরেজিতে AC = Collected works, AE = encyclopedia, AI = Index, AM = Museum, AN = Newspaper, AP = Periodical AY = Yearbooks ইত্যাদি)। মূল শ্রেণীতেও এই স্মরণীয়তা গুণের কিছু সাক্ষাৎ মেলে, যেমন, G = Geography (ভূগোল), M = Music (সংগীত), T = Technology (প্রকৌশল)।

কংগ্রেস গ্রন্থাগার বর্গীকরণে মিশ্র প্রতীকচিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। ২৬টি বড় হরফের রোমক বর্ণমালা, ১ থেকে ০ পর্যন্ত দশটি গাণিতিক সংখ্যা এবং একটি বিন্দু। হরফ এবং সংখ্যা মিলে শ্রেণীবিন্যাস স্পষ্টভাবে গড়ে তোলে মূল শ্রেণী বা অংশবিশেষ বোঝাবার জন্য দু'টি হরফ ব্যবহার করা যায় এবং বিভাগ ও উপবিভাগের জন্য চারটি পর্যন্ত সংখ্যার ব্যবহার চলে। সংখ্যাগুলি দশমিকক্রমে ব্যবহার হয় না। পূর্ণসংখ্যা হিসেবেই ব্যবহৃত। এদের মধ্যে সামান্য ফাঁক রেখে নূতন বিষয়ের প্রবর্তন করতে হয়। ফাঁক রাখা যখন সম্ভব হয়না তখন সংখ্যার পরে বিন্দু চিহ্নটি বসানো হয়। যেমন, LB 1043.5 হচ্ছে শিক্ষায় দৃষ্টি সহায়ক সামগ্রী। হরফের সাহায্যে উপবিভাগ তৈরীর জন্যও বিন্দুচিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন, 5SB 211.P8 আলু। QL444·D3 গলদা চিংড়ি।

কংগ্রেস গ্রন্থাগার পদ্ধতিই একমাত্র বর্গীকরণ পদ্ধতি যার কোনো নির্দিষ্ট প্রকারগত বিভাগ নেই। উক্ত বিভাজন রয়েছে, কিন্তু শ্রেণী-নির্বিশেষে সেগুলি অভিন্ন নয়। যেমন, TS হচ্ছে উৎপাদন শিল্প, এই সংক্রান্ত সাময়িকীর প্রতীক চিহ্ন TS 1, TS200, TS540, TS1228 TS 1772 এবং TS1784 ব্যবহৃত হ'তে দেখা যায়। প্রকারগত বিভাগের একটি প্রচলিত ছক নিম্নরূপ :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | সাময়িকী | 6 | স্থানিক |
| 2 | বার্ষিকী | 7 | নির্দেশপঞ্জী, তালিকা |
| 3 4 | কংগ্রেস | 8A—Z | বিভিন্ন সংস্থা-কাটার-চিহ্ন অনুযায়ী সজ্জিত |
| 5 | ইতিহাস | | |

প্রকারগত বিভাগের স্থায়ীছকের নমুনা নেওয়া যেতে পারে Z 5001—8000 প্রতীকের বিষয়গত গ্রন্থপঞ্জী পর্যায়ে। বিশেষ বিষয় Z 7164 থেকে নিম্নরূপ নমুনা তুলে ধরা যায়। :—

বিষয় :— ম্যাসাচুসেট্‌স্ পরিসংখ্যান সংস্থার শ্রম গ্রন্থপঞ্জী Z গ্রন্থপঞ্জী

7164 রাষ্ট্র ও সমাজ বিজ্ঞানের বিশেষ প্রসঙ্গ

.L1 শ্রম

M4 ম্যাসাচুসেট্‌স্ ( কাটার চিহ্ন )

সমগ্র প্রতীকটি দাঁড়াল Z 7164.L1 M4।

ভৌগোলিক উপবিভাগের জন্যও নির্দিষ্ট কোনো ছক বক্ষ্যমান পদ্ধতিটিতে নেই। এর জন্য অন্তত চার রকম প্রক্রিয়া রয়েছে দেখা যায়। (১) মূল শ্রেণীর সঙ্গে দেশ-জ্ঞাপক সংখ্যা যোগ করে। যেমন, মাছ ধরা S H, য়ুরোপের SH 603–643, এশিয়ার SH 651–667. আমেরিকার SH 461—601, ইত্যাদি। (২) বাড়তি বিন্দু-চিহ্ন প্রয়োগ করে। যেমন, GB 561–568 'উপত্যকা'; এর সঙ্গে বিন্দু সহযোগে ভৌগোলিক সংখ্যা ব্যবহার ক'রে বিভিন্ন দেশের উপত্যকা বোঝানো যায়। উক্ত সংখ্যার নমুনা :—'69 এশিয়া, '71 ভারত ও শ্রীলঙ্কা, .76 ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, .43 ব্রিটেন, .44 ইংলণ্ড, .45 স্কটল্যাণ্ড, ইত্যাদি। (৩) কখনো বা একগুচ্ছ সংখ্যা উহ্য রেখে বিশেষ ভৌগোলিক ছকের প্রতি নির্দেশ দিয়ে। যেমন, HX 840 অরাজকতা, দেশগত ছক ৫ নং অনুযায়ী মেক্সিকোর প্রতীক সংখ্যা 11 ( এগারো ), তাহলে HX851 মেক্সিকোতে অরাজকতা। (৪) A—Z পর্যন্ত ভৌগোলিক বর্ণ বিন্যাস প্রয়োগ। যেমন, SH 101 ইয়োরোপীয় দেশে মৎস্য চাষ, SH 101.F 5 ফিনল্যাণ্ডে মৎস্য চাষ।

লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস বর্গীকরণ পদ্ধতির জটিলতা ও দুর্বলতা থাকলেও গ্রন্থাগারের বিশেষ সংগ্রহকে কেন্দ্র ক'রে বিস্তার লাভ ক'রে বলে এর কার্যকর সার্থকতা অনস্বীকার্য।

## গ্রন্থ বর্গীকরণের আন্তর্জাতিকতার চিন্তা

বই মাত্রেরই একটা প্রতিপাদ্য বিষয় থাকে। কোনো বিষয়ের প্রকাশ নেই অথচ বই লেখা হচ্ছে তা কল্পনা করা যায় না। বিষয়ই প্রধান ব'লে বর্গী করণের মূলে থাকে বিষয় বিভাগ। সেই সঙ্গে স্বভাবতই আসে আকারগত প্রকারগত, ভৌগোলিক, কালানুক্রমিক প্রভৃতি বিবিধ উপবিভাগ। এগুলি প্রকাশ করতে গিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই প্রতীক চিহ্ন জটিল হয়ে পড়ে। সহজসূত্র বড় একটা মেলেনা। ওরই মধ্যে ডিউই বা কাটার বা ব্লিস সরল প্রকরণ বা'র করবার চেষ্টা করেছেন, এবং তার ফলে দেশকালের গণ্ডী পেরিয়ে কিছুটা আন্তর্জাতিকতার ছোঁয়া লেগেছে বর্গীকরণে, —বিশেষত ডিউই দশমিক বর্গীকরণ প্রকল্পে। তবুও বিশ্বের সব দেশ ও সব বিষয়ের প্রতি সুবিচার সম্ভব হয়নি। তাই গ্রন্থাগার বিভেদে হয় নিজেদের উপযোগী কোনোও বর্গীকরণ

বেছে নেওয়া হয়, নয়তো নিজেদের অনুকূলে অদল বদল ক'রে নিয়ে কাজ চালানো হয়। সার্বদশমিক বর্গীকরণকে সার্বদেশিক সার্ববিষয়গত করার প্রয়াস ছিল. প্রয়াস ছিল রঙ্গনাথনের দ্বিবিন্দু বর্গীকরণের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে। কিন্তু তা'তেও ক্রমে বর্গজটিলতা বেড়েছে ছাড়া কমেনি।

আন্তর্জাতিকতা বর্গীকরণের নূতন চেষ্টা করলেন ডঃ ফ্রেমণ্ট রাইভার। তাঁর প্রকল্প আন্তর্জাতিক বর্গীকরণ ( Inteanational Classification ) বেরোয় ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর এই পরিকল্পনা সাধারণ গ্রন্থাগারের জন্য। এবং এজাতীয় গ্রন্থাগারের সংগ্রহ যদি লাখ দশেক হয় তাহলে, তাঁর মতে ত্রিশটির মতো প্রতীকের প্রয়োগ হলেই চলবে। কেননা, তিনি মনে করেছেন। বর্গীকরণ প্রক্রিয়া ছোট এবং সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত, —যে গুনের জন্য দশমিক বর্গীকরণ এত জনপ্রিয়। তাঁর আরও মত, সর্ব-গ্রাহ্য পদ্ধতি জাতি বা দেশ বা ধর্ম প্রভৃতি প্রবণতা থেকে মুক্ত হওয়া বাঞ্চনীয়।

আন্তর্জাতিক বর্গীকরণ পদ্ধতির ছক নিম্নরূপ :—

| | |
|---|---|
| A সাধারণ | N শিক্ষা। বিনোদন |
| B দর্শন। মনস্তত্ত্ব | O শিল্প ও বাণিজ্য |
| C ধর্ম | P সমরকৌশল। যোগাযোগ। যানবাহন |
| D ইতিহাস,-সাধারণ। আমেরিকা | Q পদার্থবিজ্ঞান |
| E ইউরোপ | R রসায়ন। রাসায়নিক প্রকৌশল |
| F অবশিষ্ট পৃথিবী | S পূর্তবিদ্যা |
| G ভূগোল,-আমেরিকা | T জৈববিজ্ঞান |
| H ইয়োরোপ | U চিকিৎসাশাস্ত্র |
| I অবশিষ্ট পৃথিবী | V কৃষি। গার্হস্থবিদ্যা |
| J সমাজবিজ্ঞান | W চারুশিল্প |
| K আইন | X ভাষা |
| L অর্থনীতি | Y সাহিত্য, ইয়োরোপ |
| M রাষ্ট্রবিজ্ঞান। প্রশাসন | Z অবশিষ্ট পৃথিবী |

একমাত্র উপরোক্ত রোমক বড় হরফই প্রতীকচিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তিনটির বেশি হরফ একসঙ্গে ব্যবহার করা হয়না। সন্দেহ

নেই যে এজন্য পদ্ধতিটি সরল ও সংক্ষিপ্ত হয়েছে, কিন্তু স্পষ্ট হয়নি। অতিরিক্ত দৃঢ় নিবদ্ধ হবার দরুণ ব্যঞ্জনাগুণ ব্যাহত হয়েছে। যেমন, EAN প্রতীকে ইয়োরোপীয় নবজাগরণ চিহ্নিত, কিন্তু এই বিষয়ের বিশালত্বের পরিপ্রেক্ষিতে কোনও ব্যবস্থা করা নেই। আবার ভৌগলিক উপবিভাগের জন্য কোনও বিশেষ ব্যবস্থা না রেখে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বাড়তি একটি হরফ যোগ ক'রে কাজ চালানো হয়েছে যা'র ফলে একই হরফ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্ন স্থান নির্দেশ করছে। যেমন, গ্রন্থাগারে (AI) এর ক্ষেত্রে ভারত চীন ও জাপানের জন্য যথাক্রমে V.W.X, ব্যবহৃত হয়েছে, ভূবিদ'্যার ক্ষেত্রে উক্ত কাজ করছে যথাক্রমে S, Q O, কিম্বা চারুশিল্পের ক্ষেত্রে E, C, D। সুতরাং বর্গীকারকের কাজ এতে সরল না হয়ে বরঞ্চ গোলমেলেই হয়ে পড়ে।

মনে করা যায়, কোনও ভবিষ্যৎ শুভ প্রচেষ্টার এটি সূচনা মাত্র। আপাতদৃষ্টিতে এই পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিকতা বিশেষ পরিস্ফুট নয়।

## প্রাচ্য বর্গীকরণ পদ্ধতি ( Oriental Classification )

এবারে ভারতীয়, তথা প্রাচ্য জ্ঞান বিভাগের ভিত্তিতে পুস্তক বর্গী-করণ প্রচেষ্টার একটি নিদর্শন তুলে ধরা যাক। বেকন প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক ও শিক্ষাবিদদের তৈরি জ্ঞানের শ্রেণী-নির্ণয় এবং তারই ভিত্তিতে বিষয় বর্গীকরণের প্রসঙ্গ এতক্ষন আলোচিত হয়েছে। জ্ঞানের একটি বিশিষ্ট শ্রেণীবিভাগ প্রাচ্য দেশেও প্রচলিত ছিল,—সুনিপুন-প্রক্রিয়াতেই সেটি তৈরী হয়েছিল।

ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে জ্ঞানের চারটি মূল শ্রেণী নির্ণিত হয়েছিল, —ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। এই চারটি শ্রেণীর মধ্যে তাবৎ বিদ্যাকান্ত বিধৃত। এই ধারা অবলম্বন করে কাশী বিদ্যাপীঠের শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ মহাশয় ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রাচ্য বর্গীকরণ পদ্ধতি (Oriental Classification) প্রণয়ন করেন।

সমগ্র জ্ঞান কাণ্ডের ভারতীয় শ্রেণীবিভাগ নিম্নরূপ :—

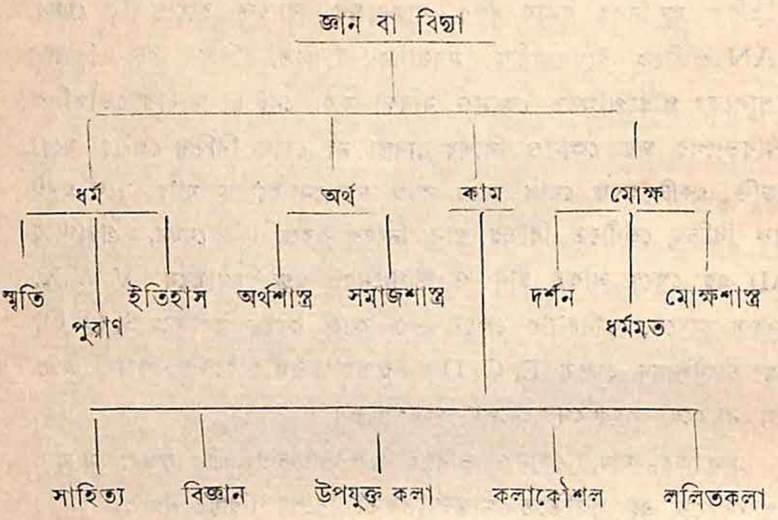


সতীশচন্দ্র গুহ-কৃত প্রাচ্য বর্গীকরণ পদ্ধতিতে উক্ত চতুবর্গের সঙ্গে সার্ববর্গ ( Generalia ) নামে একটি পঞ্চমবর্গ জুড়ে নিয়ে দশটি মুখ্যভাগে এগুলিকে বিভক্ত ক'রে প্রত্যেক ভাগের জন্য ১ থেকে ০ শূন্য পর্যন্ত দশটি গাণিতিক সংখ্যা প্রতীকরূপে গৃহীত হয়েছে। যেমন—

০ সার্ব-বর্গ ( Generalia )

১-২ ধর্ম-বর্গ—স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, ইত্যাদি

৩ অর্থ-বর্গ—অর্থশাস্ত্র, সমাজশাস্ত্র, ইত্যাদি

৪-৭ কাম বা কলাবর্গ,—সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলাকৌশল, ললিতকলা, ইত্যাদি

৮-৯ মোক্ষবর্গ - দর্শন, ধর্মমত, ইত্যাদি।

এই দশটি ভাগকে দশমিক প্রক্রিয়ায় দশগুণ বিস্তৃত ক'রে একশোটি বিভাগ সৃষ্টি করা হয়েছে। সতীশচন্দ্র সংস্কৃত শ্লোক গেঁথে এই বর্গীকরণ পদ্ধতির সূত্ররূপ বুঝিয়েছেন এই ভাবে —

বর্গীকরণ কার্য্যেঽস্মিন্ অঙ্গ মেষ্ট বিধং স্মৃতম্।
বর্গকায়ৌ দেশবাচৌ নৃ-কালৌ দিক্ চ কর্ত্তা চ॥

প্রাচ্য বর্গীকরণের এই আটটি অঙ্গ নিম্নরূপ —

১। বর্গ ( Class ); ২। কায় ( Body, feature );

৩। দেশ (Region Geography) ৪। বাক ( Speech );
৫। নৃ ( Human branch ); ৬। কাল (Time, chronology);
৭। দিক ( Viewpoint ); ৮। কর্তা ( Aurhor )।

এই আটটির মধ্যে প্রথমটি এবং অষ্টমটি আবশ্যক, বাকি ছয়টি প্রয়োজন স্থলে ব্যবহার্য।

প্রাচ্য বর্গীকরণ পদ্ধতিরি বর্গ নির্ণয় চক্রের একশোটি মূল ভাগ নিম্নরূপ—

০০ সাধারণী [Generalia]
০১ প্রদর্শন [Exposition]
০২ গ্রন্থাগার বিদ্যা
০৩ মহাকোষ [Encyclopedia]
০৪ অন্যান্য সন্ধান গ্রন্থ
০৫ বৃত্তপত্র [Periodicals]
০৬ সংস্থা
০৭ সমাচার পত্রিকা [Newspapers]
০৮ গ্রন্থাবলী সংগ্রহ
০৯ সরকারী বিজ্ঞপ্তি
১০ ধর্মশাস্ত্র
১১ স্মৃতি
১২ সংহিতাকার
১৩ নীতিধর্ম [Ethics]
১৪ ব্যবহার ধর্ম [Law]
১৫ রামায়ণ
১৬ মহাভারত
১৭ পুরাণ
১৮ উপপুরাণ
১৯ অন্যান্য
২০ ইতিহাস
২১ বিশ্ব
২২ স্বদেশ : ভারত
২৩ প্রতিবেশী : এশিয়া
২৪ আফ্রিকা
২৫ ইউরোপ
২৬ আমেরিকা
২৭ অন্যান্য দেশ
২৮ ভূগোল, ভ্রমণ
২৯ জীবনী, —সাধারণ
৩০ অর্থশাস্ত্র, —সাধারণ
৩১ পরিসংখ্যান
৩২ রাজনীতি
৩৩ অর্থশাস্ত্র
৩৪ সমাজশাস্ত্র [Sociology]
৩৫ শাসন [Administration]
৩৬ সংস্থা
৩৭ শিক্ষা
৩৮ বাণিজ্য [Commerce]
৩৯ রীতিনীতি, পরিচ্ছদাচ্ছ [Custom, Costumes]
৪০ সাহিত্য
৪১ পদ্য
৪২ নাটক
৪৩ উপন্যাস
৪৪ গল্প
৪৫ গদ্য [Essays]
৪৬ বাগ্মিতা [Rhetoric]

৪৭ পত্রলেখন [Correspondence]
৪৮ হাস্যরস [Sattire]
৪৯ ভাষাশাস্ত্র [Philology]
৫০ বিজ্ঞান
৫১ অঙ্কশাস্ত্র
৫২ জ্যোতিষ [Astronomy]
৫৩ পদার্থবিদ্যা
৫৪ রসায়ন
৫৫ ভূতত্ত্ব
৫৬ জীবপ্রত্নতত্ত্ব [Paleontology]
৫৭ জীবতত্ত্ব [Biology]
৫৮ উদ্ভিদতত্ত্ব [Botany]
৫৯ প্রাণিতত্ত্ব [Zoology]
৬০ উপযুক্ত কলা [Useful arts]
৬১ চিকিৎসাশাস্ত্র
৬২ পূর্তবিদ্যা [Engineering]
৬৩ কৃষিবিজ্ঞান
৬৪ গৃহস্থলী বিজ্ঞান [Home Science]
৬৫ কৌশল [Labour savers]
৬৬ নির্মাণ [Manufacture]
৬৭ নির্মাণ-কৌশল [Mechanic art]
৬৮ গৃহনির্মাণ
৬৯ অন্যান্য
৭০ চারুকলা
৭১ বিশেষ প্রাচ্য [Oriental]
৭২ স্থাপত্য [Architecture]
৭৩ ভাস্কর্য [Sculpture]
৭৪ অঙ্কন, বিভূষণ [Drawing, Decoration]
৭৫ চিত্রণ বিদ্যা [Painting]
৭৬ তক্ষণ [Engraving]
৭৭ ছায়াচিত্র [Photography]
৭৮ সংগীত
৭৯ প্রমোদন
৮০ দর্শন
৮১ ন্যায়-বৈশেষিক
৮২ সাংখ্যা-যোগ
৮৩ মীমাংসা
৮৪ বেদান্ত
৮৫ শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব
৮৬ বৌদ্ধ, জৈন
৮৭ অন্যান্য প্রাচ্য দর্শন
৮৮ পাশ্চাত্য দর্শন
৮৯ অন্যান্য
৯০ ধর্মমত [Religion]
৯১ তুলনাত্মক [Comparative]
৯২ সনাতন ধর্ম
৯৩ তদুৎপন্ন ধর্ম
৯৪ বৌদ্ধ, জৈন
৯৫ ইসলাম
৯৬ জরথুষ্ট্র
৯৭ কনফুশীয়
৯৮ খ্রীষ্টধর্ম
৯৯ অন্যান্য

দশমিক প্রয়োগে বিভাগ বিস্তারের কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক :—

২৫ ইউরোপ
২৫.২ জর্মনী.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৫.১ | যুক্তরাষ্ট্র | ২৫.৩ | ফ্রান্স |
| ২৫.১১ | ইংলণ্ড | ২৫.৪ | ইতালি |
| ২৫.১৩ | স্কটল্যাণ্ড | ২৫.৭ | রাশিয়া |
| ২৫.১৮ | আয়ার্ল্যাণ্ড | | ইত্যাদি। |
| ৮৪ | বেদান্ত | ৮৪.৪ | বিশিষ্টাদ্বৈত ( রামানুজ ) |
| ৮৪.১ | অদৈত ( শঙ্কর ) | ৮৪.৫ | দ্বৈতাদ্বৈত ( নিম্বার্ক ) |
| ৮৪.২ | ভেদাভেদ ( ভাস্কর ) | ৮৪.৬ | দ্বৈত ( মধ্বাচার্য ) |
| ৮৪.২৪ | অচিন্ত্য ভেদাভেদ ( বলদেব ) | ৮৪.৭ | গৌড়ীয় ( চৈতন্য ) |
| | | | ইত্যাদি। |

কায়নির্ণয়চক্র (form subdivision) সংক্ষেপে নিম্নরূপ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ·১ | মূল (text) | ·০৫ | বৃত্তপত্র (periodicals) |
| ·০০১ | আধার (theory) | ·০৫১ | মাসিক |
| ·০০২ | তুলনাত্মক | ০৫৩ | ত্রৈমাসিক |
| ·০১ | ভাষ্য (commentary) | ·০৫৫ | বার্ষিক |
| ·০২ | ভাষান্তর (translation) | ·০৫৭ | সাপ্তাহিক |
| ·০৩ | সন্ধান-সাধন (reference) | ·০৬ | সংস্থা (society) |
| ·০৩১ | কোষ (dictionary) | ·০৭ | সাধ্যায় (studies) |
| ·০৩২ | মহাকোষ (encyclopedia) | ·০৮ | নানাবিধ (polygraphy) |
| ·০৩৫ | গ্রন্থপঞ্জী | ·০৯ | ইতিবৃত্ত |
| ·০৪ | বিবৃতি সাহিত্য | ·০৯২ | জীবন চরিত্র |
| ·০৪৪ | ভাষণ | ·০৯৩ | চরিত্র সংগ্রহ ইত্যাদি। |
| ·০৪৫ | নিবন্ধ | | |

ব্যবহারিক উদাহরণ :—

৮৪·১ অদ্বৈত বেদান্ত

৮৪·১০১ অদ্বৈত বেদান্তের ভাষ্য

৮৪·১০৩৫ অদ্বৈত বেদান্ত গ্রন্থপঞ্জী।

দেশনির্ণয় চক্র (Regional table) সংক্ষেপে লিম্নরূপ—

(এখানে মূল বর্গের পরে দ্বিবিন্দু চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে)

| | | | |
|---|---|---|---|
| : ০ | বিশ্বব্রহ্মাণ্ড (Universe) | : ৬ | আমেরিকা |
| : ১ | পৃথিবী | : ৬.২ | যুক্তরাষ্ট্র |

| | | | |
|---|---|---|---|
| : ২ | স্বদেশ,—ভারতবর্ষ | : ৭ | অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড |
| : ৩ | প্রতিবেশী,—এশিয়া | : ৮ | সাগর |
| : ৪ | আফ্রিকা | : ৮.১ | ভারত মহাসাগর |
| : ৫ | ইউরোপ | : ৮.২ | প্রশান্ত মহাসাগর |
| : ৫.১ | ইংলণ্ড | | ইত্যাদি। |
| : ৫.৮২ | চেকোশ্লোভিয়া | | |

উপরোক্ত বিভাগের বিস্তারের একটু নমুনা দেখা যাক—

| | | | |
|---|---|---|---|
| : ২ | ভারতবর্ষ | : ২.৪ | উত্তরপ্রদেশ |
| : ২.১ | বঙ্গ, আসাম | : ২৬ | বিহার |
| : ২.৭ | উড়িষ্যা | : ৩.১ | তুরস্ক |
| : ২.৮৪ | কর্ণাটক | : ৩.৪ | আফগানিস্থান |
| : ২.৮৭ | হিমাচল | : ৩৬ | চীন |
| : ২.৯২ | মহীশূর | : ৩.৭ | জাপান, কোরিয়া |
| : ২.৯৪ | কাশ্মীর | : ৮.৫ | সিংহল |

ব্যবহারিক উদাহরণ—

২৮ ভ্রমণ

২৮:৫.৮২ চেকোশ্লোভাকিয়ায় ভ্রমণ।

বাক্-নির্ণয়চক্র (Philological table) সংক্ষেপে নিম্নরূপ—

| | | | |
|---|---|---|---|
| : ১০০ | আর্যভাষা গোষ্ঠি | : ১৭০ | লাতিন |
| : ১১০ | ভারতীয় শাখা | : ১৭৩ | ফরাসী |
| : ১১২ | সংস্কৃত | : ১৮০ | টিউটানিক |
| : ১১৪ | পালি | : ১৮৩ | ইংরাজি |
| : ১২০ | আধুনিক ভারতীয় | : ১৮৪ | জার্মান |
| : ১২১ | মারঠী | : ১৯৭ | রাশিয়ান |
| : ১২৪ | কাশ্মিরী | : ২০০ | সেমেটিক |
| : ১২৯ | সিংহলী | : ২০৪ | হিব্রু |
| : ১৩০ | হিন্দি | : ২০৫ | আরবীয় |
| : ১৩২ | ব্রজভাষা | : ৩০০ | হেমেটিক |
| : ১৪০ | মৈথিলী | : ৪০০ | মুণ্ডা |
| : ১৪১ | বাংলা | ; ৬০০ | চীনা |

: ১৪৩ ওড়িয়া : ৬০৩ জাপানী

: ১৪৭ তামিল : ৮০০ অন্যান্য

: ১৫০ ইন্দো ইউরোপীয়

: ১৫৭ গ্রীক ভাষাবর্গ ইত্যাদি—

ব্যবহারিক উদাহরণ

৯২.৪০২ গীতা ভাষ্য

৯২.৪০২:১৮৪ জার্মান ভাষায় গীতাভাষ্য।

নৃ-নির্ণয়চক্র (Authoropological table) সংক্ষেপে নিম্নরূপ—

৯০০ মানুষ ৯২০ বৌদ্ধ-জৈন

৯১০ আর্য ৯৩০ মোসলেম

৯১১ ব্রাহ্মণ ৯৮০ নিগ্রো

৯১৪ শূদ্র ৯৯০ ইহুদি ইত্যাদি।

ব্যবহারিক উদাহরণ—

৩৬.১ দাতব্য প্রতিষ্ঠান

৩৬.১:৯৯০ ইহুদি সহায়ক দাতব্য প্রতিষ্ঠান।

কাল নির্ণয় চক্রের (Chronological table) জন্য কোলন বা দ্বিবিন্দু চিহ্নের পরে শতাব্দি উল্লেখ ক'রে দিলেই চলতে পারে। তবে এর জন্য স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ এবং সংবলিত একটি বিচিত্র তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। যেমন—

অ গ্রীষ্টপূর্ব খ গ্রীষ্টীয় ২য় শতক

আ গ্রী পূ ১ম গ-ধ গ্রী ৩য়—১১শ শতক

অি গ্রী পূ ২য় ন বিংশ শতাব্দি

ক গ্রীষ্টীয় ১ম শতক না ২০শ। শতাব্দির ১ম দশক (১৯০০—১৯০৯)

কা ১ম গ্রীষ্টাব্দের ১ম দশক নৃ ২০শ শতাব্দির ৬ষ্ঠ দশক (১৯৫০—১৯৫৯)

কি ঐ ২য় দশক নৄ ১৯৫৭ গ্রী

কো ঐ ৯ম দশক ইত্যাদি।

ব্যবহারিক উদাহরণ—

৩৭,০৯ শিক্ষার ইতিহাস

৩৭,০৯:২ ৯৫ রাজস্থানের শিক্ষার ইতিহাস

৩৭.০৯:২ ৯৫:১৯৫৭ অথবা ৩৭.০৯:২.৯৫: ন্নী } ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত রাজস্থানের শিক্ষার ইতিহাস

দিক্-নির্ণয় চক্রের (view point device) জন্য বিষয় প্রতীকের (Class no) পরে একসঙ্গে দুটি দ্বিবিন্দু বা কোলন চিহ্ন (::) দিয়ে তারপরে দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ বর্গসংখ্যাটি বসাতে হয়। যেমন, উপরোক্ত উদাহরণের, অর্থাৎ "১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত রাজস্থানের শিক্ষার ইতিহাস" গ্রন্থের বিচার যদি বেদান্তের দৃষ্টি থেকে হয়, অর্থাৎ বেদান্ত শিক্ষার ইতিহাস হয় তবে তার বিষয় প্রতীক চিহ্ন হবে নিম্নরূপ

৩৭ ০৯:২. ৯৫:ন্নী::৮৪

অথবা ৩৭.০৯:২.৯৫:১৯৫৭::৮৪।

কর্তৃনির্ণয়চক্র (Author mark দিয়ে গ্রন্থনাম সম্পূর্ণ হয়। এজন্য সতীশচন্দ্র একটি গ্রন্থকার সংখ্যা তৈরী করেছেন,—ইংরেজিতে যেমন করেছেন কাটার সাহেব, বাংলাতেও যেমন আছে প্রমীলচন্দ্র বসু-কৃত গ্রন্থকার নামা। মারাঠী ভাষায় কুড়লকর-কৃত গ্রন্থকার প্রতীক সংখ্যা, ইত্যাদি।

প্রাচ্য বর্গীকরণ পদ্ধতির এই আটটি অঙ্গের সরল গাণিতিক সংখ্যা-প্রতীক ব্যবহার গ্রন্থবর্গীকরণের সকল দিক বিচার ক'রে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রকরণ রচনা করেছে সন্দেহ নেই। দার্শনিক তথা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে জ্ঞানের এই বিশ্লেষণ গুণিজনে বিবেচনাযোগ্য। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সরলীকৃত দশমিক বর্গীকরণে সতীশচন্দ্র গুহের এই পদ্ধতির ছাপ এবং সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ দূরপ্রাচ্য এবং মধ্যপ্রাচ্যে ঘটেছিল স্মরণাতীত কাল থেকে। জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান প্রচারের বিবিধ মাধ্যমও সৃষ্টি করেছিল মানুষ। এই সকল ভূখণ্ডের বিচিত্র পুথি-পুস্তকাদির নিদর্শন মহাকালের কবলে পড়ে লুপ্ত হয়েছে। এবং তারই কিছু নমুনা যে খননকার্য্যের ফলে হাতে এসেছে সে প্রসঙ্গে গ্রন্থারম্ভে আলোচনা করা হয়েছে। ভারতীয় বর্গীকরণ পদ্ধতির সূত্রে স্বভাবতই মনে হবে চীন প্রভৃতি জ্ঞানবৃদ্ধ প্রাচ্যদেশে পুস্তক বর্গীকরণ চালু ছিল কিনা বা কিভাবে চালু ছিল। চীন মহাদেশে ভারতের মতো বিধ্বংসী

কোনো বহিরাগত বিজেতা শত্রু এসে এজাতীয় নিদর্শন ধ্বংস করতে পারেনি। কিন্তু কালের কবল, অবহেলার কবল তারাও এড়াতে পারেনি ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি নানান প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনেক সম্পদই বিনষ্ট হয়েছে। অবলুপ্তির কবল থেকে তুন হুয়াং সম্পদ আবিষ্কারের উল্লেখ ও ইতিপূর্বে করা হয়েছে। একালে চীনদেশে পুস্তকের বর্গীকরণ হয়ে থাকে প্রধানত ডিউই দশমিকের অনুসরণে। প্রাচীনকালে প্রচলিত চীনা জ্ঞানশ্রেণী অনুযায়ী অবশ্য পুথি পত্রের চারটি প্রধান শ্রেণী বিভাগ চালু ছিল। মূল শাস্ত্রাদি বা ক্লাসিক্স্ (Classics), ইতিহাস, দর্শন এবং রসসাহিত্য (Belles lettres)। এগুলিরও আবার ৪৪টী বিভাগ এবং ৬৫টী উপবিভাগ ছিল। ক্লাসিক্স্ পর্যায়ে বর্গীকৃত থাকত শাস্ত্রাদির সঙ্গে সংগীত এবং ভাষাবিজ্ঞান। ইতিহাস পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হত জীবনী, ভূগোল রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আইন এবং গ্রন্থপঞ্জী। দর্শন পর্যায়ের অঙ্গীভূত ছিল সমরবিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, কৃষিবিদ্যা, জ্যোতিষ, গণিত, শিল্প, ধর্ম; ও কোষগ্রন্থাদি। সাধারণত এই সকল বিষয়কে সাজানো হত কালানু-ক্রমিক পর্যায়ে। প্রসঙ্গত বলা যায়, এই চারটি মূল শ্রেণীর মধ্যে বিষয়গুলিকে যে ভাবে সারিবদ্ধ করা হয়েছে তাতে অনেকাংশে ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও তার সংশ্লিষ্ট দর্শন স্বাতন্ত্র্যে পরিস্ফুট নয়। সূক্ষ্ম বিভাজন দ্বারা সে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই শ্রেণীবিভাগকে অনেকাংশে প্রাচ্য বর্গীকরণ পদ্ধতির সগোত্র বলে মনে হবে।

## গ্রন্থচিহ্ন। গ্রন্থকার চিহ্ন: গ্রন্থ সংলেখ।

পুস্তক বর্গীকরণের বিভিন্ন পদ্ধতির আলোচনার ফলে এমন বর্গপ্রতীকের বা বর্গসংখ্যার (Class no) সন্ধান পাওয়া গেল যার সাহায্যে কোনো বিশেষ বিষয়ের বইকে বিশিষ্টতায় চিহ্নিত করা যাচ্ছে। কিন্তু এই প্রতীকচিহ্ন নির্বিশেষ ভাবে প্রত্যেকটি বইকে স্বাতন্ত্র্য দিচ্ছেনা। কেননা একই বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থাকার রচিত ভিন্ন ভিন্ন বই থাকতে পারে—এবং থাকে—যেগুলির বর্গসংখ্যা এক এবং অভিন্ন। তার ফলে পুস্তকমঞ্চ থেকে নির্দিষ্ট কোনো বই বাছাই করার ব্যাপারে সমস্যা দেখা দেয়। যেমন, লেগুই লিখিত 'ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থটির বর্গসংখ্যা, ডিউই দশমিক মতে, ৮২০.৯;

আবার কম্পটন-রিকেট রচিত 'ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থটির বর্গসংখ্যাও উপরোক্ত মতে, ৮২০.৯। সুতরাং প্রত্যেকটি বইকে স্বতন্ত্র্য দেবার জন্য আরও কোনো চিহ্নের প্রয়োজন পড়ে। সেজন্য বর্গসংখ্যার সঙ্গে গ্রন্থকার চিহ্ন এবং গ্রন্থচিহ্ন দিয়ে বইটিকে স্বাতন্ত্র্যে স্বাক্ষরিত করা হয়। কাটার-কৃত গ্রন্থকার সূচী অনুযায়ী লেগুই-এর গ্রন্থকারচিহ্ন L 525, এবং কম্পটন-রিকেটের গ্রন্থকার চিহ্ন C 739। এবারে সবটা মিলিয়ে উপরোক্ত বই দু'টির গ্রন্থসংলেখ ( Call No. ) হবে যথাক্রমে 820.9 L525 এবং 820.9 C739। আবার লেগুই লিখিত 'সংক্ষেপিত ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস' বইটির গ্রন্থসংলেখ হয়ে যাচ্ছে একই রকমের, —820.9 L 525; তাই এই বইটিকে স্বাতন্ত্রে চিহ্নিত করার জন্য গ্রন্থাখ্যার প্রথম হরফটি গ্রন্থচিহ্ন হিসেবে গ্রন্থকার চিহ্নের সঙ্গে জুড়ে দিতে হয়, যার ফলে উক্ত বইটির গ্রন্থসংলেখ দাঁড়াল 820.9 L 525 S ( Short history .. .. সূচক আখ্যার প্রথম হরফ S সংযোগে )। একই বইএর একাধিক সংখ্যা অথবা একাধিক সংস্করণ গ্রন্থাগারে থাকলে কাজের সুবিধের জন্য ১ম, ২য়, ৩য়, ১ম সং, ২য় সং, ৩য় সং, লিখে চিহ্নিত করা চলে। কোলন বা দ্বিবিন্দু প্রভৃতি কোনো কোনো পদ্ধতিতে সংখ্যা বা সংস্করণের জন্য স্বতন্ত্র চিহ্নের ব্যবস্থা পদ্ধতির মধ্যেই ক'রে দেওয়া আছে। এভাবে সবটা মিলিয়ে তবে গ্রন্থসংলেখ সম্পূর্ণতা পায়। বর্গীকরণের মূল উদ্দেশ্য বিশেষ বইটিকে চিনিয়ে দেওয়া। গ্রন্থাগারের প্রয়োজনে তাই কেবলমাত্র 'বর্গীকরণ' না ব'লে বলতে হয় 'পুস্তক বর্গীকরণ'। বইটিকে চিনতে হলে তা'র বিষয়, বইটির লেখক এবং আখ্যা—সবই জানা প্রয়োজন প্রতীক চিহ্নের মধ্যে তাই স্বভাবতই এই তিনটি অঙ্গই ধ'রে রাখতে হয়; —বিষয় ও গ্রন্থকার আবশ্যিক ভাবে, গ্রন্থচিহ্ন প্রয়োজন মতো।

## পুস্তক সূচীকরণ ( Cataloguing )

বর্গীকরণের সাহায্যে গ্রন্থগুলিকে বিষয় অনুযায়ী, অথবা যে কোনো একটি ধারা অনুযায়ী সাজাবার সূত্র পাওয়া গেল। অর্থাৎ বইগুলিকে কোনো একটি পর্যায়ে মঞ্চে সাজানো হল। কিন্তু গ্রন্থাগারের কোথায় কোন মঞ্চের কোন তাকে কোন বই আছে তা জানবার একটি সহজ সূত্র না থাকলে কাজ চলে না। এমনকি নির্দিষ্ট মঞ্চ বা তাকে গিয়েও বইটি

খুঁজে বার করা কঠিন হয়ে পড়ে। সুতরাং বর্গীকরণের পরিপূরক হিসেবে পুস্তক সূচীকরণের প্রয়োজন। মঞ্চে যেভাবে বই সাজানো থাকে তার নির্দেশক হিসেবে হাতের কাছে একটি তালিকা থাকলে সন্ধানের কাজ সরল ও দ্রুততর হয়। সূচীকরণ তালিকা প্রণয়নের একটি পদ্ধতি। এই তালিকা বা পুস্তক সূচী কিভাবে কোন পর্যায়ে গ্রথিত থাকলে সুবিধা সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার আগে সূচী বলতে ঠিক কী বোঝায় তা জেনে রাখা দরকার। সূচীপত্র বলতে যেমন কোনো পুস্তকে প্রকাশিত বিষয়ের পরিচ্ছেদ তালিকা বোঝায় (list of contents) তেমনি অনেকগুলি বইএর একত্র উল্লেখসূচীও তালিকা (Bibliography)। অর্থাৎ. বইএর তালিকা সেগুলির আভ্যন্তরীণ বিষয়বস্তু নিয়ে তৈরী হতে পারে, অথবা সমগ্রভাবে এক বা বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত বই নিয়েও তৈরী হতে পারে। শাদামাটা ভাবে ইংরেজি আখ্যা 'Catalogue' এবং এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'সূচী' উল্লেখ তালিকাই বোঝায়। কিন্তু শব্দটির বিবৃত অর্থ 'ধারানুসারী বিন্যাস,'—যে বিন্যাস বর্ণানুক্রমিক অথবা অন্যবিধ অনুক্রমানুসারী হতে পারে, এবং যার মধ্যে বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকে। পুস্তক সূচীকরণের ক্ষেত্রে এই সূচী অর্থে বুঝতে হবে কোনও গ্রন্থাগারের অথবা বিশেষ গ্রন্থ সংগ্রহের এবং গ্রন্থভুক্ত বিষয়ের সুপরিকল্পিত সামঞ্জস্যপূর্ণ বিশিষ্ট ধরণের তালিকা প্রকরণ। বিভিন্ন প্রকরণ হিসেবে গ্রন্থসূচী (Catalogue), গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography) এবং বিষয়সূচী বা অনুক্রমণিকা (Index)—এই তিনটির কার্যকর প্রভেদ সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার।

গ্রন্থসূচী বিশেষ কোনো গ্রন্থসংগ্রহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, কিন্তু গ্রন্থপঞ্জী পৃথিবীর যে কোন অংশের যাবতীয় গ্রন্থ বা বিষয় নিয়ে তৈরি হতে পারে। গ্রন্থসূচী একই গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বিষয়ের বই নিয়ে তৈরি, গ্রন্থপঞ্জী সাধারণত বিষয় বিশেষের তাবৎ গ্রন্থের তালিকা। গ্রন্থসূচী দুই পদ্ধতিতে মাত্র বিন্যস্ত থাকে—বর্ণানুক্রমিক বা বিষয়ানুক্রমিক, গ্রন্থপঞ্জী নানানভাবে সাজাণো যায়—বর্ণানুক্রমিক, কালানুক্রমিক, বিষয়ানুক্রমিক গ্রন্থকারভিত্তিক দেশভিত্তিক, ইত্যাদি। গ্রন্থপঞ্জী গ্রন্থসংগ্রহের অংশবিশেষে সীমাবদ্ধ (selective) হতে পারে, অথবা সর্বাশ্রয়ী (Comprepreusive) হতে পারে কিন্তু গ্রন্থসূচী বিশেষ বিশেষ সংগ্রহের সীমা মেনে নিয়ে আবশ্যিকভাবে

সর্বাশ্রয়ী, অর্থাৎ কোনো বিশেষ সংগ্রহের সবিস্তর বিবরণ।

বিষয়সূচী কেবলমাত্র গ্রন্থসূচী নয়, গ্রন্থসূচীর অতিরিক্ত নির্দেশ দেওয়াই তার কাজ। বিষয়সূচী নির্দিষ্ট বিষয়ের যথাযথ নির্দেশ দেয়, গ্রন্থসূচী দেয় নির্দিষ্ট গ্রন্থ বা সংগ্রহের সন্ধান।

গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে গ্রন্থসূচী অপরিহার্য। দিক্‌নির্ণয় যন্ত্র ছাড়া যেমন জাহাজ বা বিমান চালনো যায় না তেমনি সুষ্ঠু গ্রন্থসূচী না থাকলে গ্রন্থাগারের কাজ চলেনা। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে গ্রন্থসূচীর উপরেই গ্রন্থের বর্গ শ্রেণীভুক্তি নির্ভর করে, অর্থাৎ গ্রন্থসূচীই নির্দেশ দেয় বর্গশ্রেণীর। সুতরাং বর্গীকরণ এবং সূচীকরণের পারস্পরিক সম্বন্ধ কী তা বুঝে দেখা দরকার।

বর্গীকরণের ফলে গ্রন্থের বিষয়নির্দেশ এবং মঞ্চসজ্জার সন্ধান মেলে। কিন্তু এই নির্দেশ পাওয়া যায় সূচীকরণের মাধ্যমেই। কোনো একটি গ্রন্থে যদি একাধিক বিষয়ের আলোচনা থাকে কেবলমাত্র একটি বিষয় নির্ধারণ ক'রেই গ্রন্থটিকে বর্গভুক্ত করতে হয়। কোনো গ্রন্থ যদি একাধিক লেখকের লিখিত হয় তাহলে কেবলমাত্র একটী লেখকের নামে গ্রন্থকারচিহ্ন বসাতে হয়। বর্গীকরণ একসূত্রে এগুলিকে বেঁধে রাখতে পারে না। তখন প্রয়োজন পড়ে গ্রন্থসূচীর। গ্রন্থসূচীই কোনো বিশেষ বইএর একাধিক লেখকের নির্দেশ দিতে পারে। এমন অনেক বই আছে যার একাধিক আখ্যা বা নামপত্র প্রচলিত। সেক্ষেত্রেও সব ক'টির নির্দেশ মেলে গ্রন্থসূচীর মাধ্যমেই।

গ্রন্থসূচী প্রণয়নের সময়ে মনে রাখতে হবে যে এটি যাঁর ব্যবহার করবেন তাঁরা স্বভাবতই এর জটিল প্রযুক্তি কৌশল সম্পর্কে পরিচিত নন। সাধারণ পাঠক যাতে সহজে বুঝতে পারেন সেইভাবে সূচী তৈরি করতে হয়। গ্রন্থসূচীর প্রাথমিক নিয়ম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য এর যথাযথতা (accuracy) (consistency) এবং উপযোগীতা (convonience)। গ্রন্থাভন্তেরস্থ সুসঙ্গতি আঙ্গিক ও বিষয়ের বিবরণ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে, যে সূচীপদ্ধতি অবলম্বিত হচ্ছে তার সঙ্গে বরাবর সঙ্গতি বা ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলতে হবে। এর উপকরণগত ব্যবহার সুবিধাজনক হবে। উপযোগী হবে গ্রন্থাগারের প্রকার ও বিশেষত্ব অনুযায়ী। রেলপথের জন্য যেমন সময় সারণি, গ্রন্থাগারের বেলায় তেমনি গ্রন্থসূচী।

সাধারণ পাঠক গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে এসে যে প্রশ্নগুলির সম্মুখীন হয়ে থাকেন এবং যেসকল প্রয়োজনের সমাধান চাইতে পারেন। সেগুলিকে ভিত্তি করেই গ্রন্থসূচীকরণ। প্রশ্নগুলি নিম্নোক্তরূপ হতে পারে :—

১। বিশেষ লেখকের কোন কোন বই আছে ?
( যেমন, রবীন্দ্রনাথের কোন কোন বই আছে ? )

২। বিশেষ শিরোনামার বইটি আছে কি ?
( যেমন 'শেষের কবিতা' বইটি আছে কি ? )

৩। বিশেষ বিষয়ের কোন কোন বই আছে ?
( যেমন, মনোবিজ্ঞানের কী কী বই আছে ? )

৪। কোনো বিশেষ গ্রন্থমালার কোন কোন বই আছে ?
( যেমন, বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহের কোন কোন বই আছে ? )

মূলত এই প্রশ্নগুলিই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা প্রকারে বিভিন্ন আকারে আসতে পারে। যেমন, অমুক লেখকের অমুক বইটি আছে কিনা, অমুক বইটি কা'র লেখা, অমুক বিষয় নিয়ে অমুক লেখকের কোন কোন বই আছে, অমুক লেখকের অমুক বিষয়ে লেখা কী কী বই আছে, অমুক বইটি কোন গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত, ইত্যাদি।

গ্রন্থসূচী এই প্রশ্ন বা সমস্যাগুলির দিকে লক্ষ্য রেখে গ্রন্থসংগ্রহ সম্পর্কিত নিম্নরূপ সংবাদ যথাযথ ভাবে দিয়ে থাকে। :—

১। পাঠকের প্রয়োজন মতো কোনো বিশেষ লেখকের, অথবা বিশেষ আখ্যার, অথবা বিশেষ বিষয়ের বই আছে কিনা।

২। নির্দিষ্ট গ্রন্থাগারে কোনো বিশেষ বিষয় সংক্রান্ত, অথবা বিশেষ লেখককৃত অথবা বিশেষ ধরণের সাহিত্য সংক্রান্ত ( কাব্য, নাটক, ইত্যাদি ) কী কী বই আছে।

৩। বইএর গ্রন্থন সম্পর্কিত যথাযথ বিবরণ, যেমন লেখক, আখ্যা, সংস্করণ, প্রকাশকাল, প্রকাশক, পত্র সংখ্যা, ইত্যাদি।

৪। বইএর আভ্যন্তরীন প্রকারগত পরিচয়, সম্ভাব্য বিষয় বৈচিত্র্যের নির্দেশ।

৫। পুস্তক, পুস্তিকা, সাময়িকী, মানচিত্র ইত্যাদির তালিকা ও বিবরণ।

এই সকল তথ্য ছাড়াও সূচীপত্রকে গ্রন্থ সংলেখ ( Call No. ) এবং গ্রন্থসংখ্যা অর্থাৎ পরিগ্রহণ সংখ্যা ( accession no. ) লিখিতে হয় পত্রকের বাঁদিকের নির্দিষ্ট স্থানে। গ্রন্থসংলেখ পুস্তকের মঞ্চ সংস্থানের নির্দেশ দেয়,

পরিগ্রহণ সংখ্যা থেকে পাওয়া যায় সেটির গ্রন্থাগারে অন্তভুর্ক্তির বিবরণ।

স্চীকরণে তাহলে থাকছে মূল পাঁচটি অংশ বা অনুচ্ছেদ। উপরোক্ত গ্রন্থ সংখ্যায়ন নিয়ে ছয়টি।

১। গ্রন্থকার ( লেখক, সম্পাদক, সংস্থা ইত্যাদি )।

২। গ্রন্থাখ্যা ( বিবৃত আখ্যা সমেত )

৩। গ্রন্থপরিচয় বা মুদ্রণতথ্য ( imprint ), —প্রকাশ-স্থান, প্রকাশক, প্রকাশকাল।

৪। গ্রন্থপ্রকরণ বা পুস্তকতথ্য ( Collation ), —পত্রসংখ্যা, খণ্ডবদ্ধ হ'লে খণ্ডসংখ্যা, চিত্র, নক্সা প্রভৃতির সংখ্যা গ্রন্থের মাপ, গ্রন্থমালা এবং মূল্য।

৫। টীকা ( Notes ), —গ্রন্থ সংক্রান্ত অতিরিক্ত ও প্রয়োজনীয় সমাচার। যেমন, —সীমিত সংস্করণ সংখ্যার বা স্বাক্ষরিত সংস্করণ সংখ্যার নির্দেশ ভিতরের কোনো অংশে যদি কোনো গলদ থাকে অথবা চিত্র মানচিত্রাদি যদি নিখোঁজ হয় সেই তথ্য, মূল আখ্যা যদি পরিবর্তিত হয়ে থাকে সেই তথ্য, কোনো বিশেষ গ্রন্থের পরিপূরক প্রকাশন হ'লে তার উল্লেখ ইত্যাদি। এবং, বিশেষ ক'রে, গ্রন্থপঞ্জী।

৫ (ক) প্রয়োজন পক্ষে বইএর সূচীপত্র, অথবা কোনো বিশেষ অধ্যায় নির্দেশ এই অংশে স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদে 'সূচী' ( Contents ) কথাটি লিখে লিপিবদ্ধ করা যায়।

৬। প্রত্যক্ষ ভাবে সূচীকরণের অঙ্গ না হলেও পত্রকে গ্রন্থসংলেখ এবং পরিগ্রহন সংখ্যা লিখতেই হয়, নচেৎ পত্রক নিরর্থক হবে।

পরিশেষে সূচীপত্রকের পিছনে অনুসরণী ( tracing ) লিখতে হয়। অর্থাৎ রচিত সবকয়টি পত্রকের নির্দেশ এখানে থাকা দরকার। কোন বইএর কতগুলি সূচীপত্রক তৈরি করতে হবে তা নির্ভর করে বইটির বিষয় এবং প্রকাশ-বৈচিত্র্যের উপরে। তাই প্রয়োজন হলে যা'তে সূচীকৃত সবকয়টি পত্রকের সন্ধান মেলে সেজন্য মূল পত্রকের ( Sheltlist ) উল্টো পিঠে এই সংখ্যার বিবরণ রাখতে হয়।

পুস্তক সূচীকরণের গঠনগত রূপ দ্বিবিধ, আভ্যন্তরীন এবং বহিরাঙ্গিক অর্থাৎ প্রকারগত এবং আকারগত। আকারগত রূপ ত্রিবিধ হতে পারে।

১। মুদ্রিত পুস্তক সূচী ( Printed Catalogue )
( পুস্তকাকৃতি )

২। অলংগ্ন পত্রক সূচী ( Sheet Catalouge )
( স্তবকাকৃতি )
৩। স্বতন্ত্র পত্রক সূচী ( Card Catalouge )
(পত্রকাকৃতি )

এ গুলির প্রত্যেকটিরই দোষ বা গুণ, সুবিধা বা অসুবিধা আছে। মুদ্রিত পুস্তক সূচীর প্রধান সুবিধা এর একাধিক নকল রাখা যায়। তার ফলে এক সঙ্গে অনেকে ব্যবহার করতে পারে। প্রয়োজন হ'লে যে কোনো গ্রন্থাগার একটি করে খণ্ড সংগ্রহ করতে পারে এবং বিশেষ গ্রন্থাগারের গ্রন্থতথ্য জেনে নিতে পারে। কাজের সুবিধের জন্য ইচ্ছে করলে খণ্ড খণ্ড পর্যায়ে অথবা শ্রেণীগত ভাবে ছাপানো চলে। পক্ষান্তরে, অলংগ্ন পত্রকসূচীর ক্ষেত্রে এই সুবিধা সীমাবদ্ধ. পত্রকসূচীতে এই সুবিধা অনুপস্থিত। কিন্তু, যেহেতু গ্রন্থাগারের পুস্তক সম্ভার ক্রমবর্ধনশীল, প্রত্যহই নূতন নূতন বই সংযোজিত হচ্ছে, সেহেতু মুদ্রিত সূচী সব সময়েই পুরোনো হয়ে যায়। কেননা, এটি ছাপাতে এবং প্রকাশ করতে যে সময় লাগে তার মধ্যে গ্রন্থাগারের সংগ্রহ অনেক বেড়ে যায়। কোনো গ্রন্থাগার থেকে কোনো বই বাতিল ক'রে দিলে বা হারিয়ে গেলে সেই মতো এটিকে সংশোধিত রূপ দেওয়া যায় না। উপরন্তু এটি প্রচুর ব্যায় সাপেক্ষ। তবুও অধুনাতন গ্রন্থ সমবায়ের পরিপ্রেক্ষিতে এর প্রয়োজন আছে সেকথা স্বীকার্য। ব্রিটিশ মিউজিয়াম, লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস, জাতীয় গ্রন্থাগার, অথবা বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার গ্রন্থসূচী সকল গ্রন্থাগারের পক্ষেই অপরিহার্য হয়ে ওঠে। তা'ছাড়া, গ্রন্থপঞ্জী হিসেবেও এগুলি মূল্যবান।

অলংগ্ন পত্রকসূচী মূলত মুদ্রিত পুস্তকসূচীরই অনুরূপ। এর পাতাগুলি আলগা থাকলেও একসঙ্গে এককে গুচ্ছ বই এর মতো গ্রথিত থাকে। ইচ্ছে করলে এটিকেও ছাপানো যায় বা দূরদেশে পাঠালে চলে। তবে সাধারণত টাইপ ক'রে বিশেষ গ্রন্থাগারে ব্যবহারের জন্যই রাখা থাকে। সাধারণত লম্বায় ৭½″ সাড়ে সাত ইঞ্চি এবং চওড়ায় ৪″ চার ইঞ্চি মাপের কাগজে স্বতন্ত্রভাবে এককেটী বই তচীকৃত হয়। তারপরে বই এর মতো অথবা এলবামের মতোবাঁধিয়ে রাখা হয়। এর সুবিধে, বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য বিভিন্ন খণ্ড রাখা যায়, একই খণ্ডের একাধিক নকল ও রাখা যেতে পারে। সেরকম করা হলে এগুলির আয়তনও সীমাবদ্ধ থাকে এবং এককেজন পাঠক এককেটি

খণ্ড বা নকল নিয়ে একই সঙ্গে মুদ্রিত স্থচীর মতোই ব্যবহার করতে পারে। নূতন সংযোজন হলে স্থচীকৃত কাগজের খণ্ডটির যথাস্থানে সন্নিবেশে ক'রে, এবং বাতিল বইএর বেলায় স্থচীপত্রকটি খুলে নিলেই হ'ল। পত্রক-স্থচীর চেয়ে এগুলি রাখতে অনেক কম জায়গা লাগে, এবং খরচের দিক থেকেও শস্তা। কিন্তু সর্বসাধারণের স্থবিধার জন্য এটিকে প্রদর্শিত অবস্থায় রাখা যায় না। ফলে গ্রন্থাগারের সংগ্রহসংখ্যার ধারণা করা কঠিন হয়। বারবার উঠানো ও ব্যবহার করতে করতে এর পাতাগুলি সহজেই জীর্ণ হয়ে যায়। তাছাড়া, স্থচীকরণে লেখকের নাম বাঁ দিক থেকে স্থরু হয় এবং সে দিকটাই বাঁধানো থাকে ব'লে সঠিক পাতাটি বার করা সময়সাপেক্ষ হয়ে পড়ে। উপরন্তু, কোনো একটি খণ্ড যখন কোনো পাঠক ব্যবহার করেন তখন সেই খণ্ডে গ্রথিত অন্য কোনো বই অপর পাঠকের দেখার দরকার হ'লে তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়,—একসঙ্গে একাধিক ব্যক্তি দেখতে পারেন না ব'লে অনেকটা সময় নষ্ট হয়। পাঠকরা প্রায় ক্ষেত্রেই এটিকে যথাস্থানে তুলে রাখেন না ব'লে এলোমেলো হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

স্বতন্ত্র পত্রক স্থচীতে নির্দ্দিষ্ট মাপের একেকটি পত্রক বা কার্ডে একেকটি বই স্থচীকৃত হয়। নির্দ্দিষ্ট মাপের কাঠের দেরাজে সেগুলি পরম্পরাক্রমে সজ্জিত থাকে। একটার পর একটা দেরাজের বাক্স সাজিয়ে একেকটি পত্রকাধার বা কার্ড কেবিনেট তৈরি হয়। পত্রকগুলির মাপ ১২$\frac{১}{২}$ × ৭$\frac{১}{২}$ সেন্টিমিটার, অর্থাৎ দৈর্ঘে প্রায় ৫″ পাঁচ ইঞ্চি এবং প্রস্থে প্রায় ৩″ তিন ইঞ্চি। স্থচীপত্রকগুলির নিচের অংশে মাঝামাঝি জায়গায় একটি করে শলাকা (rod) গ্রথিত থাকে। এই শলাকা পত্রকের ফুটোর মধ্য দিয়ে ফুটো থাকে, এবং দেরাজের নিচের দিকে ফটোর সঙ্গে ব্যবধান-সামঞ্জস্য রেখে একটি চালিয়েপিছন দিকে স্ক্রু দিয়ে আটকানো থাকে,– যাতে সেগুলি প'ড়ে না যায় বা এলোমেলো হয়ে না যায়। পত্রকাধার বা কাঠের দেরাজের গঠন এমন যে পত্রকগুলি ঠিক খাপে খাপে এঁটে যায়। উপরের দিকে কিছুটা অংশ বাড়তি থাকে নির্দেশ পত্র দেবার প্রয়োজনে এবং আঙুল দিয়ে একের পর এক পত্রক দেখবার স্থবিধার জন্য। দেরাজের পাশের দিকের ছ'টি ধার নিচু থাকে—সমগ্র খাড়াইএর প্রায় অর্ধেক। অভ্যন্তরে পত্রকেরই মাপের একটি একটি কাষ্ঠ ফলক থাকে পত্রকাধার ভর্তি না

হলেও যাতে সেগুলি হেলে না পড়ে সেজন্য। এই ফলকের নিচেও পত্রকের অনুরূপ একটি ফুটো থাকে। ধাতুশলাকা ঢুকিয়ে আটকে রাখার জন্য এই ফলকের উপরে একটি প্যাঁচ বা স্ক্রু থাকে অথবা দেরাজের একেবারে শেষপ্রান্তের কাঠে থাকে অনুরূপ প্যাঁচ। শলাকাটিকে আটকে রাখার জন্য সম্মুখ ভাগে এর গায়ে খাঁজ আছে এবং দেরাজের সামনের কাঠটির গায়ে একটি ছোট ফলকের সাহায্যে সেই খাঁজ আটকে রাখার বন্দোবস্ত আছে। দেরাজটি টানাটানির সময়ে যাতে পড়ে না যায় সেজন্য মূল আধারের বাঁদিকে একটি স্বয়ংক্রিয় ছিটকিনি আছে, সেটি আপনা থেকেই আটকে যায়, খোলবার সময়ে আঙুল দিয়ে এটিকে একটু ঠেলে দিতে হয়। ধারগুলি নিচু থাকার জন্য এই ছিটকিনি পত্রক ব্যবহারের সময়ে বাধা পায় না, শেষ প্রান্তের কাঠে এসে বাধা পায়। পত্রকসূচীর বিশেষ সুবিধা এই যে এটি সম্প্রসারণশীল। বই এর সংগ্রহ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন পত্রক ঠিক জায়গামতো নথিভুক্ত করতে বেগ পেতে হয়না। একটা দেরাজ ভর্তি হয়ে গেলে অন্য দেরাজে চারিয়ে দিলেই চলে। বাতিল বই এর পত্রক যখন খুশি তুলে ফেলতে হাঙ্গামা নেই। মুদ্রিত সূচী অপেক্ষা এটিতে খরচ অনেক কম, এবং খুবই টেঁকসই। এর প্রকরণ পদ্ধতি এবং ব্যবহার পদ্ধতি এবং ব্যবহার বিধিও অন্যগুলির তুলণায় সহজ ও সরল। সাম্প্রতিকতা (up to date) গুণ এটিতে পুরোমাত্রায় বর্তমান, সংগ্রহের শেষতম বইটির পত্রকও নথিভূক্ত ক'রে নিতে সময় লাগেনা। তাছাড়া এটিকে যেকোনও ক্রমানুসারে সাজিয়ে নেওয়া চলে, যখন যেমন প্রয়োজন। বিষয়ানুক্রমে অথবা লেখক সূচীক্রমে অথবা অন্য যেকোনও ধারায় এটিকে সাজিয়ে রাখা যায়। সুতরাং এর ব্যবহারিক সুবিধা অনস্বীকার্য।

তবে, অপরপক্ষে, পত্রকসূচীর কতকগুলি অসুবিধার দিকও আছে। অন্যান্য যে-কোনো সূচীর চেয়ে এটি বিপুলায়াতন এবং স্বভাবতই ভারী। পত্রকাধারগুলি সুদৃশ্যভাবে তৈরি হলে গ্রন্থাগারের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে সন্দেহ নেই। তবে রাখতে প্রচুর জায়গা নেয়। দ্বিতীয় অসুবিধা, একসঙ্গে একাধিক লোক এটি ব্যবহার করতে পারেন না, কোনো দেরাজ যখন একজন ব্যবহার করেন তখন আরেকজনকে অপেক্ষা করতে হয়। মুদ্রিত অথবা অলগ্ন-পত্র সূচীর বেলায় প্রতি খণ্ডের একাধিক সংখ্যা রেখে এই অসুবিধা কিছু পরিমাণে দূর

করা সম্ভব, কিন্তু পত্রকসূচীর বেলায় তা অসম্ভব। উপরন্তু উপযুক্ত নির্দেশ প্রতিনির্দেশ না থাকলে সঠিক বইটি বা'র করতে অনেক সময়ে বেগ পেতে হয়। কিন্তু এইসব অসুবিধা বা ত্রুটী থাকলেও গ্রন্থাগার কর্মীদের পক্ষে এবং পাঠকদের পক্ষে এই পদ্ধতি ব্যবহারিক বিচারে সর্বাধিক সন্তোষজনক।

বইএর প্রকারগত তালিকা নানারকমের হ'তে পারে। যেমন:—

১। লেখক তালিকা ( Author Catalogue )

২। নাম তালিকা ( Name Catalogue )

৩। আভিধানিক তালিকা ( Dictionary Catalogue )

৪। বিষয়ানুক্রমিক তালিকা ( Classified Catalogue )

৫। বিষয়ানুবর্ণিক তালিকা (Alphabetico-classed Catalogue)

এগুলির মধ্যে আভিধানিক ও বিষয়ানুক্রমিক তালিকা দুটিই বহুল ব্যবহৃত এবং পরিপূর্ণতর। লেখক তালিকা বা নাম তালিকার স্বয়ং সম্পূর্ণতা-গুণ নেই। লেখক তালিকা বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিতে লেখকের নাম অনুযায়ী সাজানো হয়। পাঠক যদি সঠিক ভাবে লেখকের নামটি মনে রেখে থাকেন তাহলেই সঠিক বইটি তিনি পাবেন। এই পদ্ধতিতে অবশ্য একই লেখকের রচিত সব বইএর তালিকা এক জায়গায় পাওয়া যায়। তবে পূর্বোল্লিখিত সম্ভাব্য প্রশ্নগুলির সবকটির উত্তর পাওয়া যাবেনা। যেমন, কোনও বিশেষ বইএর বা বিশেষ বিষয়ের বইএর নিশানা এই তালিকায় মিলবে না।

নাম তালিকা এই লেখক তালিকারই অপর এক রূপ। এতে লেখকের নামের সঙ্গে সঙ্গে লেখক সম্পর্কিত আলোচনা গ্রন্থের, এবং জীবনগ্রন্থ হ'লে যাঁর জীবনী তাঁর নামও ঐ সঙ্গেই সাজানো থাকে। অতএব এই তালিকায় সমালোচনা বা জীবনীর হিসেব পেলেও অন্যান্য সমস্যাগুলি থেকেই যায়। কেননা এতেও অমুক বইটি আছে কিনা অথবা অমুক বিষয়ের বই আছে কিনা জানা যাবেনা।

আভিধানিক তালিকায় অভিধানের মতো বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিতে সব ধরণের সূচীই একত্র সজ্জিত থাকে। সূচীকরণের সার্থকতা প্রাথমিক প্রশ্নগুলির যথাযোগ্য সমাধানে প্রথম প্রশ্ন, —অমুক লেখকের বই আছে কিনা, যার উত্তরে লেখকের নামে পত্রক বা তালিকা তৈরি হয়। দ্বিতীয় প্রশ্ন, —অমুক বইটি আছে কিনা, যার উত্তরে তৈরি হয় গ্রন্থাখ্যা পত্রক বা তালিকা। তৃতীয় প্রশ্ন, —অমুক বিষয়ের কোন বই আছে, এর উত্তরে হয় বিষয় পত্রক

প্রণয়ন। এবং চতুর্থ প্রশ্ন, —অমুক গ্রন্থমালার বই আছে কিনা, এর উত্তরে তৈরী হল গ্রন্থমালা পত্রক বা তালিকা। আভিধানিক তালিকায় উক্ত উপায়ে সূচীকৃত সব রকমের তালিকা বর্ণানুক্রমিক ধারায় সজ্জিত থাকে ব'লে সহজেই সব কটির খোঁজ মেলে। কার্যকারিতায় এটি উৎকৃষ্ট হলেও কোনো কোনো সমস্যার সহজ সমাধান মেলেনা। যেমন, কোনো বিশেষ বিষয়ের বই একত্র পেলেও উক্ত বিষয়-সংশ্লিষ্ট একই জাতীয় গ্রন্থের তালিকা এক জায়গায় থাকেনা যথা,—'ফুল' বা 'পুষ্প' শিরোনামে যাবতীয় ফুলের বিষয়ে তালিকা বর্ণানুক্রমিক ভাবে পাওয়া যাবে, কিন্তু কেবলমাত্র 'গোলাপ' বা 'পদ্ম' ফুলের বিষয়ে জানতে হ'লে তার সন্ধান এখানে মিলবেনা। অর্থাৎ, সংশ্লিষ্ট বিষয় মূল বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। 'স্থাপত্য বিদ্যা' এবং 'বস্তুবিদ্যা', অথবা 'পদার্থবিদ্যা' এবং 'তাপ' বা 'আলো' একটার থেকে আরেকটা অনেক দূরে স'রে যায়। এই অসুবিধা দূর করার জন্য 'নির্দেশক' সূচী তালিকাভুক্ত করতে হয়। যেমন,—

ছাপাখানা, দেখুন, মুদ্রণ, বা মুদ্রাযন্ত্র।

সাহিত্য, আরও দেখুন, বাংলা সাহিত্য।

সুতরাং বিষয়-শিরোনামে নির্বাচনে হুঁশিয়ার হয়ে বরাবর সেই নির্বাচনটি অনুসরণ করা প্রয়োজন।

বিষয়ানুক্রমিক তালিকার বিষয়টিই প্রধান, এবং যে পদ্ধতিতে বর্গীকৃত হয় সেই পদ্ধতি অনুযায়ী তালিকা সজ্জিত হয়। মূল বিষয়ের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিও সাজানো থাকে বলে যাঁরা কোনো বিশেষ বিষয়ে গবেষণা বা পড়াশোনা করতে চান তাঁরা উপকৃত হন। বিশেষ লেখকের বই বা বিশেষ কোনো বই খুঁজতে হ'লে এ তালিকা কাজে লাগেনা। এবং বর্গীকরণ পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা না থাকলে কিছু অসুবিধায়ও পড়তে হয়। এজন্য এই তালিকা-প্রকরণে নির্দেশিকা বা অনুক্রমণিকা ( Index ) আবশ্যিক হয়ে পড়ে। এবং বিষয় নির্দেশিকা ও লেখক সূচী—এ দুটিও এর সঙ্গে রাখার প্রয়োজন হয়।

বিষয়ানুবর্ণিক তালিকা উপরোক্ত প্রকরণেরই প্রকারভেদ। এতে মূল বিষয়গুলি বর্ণানুক্রমিক ভাবে সাজিয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি মূলবিষয়ের সঙ্গে বিষয়ানুক্রমিক ভাবে সাজানো থাকে। এই পদ্ধতির বহুল প্রচার হয়নি, কেননা, এতে অভিধানুসারী বর্ণানুক্রমিক প্রক্রিয়ার সরলতা যেমন নেই তেমনি বিষয়ানুক্রমিক পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণও বজায় থাকেনি।

এবারে সূচীকরণের প্রধান ছ'টি তালিকা, অর্থাৎ আভিধানিক (Dictionary) এবং বিষয়ানুক্রমিক (Subject) সূচীকরণের সূত্রগুলি নিয়ে আলোচনা করা যাক। এই ছ'টি পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা অন্যান্য পদ্ধতির অনুসরণ সহজতর হবে।

আগেই বলা হয়েছে কোনো পাঠক বই এর খোঁজ করতে এসে কী কী প্রশ্নের সমাধান চাইতে পারেন। সেদিকে লক্ষ্য রেখে আভিধানিক তালিকায় নিম্নোক্ত সূচীপত্রকগুলি করা প্রয়োজন—

১। লেখক পত্রক (অমুক লেখকের কী বই আছে)

২। শিরোনাম পত্রক (অমুক বইটি আছে কিনা)

৩। বিষয় পত্রক (অমুক বিষয়ের কী কী বই আছে)

৪। গ্রন্থমালা পত্রক (অমুক গ্রন্থমালার কোন কোন বই আছে)

৫। বিবিধ সন্ধান সূচী

লেখক পত্রকটিই প্রধান। এটির মধ্যে পুস্তকের যাবতীয় তথ্য গ্রথিত ক'রে এটিকে প্রধান পত্রক (Main card) হিসেবে ধরা হয়। এই পত্রকটি ঠিকমতো করে নিলেই এর থেকে বাকিগুলি তৈরি করে নিতে অসুবিধা হয় না।

উপরোক্ত বিবিধ সূচীকরণের লিখন পদ্ধতি কেমন হবে তার আলোচনার আগে সূচীনিদান, অর্থাৎ কোন প্রসঙ্গ এতে লিপিবদ্ধ করতে হবে তার বিবরণ জানা প্রয়োজন। এই সূচীনিদান নিম্নরূপ—

১। গ্রন্থকার (author) বা সম্পাদক (editor)

২। গ্রন্থাখ্যা (title)

৩। গ্রন্থ সমাচার বা মুদ্রণতথ্য (imprint)

৪। গ্রন্থ প্রকরণ বা পুস্তকতথ্য (collation)

৫। গ্রন্থমালা নির্দেশ (series)

৬। সূচী (contents)

৭। টীকা বা মন্তব্য (notes)

৮। মূল্য (price)

৯। গ্রন্থসংলেখ (call no)

১০। পরিগ্রহণ সংখ্যা (accession no)

এবারে সূচীনিদানের উপরোক্ত অংশগুলির অর্থ এবং কার্যকারিতা

কী তা দেখা যাক।

১। গ্রন্থকার বা সম্পাদক। গ্রন্থকার বলতে পুস্তকের প্রণেতা, একাধিক লেখকের যৌথভাবে লিখিত বই, এক বা বিভিন্ন লেখকের লিখিত বই এর সংকলয়িতা বা সম্পাদক, সরকারী বা বেসরকারী বিবিধ সংস্থা থেকে প্রকাশিত বই,—প্রভৃতি নানান ধাঁচের প্রণেতা বোঝায়।

২। গ্রন্থাখ্যা। গ্রন্থের চলতি আখ্যা বা নাম অথবা পরিবর্ত্তিত নাম যেমন থাকতে পারে তেমনি থাকতে পারে মূল আখ্যা বা গৌন আখ্যা (sub title)। পুস্তকে আলোচিত প্রধান বিষয়ের নাম এবং বিবিধ গৌন বা আনুষঙ্গিক বিষয়ের নামও অখণ্ড বা খণ্ডবদ্ধ গ্রন্থে থাকতে পারে।

৩। গ্রন্থপরিচয় বা মুদ্রণতথ্য। এই অংশে থাকে বইটির সংস্করণ সংখ্যা, প্রকাশের স্থান, প্রকাশকের নাম, প্রকাশের তারিখ।

৪। গ্রন্থপ্রকরণ বা পুস্তকতথ্য। এই অংশে থাকে গ্রন্থের পত্রসংখ্যা, খণ্ডবদ্ধ গ্রন্থ হলে তার খণ্ডসংখ্যা, পত্রসংখ্যার হিসাবে থাকে ভূমিকা বা প্রবেশক পত্রাদির সংখ্যা এবং মূল গ্রন্থের পত্রসংখ্যা, চিত্রসংখ্যা (মানচিত্র, সরণি, আলোকচিত্র নক্সা প্রভৃতি সমেত), গ্রন্থের মাপ (কাগজের মাপে অথবা সেন্টিমিটারের মাপে), গ্রন্থমালা নির্দেশ।

৫। গ্রন্থমালা—গ্রন্থপ্রকরণের অন্তর্ভুক্ত।

৬। সূচী। প্রয়োজন বোধে এই অংশ টীকা বা মন্তব্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

৭। টীকা বা মন্তব্য। পুস্তক সংক্রান্ত বিশেষ কোনো তথ্য—যা অন্যত্র লিপিবদ্ধ করার সুযোগ নেই—তা এখানে লেখা যায়। এই অংশে সূচী নির্দেশ থাকতে পারে।

৮। মূল্য। সবশেষে বই এর দাম লিখে রাখা উচিত। এটা গ্রন্থের আসল দাম হওয়াই বাঞ্ছনীয়, গ্রন্থাগার যে দামে কিনেছে সে দাম নয়।

৯। গ্রন্থ সংলেখ, এবং

১০। গ্রন্থসংখ্যা,—দুটিই সূচীপত্রকের বাঁদিকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে লেখা আবশ্যিক।

সূচীপত্রকের লিখন পদ্ধতি এবং লিখন ধারায় পারম্পর্য থাকা উচিত। কেননা, বর্গীকরণ নানান রকমের হলেও সুলুক-সন্ধানে কোনো অসুবিধা হয় না, কিন্তু সূচীকরণ নানান রকমের হলে বই এর খোঁজ পাওয়া

কঠিন হয়ে পড়ে। সূচীনিদানের বিবরণ এর আগে দিয়েছি, এখন সূচীপত্রকে সেগুলির সংস্থান কেমন হবে দেখা যাক। ১২½ × ৭½ সেন্টিমিটারের পত্রকে সোজাভাবে পংক্তি টানা থাকে। আর আড়াআড়িভাবে বাঁদিক ঘেঁষে দুটি পংক্তি টেনে পরিচ্ছেদ নির্দ্দিষ্ট হয়। এই দুই পংক্তিক্রমের কোনটির থেকে গ্রন্থাগার নাম সুরু হবে কোনটির থেকে সুরু হবে গ্রন্থাখ্যা তাও নির্দ্দিষ্ট। একে বলেপংক্তিক্রম বা সংস্থান (indextion)। নিচের ছবি থেকে এরূপ বোঝা যাবে। :—

| | | |
|---|---|---|
| গ্রন্থ সংলেখ | লেখক | সংস্থান |
| গ্রন্থ পরিগ্রহণ সংখ্যা | | গ্রন্থাখ্যা সংস্থান |

এবং সূচীপত্রকের সর্বাধিক তথ্য সংস্থান হবে নিম্নরূপ :—

| | |
|---|---|
| গ্রন্থ সংলেখ | গ্রন্থকার ঃ লেখক বা সম্পাদক বা সংস্থান |
| গ্রন্থ পরিগ্রহণ সংখ্যা | গ্রন্থাখ্যা ঃ গৌন আখ্যা, অনুবাদক বা সম্পাদক ইত্যাদি, সংস্করণ, প্রকাশকের স্থান, প্রকাশ কাল ( গ্রন্থস্বত্ব চিহ্ন সহ )।<br>পৃষ্ঠা সংখ্যা, চিত্র ইত্যাদি সংখ্যা, গ্রন্থের মাপ, [গ্রন্থমালা]।<br>গ্রন্থপঞ্জী / টীকা, ইত্যাদি<br>গ্রন্থসূচী<br>মূল্য |

এখানে লক্ষনীয়, পত্রক বা গ্রন্থসংলেখ-এর কিনারা থেকে প্রথম বিভাগ বা পরিচ্ছেদটি লেখক-সংস্থান ( author indextion ) এবং দ্বিতীয়টি গ্রন্থাখ্যা-সংস্থান ( Title indextion )। গ্রন্থকার ব্যতিরেকে আর সব তথ্যেরই আরম্ভ গ্রন্থাখ্যা-সংস্থান থেকে। তবে আরম্ভের পর লেখা যদি পংক্তি অতিক্রম করে তবে অনুবৃত্তি গ্রন্থকার সংস্থান থেকেই চলে। কোনো গ্রন্থে গ্রন্থপঞ্জী থাকলে তার উল্লেখ এবং পৃষ্ঠানির্দেশ অবশ্যই লিখিতব্য। এবং এটি স্বতন্ত্র পংক্তি হিসেবেই থাকা বাঞ্ছনীয়। সেক্ষেত্রে টিকা ইত্যাদি পরবর্তী পংক্তিতে আসবে।

স্থচীপত্রক লিখন পদ্ধতি বিশ্লেষণের পূর্বে স্থচীকরনের প্রয়োজনে বইএর কোন কোন অংশ থেকে তথ্য আহরণ করতে হয় তা জেনে রাখা দরকার।

১। আখ্যাপত্র ( title page ): এখানে বইএর নাম, লেখক, সম্পাদক প্রভৃতির নাম, এবং প্রকাশক ইত্যাদির সংবাদ মেলে।

২। আখ্যাপত্রের অপর পৃষ্ঠা: প্রায়শই দেখা যায় এই পৃষ্ঠায় ( মূল পৃষ্ঠার বদলে ) সংস্করণ সম্পর্কিত বিবৃতি, প্রকাশকাল, প্রকাশক সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্য এবং—বিশেষ করে গ্রন্থস্বত্বের নিদর্শন থাকে।

৩। স্থচীপত্র এবং চিত্রাদির স্থচী।

৪। ভূমিকা বা মুখবন্ধ: অনেক ক্ষেত্রে সম্পাদক প্রভৃতির নাম এখানেও মেলে। তাছাড়া স্বনামধন্য ভূমিকা-কার হ'লে তাঁর নাম পত্রকে উল্লেখ করতে হয়। গ্রন্থের পূর্ববর্তী সংস্করণের নাম বদল ক'রে অনেক সময়ে নূতন নামকরণ হয়,—তারও নির্দেশ এই অংশে পাওয়া যায়।

৫। পত্র সংখ্যা ( ভূমিকা অংশের পত্রসহ ), গ্রন্থপঞ্জী বা পাঠ্যস্থচী, চিত্রাদির পত্র সংখ্যা এবং এই ধরণের বিশেষ তথ্যের জন্য বইটি উল্টে পাল্টে দেখে নিতে হয়।

স্থচীকরণের কয়েকটি রীতি বা প্রচল ( Convention ) আছে। সেগুলি মেনে চলতে হয়। কেননা, পৃথিবীর যাবতীয় গ্রন্থাগারে এই স্থচীরীতি ও চিহ্ন-প্রয়োগ অনুস্থত হ'লে সঙ্গতি বজায় থাকে, স্থচীকরণে সার্বিক সাম্য রাখা যায়। এই প্রচল ধারা নিম্নরূপ—

১। বর্জন চিহ্ন। স্থচীকরণীয় অংশ থেকে অপ্রয়োজনীয় তথ্যাদি বাদ দেবার অথবা সংক্ষিপ্ত করার জন্য উক্ত অংশের স্থলে তিনটি ফুটকি চিহ্ন (...) বসাতে হয়।

২। Italies বা বাঁকা ছাঁদে সেই সব অংশ লিখতে হবে যেগুলি মূল স্থচীকরণ

সূত্র-ভুক্ত নয়, অথচ নির্দেশ করা প্রয়োজন। বাঁকা ছাঁদের হরফের বদলে উক্ত অংশের নিচে দাগ কেটে ( underline ) দেওয়া চলে, বিশেষ ক'রে 'দেখুন', 'আরও দেখুন' জাতীয় নির্দেশের বেলায়।

৩। বড় হরফ, ছোট হরফ লিখন-রীতি। বইএর নামের প্রারম্ভ হরফ, এবং নাম, স্থান, পদবী প্রভৃতি শব্দের আদ্যক্ষর বড় হরফের হবে।

৪। বন্ধনী। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বন্ধনী চিহ্ন ব্যবহারের রীতি আছে। বইএর নাম যদি 'a', 'the' প্রভৃতি অনির্দিষ্ট পদদ্বারা সুরু হয় তবে তা বন্ধনীর মধ্যে দিতে হবে,—প্রথম বন্ধনী ; এবং পত্রকাধারে সাজানোর সময়ে এই অক্ষর গুলি হিসেব থেকে বাদ দিয়ে ধরতে হবে। গ্রন্থমালা নির্দেশ মূল পত্রকে ( main card ) বন্ধনীর মধ্যে লিখতে হবে, — দ্বিতীয় বন্ধনী। এছাড়াও যে সকল অংশ গ্রন্থাখ্যা পত্রে মুদ্রিত না হয়ে বইএর অন্যত্র মুদ্রিত থাকে অথবা কোনও অনুল্লেখিত অংশ যা সূচীকরণের প্রয়োজনে উল্লেখ করতে হয়, সেসব হবে দ্বিতীয় বন্ধনীভূক্ত।

৫। যতি, বিরতি চিহ্নাদি (punctuation)। কোথায় কমা, কোলন, সেমিকোলন, দিতে হবে, কোথায় বসাতে হবে full stop বা দাড়ি, কোথায় কয় ঘর ফাঁক দিয়ে লিখতে হবে তার নির্দ্দিষ্ট রীতি আছে। পত্রকরচনা প্রসঙ্গে তার ব্যাখ্যা দেখা যাবে।

৬। মুদ্রন প্রমাদ। ছাপার ভুল থাকলে সেগুলি বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করে দেখানো দরকার, অথবা টীকা বা মন্তব্য অংশে উল্লেখ করা উচিত।

৭। ঐ একইভাবে পুস্তকে উল্লিখিত কোনও বিশেষ মন্তব্যাদির উল্লেখ করা কর্তব্য।

৮। সংক্ষিপ্তি চিহ্ন (abbreviation)। পুনরাবৃত্তি অথবা স্থান সংকোচ ইত্যাদি কারণে কোনো কোনো শব্দের বা উক্তির সংক্ষেপ করতে হয়। এই সংক্ষেপ করণের একটা প্রচলিত রূপ দাঁড়িয়ে গিয়েছে। যেমন, আখ্যাপত্র title page – t.p., পৃষ্ঠা—পৃঃ, page—p. pages—pp , সম্পাদক—সং, editor – ed , অনুবাদক—অনুঃ, translator —tr , যুগ্ম লেখক — Joint author — jt. auth. ইত্যাদি।

৯। অনুসরনী (tracing)। সর্বমোট কোন কোন প্রকারের ক'টি পত্রক প্রস্তুত হল তার তালিকা মূল পত্রকের ( self list বা মঞ্চপত্রকের ) পিছনে

সংক্ষেপে লিখে রাখতে হয়, যাতে দরকার পড়লে সব কটি পত্রক খুঁজে বার করতে সুবিধে হয়।

এবারে পত্রক কতরকমের হতে পারে তার হিসেব নেওয়া যাক—

১। মঞ্চ পত্রক (shelf card, shelf list)। এটি মূল বা প্রধান পত্রক, এবং গ্রন্থকার পত্রকের অনুরূপ। এতে বক্ষ্যমান বই সংক্রান্ত পুরো বিবরণ থাকে। কারণ, পত্রক তালিকার ক্ষেত্রে এর থেকেই কোন গ্রন্থাগারে কত বই আছে এবং কোন কোন লেখকের কী কী বই আছে তার হিসাব মেলে। অনেক সময়ে গ্রন্থ সংগ্রহ তালিকা বা গ্রন্থ পরিগ্রহণের কাজ মঞ্চপত্রক দিয়েই হয়ে থাকে। গ্রন্থাগারিকের কাজের জন্য এটি অপরিহার্য, কেননা বই এর খুঁটিনাটি তথ্য থাকে এই পত্রকে।

২। গ্রন্থকার পত্রক (Author card)। এই পত্রকে মঞ্চ পত্রকের মতো সব তথ্য সন্নিবিষ্ট না হলেও পাঠকের পক্ষে প্রয়োজনীয় যাবতীয় সমাচার থাকে। যেমন, গ্রন্থকার, গ্রন্থাখ্যা, সংস্করণ সংখ্যা, প্রকাশ কাল ইত্যাদি। গ্রন্থকার অর্থে বোঝায় লেখক, যুগ্ম লেখক, সম্পাদক, অনুবাদক সরকারী বা বেসরকারী সংস্থা, ছদ্মনামা বা অনামা গ্রন্থাদি।

৩। গ্রন্থাখ্যা পত্রক (title card)। এই পত্রকে আখ্যা-সংস্থানে গ্রন্থনাম, সংস্করণ ও প্রকাশকাল লিখিত হয়। এবং তারপরে লেখক সংস্থানে লিখতে হয় গ্রন্থকারের নাম।

উপরোক্ত এই তিনটি পত্রক যে কোনো গ্রন্থাগারের পক্ষে আবশ্যিক। অর্থাৎ অন্যান্য পত্রক যদি নাও তৈরী করা যায় তবুও কমপক্ষে এই তিনটি অপরিহার্য। এছাড়া অন্যান্য পত্রকগুলির পরিচয় নিম্নরূপ—

৪। যুগ্ম লেখক পত্রক (Joint author card)। দুই বা ততোধিক লেখক বা সম্পাদক ইত্যাদি থাকলে প্রতি লেখকের নামে পত্রক রচনা করতে হয়। যুগ্ম লেখকের নাম আখ্যা-সংস্থান থেকে লেখার রীতি। বস্তুতপক্ষে মূল লেখক ছাড়া বাকি সবরকমের পত্রকই সুরু করতে হয় আখ্যা সংস্থান থেকে। ব্যতিক্রম আছে, যেমন গ্রন্থমালা।

৫। সম্পাদক, অনুবাদক ইত্যাদির নামেও আলাদা পত্রক তৈরী করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে লেখক ব্যতীতও সম্পাদক থাকেন, তাছাড়া

সংস্থা প্রভৃতির প্রকাশিত পুস্তকেও সম্পাদক থাকেন। এ জাতীয় পত্রকেরও প্রারম্ভ আখ্যা সংস্থান থেকে।

৬। বিষয় পত্রক (Subject card)। বইটি যে বিষয়ে লিখিত সেই বিষয়ের নাম প্রথম পংক্তিতে লাল হরফে, অথবা সাধারণ হরফ থেকে স্বতন্ত্র কোনও হরফে লিখতে হয়। সুরু আখ্যা সংস্থান থেকে। তারপরে একটি পংক্তি ছেড়ে দিয়ে মঞ্চপত্রকের মতো বইটির পুরো বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হয়।

৭। গ্রন্থমালা পত্রক (series card)। প্রথম পংক্তিতে, লেখক সংস্থান থেকে, গ্রন্থমালার নাম লিখে একটি পংক্তি ছেড়ে দিয়ে তারপরে গ্রন্থমালা সংখ্যা সহ গ্রন্থের নাম ও লেখকের নাম লিখবার রীতি। গ্রন্থমালা সংখ্যাটি পত্রকের বাঁদিকে যেখানে দুটি লাল পংক্তির মাঝে অনুচ্ছেদ অংশ আছে তার মধ্যে থাকে।

৮। সরকার প্রকাশিত পুস্তকের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বা প্রদেশের নাম দিয়ে সুরু ক'রে শেষে সরকার বা তার বিশেষ মন্ত্রক বা বিভাগের নাম দিতে হয়। বিশেষ সভা বা সমিতির প্রতিবেদন সংক্রান্ত নিয়মও অনুরূপ। সুরু লেখক সংস্থানে। সংস্থা পরিচালিত পুস্তকের ক্ষেত্রে ঐভাবেই সংস্থা ও স্থানের নাম দিতে হয়।

৯। কালজয়ী গ্রন্থাদি (classics), যেমন রামায়ন, মহাভারত, গীতা, বাইবেল ইত্যাদি, এবং কোষ বা অভিধান জাতীয় গ্রন্থের পত্রক প্রস্তুত বিধি গ্রন্থকার পত্রকের মতো। অর্থাৎ এই জাতীয় গ্রন্থকেই গ্রন্থকার সংস্থানে স্থান দিতে হয়।

১০। ছদ্মনামা লেখকের ( Pseudonym ) পত্রক মূল নামে তৈরী করাই বিধেয়। তবে সব সময়ে প্রকৃত নাম জানা থাকেনা বা জানা সহজ হয়না, এবং মূল নামর চেয়ে ছদ্মনামেই লেখক বেশি পরিচিত হন, সেজন্য ছদ্মনামকেই লেখক হিসেবে ধরে মূল পত্রক রচনা করা হয় এবং প্রকৃত নামের একটি নির্দেশ পত্রক (দেখুন বা পশ্য পত্রক) তৈরি করতে হয়। লক্ষ্য রাখা দরকার যেন দুই নামেই বই না থাকে, তা হলে পত্রক একসঙ্গে থাকবেনা ছড়িয়ে থাকবে।

১১। একই বই এর একাধিক আখ্যা বা একাধিক বিষয় থাকলে, অর্থাৎ

বিবিধ আখ্যার বই একসঙ্গে গ্রথিত থাকলে অথবা একই বই-এ বিবিধ বিষয়ের আলোচনা থাকলে প্রত্যেকটি আখ্যা ও বিষয়ের আলোচনা থাকলে প্রত্যেকটি আখ্যা ও বিষয়ের জন্য বিশ্লেষ পত্রক (Analytic card) তৈরি করতে হয়।

১২। যেসব পুস্তকে চিত্রকর, সারসংকলয়িতা প্রভৃতির বিশেষ স্থান থাকে সেক্ষেত্রে তাঁদের নামেরও অতিরিক্ত পত্রক প্রস্তুত করা দরকার। নামের সুরু হবে অতিরিক্ত পত্রকের সাধারন নিয়মে আখ্যাসংস্থানে।

১৩। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে গ্রন্থকার, গ্রন্থাখ্যা, বিষয় ইত্যাদির জন্য একাধিক নির্দেশক পত্রক (reference card),—যেমন 'দেখুন' বা 'পশ্য' (see), 'আরও দেখুন' বা 'অপিচ পশ্য' (see also) পত্রক তৈরি করতে হয়।

১৪। আরেকটি অবশ্য করণীয় অনুসরনী (tracing)।

মঞ্চপত্রক অর্থাৎ মূল পত্রকের পিছনে লিখে রাখতে হয় যে ক'টি পত্রক প্রস্তুত হল তার সংক্ষিপ্ত হিসাব বা নির্দেশ। এর ফলে এক নজরে জানা যায় বইটির কতগুলি পত্রক লেখা হয়েছে। কোন কারনে এগুলির সংশোধন, সংযোজন বা বর্জনের প্রয়োজন হ'তে পারে। অনুসরনী থাকলে সেগুলি সহজেই বার করে নেওয়া সম্ভব হয়।

পত্রক রচনার জন্য মার্কিন ও ব্রিটিশ লাইব্রেরি এসোশিয়নের সংযুক্ত নিয়মাবলী আছে (joint A.L.A. code)। সেটি অনুসরণ করলে পৃথিবীর তাবৎ গ্রন্থ-সূচীকরণে সামঞ্জস্য থাক। বাংলা বা অন্যান্য ভাষার জন্যও ঐ একই নিয়ম অনুসরণ করা যায়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে নামের ব্যবহার বিধি বিচিত্র রকমের, বানান নিয়েও সমস্যা। অপরাপর দেশে যেমন নামের মধ্যে পদবীই প্রধান,—এদেশে তা নয়—মূল বা ব্যক্তিনামেরই প্রাধান্য। তাই সাধারণভাবে এখানে মূল নামেই সূচীকরণ প্রচলিত। বানানের বেলায় গ্রন্থাগার কোনো একটা নীতি মেনে নিয়ে অপরাপর ব্যবহৃত বানানের জন্য নির্দেশপত্রক রেখে দিতে পারে।

বিভিন্ন পত্রকের কয়েকটি নমুনা নিচে দেওয়া হল। এগুলি গ্রন্থাগারের পক্ষে আবশ্যিক, এবং এরই ভিত্তিতে অন্যান্য প্রয়োজনীয় পত্রক সমূহ রচিত হয়ে থাকে—গ্রন্থাগারের প্রয়োজন ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী।

১। মূল পত্রক বা মঞ্চপত্রক

025 Wilson. houis Round, Tauber, Maurice F.
W69 The university library, the orgini
zation Adminstration and functions of
academic libraries, 2nd Ed ; New york;
Columbia
xiv, 614 P., Figs., tabs. 23cm (columbia
University studies in library science No. 8)
Bibliography.

বিবি থান য়ুন-শান
৫৩ আধুনিক চীন। অনুবাদক : বীরেন্দ্রচন্দ্র
বন্দ্যোপাধ্যায় ; কলিকাতা, বিশ্বভারতী
গ্রন্থালয়, ১৩৫৩।
৮৪ পৃঃ ; [বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ, ৫৩]

২। গ্রন্থকার পত্রক

025 Wilson, houis Round, and Tauber, Maurice F.
W69 (The) university library…2nd. ed ;
1958.

| | | |
|---|---|---|
| বিবি | থান য়ুন-শান | |
| ৫৩ | আধুনিক চীন। ১৩৫৩ | |

৩। যুগ্ম লেখক / অনুবাদক পত্রক

| | | |
|---|---|---|
| 025 | | Tubes, Maurice F., jt. auth. |
| W69 | | Wilson, houis Pound, and Tauber, Maurice F. |
| | | (The) university library 2nd ed., |
| | | 1958. |

| | | |
|---|---|---|
| | | বীরেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুবাদক |
| বিবি | | থান য়ুন-শান |
| ৫৩ | | আধুনিক চীন। ১৩৫৩ |

৪। গ্রন্থাখ্যা পত্রক

| | | |
|---|---|---|
| 025 | | (The) university library · 2nd. ed,, 1958 |
| W69 | | Wilson houis Round. and Tauber. Maurice F |

| | | |
|---|---|---|
| বিবি | | আধুনিক চীন। ১৩৫৩ |
| ৫৩ | | থান য়ুন-শান |

৫। গ্রন্থমালা পত্রক

| | | |
|---|---|---|
| | | Columbia university Studies in library science |
| 025 | 8 | The University library, by louis |
| W69 | | Round wilson, and Maurice F. Tauber. |

| | | |
|---|---|---|
| | | বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ |
| বিবি ৫৩ | ৫৩ | থান য়ুন-শান। আধুনিক চীন। ১৯৫৩ |

৬। বিষয় পত্রক

| | |
|---|---|
| 025<br>W69 | LIBRARY ADMINISTRATION-<br>UNIVERSITY |
| | Wilson. houis Round, and Tauber, Maurice F<br>The university library, the organization<br>Administration and functions of academic<br>libraries, 2nd Ed ; New york, Columbia<br>university Press, 1958.<br>xiv, 614 P., Figs., tabs. 23cm (columbia<br>University studies in library science No. 8)<br>Bibliography. |

| | |
|---|---|
| বিবি<br>৫৩ | চীন-ইতিহাস |
| | থান য়ুন-শান<br>আধুনিক চীন। অনুবাদক : বীরেন্দ্রচন্দ্র<br>বন্দ্যোপাধ্যায় ; কলিকাতা, বিশ্বভারতী<br>গ্রন্থালয়, ১৩৫৩।<br>৮৪ পৃঃ ; [বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ, ৫৩] |

বিষয় পত্রকের সূত্রে কিছু নির্দেশক পত্রক, অর্থাৎ See, See also, দেখুন, আরও দেখুন—এই জাতীয় পত্রক তৈরি করার প্রয়োজন হয়। যেমন (উপরোক্ত বইদুটির পরিপ্রেক্ষিতে)—

UNIVERSITY LIBRARY-
ADMINISTRATION

See

LIBRARY ADMINISTRATION-
UNIVERSITY

LIBRARIES ADMINISTRATION

See also

LIBRARY ADMINISTRATION-
UNIVERSITY

দূরপ্রাচ্য-ইতিহাস

আরও দেখুন

চীন-ইতিহাস

নির্দেশক পত্রক সব রকমের সূচীপত্রকের বেলাতেই বানাবার প্রয়োজন হয়। গ্রন্থাগারের সূচীকরণ পদ্ধতিতে একটি বিশেষ ধারা অনুসরণ করে চলাই বিধেয়। বিষয় বা গ্রন্থকার বা অন্য যে কোন বিথনের বেলায় একবার যেভাবে লেখা শুরু করা হবে সেটিকে বরাবর বজায় রেখে চলতে হবে। অথচ বিভিন্ন গ্রন্থাগারে কিম্বা একই গ্রন্থাগারেও এগুলিকে বিভিন্নভাবে লেখা সম্ভব, লেখা অযৌক্তিকও বলা যায় না। সেই কথা ভেবে শিরোনামের নির্দেশগুলি সূচীপত্রকে থাকা অবশ্যই দরকার। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা যাবে।

এখন দেখা যাক, এই মূল পত্রকগুলি কত প্রকারের হ'তে পারে। 'গ্রন্থকার' সংজ্ঞায় কী কী বা কা'রা পড়ে তার কিছু ইঙ্গিত আগে দেওয়া হয়েছে। যিনি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তিনিই গ্রন্থকার। আবার একাধিক ব্যাক্তিও একই গ্রন্থের প্রণেতা হতে পারেন। সেক্ষেত্রে প্রত্যেক লেখকের নামে একটি ক'রে যুগ্ম লেখক পত্রক রচনা কর্তব্য। তবে, বাড়তি পত্রকের বোঝার ভার কমাতে, অথবা বিশেষ প্রয়োজন ব'লে মানে না করলে গ্রন্থাগারিক দুটি বা তিনটির বেশি যুগ্ম লেখক পত্রক রচনা করবেন না। এবং অন্যান্য লেখকদের নাম সামিল ক'রে রাখবেন গ্রন্থাখ্যার সঙ্গে, অথবা দ্রষ্টব্য বা মন্তব্য হিসেবে পত্রকের শেষাংশে।

সম্পাদক বা অনুবাদকও বিকল্পভাবে লেখকের স্থান নিয়ে থাকে। ক্ষেত্রবিশেষে এইনামে মূল গ্রন্থকার পত্রক অথবা অতিরিক্ত গ্রন্থকার পত্রক তৈরী করতে হয়।

ছদ্মনামা লেখকদের বেলায় মূল নাম জানা থাকলে সে নামেই পত্রক রচনা বিধেয়। তবে অবশ্যই ছদ্মনামের জন্য একটি গ্রন্থকার নির্দেশক পত্রক রাখতে হবে। ছদ্মনাম মূল নামের চেয়ে বেশি পরিচিত হলে ছদ্মনামেই পত্রক রচনা করা সঙ্গত,—মূল নামের জন্য একটি নির্দেশক পত্রক রেখে। কোন নামটি গ্রন্থাগারের সূচীপত্রকে থাকবে তা স্থির করবেন গ্রন্থাগারিক এবং সেই ধারা থেকে আর বিচ্যুত হবেন না। যেমন,—Clemens, S,. L., see Mark Twain, অথবা Mark Twain, see Clemens, S. L বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, দেখুন বনফুল, অথবা বনফুল, দেখুন বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। একই লেখক যদি একাধিক ছদ্মনামে লিখে থাকেন তাহলে এইভাবেই পত্রক রচনা করতে হবে।

এই সূত্রে ভারতীয় নামের ব্যবহার বিধি সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। ভারতীয় নামের গঠনে যে, দুই তিন বা ততোধিক অংশ থাকে তার ভিত্তি এবং পরিচিতি বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের। তাই একটু সমস্যার সৃষ্টি হয়। একটা সাধারণ ছকে ফেলা যায় না। ইউরোপ বা আমেরিকায় নামের পরিচয় পদবী দিয়ে, যেমন মিঃ চার্চিল, মিঃ কেনেডি। এদেশে তা নয়। নামের প্রথমাংশেই পরিচিতি। যেমন রবীন্দ্রনাথ, তারাশঙ্করবাবু, ইত্যাদি। বিদেশী নামের পত্রক রচনায় যেমন পদবী বা নামের শেষাংশকেই প্রধান ধ'রে নিয়ে পত্রক রচনা করা হয়, ভারতীয় নামের জন্য তেমনি তার বদলে মূল বা ব্যক্তিনাম নিয়েই পত্রক রচনা সুবিধাজনক। কিন্তু ভারতে উত্তরাঞ্চল এবং দক্ষিনাঞ্চলের নামের ধরন গড়ন স্বতন্ত্র ও বিচিত্র রীতির। মোটামুটিভাবে তার পরিচয় এবং পত্রক রচনা পদ্ধতির আভাষ দেওয়া হচ্ছে।

ভারতীয় নামের ক্ষেত্রে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান প্রভৃতির নামে স্বাতন্ত্র্য আছে। সাধুসন্তদের নামেও আছে বিশেষত্ব। হিন্দুনামের পদবীর মধ্যেও রয়েছে যুক্ত ব্যবহার, যেমন দাশগুপ্ত, রায়চৌধুরী, ঘোষ দস্তিদার, দত্তমজুমদার, বসুরায়, গুহঠাকুরতা, ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেকে আবার পারিবারিক পদবী বর্জন করে নাম লেখেন যেমন, উদয়শঙ্কর, শ্রীঅরবিন্দ, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, তিমিরবরণ ইত্যাদি। পদবীমূলক পত্রক রচনা করতে হলে এক্ষেত্রে সমস্যা বেড়ে যায়। পদবীর দ্বিতীয়ার্ধের জন্যও নির্দেশক পত্রক করতে হয়। যেমন, 'রায়চৌধুরী, সুধাকান্ত'—এই নামের জন্য 'চৌধুরী, সুধাকান্ত রায়,' দেখুন 'রায়চৌধুরী, সুধাকান্ত'।

তবে ব্যক্তিনামে পত্রক রচনার বিধি মেনে নিলে এই সমস্যা থাকেনা। এবং ব্যক্তিনামের পরিচয়ই প্রধান বলে এই রীতিই বহুল প্রচলিত। ইংরেজিতে এই নিয়মে পত্রক লিখলে লক্ষ্য রাখা দরকার যেন দুই পদ্ধতিই একযোগে ব্যবহৃত না হয়। যেমন, আখ্যাপত্র দেখে অনেক সময়ে এই-ভাবে লেখা হয়ে যায়,—Ramesh Chandra Mazumdar. এবং Mazumdar R. C.। স্বেচ্ছায় বা ভুলক্রমে যদি দুই ভাবে পত্রকরচিত হয়ও তাহলে এই দুই নামের পারস্পরিক নির্দেশক পত্রক তৈরি করে রাখা দরকার।

আরেকটি অসুবিধা, ইংরেজিতে নামের বানান নিয়ে। নিজের ইচ্ছে

মতো নানারকম ভাবে বানান লেখা হয়। উমেশচন্দ্র কে Umeshchandra Woomeshchandro, Oomeshchandra. অরুণকুমার কে Arun Kumar. Aroon Kumer, Arun Coomar, Oroon Cumer প্রভৃতি বিবিধ কায়দায় লেখা হয়েছে নজরে পড়ে। পদবীর বানানেও Mukherjee. Mukherji, Mookherjee, Mukerji, অথবা Banerjee, Banarji. Banerjea. Bonerji প্রভৃতি হরেক রকমের। এসব ক্ষেত্রে যথাযথভাবে পরপর লিখে টেলিফোন ডাইরেক্টারির পদ্ধতিতে পত্রকাধার ভুক্ত করা যায়,— যদিচ তাতে পাঠকদের বিভ্রান্ত বোধ করার সম্ভাবনা থাকে। তবে আরো ভালো হয় যদি গ্রন্থাগারিক সঠিক উচ্চারণ বিধি অনুযায়ী রোমান হরফে নামটির ব্যবহার পত্রকে চালু করেন। এবং সবগুলি বানানের জন্যই নির্দেশক পত্রক রাখেন। অর্থাৎ- একটি বিশেষ বানানেই রচিত হবে পত্রক এবং সেইভাবেই সজ্জিত থাকবে পত্রকাধারে।

উত্তরভারতের নাম, যেমন গুজরাটে বা মহারাষ্ট্রে, এবং দক্ষিনভারতের সব অঞ্চলেই নাম নানান ভাগে বিভক্ত। কোনো একটি নামের মধ্যে কয়েকটি নামের সমাহার লক্ষ্য করা যায়,—ব্যক্তিগত নাম, পিতার নাম, পারিবারিক নাম, অর্থাৎ জাতি, বংশ বা গোষ্ঠীর পরিচয়, এবং নিজ গ্রাম বা জন্মস্থানের নাম। যেমন, মহাত্মা গান্ধীর নাম,— মোহনদাস (ব্যক্তিগত নাম), করমচাঁদ (পিতৃনাম), গান্ধী (পারিবারিক নাম) ; রঙ্গনাথনের নাম— শিয়ালী (বংশগত গ্রামের নাম, রামামৃত (পিতৃনাম), রঙ্গনাথন (ব্যক্তিগত নাম)।

খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলে একটি খ্রীষ্টিয় নাম দেওয়া হয়। যেমন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত। আবার সন্যাস বা প্রব্রজ্যা নিলে নামের বদল হয়। যেমন, স্বামী বিবেকানন্দ, কালিকানন্দ অবধূত, শান্তি ভিক্ষু, ইত্যাদি।

মুসলমানদের নাম আজকাল ইউরোপীয় প্রভাবে কিছু সরল হয়েছে। পত্রকরচনায় পদবী দিয়েই সুরু করা যায়। যেমন, Azad, Abul Kalam ; Kabir, Humayun, ইত্যাদি। তবে নামের মধ্যে কাজী মৌলানা, সৈয়দ ইত্যাদি অংশ থাকলে তা বন্ধনীর মধ্যে রাখা চলে,— পত্রকাধারে সাজানোর সময় সেটিকে হিসেবে মধ্যে ধরা হবেনা। যেমন, Azad (Maulana) Abul Kalam ; মুজতবা আলী (সৈয়দ), আবদুল ওদুদ (কাজী), ইত্যাদি।

দক্ষিণ ভারতীয় নামের পত্রক রচনায় বিভিন্ন শ্রেণীয়দের জন্ত ভিন্ন-

রকমের ব্যবহার। তামিল ও কানাড়ীয় নামে শেষ দু'টি নামাংশ দিয়েই পত্রক সুরু করতে হয়। যেমন, Ramaswamy Aiyer, C.P. Mangesh Rao, Savour. ইত্যাদি। তেলুগু ও মালয়ালী নামে এটা নেই। যেমন, Radhakrishnan, Sarvapalle।

ইউরোপীয় নামের মধ্যে যুগ্মপদবীর প্রবল কিছু জটিলতার সৃষ্টি করে। যেমন, হাইফেনযুক্ত নাম Grose-Hodge, Humfrey ; এস্থলে নির্দেশক রচনা করতে হবে Hodge, Humfrey Grose আবার De Quincey, Thomas নামের জন্য Quincey, Thomas de নির্দেশক।

বিখ্যাত বা কালজয়ী গ্রন্থ এবং প্রাচীন শাস্ত্র বা পুরাণ ইত্যাদির পত্রক রচনায় গ্রন্থই লেখকের স্থান নেয়। এমনকি কোনো ক্ষেত্রে যদি লেখকের নাম জানাও থাকে,- যেমন রামায়ন বা মহাভারত বা শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা তবুও গ্রন্থের যশেই পরিচয় বলে রচয়িতার নামকে অপ্রধান করা হয়। এজাতীয় পুস্তক পত্রক হবে নিম্নরূপ— (এখানে পত্রকগুলির বিস্তৃত রূপ অনাবশ্যক বিবেচনায় দেওয়া হলনা। কেননা, সেগুলির রূপ কেমন হবে তা পূর্বোক্ত পত্রগুলিতে হুবহু লিপিবদ্ধ হয়েছে। নিম্নোক্ত উদাহরণগুলিতে যেখানে অংশবিশেষ লেখা হলনা সেখানে পত্রক প্রচল অনুসারে তিন ফুটকি দেওয়া হয়েছে)—

Arabian Nights<br>
  Stories from the Arabian<br>
Nights, retold by Laurence<br>
Housman,……

Housman, Laurence, ed.

Arabian Nights

Stories from the Arabian

Nights, retold by……

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক

অনূদিত…

গীতা

শ্রীমদ্ভগবগীতা

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, কর্তৃক

অনূদিত ··

জগদীশ্বরানন্দ, স্বামী, অনুঃ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ...

সংস্থা বা সরকারী প্রকাশনের পত্রক প্রস্তুত উপরোক্ত নিয়মে হলেও, অর্থাৎ সংস্থাকেই লেখক ব'লে ধ'রে নিলেও লিখনের ব্যাপারে স্বাতন্ত্র্য আছে। সংস্থা অবশ্য লেখকের স্থান নেয়, কিন্তু সরকারী প্রকাশন সুরু করতে হয় দেশ বা র‍্যাষ্ট্রের নাম দিয়ে। যেমন :—

সরকারী প্রকাশন

India, Ministry of Education.

Report of the conference

on emotional integration ..

পশ্চিমবঙ্গ। শিক্ষা অধিকার।

জলের কথা.......

সংস্থা

National Council of Applied
Economic Research. New Delhi.
Contractual Saving in
urban India···

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন, কলিকাতা।
রবীন্দ্র শতবার্ষিকী অর্ঘ.·····

এবারে বিশ্লেষ-পত্রক ( Analytic card ) প্রসঙ্গ। কোনো কোনো গ্রন্থে একাধিক লেখক লিখিত বিবিধ বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। অথবা একই লেখকের বিভিন্ন ধরণের রচনা গ্রথিত থাকে। এসব ক্ষেত্রে প্রতিটি বই এবং প্রত্যেক লেখকের নামে স্বতন্ত্র পত্রক প্রস্তুত করা বিধেয়। নিচে এ জাতীয় পত্রকের কতকগুলি উদাহরণ উল্লিখিত হল :—

মূল পত্রক

Fry, Christopher
Three Plays···
Contents : The First born ;
Thor, with angels : A sleep of
prisoners.

লেখক বিশ্লেষ পত্রক

Fry, Christopher

(The) First born ( included in his 'Three plays'. p, 1-96 )

---

Fry, Christopher

Thor, with angels ( included in his 'Three plays', p, 97-154 )

---

( The ) First born

Fry, Christopher ( in his 'Three plays'. p 1-96 )

| | | |
|---|---|---|
| | | Thor, with angels |
| | Fry, Christopher ( in his | |
| | | 'Three plays'. p 97-154 ) |

একই লেখকের গ্রন্থের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত রচনা থাকলে সেগুলির অন্তর্ভুক্তি পত্রক ( Includes Card ) উপরোক্ত ভাবেই প্রস্তুত করা যায়। বিভিন্ন বিষয়ের বা পরিচ্ছদের লেখক যদি স্বতন্ত্র হন তাহলে তাঁদের নামেও এই পদ্ধতিতেই পত্রক রচনা বিধেয়। এবং কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত বিশেষ রচনাধ পত্রকও লেখক ও আখ্যা অনুযায়ী এই রীতিতে রাখা সম্ভব। এই জাতীয় পত্রকের উদাহরণ নিচে গ্রথিত করা গেল।

লেখক বিশ্লেষ পত্রক

| | | |
|---|---|---|
| | Nihar Ranjan Ray | |
| | | Sculpture, |
| | | ( In R. C. Majumdar & A. D |
| | Pulsalker, ed., The History and | |
| | Culture of the Indian people, | |
| | V. II, 1953, p. 506-526 ) | |

প্রবোধ চন্দ্র সেন

রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে কালিদাস।

( পুলিন বিহারী সেন, সাং
রবীন্দ্রায়ন, ১ম খণ্ড, পৃ: ৮৩-১১৩ )

আখ্যা বিশ্লেষক পত্রক

Sculpture.

Nihar Ranjan Ray

( In R. C Majumdar & A. D,
Pusalker. ed., The History and
Culture of the Indian people,
V. II, 1953, p. 506-526 )

রবীন্দ্র দৃষ্টিতে কালিদাস।

প্রবোধ চন্দ্র সেন

( পুলিন বিহারী সেন, সাং, রবীন্দ্রায়ন,
১ম খণ্ড, ১৩৬৮, পৃ: ৮৩-১১৩ )

বিষয় বিশ্লেষ পত্রক

SCULPTURE – INDIA

Nihar Ranjan Ray

Sculpture. ( In R. C. Majumdar & A. D. Pusalkar, ed., The History and Culture of the Indian people, v II, 1953, p. 506-526 )

---

রবীন্দ্রনাথ ও কালিদাস—আলোচনা

প্রবোধ চন্দ্র সেন

রবীন্দ্র দৃষ্টিতে কালিদাস। ( পুলিন-বিহারী সেন, সাং, রবীন্দ্রায়ন, ১ম খণ্ড, ১৩৬৮, পৃ: ৮৩-১১৩ )

---

কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ—আলোচনা

প্রবোধ চন্দ্র সেন

রবীন্দ্র দৃষ্টিতে কালিদাস, ( পুলিন বিহারী সেন, সাং, রবীন্দ্রায়ন, ১ম খণ্ড, ১৩৬৮, পৃ: ৮৩-১১৩ )

অভিধান ও কোষ গ্রন্থাদির পত্রক রচনায় গ্রন্থকারের নাম সেই সকল ক্ষেত্রে বাদ দেবার রীতি যেখানে গ্রন্থটির নামই প্রধান বা বেশি পরিচিত। তাছাড়া এগুলি অনেক সময়েই কোনো সংস্থা থেকে প্রকাশিত হয় এবং সংকলক বা সম্পাদক বদল হয়। খ্যাতিমান প্রথম বা প্রধান সম্পাদকের বা প্রণেতৃর নামে পত্রক রচনাও বিধেয়। এ জাতীয় কয়েকটি উদাহরণ নিচে দেওয়া হল। —

Webster, Noah
New International dictionary
of the English language ···

Chamber's twentieth century
dictionary, rev, edn., with
Supplement, ed, by ······

Encyclopodia Britannica ;
a new survey of university
knowledge, 15th edn. ...
24 v,
v. 25 Index,

হরি চরন বন্দ্যোপাধ্যায়
বঙ্গীয় শব্দকোষ, নিউ দিল্লি.
সাহিত্য অকাদেমী, ১৯৬৬
২ খণ্ড
খণ্ডশ: প্রথম প্রকাশ ১৩৪০-১৩৫৩

ভারত কোষ ; কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য
পরিষদ ..
৫ খণ্ড
১ম খ: অওঘড়—উষানাথ সেন
২য় খ: ঋগ্বেদ—কেসরকেসস
৩য় খ: খই—থ্রম্বোসিস
৪র্থ খ: দই – ফ্লেমিং
৫ম খ: বংশধর—হ্বেবের, আলব্রেখট ফ্রিড্রীথ্

উপরোক্ত নমুনা-পত্রক গুলিতে লক্ষ্যনীয়, কোষগ্রন্থ এবং নামী অভিধানের আরম্ভ লেখক সংস্থান থেকে এবং তারপরে সমুদয় উল্লেখই আখ্যাসংস্থানে আবদ্ধ, —আর ঘুরে লেখক সংস্থানে যাচ্ছেনা। এ রকম পত্রক রচনাকে বলে hanging indextion বা উদ্বন্ধ সংস্থান। তবে এই পত্রক গ্রন্থকার পত্রকের পদ্ধতিতেও লেখা যায়।

বর্ষপঞ্জী, পঞ্জিকা ইত্যাদির পত্রক, এবং বাঁধানো পত্রিকার পত্রকও, গ্রন্থের নামে লেখারই রীতি। গ্রন্থাগারে এগুলির যে সব সংখ্যা আছে এবং যেগুলি নাই তা'র নির্দেশও পত্রকে লিখতে হয়। যেমন, —

(The) Statesman's year-book ;

Statistical and historical anrual
of the states of the world 1st
edn. 1864.
london, Macmillan,
1864
-v. 18cm

See next card.

2

The Statesman's year-book ( contd ).

Editors : 1864-82, F. Martin ;
1883-94. I. S. Keltie ; – etc.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Library has | | Library Locks | |
| . . . | --- | ... | --- |
| . . . | ... | ... | ... |

পঞ্জিকা

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা। ...

| গ্রন্থাগারে আছে | | | গ্রন্থাগারে নাই |
|---|---|---|---|
| ১ | ৩৬ | ৫-৭০ | ১৩৭১ |
| ১ | ৩৭ | ২ | ১৩৭৩ |
| ১ | ৩৭ | ৪-৭৬ | ১৩৭৭ |
| ১ | ৩৭ | ৮ | ...... |

পত্রিকা বাঁধিয়ে নেবার পর গ্রন্থের মর্যাদা পায় এবং পরিগ্রহণ ও বর্গীকরণের পর মঞ্চে স্থান পায়। পত্রিকার পত্রক রচিত হয় পত্রিকার নাম অনুসারে। পত্রক-রচনার রীতি নিম্নরূপ :—

Modern review ; a monthly review and misecllany v 1- ; 1907- Calcutta, Modern Review Office.
- v.
Editors : 1907-1942, Ramananda-Chatterjee : 1943, Ramananda Chatterjee & Kedarnath Chatterjee ; 1944 —Kedarnath Chatterjee.

| Library has | | Library lacks |
|---|---|---|
| . . . . | ... | --- |

বঙ্গদর্শন, মাসিক পত্রিকা
সম্পাদক : ১২৭৯-৮২, বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ;
১২৮৪-৮৯, সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ;
১২৯০, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ; নবপর্যায়-
১৩০৮-১৩, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; ...ইত্যাদি

| গ্রন্থাগারে আছে | গ্রন্থাগারে নাই |
|---|---|
| . . , --- | --- --- |

মূল পত্রক বা মঞ্চ পত্রকের ( Shelf list ) অপর পৃষ্ঠে অনুসরণী ( tracing ) লেখা প্রয়োজন। কোনো সময়ে প্রয়োজন হলে এর থেকে এক নজরে জেনে নেওয়া যায় গ্রন্থটির জন্য কোন কোন বিশেষ পত্রক বা অতিরিক্ত পত্রক প্রস্তুত করা হয়েছে। তা নইলে পত্রকগুলির সন্ধান মেলেনা. ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যায়। নিচে এই রকমের পত্রক রচনার এপিঠ ওপিঠের নমুনা দেওয়া হল।—

Jobes, Gertrude
Dictionary of mythology, folk
Lore and symbols. New york,
Scarecrow Press. 1962 –
3 v. 22cm.
Bibliography

1. author
2. title
3. mythology—Dictionary
4. folklore—Dictionary
5. Symbols—Dictionary

বীরেন্দ্র [চন্দ্র] বন্দ্যোপাধ্যায়

সূর্যিমামার দেশের গল্প ( চীন-

জাপান- ( কোরিয়া )। [চিত্র শিল্পী—অরূপ

গুহঠাকুরতা]। কলিকাতা, এ মুখার্জী এণ্ড

কোং লিঃ, [১৩৬০]

[৮], ১০০ পৃঃ। সচিত্র।

মূল্য ---

১। গ্রন্থকার
২। গ্রন্থাখ্যা
৩। চিত্রশিল্পী
৪। রূপকথা—চীন
৫। রূপকথা—জাপান
৬। রূপকথা কোরিয়া

## পত্রক বিন্যাস ( Filing of cards )

পত্রকাধারে (Card cabinet) সূচীকৃত পত্রক স্বভাবতই একটি সুষ্ঠ এবং সুবিন্যস্ত পদ্ধতিতে সাজিয়ে রাখা দরকার। পত্রক দুই রকমের ধারায় বিন্যস্ত হতে পারে ; শব্দানুক্রমিক (word to word) এবং বর্ণানুক্রমিক (letter to letter)। নমুনা হিসেবে 'New york' এবং 'Newark' 'পশ্চিম বঙ্গ' এবং 'পশ্চিমাঞ্চল'—এই চারটি নাম শব্দ নেওয়া যাক। শব্দানু-

ক্রমিক পদ্ধতিতে সাজালে 'Newark' আসবে New york' এর পরে. 'পশ্চিম বঙ্গ' আসবে 'পশ্চিমাঞ্চল এর আগে। বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিতে এই সজ্জা উল্টে যাবে; Nework এর পরে আসবে 'New york' এবং 'পশ্চিম বঙ্গ 'পশ্চিমাঞ্চল' এর পরে আসবে। কেননা 'New' এবং 'পশ্চিম' শব্দ দুটিকে প্রধান ব'লে ধ'রে নেবার ফলে যতক্ষণ না এই শব্দে গঠিত বাক্যাংশ শেষ হচ্ছে ততক্ষন অন্য শব্দ আনা যাচ্ছেনা। কিন্তু বর্ণ বা অক্ষরকে যদি প্রধান ধরা হয় তাহলে যেহেতু 'y' এর আগে 'w', এবং 'ব' এর আগে 'া' (আ) আসছে, সেহেতু 'Newark' এবং 'পশ্চিমাঞ্চল' এসে যাচ্ছে আগে। এই পদ্ধতিতেই সাধারণত অভিধানের শব্দাবলী সজ্জিত থাকে, তাই এই সজ্জাকে 'আভিধানিক তালিকা' (dictionary catalogue) বলেও অভিহিত করা হয়। গ্রন্থাগারিক স্থির করে নেন উপরোক্ত কোন পদ্ধতিতে তাঁর গ্রন্থাগার পত্রক সাজানো থাকবে, এবং একবার তা ঠিক ক'রে নেবার পর থেকে তিনি আর বিচ্যুত হন না।

পত্রকাধারে বিন্যস্ত পত্রকগুচ্ছের মাঝে মাঝে বিভাগ বোঝাবার জন্য সংকেত পত্রক ( guide card ) রাখা বাঞ্ছনীয়। এই পত্রকের উপরের কিছুটা অংশ সামান্য বাড়ানো থাকে এবং সেই বাড়তি অংশে লেখা থাকে সংকেত লিপি। নিচে এই জাতীয় পত্রকের নমুনাচিত্র দেখা যাবে।—

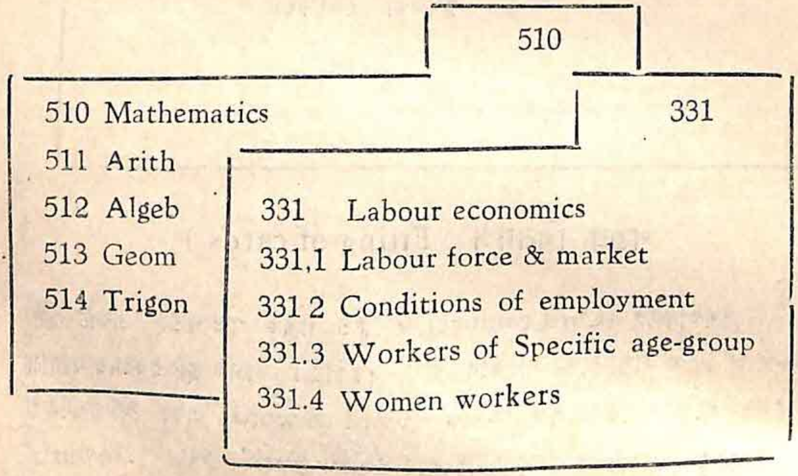


উপরের চিত্রে পরপর দুটি সংকেত পত্রকের নমুনা মুদ্রিত হল। সংকেত

পত্রকের বাড়তি অংশটুকু প্রতি পত্রকেই একই কোনে না রাখাই বাঞ্ছনীয়। বিভিন্ন পত্রকের বিভিন্ন স্থানে বাড়টুকু রাখলে আঁকাবাঁকা ভাবে (zigzag) সজ্জিত থাকে, এবং পত্রকাধার খুললেই এক নজরে অবস্থানগুলি দেখবার সুবিধে হয়।

এছাড়াও প্রতিটি পত্রকাধারের গায়ে (সম্মুখভাগে) সংলগ্ন ঘরে সেই আধারে সজ্জিত পত্রকের প্রথম শব্দ বা অক্ষর এবং শেষ শব্দ বা অক্ষর লিখে রাখতে হয় সেকথা বলা বাহুল্যমাত্র। নমুনা চিত্র নিম্নরূপ—

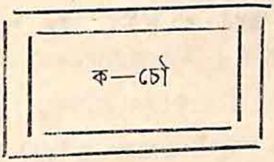


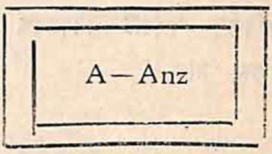


## গ্রন্থবিদ্যা

গ্রন্থবিদ্যা (Bibliography) মোটামুটি ভাবে দু'রকমের হতে পারে। একটিতে পুস্তকের বিষয়বদ্ধ বিবরণ, অপরটিতে উপকরণ বা উপাদানগত তথ্য বিশ্লেষণ। ইংরেজিতে enumerative অথবা systematic bibliography, এবং analytical অথবা critical bibliography; বাংলায় বলতে পারি 'গ্রন্থেক্ষণ' এবং 'গ্রন্থবীক্ষণ'। 'ঈক্ষণ' ও 'বীক্ষণ'—এই দুই শব্দের ব্যবহার দিয়ে বই এর বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীন বিচারের পার্থক্য বোঝাতে চেয়েছি। একটিতে বাহির থেকে দেখা,—তথ্যবিন্যাস,—বহিরঙ্গ বিচার; অপরটিতে ভিতর থেকে দেখা,—অনুশীলন,—অন্তরঙ্গ বিচার।

গ্রন্থবিদ্যাকে একাধারে শিল্প ও বিজ্ঞান বলা যেতে পারে। তথ্যবিবরণাদির পর্যায় শৈল্পিক ক্রিয়া, গ্রন্থপ্রস্তুতি পর্ব বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া গ্রন্থকে আধিভৌতিক বা বাস্তব পদার্থ হিসেবে গ্রহণ ক'রে নিয়ে গ্রন্থবিদ্যার কাজ সুরু। গ্রন্থালোচনার সূত্রপাত ভাবের আদান প্রদানের আধার হিসেবে। গ্রন্থই সমাজের দশজনের কাছে বক্তব্য উপস্থাপন করে, এই তার সক্রিয় বাস্তব ভূমিকা। গ্রন্থ ও তা'র আধারের বিচার বিশ্লেষণ—

সম্যক ধারণাই গ্রন্থবিদ্যা, —গ্রন্থকেন্দ্রিক বিদ্যা ও সমীক্ষা। কিন্তু এর সঙ্গে বই এর বিষয় মূল্যের বা সাহিত্যমূল্যের প্রত্যক্ষ কোনো সম্বন্ধ নেই। বক্তব্য বিষয়ের প্রচার ও প্রসার পুস্তকের লক্ষ্য ; সাহিত্য-দলিলের প্রামানিকতা গ্রন্থ-বিশ্লেষণের কাজ। যত্নকৃত গ্রন্থেক্ষণ ও গ্রন্থবীক্ষণ বই এর বিষয়-বিচারের বারো আনা কাজ ক'রে দেয়। গ্রন্থবিজ্ঞানের বাকি অংশের পরিপূরক সাহিত্যশিল্প।

গ্রন্থেক্ষণ বইএর বর্ণনামূলক বা বিষয়ানুক্রমিক তথ্য বিবরণ। গ্রন্থ-বীক্ষণ বই এর আলোচনামূলক বা বিশ্লেষণাত্মক বিচার। একটি বিষয়বদ্ধ গ্রন্থবিদ্যা, অপরটি বিষয়বদ্ধ গ্রন্থবিদ্যা। এখন এ দু'টির কিছু পরিচয় নেওয়া যাক।

## গ্রন্থেক্ষণ

পুস্তকে প্রকাশিত বিষয়ের লিপিবদ্ধ বিবরণ প্রস্তুত করা গ্রন্থেক্ষনের কাজ—যাতে বইটির গঠন ও প্রকরণ সম্পর্কে যে কোন বিদ্যার্থী এক নজরে উদ্দেশ পান। কোন বিষয় নিয়ে গবেষণা বা পড়াশোনা করতে গেলে উক্ত বিষয়ে কী কী বই বেরিয়েছে এবং কোন কোন ধরনের কাজ হয়েছে তার জ্ঞান সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এ কাজ কেবলমাত্র বিষয়গত তালিকা প্রণয়নেই শেষ হয়না, বিষয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্য বিবৃতিও থাকলে বিদ্যার্থী বইটি চেখে না দেখলেও তা'তে কী আছে, কোন ধরণের আলোচনা আছে তা জানতে পারেন। এজন্যই গ্রন্থপঞ্জী নানা ধরনের হয়ে থাকে। এবং তা পুস্তক তালিকার থেকে স্বতন্ত্র রকমের হয়। বিবিধ প্রকাশক, পুস্তকবিক্রেতা প্রভৃতির গ্রন্থতালিকা বই সম্পর্কে সামান্যমাত্র পরিচয় দেয়। গ্রন্থাগারের গ্রন্থ সংগ্রহ তালিকাও সংক্ষিপ্ত,—ক্ষেত্রবিশেষে কিছু পরিমাণ বিস্তারিত হতে পারে। আবার বিষয়গত বা ভাষাগত গ্রন্থপঞ্জীও তৈরি হতে পারে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সহ। লেখক, প্রকাশ-কাল, প্রকাশক প্রভৃতিকে কেন্দ্র করেও রচয়িতা-কেন্দ্রিক, স্থান কেন্দ্রিক, কালানুক্রমিক,—এবং নানান দৃষ্টিকোণ থেকে নানান ধরণের রচনার তালিকা বা পঞ্জী প্রস্তুত হতে পারে। এই সবের মধ্যে একটা জিনিস স্পষ্ট যে,

বিন্যাসের সূত্র এমন হওয়া দরকার যাতে কার্যকর কোনো বিশেষ ধারা বা পদ্ধতি অনুসরণ করা যায়। তালিকার আবশ্যিক ন্যূনতম বিবরণ লেখকের ও গ্রন্থের নাম। কিন্তু প্রকাশক, মুদ্রক, প্রকাশ-কাল, সংস্করণ প্রকাশ স্থান, পত্রসংখ্যা, মূল্য প্রভৃতির উল্লেখ না থাকলে তালিকা বা গ্রন্থ পরিচিতি অসম্পূর্ণ থেকে যায়, বইটিকে যেন চিনেও সনাক্ত করা যায় না। সুতরাং উপরোক্ত পরিচয়টুকু লিখলে গ্রন্থটির মোটামুটি একটা পরিচয় ফুটে ওঠে। যেমন—

গ্রন্থাগার বিদ্যা/শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়/
কলিকাতা/জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ/
১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দ/[৪]+ক-ঙ+[৩]+১০৮ পৃঃ/
১/৮ ডিমাই/৮্টাকা

কিন্তু বিদ্যার্থীর প্রয়োজন বুঝে এবং গবেষনা ইত্যাদির জন্য গ্রন্থবিবরণ আরো বিস্তারিত করা যায়। এজন্য বইটির সূচীপত্র অনুযায়ী ভূমিকা প্রবন্ধগুলির শিরোনাম, গ্রন্থপঞ্জী বা নির্ঘণ্ট অংশের উল্লেখ করা যায়। আরেকটু বিশদ করতে হলে প্রবন্ধগুলির বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও লিপিবদ্ধ করতে হয়। সংস্করণ হলে তারও উল্লেখ প্রয়োজন। অর্থাৎ প্রথম পরিচয় বই এর আখ্যাপত্র থেকেই মোটামুটি মেলে। পরিচয়ের ব্যাপ্তির জন্য বইটি আদ্যোপান্ত উল্টে পাল্টে দে'খে এবং পড়ে নিতে হয়।

গ্রন্থক্ষণের বিভিন্ন প্রকাশ নিম্নরূপ—

১। সাধারণ গ্রন্থপঞ্জী। প্রস্তুতের মূল ধারা কালানুক্রমিক, ভৌগলিক ভাষাভিত্তিক, ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে আবার উপবিভাগ থাকতে পারে। যেমন, কোনও কালপর্যায়ে প্রকাশিত গ্রন্থের স্থান ভিত্তিক তালিকা বা ভাষাভিত্তিক, তালিকা (এখানে প্রকাশকাল প্রধান বিভাগ এবং স্থান বা ভাষা উপবিভাগ); অথবা বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থের স্থান ভিত্তিক তালিকা (এখানে ভাষা প্রধান ভাগ এবং স্থান উপবিভাগ); ইত্যাদি।

২। প্রকারগত গ্রন্থপঞ্জী। প্রকাশিত গ্রন্থাদির বিশেষ কোনো প্রকার যা'র ভিত্তি। যেমন, Union list of Serials; World Bibliography of Bibliographies, শিশুগ্রন্থপঞ্জী, ইত্যাদি।

৩। বিষয়গত গ্রন্থপঞ্জী। বই এর অন্তর্গত লিখিত বিষয়ের ভিত্তিতে প্রস্তুত গ্রন্থতালিকা।

৪। রচয়িতা কেন্দ্রিক গ্রন্থপঞ্জী। বিশেষ লেখক বা চিত্রকর ইত্যাদির প্রকাশ-তালিকা।

৫। বিবিধ। এগুলি ছাড়াও বিবিধ ও বিচিত্র ধরণের পঞ্জী হতে পারে। যেমন৷ British National Bibliography. Indian National Bibliography, Index Translationum, Catalogus Catalogorum, ইত্যাদি। বিভিন্ন প্রকাশকগণও তাঁদের প্রকাশিত পুস্তক তালিকা তৈরি করেন, যেমন, পুস্তক বিক্রেতা সমিতির তালিকা। অথবা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সমিতি প্রকাশিত আরেক ধরণের নির্বাচিত গ্রন্থ তালিকা।

কিন্তু গ্রন্থেক্ষণের কাজ পুস্তকের সাধারণ তালিকা প্রণয়নেই শেষ হয় না, বিষয়ানুগ ও বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রস্তুত পঞ্জীকরণই প্রধান। গ্রন্থপঞ্জীর প্রস্তুতিতে ব্যাপক তথ্যসন্ধান ও তার বিন্যাস আবশ্যক। পঞ্জী সমগ্র বই নিয়ে হতে পারে, বই এর অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধাদির বিবরণ হতে পারে, পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের বিষয়বদ্ধ বিন্যাস হতে পারে। কোনো বিষয় নিয়ে যেমন পূর্ণাঙ্গ একটি বই লেখা যায়, তেমনি বিভিন্ন বিষয়ের প্রবন্ধ সমষ্টি নিয়েও বই তৈরী হয়। পত্রিকায় তো সাধারণত প্রবন্ধ বৈচিত্র থাকেই। তাই একাজের জন্য গ্রন্থ এবং/বা রচনার অনুসন্ধান প্রয়োজন। এবং সেজন্য বিভিন্ন আকার গ্রন্থের সাহায্য নিতে হয়, অথবা প্রকাশিত যাবতীয় পুস্তক এবং/বা পত্রিকা খুঁজে দেখতে হয় এইসব বিবরণ লিপিবদ্ধ করে তারপরে বিশেষ পদ্ধতিতে সাজিয়ে নিতে হয়,— স্থান, কাল, বিষয় ইত্যাদির যে কোনো পর্যায়ে। যেসব গ্রন্থপঞ্জী মূল রচনার সর্বাশ্রয়ী বা সর্বৈব বিবরণ দেয় সেগুলিকে বলা যায় আকরগ্রন্থ। এবং এর সাহায্যে গবেষণার অনুকূল বিবিধ বিষয় পঞ্জী তৈরি সম্ভব হয়। যেমন, প্রথম পর্যায়ে জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী, এবং তার থেকে বিজ্ঞান চর্চার গ্রন্থপঞ্জী, অনুবাদ গ্রন্থপঞ্জী প্রভৃতি প্রস্তুত হতে পারে। এধরনের বিশেষ পঞ্জীতে অধিকতর তথ্য সন্নিবেশ সমীচিন। পঞ্জীকারক যিনি, তাঁকে তাঁর কাজ সম্পর্কে সংহত দৃষ্টি রাখতে হবে, উচ্চ এবং দৃঢ় ধারণা পোষণ করতে হবে, লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কোনো ছোটোখাটো জিনিসকেও তুচ্ছ জ্ঞান না করা হয়। তাঁর কাজ পরিচ্ছন্ন, যথাযথ ও সংক্ষিপ্ত ভাবে পঞ্জীসামগ্রী লিপিবদ্ধ করা। অনুমানের উপরে ভিত্তি ক'রে, অথবা অপর কা'রো উল্লেখকেই অভ্রান্ত না ভেবে নিজেকে খুটিয়ে দেখে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হবে।

পঞ্জীর ধরণ এবং অনুক্রম গবেষকদের জিজ্ঞাসার অনুকূল হ'ল কিনা সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে গ্রন্থপঞ্জী হবে সংক্ষিপ্ত অথচ পুঙ্খানুপুঙ্খ।

সূক্ষ্ম বিচারে গ্রন্থেক্ষণকে দুই ভাগ করা চলে। · বিবরণমূলক (descriptive) এবং অনুক্রমিক (enumerative) প্রথমটি বিস্তারিত আকর-গ্রন্থ প্রস্তুতির শ্রেণীতে পড়ে। এটি গ্রন্থসন্ধান পর্বের এবং বিষয়বস্তু বিন্যাস ও পরিচিতির চূড়ান্ত নির্ধারক। এটি দ্বিতীয়টির চেয়ে স্বভাবতই একটু বেশী মাত্রায় ছড়ানো ধরণের হয়। অনুক্রমিক গ্রন্থেক্ষণ পুস্তক সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় অথচ ন্যূনতম গ্রন্থবিবরণ লিপিবদ্ধ করে। বিবরণমূলক গ্রন্থেক্ষণ কোনও পুস্তকের একাধিক সংস্করণের পার্থক্য লিপিবদ্ধ করে, গ্রন্থের অন্তর্গত খুঁটিনাটি যাবতীয় প্রসঙ্গ খতিয়ে দেখে। ফলে এটি গ্রন্থের নিখুঁৎ বা আদর্শ সংস্করণ নির্ণয়ে সহায়তা করে। অপরপক্ষে অনুক্রমিক প্রকল্প কোনো গ্রন্থের একটিমাত্র প্রস্থ নিয়ে তা'র বিবরণটুকুই লিপিবদ্ধ করে,— সংক্ষিপ্তভাবে অথবা বিশদভাবে। কোনও তুলনামূলক বিবৃতির মধ্যে যায় না। বিবরণমূলক গ্রন্থেক্ষণ গ্রন্থ সংস্করাণর তুলনামূলক বিশ্লেষণ হয়ে দাঁড়ায়, —মুদ্রণ, মুদ্রক, হরফ, কাগজ থেকে সুরু করে বিস্তারিত বিষয়সূচী এবং প্রকাশনার উল্লেখ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করে। পরিণামে এজাতীয় গ্রন্থপঞ্জী প্রায় বিশ্লেষণাত্মক প্রকল্পকে ছুঁয়ে যায়।

বিবরণমূলক গ্রন্থেক্ষণ কিভাবে গ্রন্থবিশ্লেষণ হয়ে দাঁড়ায় তার উদাহরণ নেওয়া যাক। গ্রন্থবিবরণে ন্যূনতম পরিচয় লেখার নমুনা আগে দেখা গিয়েছে। তা'তে থাকে লেখকের নাম; গ্রন্থনাম এবং ঐসঙ্গে আখ্যাপত্রে যতটুকু বিবরণ থাকে,—অর্থাৎ সংস্করণ, সম্পাদক বা অনুবাদক বা চিত্রকর ইত্যাদি; পুস্তকতথ্য এবং মুদ্রণতথ্য। কিন্তু বিস্তৃত পরিচয়ের জন্য গ্রন্থটির হুবহু বিবরণ প্রয়োজন হয়। পর্যায়ক্রমে আখ্যাপত্রের সমগ্র লিপি বা প্রতিলিপি, সংস্করণ বা পুণর্মুদ্রণ, বিশেষ আখ্যা এবং বিভাগীয় আখ্যা, পুষ্পিকা, পুস্তকের মাপ ও ফর্মাসংখ্যা, গ্রন্থপ্রকরণ, কাগজ ও হরফ সংক্রান্ত টীকা, অধ্যায়নাম তালিকা এবং ক্রমাগত গ্রন্থনাম টীকা, (বিকল্প সহ), সূচী, টীকা-টীপ্পনি ইত্যাদি যাবতীয় তথ্যেরই উল্লেখ করতে হবে। পুরানো দিনের পুস্তকে পত্র সংখ্যার বদলে ফর্মা বা গুচ্ছসংখ্যা থাকত তাই সেগুলি পরপর উল্লেখ ক'রে তার যোগফলে পত্র সংখ্যা গণনা করতে হয়। আধুনিক গ্রন্থে এবং সংস্করণেও তার উল্লেখ বাঞ্ছনীয়—মুদ্রণাদির প্রভেদ নির্ণয়ের জন্য। অর্থাৎ, সমগ্রভাবে

বইটি যেমন ভাবে সাজানো সেইভাবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিবরণ লিখে যেতে হবে, যা'তে চোখের সামনে বইটি না থাকলেও অনুসন্ধিৎসু সেটিকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন। পূর্বে উল্লিখিত বইটিকেই ছোটখাট উদাহরণ হিসেবে ধ'রে নেওয়া যাক। (বিবৃতিতে বড় দড়িগুলি একেকটি পংক্তির শেষ নির্দেশ করছে।) :—

[ আখ্যাপত্র ]

গ্রন্থাগারবিদ্যা/শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়/

(প্রকাশকের শীলমোহরাঙ্কিত নক্সা)/জেনারেল প্রিন্টার্স

য়্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড/১১৯, ধর্মতলা

ষ্ট্রীট : কলিকাতা ১৩

[আখ্যাপত্রের অপরপৃষ্ঠে, বামাংশ]

শ্রীসুরজিৎচন্দ্র দাস কর্তৃক ------ --- হইতে প্রকাশিত/Cবীরেন্দ্র চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়/প্রথম সংস্করণ আগষ্ট ১৯৬৮/মূল্য—আট টাকা/শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় কর্তৃক শ্রীসুরেন্দ্র প্রেস/১৮৬/১, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

পৃষ্ঠা [৪]+(ক—চ)+[২]+১০৮

[গুচ্ছচিহ্ন]২—৭^১৬ ; ট্রুডিমাই

[প্রবন্ধক্রম] গ্রন্থাগার বিদ্যা, ১—৬ ; গ্রন্থাগারে মনোবীক্ষণ, ৭—১২ ; জনসংযোগে গ্রন্থাগার; ১৩—২২ ; গ্রন্থাগারে কর্মীসহযোগ, ২৩—৩১ গ্রন্থাগারের সমরকালীন ভূমিকা, ৩২—৩৭ ; সাময়িকী ৩৮—৫৫ ; গ্রন্থাগারে প্রচার, ৫৬—৬৭ ; গ্রন্থাগারের গ্রন্থাতিরিক্ত কার্যক্রম, ৬৮—৭৫ ; রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থচিন্তা, ৭৬—৮১ ; বাংলা বই ও গ্রন্থাগার, ৮২-৮৯ ; বই এর আঙ্গিক বিভ্রাট, ৯০—৯৭ ; ডিউই বর্গীকরণ : ভারতবর্ষ ও এশিয়া, ৯৮—১০৮।

[টীকা] আখ্যাপত্র, দক্ষিণ ও বামাংশ—পূর্বোল্লেখ অনুরূপ। তৃতীয় পত্রের দক্ষিণাংশ উৎসর্গপত্র, পাঠ নিম্নরূপ :—'যাঁর উৎসাহ এবং সহায়তায় গ্রন্থাগারবিদ্যায় ... ... ... ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয়ের স্মরণে। সশ্রদ্ধ নিবেদন।'; উৎসর্গপত্রের অপরপৃষ্ঠে বাম পত্রাংশ মুদ্রণ শূন্য। পৃষ্ঠা ক-ঙ গ্রন্থকারের মুখবন্ধ ; [চ] বা 'ঙ' পত্রাঙ্কের অপরপৃষ্ঠে বামাংশ মুদ্রণশূন্য। পরবর্তী পৃষ্ঠা সূচীপত্র ইহার অপরপৃষ্ঠ মুদ্রণশূন্য।

পুস্তকটির বাম পত্রাঙ্ক সমূহে ক্রমায়ত গ্রন্থাখ্যা এবং দক্ষিণ পত্রাঙ্ক

সমূহে ক্রমায়ত অধ্যায় আখ্যা মুদ্রিত।

এইভাবে বক্ষ্যমান পুস্তকের বিশিষ্ট অংশের বিবরণ এবং বৈশিষ্ট্য গুলি তুলে ধরে গ্রন্থেক্ষণ, যা'র পরিণতি গ্রন্থবীক্ষণের গবেষণা প্রতিম পর্যায়ে।

## গ্রন্থবীক্ষণ

গ্রন্থবীক্ষণের প্রধান কাজ বিশ্লেষণাত্মক বা বিচারমূলক সমীক্ষা। এই থেকেই উদ্ভূত হয় ইতিবৃত্তি-মূলক (historical) বীক্ষণ প্রকল্প। বিশ্লেষণাত্মক সমীক্ষার ক্রিয়াপর্যায় মুদ্রিত পুস্তক অথবা পাণ্ডুলিপির গঠন ও উপাদান পরীক্ষা করে দেখা. বিশেষ কোন বই এবং সংস্করণের অকৃত্রিমতা বিচার গবেষণা সূত্রে অথবা অন্য যেকোনো প্রকারের যাচাই প্রসঙ্গে কোনো বই বা পাণ্ডুলিপি হাতে এলে সেটির সম্পর্কে তিনটি প্রশ্ন উঠতে পারে। (১) বইটিতে কোন বিষয় লিপিবদ্ধ হয়েছে ; (২) বক্ষ্যমান বইটি কবে প্রকাশিত এবং কত সংখ্যক সংস্করণ ; (৩) বইটি অবিকৃত এবং সম্পূর্ণ কি না। প্রশ্নগুলি শুনলে মনে হবে সমাধান সহজ। খবরগুলি তো আখ্যাপত্রে সূচীপত্রকেই দেওয়া থাকে। কিন্তু সূচীপত্রকের পরিবেশণ তো যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং ; বিচার বিশ্লেষণের কাজ তার নয়। বীক্ষণের কাজ বিশদ অন্তর্ভেদী ; অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে তবে পুথি বা বই এর প্রকৃত রচয়িতা, প্রকাশকাল, প্রকাশকেন্দ্র, সংস্করণ, লিখিয়ে বা মুদ্রাকর প্রভৃতির নির্ধারণ সম্ভবপর হয়, আসল না নকল সেই দ্বন্দ্বের নিরসন হয়। একটি পুথি বা পুস্তককে কেন্দ্র করে সমকালীন ইতিহাস ও সমাজের চেহারা ধরা পড়ে। পোড়ামাটির শিল্প নিদর্শন বা প্রস্তরলিপি যেমন যুগ পরিচায়ক, একেকটি পুথিও তেমনি একেক যুগের সাক্ষী।

বিশ্লেষণাত্মক সমীক্ষা ইতিবৃত্তমূলক বীক্ষণ অতিক্রম ক'রে পাঠকেন্দ্রিক গ্রন্থবীক্ষণ (textual bibliography) হয়ে পড়ে। এই বীক্ষণের কাজ বক্ষ্যমান পুথি বা পুস্তকের আলোচনা ও বিশ্লেষণ, মুদ্রিত বা অনুবাদিত গ্রন্থ থেকে কোনও লুপ্ত পুথি/পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার (যেমন ত্রিপিটক গ্রন্থ পূর্ণতা পেয়েছে তিব্বতী ভাষান্তর থেকে), পুথি বা পুস্তকের আসল-নকল

রহস্যভেদ, ইত্যাদি। পাণ্ডুলিপির উপকরণাদি, যেমন কাগজ, কালি, হস্তাক্ষর ইত্যাদির বিশ্লেষণ ক'রে প্রামানিকতা নির্ণয় করা। মুদ্রিত পুস্তকের ক্ষেত্রে মুদ্রণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যবিচার, যেমন মুদ্রাক্ষর, পুষ্পিকা, জলছাপ ইত্যাদি প্রামানিকতা প্রতিষ্ঠিত করে। এই গ্রন্থসমীক্ষা বা গ্রন্থগবেষণাই ইতিবৃত্ত-মূলক গ্রন্থবীক্ষণ,—বিশ্লেষণাত্মক গ্রন্থবিদ্যার শেষ কথা।

গ্রন্থবীক্ষণ-সূত্রে কোনো বই বা পুথি হাতে এলে সেটির আখ্যাপত্র থেকে বইটিকে চেনা যায়। আখ্যাপত্র যদি না থাকে তাহলে প্রকাশক বা মুদ্রকের বিবৃতি দেখতে হয়। এখনকার দিনে বইএর শেষে এই বিবৃতি সন্নিবিষ্ট দেখা যায়। এই বিবৃতিরও যদি অভাব ঘটে তাহলে হয়ত ভূমিকা বা অনুরূপ কোনো প্রবেশক অংশ থেকে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের পরিচয় মিলতে পারে, মিলতে পারে প্রকাশকাল ও স্থানের নির্দেশ। রচনার বা প্রকাশের কাল এযুগে সরাসরিভাবে, এবং সেযুগে সাংকেতিক পদ্ধতিতে লিখিত দেখা যায়। বক্ষ্যমান বইটির সংস্করণ নির্ধারণেও এই সকল অংশের পরীক্ষা প্রয়োজন। যদি এসব সংবাদ না মেলে তবে গ্রন্থ বা পুথির কাগজ মুদ্রণ, হস্তলিপি প্রভৃতির বিশেষত্ব পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ ক'রে সম-সাময়িক কালের পরিপ্রেক্ষিতে সমস্যার সমাধান হতে পারে। কালে কালে হরফ ও মুদ্রণপন্থার পরিবর্তন ও বিবর্তন হয়েছে। একেক সময়ে একেক ধরণ বা ধারার চল হয়েছে। বই এর মাপ, ফর্মার গড়ন প্রভৃতি সবই যুগে যুগে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছে। সুতরাং তৎকালীন ধারা অনুসরণ ক'রে, অথবা তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ক'রে গ্রন্থ বা পুথি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে হয়।

কিছু উদাহরণ নেওয়া যাক। সেকালের পুথির রচনাকাল বা'র করার একটা উপায় পুথির মধ্যেকার কালনিরূপক সংকেত সংবলিত শ্লোক। যেমন, রামায়ণ-প্রণেতা কৃত্তিবাস তাঁর জন্মদিন প্রচ্ছন্নভাবে উল্লেখ করেছেন নিম্নোক্ত শ্লোকে :—

আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস।
তথিমধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥

এই শ্লোকের মধ্যে জন্মের সাল অনুক্ত। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি হিসাব করে আবিষ্কার করেন তাঁর জন্ম ১৩২০ শকাব্দের ১৬ই মাঘ তারিখে। ঐ দিন ছিল শ্রীপঞ্চমী এবং আদিত্যবার—অর্থাৎ রবিবার।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' গ্রন্থরচনার কাল বাচক শ্লোকে আছে—

বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥

সমাধান করতে বসলে বেরোয়, বেদ = ৪ (চতুর্বেদ—ঋক্, সাম, যজু, অথর্ব.) ঋষি = ৭ ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, মহর্ষি, পরমর্ষি, কাণ্ডর্ষি, শ্রুতর্ষি, রাজর্ষি.) রস = ৬ (কটু, তিক্ত, কষায়, লবন, অম্ল, মধুর), ব্রহ্ম = ১ ; পাশাপাশি বসালে পাওয়া যায় ৪৭৬১, কিন্তু 'অঙ্কস্য বামা গতি'—এই রীতি অনুযায়ী এটি হবে ১৬৭৪ , অর্থাৎ অন্নদমঙ্গলের রচনাকাল ১৬৭৪ শকাব্দ।

আবার অনেক সময়ে 'অঙ্কস্য বামা গতি' নীতি অনুসৃত হয় না। যেমন, রামেশ্বরের 'শিবায়ন' গ্রন্থের রচনাকাল জ্ঞাপক শ্লোকে আছে—

শাকে হল্য চন্দ্রকলা রাম করতলে।
বাম হল্য বিধিকান্ত পড়িল অনলে॥

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এটির সমাধানে বলেছেন, চন্দ্রকলা = ১৬, রাম = ৩ (রামচন্দ্র, বলরাম, পরশুরাম), করতল = ২ ; অঙ্কের বামা গতি হলে হিসাবে দাঁড়ায় ২৩৬১, কিন্তু কবি নিজে বলেছে 'বিধিকান্ত' অর্থাৎ প্রচলিত বিধি 'বাম' বা অচল হল, তাই রচনাকাল দাঁড়াচ্ছে ১৬৩২ শকাব্দ।

এবারে বীক্ষণের অন্য উদাহরণ। বাংলা ভাষার প্রাচীনত্ব অথবা সাহিত্যসৃষ্টির প্রথম নিদর্শন নিয়ে অলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল ১৩২৩ বঙ্গাব্দে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থসংগ্রহ থেকে কিছু বৌদ্ধ পদ আবিষ্কার করেন এবং হাজার বছরের পুরানো বাংলা ভাষার বৌদ্ধ গান ও দোঁহা' নামে গ্রন্থ প্রকাশ করেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে। একই বিষয়ের চারটি পুথি এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট ছিল। তার মধ্যে 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়' নামে প্রচলিত পুথিটিকে বাংলা ভাষায় লিখিত বলে সিদ্ধান্ত করেন শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়। এতে ৪৬টি পুরো এবং ১টি খণ্ডিত পদ আছে। সবসুদ্ধ ২৮টি পদে ২৪জন কবির ভণিতা দেখা যায়। রচনাকাল খ্রীষ্টীয় ৮ম থেকে ১২শ শতক বলে অনুমিত হয়। এদেশে বিভিন্ন ধর্মের সহাবস্থান কেবলমাত্র সমাজে নয়। একই পরিবারের মধ্যেও সম্ভব ছিল। জৈন, বৌদ্ধ, ব্রহ্মণ্য এবং তন্ত্রধর্ম সেযুগে ছিল ব্যাপক। বৌদ্ধধর্ম সমাজের নিম্নস্তরে মূল বিস্তার করেছিল। সুনীতিবাবু উক্ত পুথির পরীক্ষাসূত্রে বলেন, চর্যার ভাষার মূল কাঠামো শৌরসেনী অপভ্রংশ হ'লেও

হিন্দী নয়। চর্যার ক্রিয়া এবং শব্দরূপের ব্যবহারে মৈথিল, ওড়িয়া, অসমীয়া ভাষাগুলির দাবীও অস্বাভাবিক নয়। কেননা, এখনকার মতো সেযুগে এসব ভাষার মধ্যে এতটা প্রভেদ ছিলনা; এগুলি স্বতন্ত্র রূপ নেয় ১৩শ শতাব্দী থেকে। কিন্তু চর্যাপদের মধ্যে, 'থির করি' পুছিয়া জান, 'ভ্রান্তি না বাসসি', 'তুহিলা তুধু', 'খুন্টি উপারি'— এমন কি 'থাইব', করিব' প্রভৃতির ব্যবহার একমাত্র বাংলা ভাষারই সাক্ষ্য দেয়। তাছাড়া, বিশেষ্য. নাম-পদের যুগ্ম ব্যবহারও বাংলা ভাষারই অনুরূপ; যেমন; 'কাআ-তরুবর', 'করুণা-নাবী', 'ভবজলধি', 'চান্দ-সুথ', 'রবি-শশী', 'নরা-নারি' ইত্যাদি। অন্যতম চর্যাকার ভুসুকপাদ একাধিক পদে নিজেকে 'বাঙালী' বা 'বাঙাল' বলে পরিচয় দিয়েছেন, এবং রচনান্তর্গত 'পঁউয়া খাল' পদ্মানদীরই উল্লেখ নিঃসন্দেহ। চর্যার মধ্যে নদীমাতৃক বাংলাদেশেরই জীবন ছায়া। ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী চর্যার যে তিব্বতী অনুবাদ আবিষ্কার করেন তার মধ্যে মুনিদত্ত নামেরও সাক্ষাৎ মেলে।

দ্বিতীয় উদাহরণ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুথি এবং চণ্ডীদাস সমস্যা। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের কাকিল্যা গ্রামে এক গৃহস্থবাড়ীর গোয়ালঘরের মাচার উপর থেকে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুথি আবিষ্কার করেন এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে সেটি প্রকাশ করেন। ঐ গৃহস্থ শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র বংশের, তাই মনে হয় এটি বৈষ্ণব ঐতিহ্য সূত্রেই এসেছে। কৃষ্ণ-রাধা-লীলার পালাগান আকারে রচিত এবং বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত; ভণিতা-বিন্যাসে আগাগোড়া সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। ভাব, ভাষা, উপস্থাপনা-পদ্ধতি, শালীনতা ও রুচিবোধে প্রচলিত পদকার চণ্ডীদাসের থেকে একেবারেই পৃথক। পুথিটির প্রথম ও শেষের কয়েকটি পাতা খণ্ডিত ছিল; সাধারণত গ্রন্থনায় রচনাকাল, রচয়িতা-পরিচয় সংবলিত পুষ্পিকা ঐ অংশে সন্নিবেশের রীতি ছিল বলেই উক্ত পুথির নির্ভরযোগ্য পরিচয় মেলেনি। রচনার স্বাতন্ত্র্যে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এবং রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম পদাবলীর রচয়িতা চণ্ডীদাস অভিন্ন কিনা, অথবা একই নামে বিভিন্ন চণ্ডীদাস ছিলেন এই সমস্যা দেখা দেয়। 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' এবং অন্যান্য মহাজনদের রচনায় জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের উল্লেখ দেখা যায়, এবং শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং এই সকল মহাজন পদাবলীর রস আস্বাদন করতেন বলে ঐসকল গ্রন্থে নিদর্শন মেলে। সুতরাং সমস্যা, পদকর্তা

চণ্ডীদাস এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-রচয়িতা চণ্ডীদাস একই ব্যক্তি কিনা, এবং যদি স্বতন্ত্র ব্যক্তি হন তাহলে কার পদ মহাপ্রভু আস্বাদন করতেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথি পর্যালোচনা ক'রে দেখা যায় দেবী বাশুলির সেবক অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসই এই পালাটি লিখেছেন। প্রত্যক্ষ তথ্যের অভাবে আভ্যন্তরীন প্রমানের উপরেই গবেষকদের নির্ভর করতে হয়েছে। পুথিটিতে তিন প্রকার হস্তলিপি আছে ; প্রথমটি প্রাচীন, দ্বিতীয়টি তারই অনুসরণ এবং তৃতীয়টি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন। প্রথম ও দ্বিতীয় হস্তলিপি একই পৃষ্ঠার অন্তর্ভুক্ত দেখা গেছে। তা'র ফলে অনুমান দু'টি লিপিই একই কালে প্রচলিত ছিল। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির অনুমান, প্রথমটি রাজ মুন্সীর লিখিত,—তাঁরা রক্ষণশীল ছিলেন, এবং তৃতীয়টি লিখনদক্ষ অপর কোনো ব্যক্তির। ভাষা প্রয়োগ বিষয়ে তাঁর মত, প্রত্যন্ত প্রদেশের ভাষায় পরিবর্তণ কম হয় বলেই চণ্ডীদাসের পদাবলীর মতন শহুরে পরিবর্তণ এটির ক্ষেত্রে হয়নি। শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত, আনুমানিক ১২০০—১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের আদি-মধ্য যুগীয় বাংলাভাষার নিদর্শন এই পুথি। শ্রীসুকুমার সেন ভাষাকে পরবর্তীকালের—এমনকি ১৮শ শতকের মনে করেন। শ্রীরাখালদাস বন্দোপাধ্যায় বলেন, পুথিটি ১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে, —সম্ভবত ১৪শ শতকের প্রথমার্ধে রচিত। শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক বলেন, লিপিকার ১৪৫০—১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ কালের। সুতরাং এই অভিমতাদি অনুযায়ী রচয়িতাকে নিঃসংশয়ে শ্রীচৈতন্য পূর্ববর্তী যুগের ধরে নেওয়া যায়। অপরপক্ষে রচনারীতি ও ভাষা প্রয়োগের বিচারে এবং রুচির পর্যালোচনায় দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা এবং পদাবলীর রাধার প্রকৃতি বহুলাংশে বিপরীত। শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মত, কেবলমাত্র ভক্তি ও আবেগে যুক্তি লোপ পায় না। প্রথম জীবনে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন লিখে পরবর্তীকালে পদাবলী রচনা অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নয়। মহাকবি কালিদাস, জয়দেব, বিদ্যাপতি প্রভৃতির ক্ষেত্রেও এমনটা দেখা গিয়েছে। উপরন্তু, জয়দেবের গীতগোবিন্দ এবং কৃষ্ণধামালির পরই হঠাৎ পদকর্তা চণ্ডীদাসের অভ্যুদয়ের মধ্যবর্তী কালের পাদপূরণ করে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। গ্রন্থটি কিঞ্চিৎ অশ্লীলতা-দুষ্ট হলেও পাণ্ডিত্যপূর্ণ। শ্রীজীব গোস্বামীর 'বৈষ্ণবতোষিনী' টিকাগ্রন্থে 'কাব্য' শব্দের ব্যাখ্যায় 'শ্রীজয়দেব চণ্ডীদাসাদি দর্শিত দানখণ্ড নৌকা খণ্ডাদি-প্রকার' উল্লেখ আছে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পালাগানের রসাস্বাদন শ্রীচৈতন্যের পক্ষে অসম্ভব মনে হয় না।

চণ্ডীদাস, বড়ু (বা বটু) চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস একই কবি ব্যবহার করে থাকতে পারেন।

এইভাবে উপাদানের বিচার-বিশ্লেষণ এবং সমসাময়িক কালের সাক্ষ্য প্রমাণের উপর নির্ভর করে গ্রন্থবীক্ষণ প্রকল্প এগিয়ে চলে। ইংরেজি প্রভৃতি বই এর মধ্যে ছাপাখানার অতিশৈশব যুগের বই (incunabula) সম্পর্কে অনুসন্ধাণ করতে গেলে বাংলা পুথির উপরোক্ত পর্যায়েরই মতো দেখতে হয় রচনাকাল সরাসরি অথবা লুক্কায়িত বয়ানে উল্লিখিত আছে কিনা. মুদ্রাকর কে এবং তিনি কোন যুগে কাজ করতেন তা' জানা যায় কিনা, টাইপ বা হরফ কী প্রকার—অর্থাৎ হরফের বিবর্তনসূত্রে কালনির্ণয় সম্ভব কিনা। এছাড়া জলছাপ বিচার ক'রে কাগজ প্রস্তুতের সময় বার করা চলে, এবং পত্রাঙ্ক বা গুচ্ছবিন্যাসের রীতিও স্থির করা যায়। কেননা কাগজের বিশেষ কোনো অংশে জলছাপ চিহ্নিত থাকে, এবং গুচ্ছ হিসেবে ভাঁজ করবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাসঙ্গিক পৃষ্ঠায় সেটির অবস্থান পরিবর্তিত হ'তে থাকে। শিক্ষার্থী একটি চিহ্নিত কাগজ নিয়ে সেটি কোয়ার্টো বা চতুরঙ্গ অকটাভো বা অষ্টাঙ্গ, ডুওডেসিমো বা দ্বাদশাঙ্গ প্রভৃতি পর্যায়ে ভাঁজ করে পরীক্ষা করে নিতে পারেন, যেমন পূর্বে পত্রগুচ্ছ বিন্যাসের সূত্রে বলা হয়েছিল। আভ্যন্তরীন রচনা বিচার করেও নির্ধারণ করতে হয় বইটি আদ্যোপান্ত একই ব্যক্তির রচনা, অথবা প্রক্ষিপ্ত কিছু ঢুকিয়ে গ্রন্থদস্যুতার প্রয়াস হয়েছে কিনা। এজাতীয় গ্রন্থদস্যুতার প্রখ্যাত উদাহরণ এলিজাবেথ ব্যারেট্ ব্রাউনিং প্রণীত (Elizabeth Barrett Browing) কাব্যগ্রন্থ 'সনেট্স্ ফ্রম দি পর্তুগীজ' (Sonnets from the Portuguese) কাহিনী। এই বইটির ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত মুদ্রণটিই প্রথম সংস্করণ হিসেবে খ্যাত ছিল। কিন্তু ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সার এডমণ্ড গস্ Edmund Gosse) সে বিষয়ে প্রথম সন্দেহ প্রকাশ করেন। সেই সূত্রে মার্কিন গ্রন্থবিদ্যা বিশারদ জন কার্টার এবং গ্রাহাম পোলার্ড John Carter & Graham Pollard) গভীর অনুসন্ধানে বইটিকে জড়িয়ে গ্রন্থদস্যুতার এক অভূতপূর্ব নিদর্শন আবিষ্কার করলেন। প্রকাশক ওয়াইজ্ (A. J Wise) গ্রন্থটিকে কেন্দ্র করে যে গল্প ফেঁদেছিলেন তা'তে বলা হয়েছিল এলিজাবেথ ব্যারেট ছিলেন আজীবন পঙ্গু, এবং ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় কবি রবার্ট ব্রাউনিঙের। পরিচয় পরিণত হল পরিণয়ে এবং ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বিবাহের পর তাঁরা বেশ কিছু-

কাল ইতালিতে গিয়ে বাস করেন। সেখানে কোনো এক স্বর্ণ-সকালে সলজ্জ সংকোচে এলিজাবেথ তাঁর স্বামীর হাতে গুঁজে দেন উক্ত সনেটের পাণ্ডুলিপি, যা পড়ে কবি রবার্ট চমৎকৃত হন। পরে এলিজাবেথ তাঁর ইংলণ্ডস্থ বান্ধবী শ্রীমতী মিডফোর্ডকে (Miss Midford) পাণ্ডুলিপিটি পাঠিয়ে দেন, এবং তার ফলে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে সীমিত প্রচারের জন্য এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং কৃত সনেট' (Sonnets by Elizabeth Barrett Browning গ্রন্থের মুদ্রণ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থেরই কয়েক প্রস্থ মিডফোর্ড রাখেন তাঁর বন্ধু বেনেট (Mr. Bennet) সাহেবের কাছে। মিঃ ওয়াইজ সেই সূত্র ধরে বইটির এক প্রস্থ পান এবং ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে করেন প্রকাশ। কার্টার এবং পোলার্ড তথ্যানুসন্ধান সূত্রে কয়েকটি অসঙ্গতি লক্ষ্য করেন। প্রথমত, শেলী প্রভৃতি অনেকেই যখন ইতালি থেকেই তাঁদের কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করতে পেরেছেন তখন এলিজাবেথ ব্যারেট তাঁর বইটি ছাপাবার জন্য ইংলণ্ড পর্যন্ত ধাওয়া করলেন কেন। দ্বিতীয়ত, যদি বা খুবই সীমিত সংখ্যায় প্রথমোক্ত বইটি ছাপানো হয়েও থাকে তবু এটা কেমন করে সম্ভব যে তার এমন একটি সংখ্যাও পাওয়া গেলনা যাতে কবি এলিজাবেথের স্বাক্ষর আছে। তৃতীয়ত, বইটি বেনেট সাহেবের সংগ্রহে ছিল অথচ এর একটি প্রস্থও ব্রাউনিং দম্পতির ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে পাওয়া গেলনা এ বড় বিস্ময়। চতুর্থত, এটি যদি সীমিত চক্রের মধ্যে দেবার জন্যই প্রকাশিত হয়ে থাকে তাহলে দেশজোড়া প্রতিটি বিত্তবানের গ্রন্থ সংগ্রহে এ বই দেখা যায় কেমন ক'রে। পঞ্চমত সমসাময়িক নীলামের বাজারের বিবরণ থেকে বইটির সমসাময়িক বিক্রয়ের কোনো নজিরই পাওয়া যাচ্ছেনা কেন। ষষ্ঠত, চিঠিপত্র এবং অন্যান্য সাক্ষ্য একথা প্রমাণ করছে না যে বেনেট সাহেব মিডফোড মেমসাহেবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। সপ্তমত, ইংলণ্ড এবং ইউরোপের গ্রন্থাগারগুলিতে প্রাপ্ত সমুদয় ১৮৪৭ সংস্করণের বইগুলিই একটিমাত্র স্থান থেকে সংগৃহীত দেখা যাচ্ছে, —অন্যতম পুস্তক-বিক্রেতা যাঁর মজুতদার মিঃ ওয়াইজ। উপরন্তু, গ্রন্থটির প্রাপ্ত সমুদয় প্রস্থেরই উপাদন পরীক্ষা করে দেখা গেল ব্যবহৃত কাগজ একই শ্রেণীর—যেটি প্রস্তুত হয়েছে রাসায়নিক কাঠ chemical wood থেকে, যা'র ব্যবহার ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ছিল অজানা। আরও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ল, যে হরফ মুদ্রণে ব্যবহৃত হয়েছে সেই ধরণের হরফের অস্তিত্ব ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ছিলনা। অপিচ, গ্রন্থপ্রকরণ বিচারে দেখা

গেল পরবর্ত্তী যুগের পাঠ মূল থেকেই বইটি গ্রথিত হয়েছে, প্রথমোক্ত গ্রন্থ থেকে নয়। এবং এর বাঁধাইও অর্বাচীন।

গ্রন্থবীক্ষণ এইভাবেই পুস্তকের উপাদান এবং তথ্য বিশ্লেষণ করে, প্রাসঙ্গিকভাবে রচনার বিচারও করে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য।

# ৩য় অধ্যায়

## গ্রন্থাগার কথা

### গ্রন্থ সংগ্রহের ব্যবহারিক প্রসঙ্গ

গ্রন্থাগার গঠন ও পরিচালনার প্রসঙ্গে গ্রন্থাগার-গৃহ নির্মান, গৃহটিকে আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো, গ্রন্থাগারিক এবং অন্যান্য কর্মীনিয়োগ এবং পুস্তক সংগ্রহের রীতিনীতির কথাই ওঠে সর্বাগ্রে। সংগঠন নীতির প্রথম প্রসঙ্গ যে-অঞ্চলে গ্রন্থাগারের পত্তন হবে সে অঞ্চলের সামাজিক মূল্যায়ন —যা'র ভিত্তিতে গ্রন্থসংগ্রহ গ'ড়ে উঠবে। এর পরের প্রসঙ্গ বিভিন্ন বিভাগের পরিচালনার ব্যবস্থা। ইমারৎ যেমন গ'ড়ে উঠবে তেমনি তার অভ্যন্তরে গড়ে উঠবে কর্মীসহযোগে সুষ্ঠু কর্মবিন্যাস। এককে শ্রেণীর গ্রন্থাগারের জন্য এককে ধরণের বিধি বন্দোবস্ত, —যদিও মূল ভিত্তি বা কাঠামো একই প্রকার। গ্রন্থাগার পরিচালনায় গ্রন্থাগারিকের মনে সমাজের প্রতি কর্তব্যপরায়ণতা এবং সমাজে এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনো সংশয় অথবা বিচ্ছিন্নতার ধারণা থাকলে চলবেনা। জ্ঞানকে দেশের প্রতি অংশে, সমাজের প্রতি স্তরে নিয়ে যাবার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য; —বিশেষত সাম্প্রত গণতন্ত্রের যুগে। সুতরাং একদিকে ইতিহাসের ধারা লক্ষ্য ক'রে এবং অন্যদিকে প্রসার ও প্রচারের মধ্য দিয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলন সৃষ্টি করে সাধারণের মনকে সচেতন করে তুলতে হয়। কেবলমাত্র বই সাজিয়ে সমাগত পাঠকবৃন্দকে তুষ্ট করলেই কাজ শেষ হয়না। গ্রন্থাগারের এক দিকে যেমন সঞ্চয় ও লেনদেনের ব্যবস্থা, অন্যদিকে তেমনি গ্রন্থমূল্য এবং গ্রন্থগত সামগ্রীর বিবিধ তথ্যদানের প্রকল্প। পর্যায়ক্রমে এর আলোচনা করা যাচ্ছে।

### গ্রন্থাগার গ্রন্থাগারিক পাঠক

#### (ক) গ্রন্থাগার ও গ্রন্থ

ইংরাজিতে যাকে বলে লাইব্রেরি ( Library ) বাংলায় তা'কে বলি গ্রন্থাগার। ভারতের অন্যান্য স্থানে ব্যবহার হতে দেখি পুস্তকালয় গ্রন্থালয়।

প্রাচীন আমলে জ্ঞান ভাণ্ডার, জ্ঞান ভাণ্ডাগার, সরস্বতীমহল, সরস্বতী ভাণ্ডার প্রভৃতি আখ্যারও প্রচল ছিল। মুসলমানী কিতাবখানা, সংস্কৃত পুথিশালা প্রভৃতি নামও দেখা যায়।

গ্রন্থাগার—অর্থাৎ গ্রন্থের আগার, যেখানে গ্রন্থ সংগৃহীত থাকে। সংস্কৃত 'গ্রন্থ' শব্দটি এসেছে 'গ্রন্থন' থেকে—যা একসঙ্গে গ্রথিত থাকে। 'পুস্তক' শব্দটির উৎস পারসিক 'পুস্ত'—অর্থাৎ চামড়া দিয়ে বাঁধা সমষ্টি। 'পুথি' কথাটির মূল 'পত্র' বা 'পাতা'; 'পুস্তক' এর সাদৃশ্যে উৎপত্তি তদনুসারীও হতে পারে। 'বই' কথাটি এসেছে আরবিক 'বহী' থেকে।

ইংরেজি 'Library' শব্দের উৎস লাতিন 'Liber'; কলদীয়রা গাছের ছালকে এই নামে অভিহিত করত; এই থেকে লাতিন 'Librarium' এবং ইংরেজি Library শব্দের উদ্ভব।

ব্যবহারিক অর্থে Library বা গ্রন্থাগার সেই স্থান যেখানে সমাজের সকলের জন্য বই সংগৃহীত থাকে এবং যে কেউ প্রয়োজনমত তা ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু এ জাতীয় সংগ্রহ 'গ্রন্থ' বলতে কী বোঝা যায় তার স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। সেকালে ছিল পুথি সংগ্রহ, অথবা ঐ জাতীয় লিখিত সামগ্রী, —যেমন কাঠ, চামড়া, মাটির চাকতি প্রভৃতি। তারপরে কাগজের আবিষ্কার এবং ছাপাখানার দৌলতে একালে বাজারে বই এর সীমা সংখ্যা নেই। পুস্তিকা থেকে সুরু করে বহুখণ্ডে সংবদ্ধ পুস্তকে এর বিস্তার। ফলে কয়েক হাজার বই কোনো গ্রন্থাগারের সংগ্রহে থাকলেও আজকাল সেটির বৃহত্বের বা আভিজাত্যের স্বীকৃতি নেই। লক্ষ লক্ষ বই জগতে সুরু করেছে বলে নানান সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। তাই বই এর আকার এবং প্রকার নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়। ছোট বই অথবা চটি বই গ্রন্থাগারে রাখা এক সমস্যার ব্যাপার। আকারগত বিচারে কোনগুলিকে গ্রন্থাগার সংগ্রহের বিচারে বই পদবাচ্য বলব তার একটা মান নির্ণয় করে নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন দেশে। ব্রিটেন ৬ পেনি দাম হলেই সেটিকে পুস্তকের মর্যাদা দেওয়া হয়, তা'র কম হলে পুস্তিকা ( pamphlet ) হয়ে গেল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পৃষ্ঠাসংখ্যার উপরে গ্রন্থমর্যাদার নির্ভর। যেমন ইতালিতে ১০০ পৃষ্ঠা, হাঙ্গেরিতে ৬৪, ডেনমার্কে ৩০, চেকোশ্লোভাকিয়ায় ৩২, কানাডায় ৪৯ পৃষ্ঠা, ইত্যাদি। আবার রাশিয়ায় বা ভারতে ছাপানো এবং সেলাই-করা হলেই সেটি বই, এবং পুস্তিকাও বই। নানান দিক বিবেচনা

ক'রে ইউনেসকো (UNESCO) পুস্তকের সংজ্ঞা নির্ধারণ ক'রে বলছে যে "সাময়িকী ব্যতিরেকে ৪৯ বা তদূর্ধ্ব পৃষ্ঠার মুদ্রিত এবং গ্রথিত পত্রসমষ্টিকে 'বই' বলা যাবে"।

কিন্তু এই সংজ্ঞার সাহায্যেও কি মুদ্রিত সামগ্রীর পুস্তকত্ব অথবা পুস্তক-মূল্য নির্ধারণ করা চলে ? মুদ্রিত সামগ্রী দু'ধরণের হয়। স্থায়ী (Permanent) এবং সাময়িক (ephemerd)। স্থায়ী মূল্যেরগুলি সাময়িক বা পুস্তিকা শ্রেণীয়। যে সকল সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয় সেগুলির আভ্যন্তরীণ রচনা যেমন মূল্য বিচারে অস্থায়ী নয়, তেমনি আবার বহু গ্রন্থ অনেক খণ্ডে দফায় দফায় প্রকাশিত হয় বলেই খণ্ডগুলি সাময়িক পর্যায়ের হয়না। এমন অনেক পুস্তিকা আছে যার মূল্য অস্থায়ী বা সাময়িক নয়, যেমন, Oxford University Pamphlets, সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ইত্যাদি। বাংলাভাষায়,—এবং ইংরেজিতেও, অনেক কবির কাব্যপুস্তকই ৪৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ছোঁয়না। সেগুলিকে নিশ্চয়ই গ্রন্থ হিসেবে উপেক্ষা বা বর্জন করা যায়না। অন্যদিকে, সোবিয়েত সরকার, চীন সরকার বা বিভিন্নদলের মুখপত্রাদি (party manifesto); সরকারী বেসরকারী বহু প্রচার বা ঘোষণাপত্র শতাধিক পৃষ্ঠার পুস্তকাকারেও মুদ্রিত হচ্ছে দেখা যায়; সেগুলিকেও কি গ্রন্থাগারের সংগ্রহে স্থায়ী মর্যাদা দেওয়া চলে ? সুতরাং বই এর আভ্যন্তরীন সামগ্রীর বিচারই প্রধান নির্দেশক, কেবলমাত্র আকার নয়।

একালে জ্ঞানসামগ্রীর বিভিন্ন ও বিচিত্র মাধ্যম, যার ফলে গ্রন্থাগারের সংগ্রহ ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটেছে। স্বরধারক থালিকা (recorded discs), শব্দ সঞ্চিত ফিতে (tape records) আলোক চিত্রায়িত সামগ্রী যেমন চিত্রপত্র (photostat), অনুচিত্র (micro film) ইত্যাদিও গ্রন্থাগারের সংগ্রহভুক্ত হচ্ছে। সুতরাং গ্রন্থাগারের প্রকৃতি বিচিত্রতর, পরিধি বিস্তৃততর হয়ে উঠছে।

গ্রন্থাগারকে প্রাথমিক বিচারে অনেকে দুই শ্রেণীভুক্ত করেন। নির্জীব গ্রন্থাগার ও সজীব গ্রন্থাগার। অর্থাৎ গতিহীন ও গতিশীল। যে সকল গ্রন্থাগারের কোনও বৃদ্ধি নেই, যা'র সঞ্চয়ে সংযোজন নেই, তা'কেই বলা হয়েছে নির্জীব গ্রন্থাগার। পুরাকালের প্রত্নগ্রন্থ সামগ্রী, প্রাচীন পুথি সংগ্রহ অথবা মন্দিরে মসজিদে গীর্জায় রক্ষিত গ্রন্থসম্ভার এই পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু এই সব গ্রন্থ সংগ্রহ কেবলমাত্র ধর্মকর্মেই ব্যবহৃত হয় না, গবেষণার প্রয়োজনে এবং বিশেষ ধরণের শিক্ষার জন্যও প্রাচীন গ্রন্থাদি খুব কাজে লাগে। এগুলি আকরগ্রন্থ

হিসেবেও মূল্যবান। বৌদ্ধ ত্রিপিটক গ্রন্থের তিব্বতীয় অনুবাদ রক্ষিত ছিল এক মঠে মূল ত্রিপিটকের কিছু অংশ ধ্বংস হয়েছিল এবং উক্ত তিব্বতীয় পুথি থেকে অনুবাদের ফলে সেটি সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং জ্ঞানের জগতে নির্জীব গ্রন্থাগার বলে অবহেলিত কিছু নেই, যদিচ আধুনিক বিচারে সংগ্রহবৃদ্ধি নেই বলে সেগুলি গতিহীন হয়ে আছে।

আধুনিক আমলের তাবৎ গ্রন্থাগারই সজীব গ্রন্থাগার। সাম্প্রতিক জ্ঞান পরিধি বিস্তারের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগারেও বিস্তৃতি দেখা দিয়েছে। গ্রন্থাগারগুলির বহুল পরিমাণ গ্রন্থস্ফীতি পরিচালনায় জটিলতা ও সমস্যার সৃষ্টি করছে। একই গ্রন্থাগারে যাবতীয় সম্পদ ধরে রাখা যেন অসম্ভব হয়ে পড়ছে। তাই ভাগ হয়ে যাচ্ছে গ্রন্থাগার। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির গ্রন্থাগার স্বভাবতই স্বতন্ত্র। জন গ্রন্থাগারগুলির পাশেও প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে বিশেষ বিশেষ গ্রন্থাগার। এমনকি, কাছাকাছি একাধিক জনগ্রন্থাগার থাকলে একেকটিতে একেক ধরনেরর গ্রন্থ সংগৃহীত রাখার প্রবণতাও দেখা দিচ্ছে। আধুনিককালের গ্রন্থাগারগুলিকে নিম্নোক্ত বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যায়।

১ম। জাতীয় গ্রন্থাগার (National Library)
২য়। জন গ্রন্থাগার (Public Library)
৩য়। শিক্ষায়তন গ্রন্থাগার (Academic Library)
(১) বিদ্যালয় গ্রন্থাগার (School Library)
(২) মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার (College Library)
(৩) বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার (University Library)
(৪) গবেষণা গ্রন্থাগার (Research Library)
৪র্থ। বিশেষ গ্রন্থাগার (Special Library)

শেষোক্ত শ্রেণীতে হরেক রকম গ্রন্থাগারের স্থান। যেমন, সংবাদ গ্রন্থাগার বেতার গ্রন্থাগার, শিল্প ও বাণিজ্য গ্রন্থাগার, কারা গ্রন্থাগার, হাসপাতাল গ্রন্থাগার, অন্ধ গ্রন্থাগার, ইত্যাদি।

## ১ম। জাতীয় গ্রন্থাগার

এই গ্রন্থাগার সরকারী অর্থানুকূল্যে পরিচালিত, এবং জাতির সেবায় নিযুক্ত। স্বভাবতই এর গ্রন্থ সংগ্রহ এবং কর্মপরিধি বিশাল। দেশের ও

বিদেশের যাবতীয় গ্রন্থ ও শিক্ষাসামগ্রী সংগ্রহ করা জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্তব্য। এই গ্রন্থাগার সরকারের তথ্য পরিবেষণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে, এবং জনসাধারণও সদস্য হয়ে ব্যবহার করতেপারে। এই পর্যায়ে জাতীয় গ্রন্থাগার একদিকে যেমন সরকারের প্রয়োজনে তথ্য-নিরূপন, পরিসংখ্যান প্রভৃতি কাজ অথবা গবেষণামূলক তথ্যাদি সরবরাহ করবে, অন্যদিকে তেমনি সাধারণ জ্ঞানার্থীকেও তথ্যানুকূল সামগ্রী সরবরাহ করবে, সহায়তা করবে গবেষণায়। আইন অনুযায়ী জাতীয় গ্রন্থাগারে দেশের মধ্যে প্রকাশিত যাবতীয় পুস্তক ও মুদ্রিত পত্র-পত্রিকার একটি প্রস্থ জমা দিতে হয়। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে ভারতবর্ষের দু'টি ক'রে বই প্রকাশকরা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে (Imperial Library) —অর্থাৎ তদানীন্তন জাতীয় গ্রন্থাগারে জমা দিত, তার একটি চলে যেত লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে (India office Library)। স্বাধীনতার পরে, বিশেষত ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে যাবতীয় প্রকাশিত বই এর চারটি করে প্রস্থ পুস্তক ও সংবাদ পত্রাদি অর্পন আইন (Delivary of Books & Newspapers Act) অনুযায়ী সরকারের কাছে জমা দিতে হয়। এই চারটি বই ভারতের চার প্রান্তের চারটি জাতীয় গ্রন্থাগারে (কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার, বম্বের জাতীয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, দিল্লীর জাতীয় কেন্দ্রীয় তথ্য গ্রন্থাগার এবং মাদ্রাজের কোনেমারা জন গ্রন্থাগার এবং মাদ্রাজের কোনেমারা জন গ্রন্থাগার) রক্ষিত থাকে। লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম অগ্রগণ্য জাতীয় গ্রন্থাগার। স্কটল্যাণ্ড জাতীয় গ্রন্থাগার এডিনবরাতে এবং ওয়েল্স্ জাতীয় গ্রন্থাগার এবারিস্টউইথে প্রতিষ্ঠিত। এছাড়া অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার দু'টি ও সমমর্যাদা সম্পন্ন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতিমান ও সুবৃহৎ জাতীয় গ্রন্থাগার ওয়াশিংটনস্থ লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস। সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্র মস্কেভ লেনিন ষ্টেট লাইবেরি এবং ফ্রান্সের সুপ্রাচীন গ্রন্থাগার বিব্লিওতেক নাসিওনেল জাতীয় গ্রন্থাগার।

জাতীয় গ্রন্থাগারের অন্যতম বিশিষ্ট কাজ জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন। সংগৃহীত গ্রন্থতালিকা প্রকাশও অন্যতম কাজ। ব্রিটিশ নেশনেল বিব্লিওগ্রাফি (British National Bibliography, সংক্ষেপে BNB), ইণ্ডিয়ান নেশনেল বিব্লিওগ্রাফি (Indian National Bibliography, সংক্ষেপে INB), লাইব্রেরি অফ ক্যাটালগ অফ ব্রিটিশ মিউজিয়াম ইত্যাদি এর উদাহরণ।

কংগ্রেস থেকে নিয়মিত পুস্তক তালিকা প্রকাশিত হয়। ডিউই ডেসিমেল ক্লাসিফিকেশন গ্রন্থটি সম্পাদনার ভারও এঁরাই নিয়েছেন।

## ২য়। জন গ্রন্থাগার

নাম থেকেই অনুমেয়, এই শ্রেণীর গ্রন্থাগার জনসাধারনের জন্য। জনগ্রন্থাগার সাধারণত সরকারী অর্থে বা অর্থানুকূল্যে পরিচালিত। কিন্তু জাতীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে এর প্রভেদ আছে। জাতীয় গ্রন্থাগার যেমন পুরোপুরি সরকারী নিয়ন্ত্রনাধীন, জনগ্রন্থাগার সর্বাংশে তা নয়। জাতীয় গ্রন্থাগার জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত নয়, প্রবেশ বিধি নিষেধ দ্বারা সীমাবদ্ধ, সদস্য হবার কয়েকটি শর্ত আছে। জনগ্রন্থাগার সরকারের আওতায় থেকেও সকলের জন্য উন্মুক্ত। দেশবাসী মাত্রেই এর সদস্য হতে পারেন, অবাধ ব্যবহারের অধিকারী হন।

বিদেশে জনগ্রন্থাগার সরকারী কর বা রেট (rate) প্রথায় পরিচালিত,—এটি ঠিক কর নয়, উপকর। সরকারী আয়ের একাংশ জনগ্রন্থাগারের জন্য ব্যয়িত হয়। ভারতবর্ষে এখনো এ প্রথা প্রবর্তিত হয়নি। গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে পরিচালনার জন্য আন্দোলনও চেষ্টা হয়েছে, শ্রীযুক্ত রঙ্গনাথনের প্রচেষ্টায় মাদ্রাজে এই প্রথা চালু হলেও অন্যান্য রাজ্যগুলি এখনো বঞ্চিত। সম্প্রতি সরকারী উদ্যোগে ভারত-জোড়া গ্রন্থাগার চক্রের সৃষ্টি হয়েছে, জিলা, মহকুমা ও গ্রাম নিয়ে পর্যায় রচিত হয়েছে, তবু দেশের সামান্যতম অংশই এযাবত নগণ্যতম সুফল পেয়েছে। জনগ্রন্থাগার বলতে এদেশে এখনো জনগণের প্রচেষ্টায় সংগঠিত গ্রন্থাগারগুলিকেই বোঝায়। বিদেশে একধরণের গ্রন্থাগার আছে যা'কে বলে চাঁদাভিত্তিক গ্রন্থাগার (Subscription Library)। সে শ্রেণীর গ্রন্থাগার জনগ্রন্থাগার বা বিশেষ গ্রন্থাগারও হতে পারে। এদেশে অনেকে মিলে চাঁদার ভিত্তিতে আঞ্চলিক জনগ্রন্থাগার স্থাপন করেছেন এবং কিছু সরকারী সাহায্যও পেয়ে থাকেন। এদেশের জন গ্রন্থাগার এখনো এজাতীয় গ্রন্থাগারকেই বোঝায়। যদিও সরকারী উদ্যোগে কিছু কিছু জন-গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা হয়েছে ও হচ্ছে।

জন গ্রন্থাগার বয়স বা শ্রেণী নির্ব্বিশেষে জনগণের প্রয়োজন মেটায়। তাই বিষয় ও বিশ্বাস নির্বিশেষে শিক্ষা ও সংস্কৃতি, ধর্ম ও দর্শন প্রভৃতি

সব শ্রেণীর গ্রন্থ এবং আনুষঙ্গিক সামগ্রী সংগ্রহের আওতায় পড়ে। এই সকল সামগ্রীর সংস্করণ এবং সেগুলি ব্যবহারের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা এবং উপায় বার করে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার ও প্রসার জনগ্রন্থাগারের কাজ। যাবতীয় তথ্য যাতে প্রামাণিক ভাবে সর্বজনের কাছে পৌছায় তার বন্দোবস্ত করা দরকার। এই তথ্য সরবরাহের কাজে বাছ-বিচার করা গ্রন্থাগারের দায়িত্ব নয়' পাঠকের ইচ্ছাই সেখানে প্রধান। তবে গ্রন্থপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার প্রসারে অগ্রনী হবার দায়িত্ব জনগ্রন্থাগারের। এই কথা মনে রেখেই সরকারারী উদ্যোগে গ্রন্থাগার চক্রের প্রবর্ত্তন হয়েছে যাতে দেশের সুদূরতম অঞ্চলের লোকও পড়বার সুযোগ পায়। কেবলমাত্র বই দিয়ে নয়, বক্তৃতা প্রদর্শনী, ছায়াছবি প্রভৃতি বিবিধ মাধ্যমে জনসংযোগের কাজ করে জন গ্রন্থাগার। যাঁরা বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন তাঁদের পরবর্তীকালের পাঠ, এবং যাঁদের বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাবার সুযোগ ঘটেনি তাঁদেরও শিক্ষার সহায়তা করে জনগ্রন্থাগার। জনগ্রন্থাগার সারা-জীবনের বিদ্যা-কেন্দ্র।

## ৩য়। শিক্ষায়তন গ্রন্থাগার

### (১) বিদ্যালয় গ্রন্থাগার

শিক্ষাতন গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে বিদ্যালয় বা স্কুল গ্রন্থাগারকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মনে করা উচিত। অথচ এটি যেন উপেক্ষিত হয়ে আছে,—বিশেষত এদেশে। শিক্ষাজীবনে প্রবেশের প্রথম পদক্ষেপ বিদ্যালয়। এখান থেকেই অপরিণত বয়স্ক শিক্ষার্থীরা ভাল বা মন্দ যা কিছু গ্রহণ করে। ভবিষ্যৎ জীবনে এরা নিজেরাই শিক্ষনীয় যা কিছু তা ব্যবহার করবে, বিদ্যার্জন করবে। সুতরাং পথপ্রদর্শকের কাজ বিদ্যালয়ের। বিদ্যালয় একদিকে শিক্ষা-ক্রমের মধ্য দিয়ে অন্যদিকে গ্রন্থাগারের সাহায্যে ছাত্রছাত্রীদের গ'ড়ে তোলার কাজ করে। শিক্ষকদের ক'ছে পাঠক্রমের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা যে পাঠ নেয় সেটা অনেকাংশে আংশিক। তারই পরিপূরক গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগার তাদের শিক্ষাপর্বের আওতার মধ্যে —পাঠক্রমের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে কিছুটা মুক্তি দেয়, অধীত বিদ্যার পরিধি বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। এমনকি কোনো শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে গ্রন্থাগারের পাঠপর্ব পরিচালিত হলেও এখানে ছাত্র-

ছাত্রীর নিজেরাই পড়াশোনার কাজ করতে পারে বলে স্বভাবতই উৎসাহ পায়। নিজেদের শিক্ষাপ্রকাশের সামিল হয়ে যায়।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে দুই শ্রেণীতে বা ভাগে বিভক্ত করা চলে। তার মধ্যে প্রাক্ বিদ্যালয় পর্ব এবং/অথবা বিদ্যালয়ের সর্বনিম্ন শ্রেণীগুলির পড়ুয়াদের জন্য একেবারে পৃথক ধরণের গ্রন্থাগার হওয়া বাঞ্ছনীয়। বয়সে একটু বড় যারা তাদের জন্য যে গ্রন্থাগার তার চেহারা একটু আলাদা হতে পারে। আজকাল বিদ্যালয়ের শিক্ষাপর্ব কলেজের প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়াতে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের আকৃতি ও প্রকৃতি একটু অন্যরকমের হতে বাধ্য। উচ্চতর শ্রেণীর সঙ্গে নিম্নতর শ্রেণীর পার্থক্য বেশি হয়ে পড়ে। এদিক থেকে বিবেচনা করে একই গ্রন্থাগারের মধ্যে দুই বিভিন্ন ধারা বা বিভাগের আয়োজন থাকলে সব দিক দিয়েই সুবিধা। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিভিন্ন ধরণের ব্যক্তিত্বের উন্মেষ পর্বে সহায়তা করে থাকে। জীবনের প্রাথমিক পর্বের শিক্ষার্থীরা এখানে আসে বলে পড়ুয়াদের বয়সের অনুকূল জ্ঞান রাজের যাবতীয় বিষয়ের সংগ্রহ রাখা এবং সেগুলির ব্যবহার ও প্রয়োগ-পদ্ধতির দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। অল্পের মধ্যে সমগ্র বিশ্বজ্ঞান এখানে সঞ্চিত থাকে। বিদ্যালয় থেকেই ছেলেমেয়েরা বৃহত্তর জ্ঞানক্ষেত্রে ও কর্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। তাদের নাগরিকতা-বোধের গোড়াপত্তন এখানেই। তাই বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কর্তব্য, প্রতি পর্বের পড়ুয়াদের প্রয়োজন বুঝে সেইমত ব্যবস্থা করা। লেখাপড়ার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা যাতে পড়ুয়ারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, বইপত্রের যত্ন নেওয়া এবং কেমন করে ব্যবহার করতে হয় সেই শিক্ষা দেওয়া, এবং ঐসঙ্গে মনের প্রসন্নতা আনবার জন্য হালকা ধরণের বিষয়ের চর্চার ব্যবস্থাও রাখা। মানুষ হয়ে উঠবার এবং জীবন-যাপনের বিবিধ দিক,—যেমন স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, সংসারিকতা ও গৃহস্থালী, সুনাগরিকতা, কর্তব্যপরায়ণতা, নীতিপরায়ণতা, চরিত্র গঠন ও সুন্দরভাবে অবসরযাপন প্রভৃতি শিক্ষার গোড়াপত্তন হয় বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে তাই সবদিকদিয়ে এই পরিপ্রেক্ষিতে সাজাতে হবে। এবং ভবিষ্যৎ জীবনে গ্রন্থাগার মনা হবার জন্য শেখাতে হবে, কেমন করে বই এর বিভিন্ন অংশ ব্যবহার করতে হয়, —বইএর কোন অংশে কী থাকে, তথ্য-সহায়ক বইগুলি প্রয়োজন অনুযায়ী কিভাবে সূচীপত্রক, পঞ্জী দেখে বই খুঁজতে হয়, এবং কোন পদ্ধতিতে বই থেকে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধার করে

কাজে লাগাতে হয়। শিক্ষাজীবনই নয়, মনুষ্যজীবনের প্রবেশক বিদ্যালয় এবং তার গ্রন্থাগার।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সূত্রেই শিশু গ্রন্থাগার (Children's Library) সম্পর্কে কিছু আলোচনা সঙ্গত। শিশুদের কৌতূহল সর্বগ্রাসী। যা দেখে তাই ভাল লাগে। এই কৌতূহল ও ভাল-লাগার দিকটা বজায় রেখে শিশু গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে হবে। অপরিণত বয়সে মনের উপরে সহজে ছাপ পড়ে। তাই গ্রন্থাগারের সাজ সজ্জা এবং বই এর অঙ্গসজ্জা রঙ-বেরঙের এবং চটকদার হওয়া দরকার, যাতে গ্রন্থগৃহটির প্রতি তারা আকৃষ্ট হয়,— এখানে আসতে ভাল লাগে। ছবির বই, ছবির সহায়তায় শিক্ষা দেবার বই যেমন রাখা দরকার তেমনি রূপকথা, ভ্রমণ, শিকার কাহিনী, হাসির বই প্রভৃতির সংগ্রহ দিয়েও তাদের মনে স্বপ্ন ও আনন্দ জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন। এরই মধ্য দিয়ে শিশুদের জ্ঞানস্পৃহা জেগে উঠতে পারে। পরিবেশ গুরুগম্ভীর হলে চলবেনা। আসবাবপত্রের ধরণ ও গড়নও এক-ঘেয়ে নাহওয়া বাঞ্ছনীয়। ফুল দিয়ে ছবি দিয়ে ঘরটি সাজানো উচিত। এবং শিশুদেরও ছবি আঁকবার সরঞ্জাম এবং রকমারি খেলার সরঞ্জাম দিয়ে প্রাণখোলা আবহাওয়া সৃষ্টি করা উচিত। গ্রন্থাগারিক অথবা শিক্ষকরা মাঝে মাঝে তাদের গল্প বলবেন, গল্পের মধ্য দিয়ে নানান বিষয় তাদের রপ্ত হয়ে যাবে। বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য ছোট খাট প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা যায় মাঝে মধ্যে। জ্ঞানের দিকটা আগে না ভেবে শিশুদের মনের দিকটা ভেবে নিয়ে কাজ সুরু করলে ফল মিলবে ভাল। বয়স্করা যেমন গ্রন্থা-গারের মধ্যে ঘুরে ফিরে বইপত্র ঘাঁটতে পারেন, শিশুদের ক্ষেত্রেও তাই করতে হবে। তবেই তারা গ্রন্থাগারকে পুরোপুরি নিজেদের বলে ভাবতে শিখবে, মন গ্রন্থাগারমুখী হবে, জ্ঞানস্পৃহা বাড়বে।

শিশু গ্রন্থাগার কেবলমাত্র বিদ্যালয় গ্রন্থাগারেরই অঙ্গ নয়। দায়িত্ব কেবলমাত্র শিক্ষকদের নয়। ভাবনাটা অভিভাবকদেরও। অর্থাৎ কিনা শিশুমন গ'ড়ে তোলা সামাজিক দায়িত্ব। তাই আজকাল জনগ্রন্থাগারের সঙ্গে শিশু গ্রন্থাগারও যুক্ত থাকছে। বিদ্যালয়ে সবসময়ে শিশুদের প্রতি যথাযোগ্য নজর রাখা সম্ভব হয়না, আবার সংসারের চৌহদ্দির মধ্যেও শিশুরা স্বতন্ত্র মর্যাদা পায়না, পরিবেশও প্রায়শই পরিচ্ছন্ন থাকেন। এদের অবহেলা করলে; বড় হয়ে উঠবার সূচনাতেই বঞ্চিত করলে মানুষ হয়ে দাঁড়াবার পথে অন্তরায় সৃষ্টি হয়। সেজন্য সমাজের উচিত হয়না শিশুদের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া। শিশুদের জন্য যেমন বিশেষ পার্ক, বিশেষ

খেলাধূলার ব্যবস্থা হয়ে থাকে তেমনি তাদের জন্য বিশেষ গ্রন্থাগারেরও ব্যবস্থা করা সমীচীন। কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে এবং সরকারী জন গ্রন্থাগারে। দিল্লির জন গ্রন্থাগারে, আমেদাবাদ পুস্তকালয়ে, বড়োদায় যেসব শিশু গ্রন্থাগার সংযুক্ত আছে সেগুলির উল্লেখ করা যায়। শিশু গ্রন্থাগারকে স্বভাবতই স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে স্বতন্ত্র পর্যায়ভুক্ত করলে সুবিচার হয়।

## (২) মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার

বিদ্যালয়ের সার্ব-বিষয়ক প্রাথমিক শিক্ষা পর্বের পরে মহাবিদ্যালয় বা কলেজে এসে শিক্ষার্থীরা বিশেষ পাঠ এবং উচ্চতর বিদ্যার্জন সুরু করে। সুতরাং মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগারের চেহারা ও চরিত্র সেই ধরণের হবে সেকথা বলা বাহুল্যমাত্র। এই গ্রন্থাগারও পাঠক্রমকে কেন্দ্র ক'রেই গড়ে উঠে। এবং পাঠক্রমের নিবিড়তা ও বিস্তার এটিকে করে প্রভাবিত। মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতির দুটি পর্ব বা ধারা আছে। প্রথম পর্যায়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ও জ্ঞান সঞ্চয় করে নিয়ে বিশেষ দিকে সে জ্ঞান চালিত করা, এবং ক্রমে সেই বিশেষ বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ ক'রে চিন্তাধারায় বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা। মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কাজ বহুমুখী হলেও সীমাবদ্ধ ;—নির্বাচিত বিষয়ের দ্বারা সীমিত। জ্ঞানের যে কয়টি দিক নিয়ে মহাবিদ্যালয়ে চর্চা হয় তার মানও সীমায়িত,—গবেষণার স্তরে তা উন্নীত নয়। তাই এক হিসেবে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সংগ্রহকে মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সংগ্রহ থেকে ব্যাপ্ততর বলা যায় ;—অন্তত বৈচিত্র্যে। পাঠক্রমের প্রয়োজনে মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করতে হয়। বিষয়ানুকূল তথ্যপুস্তক, পত্রপত্রিকা এবং সাম্প্রতিকতম জ্ঞানসম্ভার নিপুনভাবে সংগ্রহ করা প্রয়োজন। গবেষণাগ্রন্থও গ্রন্থাগারভুক্ত করতে হয়,—বিশেষ করে শিক্ষকদের প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ ক'রে। মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা যা'তে অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার করতে পারে, ক্রীড়া প্রভৃতি দিকে এবং সামাজিক কাজ কর্মে যোগ দিতে পারে সে ব্যবস্থাও থাকে। উপরন্তু সাহিত্য ও শিল্পের দিকেও তাদের ঝোঁক থাকে এবং সেই ঝোঁক যা'তে অব্যাহত থাকে সে ধরণের ব্যবস্থাও থাকে মহাবিদ্যালয়ে। সেইদিকে লক্ষ্য রেখে এই জাতীয় পাঠক্রমবহির্ভূত বই পত্রও গ্রন্থাগারে রাখা অবশ্য কর্তব্য। একথা ভুললে চলবেনা যে তারা এখন নাগরিকতার

সোপানবর্তী, তারাই দেশের ও জাতির ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সবদিকেই উপযোগী করে তুলবার অন্যতম কেন্দ্র গ্রন্থাগার।

## (৩) বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

শিক্ষায়তন গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে বিশিষ্টতম স্থান বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের। কেবলমাত্র পাঠক্রম-কেন্দ্রিক নয়, গবেষণা গ্রন্থাগারের উচ্চমানেও এর সঞ্চরণ। বিশ্ববিদ্যালয় যেমন স্নাতকোত্তর উচ্চতম শিক্ষাকেন্দ্র। তেমনি স্নাতকোত্তর পর্যায়ের গবেষণাকেন্দ্র ও মহাবিদ্যালয়ের পরের ধাপের বিশেষ শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক কর্মের দিক, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর গবেষণাকেন্দ্র হিসেবে তারই ব্যপ্তির দিক বিশ্ববিদ্যালয়। এবং শিক্ষকদেরও গবেষণার প্রধানতম কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়। সুতরাং এর গ্রন্থাগারে যে জ্ঞানরাজ্যের যাবতীয় সঞ্চয় থাকবে তা বলাই বাহুল্য। প্রাচীন পুথি থেকে সুরু করে আধুনিকতম পুস্তক, যাবতীয় পত্র পত্রিকা এবং চিত্র-অনুলিপি সবই এই গ্রন্থাগারের সংগ্রহে স্থান পায়। সাধারণভাবে একথা সত্য যে যে সব বিষয় বক্ষ্যমান বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিতব্য সেই বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করেই এর সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়, রূপ গ্রহণ করে। কিন্তু এর বাইরের জ্ঞান সামগ্রীর প্রতিও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার উদাসীন থাকতে পারেনা। জ্ঞানরাজ্যের উচ্চতম সোপানে উঠলে পরে চারপাশের বিভিন্ন জ্ঞানাঞ্চল সম্পর্কে স্বভাবতই কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা জেগে ওঠে। তাই নিজ নিজ বিদ্যাক্ষেত্রের জন্য যেমন তেমনি তার বাইরের বিষয়গুলি নিয়ে ও গ্রন্থাদি সংগ্রহ আবশ্যক। বিশেষ ক'রে আবশ্যক জিজ্ঞাসা বিভাগ এবং পত্রিকা বিভাগকে সর্বাশ্রয়ী এবং এবং সাম্প্রতিকতম সংগ্রহে সজ্জিত করা। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কর্মীদের দায়িত্ব খুবই বেশি। কেবলমাত্র গতানুগতিক ভাবে কাজ করে যাওয়া বা মোটামুটি সহায়তা করাতেই তাঁদের কর্তব্য শেষ হয়না, জ্ঞানের বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন কর্মীর প্রবেশ থাকা বাঞ্ছনীয় এবং গবেষণার অনুকূল সাহায্য দেবার জন্য তৈরি থাকা উচিত। দরকার হলে বিষয় বিশেষের জন্য তালিকা তৈরী করা, পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সার সংকলন করা. আলোকচিত্রনের সাহায্যে প্রয়োজনীয় পাঠের প্রতিলিপি

তৈরী করা,—এ সবই তাঁদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। কর্মীদের বিবিধ ভাষায় অভিজ্ঞ হওয়া বাঞ্ছনীয়, কেননা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বভাষায় শিক্ষার কেন্দ্র, এবং অনেক সময়েই এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করার প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন ভাষার বই বর্গীকরণ স্থচীকরণের জন্যেও ভাষাজ্ঞান থাকা দরকার। বহু বিষয় নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত, তাই গ্রন্থাগারের ব্যাপ্তিও বিশাল হয়ে পড়ে। কার্যধারার সুবিধার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কেন্দ্রিয় এবং বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করারও প্রয়োজন হয়, প্রয়োজন হয় বিভিন্ন শিক্ষা-মণ্ডল (Seminar) গ্রন্থ সংগ্রহের। এজন্য এই গ্রন্থাগারের পরিচালনাও জটিল হয়। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের আরেকটি প্রকল্প আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বা আন্তঃগ্রন্থাগার লেনদেন প্রকল্প। কোনো বিশেষ বই গবেষণার জন্য প্রয়োজন হতে পারে,সেটি নিজস্ব গ্রন্থাগারে না থাকলে অপর কোনো গ্রন্থাগার থেকে আনিয়ে গবেষককে সাহায্য করা। এককথায়, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার উচ্চতর জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনো সীমারেখা টেনে চলতে পারেনা।

## (8) গবেষণা গ্রন্থাগার

বলতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার থেকে—তার ব্যাপ্তি জনিত সীমায়িত বিষয় প্রকল্পের জন্য অথবা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রাখার প্রয়োজনে গড়ে ওঠে গবেষণা গ্রন্থাগার। বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া কিছু বিশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গ'ড়ে ওঠে গবেষণা সংস্থা হিসেবে। এখানে অধীতব্য বিষয়কে কেন্দ্র করে গ্রন্থাগার তৈরি হয়, সেই বিষয় সংক্রান্ত যাবতীয় বই, পত্রিকা, পাণ্ডুলিপি, চিত্র-লিপি ইত্যাদি তথ্য সংগৃহীত থাকে। আবার সাধারণ অথচ বিশেষ সামগ্রীর সংগ্রহ নিয়েও গড়ে ওঠে গ্রন্থাগার। যেমন, রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার বা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার, সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত সিমলার উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (Institute of Advanced Studies) গ্রন্থাগার ইত্যাদি। গবেষণা গ্রন্থাগার বিশিষ্টতার দাবি করে কলকাতায় বাণিজ্যিক গ্রন্থাগার (Commercial Library), বসু বিজ্ঞানমন্দির প্রভৃতি। আজকাল বিশেষ বিশেষ শিল্প প্রতিষ্ঠানও একটি করে গ্রন্থাগার রাখে তাদের শিল্প সামগ্রী বিষয়ে গবেষণার জন্য, উদ্দেশ্য শিল্পের কুশলতাবৃদ্ধি ও প্রসার।

## বিশেষ গ্রন্থাগার

বিশেষ গ্রন্থাগার বলতে বিশেষ কোনো বিষয়ের অথবা বিশেষ কোনো ধরণের গ্রন্থাগার বোঝায়। গবেষণা গ্রন্থাগারও বিশেষ বিষয়ের গ্রন্থাগার শ্রেণীতে পড়ে, তবে শিক্ষা সংক্রান্ত বলে সেটিকে শিক্ষায়তন গ্রন্থাগারভুক্ত করা যুক্তিযুক্ত। তার অর্থ এই নয় যে বিশেষ গ্রন্থাগারের সঙ্গে শিক্ষার সংযোগ ক্ষীন। পার্থক্য শিক্ষার ধারায় বা শ্রেণীতে। ব্যবহারিক এবং প্রকৃতিগত ভিত্তিতে প্রভেদ। বিশেষ গ্রন্থাগার শ্রেণীভুক্ত কিছু গ্রন্থাগার অবশ্যই গবেষণা গ্রন্থাগারকে ছুঁয়ে যায়, আবার বিশেষ শ্রেণীর গবেষণার সঙ্গে সংযুক্ত কিছু গ্রন্থাগারকে বিশেষ গ্রন্থাগার পর্যায়ে ফেলা অস্বাভাবিক নয়।

বিশেষ গ্রন্থাগার বহু ধরণের হতে পারে, বিচিত্র গড়নের হতে পারে। কয়েকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেওয়া যাক।

### (১) সংবাদ গ্রন্থাগার

সংবাদপত্রের কাজ দেশবিদেশের রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক প্রভৃতি বিভিন্ন দিকের সংবাদ পরিবেশন। এবং সংবাদ প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের কাজ এই সকল তথ্য সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা এবং প্রয়োজনের সময়ে সাংবাদিকদের কাছে তা পরিবেষন করা। সাজিয়ে রাখার পদ্ধতি এমন হওয়া দরকার যা'তে চট্ করে সেগুলি বার করে দেওয়া যায়, কেননা সংবাদসেবীরা ভেবে-চিন্তে তবে সংবাদ সরবরাহের কাজ করবেন তা হয়না,—সেরকম সময় তাঁদের হাতে বড় একটা থাকেনা। তাই সংবাদ গ্রন্থাগারের কাজ জটিল। গ্রন্থাগার সংগ্রহে সাংবাদিকতা সংক্রান্ত বই রাখতে হয়, রাখতে হয় বিশিষ্ট ধরণের তথ্য সহায়ক গ্রন্থ, সাম্প্রতিকতম পত্রিকা এবং প্রকাশিত সবরকমের দৈনিক পত্রিকার সংগ্রহ ইত্যাদি। দেশ-বিদেশের সামাজিক রাষ্ট্রিক প্রভৃতি ইতিহাস, অর্থনীতিক ও ভৌগলিক পরিচয়, সমাজে সাহিত্যে শিল্পে রাজনীতিতে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরিচিতি প্রভৃতি চলতি দুনিয়ার যাবতীয় তথ্যসম্ভারের সুষ্ঠু বিন্যাস তার কাজ। এছাড়া বিশেষ করে যে কাজটি করতে হয় সেটি হল প্রকাশিত সংবাদের অংশ চয়ন (Cutting), প্রকাশিত

চিত্রাদির অংশ-চয়ন এবং মানচিত্র সংগ্রহ। এই সকল সামগ্রী কোনো একটি বিশিষ্ট ধারায় পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত থাকবে, তা সে নথিভুক্তই হোক বা পত্রকের মতো আধারেই হোক। এবং যাতে চটপট খুঁজে বার করা যায় সেজন্য প্রকাশিত সাংবাদাদির বিষয়ানুক্রমিকসূচী, প্রকাশের তারিখ অনুযায়ী সূচী, দেশভিত্তিক সূচী প্রভৃতি সুনিপুনভাবে তৈরি করে রাখতে হয়। যখনই কোনো ব্যক্তি কোনো দিকে বিশিষ্টতা অর্জন করেন, সংবাদ সেবী তাঁর ছবি, সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রভৃতি প্রস্তুত রাখেন সম্ভাব্য প্রয়োগের জন্য। যেসব আলোকচিত্র সংবাদসেবীরা গ্রহণ করেন সেগুলিও ভবিষ্যতের কথা ভেবে সঞ্চিত রাখতে হয়। যে কোনোদিন হঠাৎ কোনো তথ্য প্রয়োজন হয়ে পড়তে পারে, সেজন্য সংবাদ-গ্রন্থাগারিককে তৈরি থাকতে হয়,—ঠিক যেন হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মতো, সরকারী টাঁকশালের প্রহরীর মতো। কখন প্রয়োজন হবে বলা যায় না, তাই সাম্প্রতিকতম ব্যবস্থা নিখুঁৎভাবে সাজিয়ে বসে থাকতে হয়।

সংবাদের অংশ সঞ্চয় যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন হয় পুরো সংবাদ পত্রগুলির সঞ্চয়। এগুলি বাঁধিয়ে রাখা দুরূহ ব্যাপার; আকারে যেমন বিরাট তেমনি এর ভঙ্গুর প্রবণতা। তবু রাখতে হয় নানা কারণে। আজকাল সংবাদপত্র সংরক্ষার কাজ সহজ করে দিয়েছে আলোকচিত্রণ,—অনু-চিত্রগ্রহণের (microfilm) ব্যবস্থা করে এগুলি যেমন দীর্ঘকাল অবিকৃত অবস্থায় রাখা সম্ভব হয় তেমনি অল্প জায়গায় বহু বৎসরের পত্রিকা সঞ্চিত থাকতে পারে। সংবাদ পত্রের সেবাকার্য যেমন ব্যাপক তেমনি এর গ্রন্থাগারটি কেও তদনুরূপ করে তুলতে হয়। সংবাদ গ্রন্থাগার এমনকি গবেষকদের পক্ষেও উত্তম তথ্যজ্ঞাপক গ্রন্থাগারের কাজ করতে পারে।

## (২) বেতার গ্রন্থাগার

বেতার প্রতিষ্ঠান যেসব দেশে একাধিক নয় সেখানে বেতার গ্রন্থাগারও অনেক পরিমাণে সংবাদ গ্রন্থাগারের মতো তথ্যসহায়ক হয়ে উঠতে পারে। যেসব দেশে ব্যবসায় কেন্দ্র হিসেবে অধিক বেতারকেন্দ্র থাকে সেখানে এই কাজ আঞ্চলিক ভিত্তিতে হতে পারে। বেতারের কর্মক্ষেত্র সংবাদপত্রের

মতো ব্যাপক অথবা সর্বাশ্রয়ী নয়। টেলিভিশনে যদিচ কথার সঙ্গে ছবি দেখানো হয়, কিন্তু বেতারযন্ত্র শ্রবণ-নির্ভর। এদের স্থায়িত্ব সীমাবদ্ধ, আবেদন তাৎক্ষণিক। সংবাদ পরিবেশন ছাড়া সাংস্কৃতিক নানান অনুষ্ঠান এর অঙ্গ। আবেদন শ্রোতা বা দর্শকদের কাছে। বেতার গ্রন্থাগারের প্রধান কর্তব্য বেতার কর্মিদের তথ্যাদি দিয়ে সাহায্য করা। এবং সংগীত প্রভৃতি কার্যক্রমের রেকর্ড সংগ্রহে রাখা। এইসব সামগ্রী যথাযথ পদ্ধতিতে সাজানো না থাকলে স্বভাবতই প্রয়োজনের সময়ে হাতড়ে বেড়াতে হয়, কাজ অচল হয়ে পড়ে। বিভিন্ন দেশের এবং সংবাদ সংস্থার পরিবেষিত সংবাদলিপি প্রণয়ন বেতারের প্রধান কাজ। আজকাল একাজ টেলিপ্রিন্টারের সাহায্যে সহজ হয়েছে,—যেটি বেতার ও সংবাদপত্রের পক্ষে অপরিহার্য। কাজের ক্ষেত্র ভিন্নধরণের হলেও বেতার গ্রন্থাগার অনেকটা সংবাদ গ্রন্থাগারের অনুরূপ।

## (৩) শিল্প, বাণিজ্য গ্রন্থাগার

ব্যবহারিক শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সংস্থা নিজেদের প্রয়োজনে গ্রন্থসংগ্রহ রাখে। এই প্রয়োজন দুই ধরণের। কর্মীদের বিনোদন অন্যতম ব্যবস্থা হিসেবে কিছু হালকা বা সাধারণ পাঠের গ্রন্থ রাখা হয়। আর নিজ নিজ শিল্প সম্ভার সংক্রান্ত বই, কিভাবে উৎপাদন বাড়ানো যায়। বিচিত্রমুখী প্রকল্প নেওয়া যায় সে বিষয়ে বই এবং পত্রিকা রাখার প্রয়োজন হয়। এ ব্যাপারে গবেষণার ব্যবস্থাও থাকে বিশিষ্ট সংস্থাগুলিতে। যেমন, ঔষধ প্রস্তুত প্রতিষ্ঠানে লেবরেটারির সঙ্গে লাইব্রেরিও যুক্ত থাকে; বাণিজ্যিক সংস্থাগুলিতে আর্থনীতিক ও পরিসংখ্যান বিষয়ে পত্র-পত্রিকা এবং বই থাকে। ইম্পিরিয়াল কেমিকেল ইণ্ডাষ্ট্রিজ গ্রন্থাগার বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স গ্রন্থাগার, ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোশিয়েশন গ্রন্থাগার, প্রভৃতি নানারকমের নানাধরণের বিশিষ্ট গ্রন্থাগার রয়েছে দেশ জোড়া। সরকারী বিভাগগুলির সঙ্গেও গ্রন্থাগার থাকে আবশ্যিকভাবে। কলকাতা মহাকরণে, রাজভবনে, দিল্লি সেক্রেটারিয়েট—সর্বত্রই বিভিন্ন বিভাগে বিভাগীয় প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গড়ে উঠেছে গ্রন্থসংগ্রহ। জাম-শেদপুরে শিল্প উৎপাদনের বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে রয়েছে গ্রন্থাগার, রয়েছে ভারতীয় মানক সংস্থা .জাতীয় বিশেষ প্রতিষ্ঠানেও। নানাবিধ তথ্য

এবং উন্নততর মানের প্রয়োজনে এই সকল গ্রন্থাগার অপরিহার্য।

## (৪) হাসপাতাল গ্রন্থাগার

হাসপাতালের গ্রন্থাগার যেমন অভিনব ও বিশেষ ধরণের তেমনি এক গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় প্রকল্প। রোগীরা এখানে একে তো শারীরিক যন্ত্রণায় কাতর বা পঙ্গু, তার উপরে চার দেওয়ালের মধ্যে কেবলি ওষুধ, নার্স ডাক্তার দেখে দেখে ক্লিষ্ট, শুয়ে শুয়ে মানসিক ভাবে ক্লান্ত বোধ করে। তাই তাদের মনকে প্রফুল্ল রাখবার জন্য, চেতনাকে বৈচিত্র্যমুখী করে তুলবার জন্য কিছু ব্যবস্থা রাখা অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে। পুস্তক সংগ্রহ এর মধ্যে সর্বপ্রধান। শুধু সময় কাটাবার জন্যই নয়, রোগ নিরাময় ত্বরিত করবার জন্যও গ্রন্থপাঠ প্রয়োজন ও সহায়ক। মনোবিজ্ঞান বলে যে অসুস্থ মনের উপরে সুস্থ মন প্রভাব বিস্তার করে। এমনকি মনোবিজ্ঞানী চিকিৎসক ঠিকমতো বই এর সাহায্যে রোগ নিরাময় দ্রুততর করতে পারেন। এজন্য হাসপাতালগুলিতে গ্রন্থাগার গ'ড়ে তোলা অবশ্য কর্তব্য। কোন রোগীর পক্ষে কোন ধরণের বই উপযুক্ত তা চিকিৎসকের পরামর্শ মতো ঠিক করা উচিত। যে বই পড়লে উত্তেজনা হয়, যেমন রোমাঞ্চ বা রহস্য গল্প অথবা যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী, কিম্বা বিয়োগান্ত বা দুঃখজনক গল্প রোগীদের পড়তে দেওয়া ঠিক নয়। আবার খুব বেশি মাথা খাটিয়ে পড়তে হয় এমন বইও রোগীর পক্ষে অনুপযুক্ত। মহাযুদ্ধের সময়ে সৈনিকদের জন্য এবং সেনা-হাসপাতালের জন্য বই এর বিশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। যে সকল রোগী আরোগ্যের পথে তাদের জন্য নানাবিধ কারুশিল্প, আভ্যন্তরীন খেলা-ধূলা সংক্রান্ত বই দেওয়া যায়। গানের ও বাজনার রেকর্ড সংগ্রহ হাস-পাতাল গ্রন্থাগারের আবশ্যিক অঙ্গ। যে রোগীরা পড়তে পারেনা বা পড়বার ধকল সহ্য করতে পারে না তাদের জন্য রেকর্ড শোনানোর ব্যবস্থা থাকলে স্বভাবতই তাদের মন প্রফুল্ল থাকতে পারে। রোগীরা শুয়ে শুয়ে বই পড়তে অনেক সময়ে অসুবিধা বোধ করে। বই দুহাতে ধরে বুকের উপরে রেখে পড়া আয়াস সাপেক্ষ হয়। তাছাড়া হাত জখম হয়েছে এমন রোগীও তো থাকে। সেজন্য বিশেষ যন্ত্রের ব্যবস্থা থাকে বিশিষ্ট হাসপাতালে। বইটি যন্ত্রের সাহায্যে চোখের সামনে ধরা থাকে, এবং পাতা উল্টাবার জন্যও

থাকে বিশেষ যান্ত্রিক ব্যবস্থা।

যে সকল রোগী প্রায় আরোগ্য লাভ করেছে অথচ হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেতে দেরী আছে তাদের হাসপাতাল গ্রন্থাগারের কাজে লাগিয়ে দেওয়া যায়। এর ফলে তারা যে রোগী এটা সবসময়ে তাদের মনে হবে না, এবং একটা কাজের মধ্যে লেগে থাকার তৃপ্তি এবং আনন্দও তারা পাবে।

হাসপাতাল গ্রন্থাগার কেবলমাত্র রোগীদের জন্যই নয় সেকথা বলা বাহুল্য। শুশ্রূষাকারিনী, অন্যান্য কর্মী এবং এমনকি ডাক্তারদের কথা মনে রেখে গ্রন্থসঞ্চয় করা দরকার। এজন্য বিনোদন গ্রন্থ ছাড়াও সেবা শুশ্রূষা সম্পর্কিত বই এবং নানাবিধ তথ্য সহায়ক পুস্তক পত্র পত্রিকা প্রভৃতি সংগ্রহ-ভুক্ত থাকে। রোগীদের কাছে বই ব'য়ে নিয়ে যাবার জন্য থাকে চক্রযুক্ত মঞ্চ। গ্রন্থাগারের কাজ যদি হয় জনসেবা, তাহলে হাসপাতাল গ্রন্থাগার এই সেবাকার্যে নিশ্চয়ই অগ্রগণ্য।

## (৫) কারা গ্রন্থাগার

কারাগার এই সেদিন পর্যন্তও কেবলমাত্র আসামীদের শাস্তিভোগের জায়গা ছিল। তাদের সুখ সুবিধা অথবা অন্য কোনো রকম উন্নতির কথা ভাবা হতনা। শাস্তিভোগের পর্ব হিসেবেই যাকিছু ক্রিয়াকর্ম করতে হত। আজকাল সেই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে। কারাগারকে কেবলমাত্র দোষীদের শাস্তির মেয়াদ কাটানোর কেন্দ্র হিসেবে না দেখে তাদের চরিত্র সংশোধনের কেন্দ্র হিসেবে দেখবার চেষ্টা হচ্ছে। এবং এজন্য নানাবিধ প্রকল্প প্রস্তুত হচ্ছে। সমাজবদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে যখন কোনো অসামাজিক চক্র গড়ে ওঠে, কোনো অংশ যখন অন্যায়কর্মে লিপ্ত হয় তখন বুঝতে হবে কোথাও একট ব্যাধির প্রসার ঘটেছে। হয় সামাজিক অসাম্য অথবা ব্যক্তিক ক্ষেত্রে মানসিক ব্যাধি। সমাজের মধ্যে রুগ্ন বা নানাভাবে বিকৃত ব্যক্তিরও স্থান আছে, কিন্তু কয়েদী হিসেবে একবার যার ছাপ পড়ে তাকে সকলে যেন একেবারে একঘরে করে রাখে—ছোঁয়াচে রোগগ্রস্তের মতো দূরে রাখে ফলে অপরাধ প্রবণতা হ্রাস না পেয়ে বেড়ে যায়, কায়েমি হয়ে বসে। অপরাধী হলেও তারা সমাজেরই অঙ্গ, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক। তাদের প্রতিও কর্তব্য আছে, এড়িয়ে চলা উচিত নয়। তাই কয়েদীদেরও

সমাজের সমান অংশীদার হিসেবে গণ্য করে তাদের জন্য নানাবিধ শিক্ষা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করছেন কারাগারের কর্তৃপক্ষরা। খেলাধূলা, গান-বাজনা, ছায়াচিত্র, রেডিয়ো, গ্রামোফোন প্রভৃতি সবকিছুরই প্রচলন হয়েছে কারাগারে। এবং নানান প্রতিযোগীতার মধ্য দিয়ে তাদের উৎসাহ বর্ধিত করা হচ্ছে। রোগীরা যেমন রোগের প্রকোপ থেকে নিরাময়ের দিকে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়, তেমনি কয়েদীরাও মারাত্মক অপরাধ প্রবণতা থেকে ক্রমে নিরীহতার দিকে এগিয়ে আসে।

কারগারে কয়েদীদের দণ্ডের প্রধান অঙ্গ কিছু শ্রমসাধ্য কাজ করানো। এর মধ্যে কষ্টসাধ্য কাজ যেমন আছে তেমনি আছে শৈল্পিক উৎপাদনের কর্ম। তাঁতের কাজ, কাঠের কাজ, বাঁশের বা বেতের কাজ প্রভৃতি নানাধরণের কারুশিল্প ও কারা শিক্ষার অঙ্গ। এই সকল কাজের সহায়ক হিসেবে অথবা বিনোদনের অঙ্গ হিসেবে গ্রন্থাগারও কারাগারের পক্ষে আবশ্যিক। নিরক্ষর কয়েদীদের সাক্ষর করা এবং বয়স্কদেরও বিবিধ শিক্ষাদান করার কাজ গ্রন্থাগার কর্মীদের মাধ্যমে হতে পারে। গ্রন্থ সংগ্রহে শিক্ষার প্রাথমিক পুস্তক লঘু পাঠ্য পুস্তক, ভ্রমণ ও জীবনী গ্রন্থ, ধর্মপুস্তক ইত্যাদি থাকা উচিত। গোয়েন্দা কাহিনী বা অপরাধমূলক বই না রাখাই বাঞ্ছনীয়। এমনকি অসামাজিক কাহিনী নিয়ে গল্প উপন্যাস জাতীয় বইও এদের পড়তে দেওয়া ঠিক নয়। আবার প্রচারমূলক বইও সংগ্রহে না রাখাই শোভন। জন-গ্রন্থাগারের কাজ যেমন ব্যাপক, বিশেষ গ্রন্থাগারের কাজ সেরকম নয়। বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়েই বিশেষ গ্রন্থাগারের সৃষ্টি। এখানে কয়েদীদের সুস্থ মন গ'ড়ে তোলাই উদ্দেশ্য। তাই সেদিকে দৃষ্টি রেখেই পুস্তক নির্বাচন সমীচিন। কারা-গ্রন্থাগারিক অবশ্যই মানব-দরদী হবেন, তার মধ্যে অবজ্ঞার ভাব থাকা চলবেনা। সমাজ-শিক্ষক হিসেবে তাঁকে কাজ করতে হবে। অপরাধীদের মনের পরিবর্তনের দায়িত্ব অনেকাংশে তাঁর। এদের মধ্যে যাতে হীনমন্যতা-বোধ না জন্মায় সেকথা মনে রেখে সেইভাবে তাদের সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। এবং যেসব কয়েদীর মধ্যে দায়িত্ব বোধ এসে যায়, যা'রা মন ও বুদ্ধির অনুশীলনে আগ্রহের পরিচয় দেয় তাদের গ্রন্থাগারের কাজের সঙ্গে যুক্ত রাখা উচিত। তাতে সুফল পাওয়া যায়। সেই সুফল গ্রন্থাগারের কয়েদী কর্মীদের থেকে অন্যান্য কয়েদীদের মধ্যেও সহজেই প্রসার লাভ করে। তারাও নিজেদের কারা-কর্মীদের সামিল মনে করে উৎসাহিত হয়।

## (৬) অন্ধদের গ্রন্থাগার। মূক-বধিরাদির গ্রন্থাগার প্রকল্প

যারা অন্ধ, মূক বা বধির, অথবা এরকম কোনো বিকলতার শিকার তারা সমাজে বঞ্চিত থাকবে এবং শুধু অপরের বোঝা হয়ে তাদের দয়ায় জীবন কাটাবে এ ব্যবস্থা সভ্য সমাজ, গণতান্ত্রিক সমাজ স্বীকার করে নিতে পারে না। কেবলমাত্র পুস্তক পাঠই একালে শিক্ষালাভের একমাত্র মাধ্যম বা উপায় নয়, নানাবিধ শ্রব্য বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অন্যান্য উপায়েও শিক্ষার প্রসার সম্ভব।

অন্ধদের জন্য অবশ্য বিশেষ ধরণের হরফ এবং বই এর ব্যবস্থা আছে। লুইস ব্রেইল (Louis Braille) (১৮০৯—৫২খ্রীঃ) উচ্চতল পদ্ধতির হরফে মুদ্রিত বই আবিষ্কার করেন, এবং তাঁর নামানুসারে এই বইকে ব্রেইল বই বলা হয়। এতে হরফের ছাপ কাগজের উপরে একটু উচুভাবে পড়ে বলে অন্ধরা আঙ্গুল বুলিয়ে অনুভব করে করে পাঠ নিতে পারে। সাধারণত দেখা যায় বিকলাঙ্গ বা বিকলেন্দ্রিয় ব্যক্তিদের অন্যান্য প্রত্যঙ্গ বা ইন্দ্রিয় বেশি মাত্রায় সজাগ ও সচেতন হয়। অভ্যাসের ফলে ব্রেইল বই এর পাঠোদ্ধারে তাদের অসুবিধা হয় না। অন্ধদের বিদ্যালয়ে তাদের অসুবিধা হয় না। অন্ধদের বিদ্যালয়ে তাদের জন্য বিশেষ ধরণের শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে। নানাবিধ চারু ও কারুশিল্পে তাদের দক্ষ করে তোলা যায়। এদের শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ বই পড়ে শোনানো, রেকর্ড বাজিয়ে শোনানো আজকাল ভাষা শিক্ষা, সংগীত শিক্ষা বা যেকোনো শিক্ষার জন্য টেপ রেকর্ড ডিস্ক-রেকর্ড, প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। সুতরাং একমাত্র চোখে দেখে শেখা ছাড়া আর সবরকম উপায়ে অন্ধদের শিক্ষিত করে তোলা কঠিন নয়। অন্ধদের গ্রন্থাগারে উপরোক্ত সবরকম ব্যবস্থা থাকবে। গ্রন্থাগারিকের কাজ হবে শিক্ষকের কাজ। তিনি তাদের গল্প শোনাবেন, পত্রিকা থেকে পড়ে শোনাবেন, বিনোদনের নানাবিধ আয়োজন রাখবেন। তাদের পড়া খেলা সবকিছুতেই সাহচর্য দিতে হবে। অন্ধ বলে তারা যে কোনো বিষয়ে হেয় বা কম গুনী বা অপারগ এই ধরণের বোধ তাদের মধ্যে যেন না আসে সেই রকম ভাবে তাদের সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে গ্রন্থাগারিকের কাজ এক্ষেত্রে সেবার কাজ, কেবলমাত্র সহায়কের নয়। অন্ধদের মধ্যে

কৃতী অধ্যাপক বা ব্যবহার জীবী ইত্যাদির সংখ্যা বিরল নয়।

অন্ধদের জন্য যেমন তেমনি মূক ও বধিরদের জন্যও বিশেষ প্রতিষ্ঠান আছে দেশে দেশে। এরা কানে শোনেনা, কথা বলতে পারেনা, কিন্তু চোখে সবই দেখতে পায়। সুন্দরের জগৎ তাদের কাছে উন্মুক্ত, তারা দেখে, অনুভব করে, উপলব্ধি করে, কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না। তাদের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় পড়তে শেখানো যায় না, উচ্চারণ করে শোনালে তারা শুনতে পায় না, সে কথা বলতেও পারেনা। তবে চেষ্টা ও অভ্যাসের ফলে তারা ঠোঁঠ নাড়া দেখে বক্তব্য ধরতে পারে। কিন্তু তার আগে তাদের তো অক্ষর পরিচয় দরকার। এজন্য চিত্রের সাহায্য নিতে হয়, ক্রিয়া দিয়ে অথবা মূর্ত উদাহরণ সহযোগে তাঁদের সাক্ষর করে তুলতে হয়, শিক্ষিত করে তুলতে হয়। তাদের মধ্য থেকে যদিও বাগ্মী মিলবেনা, নেতা মিলবেনা, কিন্তু পাওয়া যাবে চিত্রশিল্পী, কারুশিল্পী প্রভৃতি —এমনকি কবি ও লেখকও। এজাতীয় বৈদগ্ধ্যের উদাহরণ বিরল নয়। এদের জন্য বিশেষ ধরণের গ্রন্থাগারে তাই থাকবে নানাবিধ ফলক ও চিত্রে শিক্ষা প্রকল্প, বই পত্র এবং আনুষঙ্গিক সামগ্রী। গ্রন্থাগারিককে হতে হবে সহানুভূতিসম্পন্ন, ধৈর্যশীল ও সেবাপরায়ণ। এই গ্রন্থাগারিক ও বহুলাংশে শিক্ষক, মূক-বধিরদের সদা-সহচর।

বিশেষ গ্রন্থাগারের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল। একথা নিশ্চয় গ্রন্থাগারসেবী ও শিক্ষার্থীর কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে বিশেষ গ্রন্থাগারকে যথাযোগ্য বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ রূপ দিতে হয়, প্রয়োজন বুঝে আয়োজন করতে হয়।

## (খ) গ্রন্থাগারিক ও পাঠক

গ্রন্থাগারিকতার কাজ বা উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। গ্রন্থাগার তথ্যাদি সরবরাহ করে, যাবতীয় জ্ঞান আহরণের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য সমাজ-সেবা। গ্রন্থাগার বিশেষ বা সাধারণ যে শ্রেণীরই হোক না কেন মুখ্যত সমাজের প্রয়োজন মেটায়। ব্যক্তি নিয়ে সমাজ। একেক চরিত্রের ব্যক্তি একেক ধরণের গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারে। পরিণামে ব্যক্তিক বিকাশের

সঙ্গে সঙ্গে যৌথভাবে সমগ্র সমাজের বিকাশ সাধন হয়। কেননা, মানুষের পরিচয় দুই ধরণের, ব্যক্তিক এবং ব্যষ্টিক। প্রতিটি ব্যক্তির উন্নতি ব্যষ্টিতে প্রতিফলিত হয়ে সামাজিক উন্নতিতে পরিণত হয়। ব্যক্তিগত চিন্তার প্রতিফলনই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয়, এবং এই লৈপিক মাধ্যমে সমাজে প্রসারিত হয়। এক দেশ থেকে অন্য দেশে বই চলে যায়, এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে চিন্তার প্রসার ঘটে। ব্যক্তিগতভাবে সমগ্র জ্ঞানধারার যাবতীয় বই যেমন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়না, ব্যবহারিক জীবনেও তেমনি সর্ববিদ্যা অধ্যয়ন করা যায়না। শিক্ষালয়ের শিক্ষার প্রেক্ষাপটও সীমিত, সেখানে বিশেষ ধারায় জ্ঞানচর্চা প্রবাহিত। কিন্তু গ্রন্থাগারের চার দেয়াল জ্ঞানকে একমুখী করেনা, এখানে জ্ঞান বিধৃত থেকেও বহুবিস্তৃত। বিজ্ঞান প্রজ্ঞান প্রভৃতি সমগ্র বিষয়েরই জ্ঞান আহরন এখানে সম্ভব।

গ্রন্থাগারের গোড়ার কথা মানব সাধনা; তাই এটি মানব বিজ্ঞান। রঙ্গনাথন এর যথার্থ চরিত্র নির্ণয় করে বলেছেন, গ্রন্থাগার সর্বজনের চিরকালের আত্মশিক্ষার কেন্দ্র (Ljbrary is a means of universal perpetual self-education)। বিদ্যায়তনে প্রাপ্ত শিক্ষার সঙ্গে এখানে আত্ম শক্ষার বা স্বশিক্ষার প্রভেদ দেখানো হয়েছে। শিক্ষকের সহায়তায় বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা লাভ করা যায় তার মধ্যে সীমাবদ্ধতা আছে। কেননা, শিক্ষকের নির্দেশ বা আওতার মধ্যে যে-শিক্ষা তাতে নিজের চেষ্টা অথবা ইচ্ছার সীমিত প্রয়োগ হয়। দ্বিতীয়ত, শিক্ষকের অধীনে থেকে শিক্ষায়তনে শিক্ষা সমাপ্ত করবার পরেই শিক্ষার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় না। বরঞ্চ প্রকৃত শিক্ষার সুরু হয়, শিক্ষাক্ষেত্রের সোপান তৈরি হয় মাত্র। পাঠক্রমের খণ্ডিত জ্ঞানের পরে বৃহত্তর ব্যাপকতর জ্ঞানের পথে পা বাড়ান শিক্ষার্থীরা। এই শিক্ষা এবং জ্ঞান আহরণের প্রধান কেন্দ্র গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারই আজীবন শিক্ষক। আজীবন শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। কিন্তু একমাত্র কেন্দ্র নয়। মানুষ চলার পথে নিত্য নানান জ্ঞান বা শিক্ষা লাভ করে। পরিবেশ থেকে, প্রকৃতি থেকে, প্রতিটি ব্যক্তির সাহচর্যে। রবার্ট ব্রুস সামান্য মাকড়সার দৃষ্টান্তে অধ্যাবসায় শিক্ষা করেন। আমাদের বাউল বলে, "গুরু ব'লে প্রণাম করবি, মন। ও তোর অথিক গুরু, পথিক গুরু অগণন।" আসলে গ্রন্থাগার নৈর্ব্যক্তিক বলেই ব্যক্তি, প্রকৃতি, পরিবেশ প্রভৃতির যাবতীয় শিক্ষার স্বাক্ষরও বহন করে। গ্রন্থাগার শিক্ষাকেন্দ্র হলেও গ্রন্থাগারিক নিজে

কিন্তু শিক্ষকের বিকল্প আসন নেবেন না,—গ্রন্থরাজির বিদ্যাধারা পাঠকদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেবেন শুধু। গ্রন্থই শিক্ষক,—গ্রন্থাগারিক তার পিছন থেকে পথটুকু দেখিয়ে দেবেন। গ্রন্থাগার শিক্ষকবিহীন আত্মশিক্ষণ কেন্দ্র, ব্যক্তিগত শিক্ষার স্থান। গ্রন্থাগার প্রকৃত বিদ্যার আগার, প্রকৃত বিশ্ব-বিদ্যালয়, ব্যক্তিত্ব-বিকাশের স্থল হিসেবে গ্রন্থাগার কর্মীদের কর্তব্য পাঠকদের মধ্যে এই ব্যক্তিত্বের—ব্যক্তিত্ববোধের সঞ্চার করা, গ্রন্থে আবদ্ধ বিদ্যার ভাষাহীন ভাষায় প্রাণ সঞ্চার করা।

গ্রন্থাগারও যেমন নানারকমের, পাঠকও তেমনি নানান ধরণের। পাঠকদের কেউ আসেন তথ্যানুসন্ধানী হয়ে, অথবা বিশেষ জ্ঞান লাভের জন্য; কেউ আসেন শিল্প সাহিত্য পাঠ জনিত সৌন্দর্যানুভূতি উপভোগের জন্য, অথবা শিল্প-সৌকর্য উপলব্ধির জন্য; আবার কেউ বা আসেন নিছক আনন্দ উপভোগ করতে, অথবা অবসর বিনোদনের জন্য। উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, গ্রন্থাগারিকের কাজ পাঠককে তাঁর রুচি বা প্রয়োজন অনুযায়ী বিষয় নির্বাচনে সহায়তা করা, সঠিক বইটি তাঁর কাছে উপস্থিত করা। বিবিধ পাঠকের বিচিত্র প্রয়োজন মেটানো কুশলী কর্ম। মানুষের যত রকমের জ্ঞান বিজ্ঞানের খেয়াল তাই নিয়ে গ্রন্থাগারিকের কারবার। বিচিত্র ধরণের মনুষ্য-কূল নিয়ে তাদের সামাজিক ঐক্যে বিধৃত করে রাখবার ব্রতই গ্রন্থাগার-বৃত্তি।

এই সূত্রে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে, মানুষের বিদ্যা অর্জনের সহায়তায় গ্রন্থাগারিক নৈর্ব্যক্তিক ভাব বজায় রাখবেন কিনা, অথবা শিক্ষা প্রকরণে এবং রুচি গঠনে তাঁর সরাসরি কোনো দায়িত্ব আছে কিনা। জড় পদার্থের মতো সমাজের কোনো সংজ্ঞালব্ধ বিশিষ্ট আকৃতি বা অবয়ব নেই, নানান বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে সমাজ ক্রম-বিবর্তনশীল, পরিবর্তনশীল। সুতরাং কোনো বিশেষ চেহারা বা স্বরূপ সমাজের উপরে আরোপ করে নিয়ে সেইদিকে প্রচেষ্টা চালানো হবে কিনা সে প্রশ্নের সরল কোনো উত্তর নেই। পড়ুয়াদের চাহিদা বা ইচ্ছাই যদি গ্রন্থাগারিকের যোগানদারির মূল লক্ষ্য হয় তাহলে তাদের উদ্দেশ্যকে কোনো নির্দিষ্ট খাতে নিয়ে যাওয়া বাস্তব ক্ষেত্রে কতখানি সম্ভব, এবং সেটা গ্রন্থাগারিকের এক্তিয়ারভুক্ত কিনা, এই জাতীয় খবরদারী তিনি করবেন কিনা,—অর্থাৎ সমাজশিক্ষকের ভূমিকা তিনি লোকগ্রাহ্যত নেবেন কিনা, তা ভেবে দেখবার বিষয়। গ্রন্থাদি সবই কিছু শুভবুদ্ধি-মূলক

বা সহৃদ্দেশ্যপূর্ব নয়, সমাজের সকলের মতিগতিও একরকমের নয়। সুনীতি দুর্নীতি সমান তালে চলে। মানুষ যখন একা থাকে তখন তা'র সভ্যতা ভব্যতা সুনীতি দুর্নীতির বালাই থাকে কিনা আমরা জানিনা, কেননা তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। কিন্তু সমাজবদ্ধতায় আচার আচরণ সুনীতি দুর্নীতি মেনে চলার প্রয়োজন হয়। জীবনযাত্রার বিভিন্ন গলি পথে ব্যবসায়িকের নীতি, তস্করের নীতি, ডাক্তার বা অধ্যাপকের নীতি নানা রকমের হলেও সমগ্রভাবে সমাজের পক্ষে, তথা ব্যক্তির পক্ষে কোন নীতি ভাল, কোন নীতিতে ব্যষ্টিক মঙ্গল তা সকলেই জানেন এবং বোঝেন। সমাজের সেই সামগ্রিক নীতিবোধই গ্রন্থাগারিকের নীতি। পড়ুয়াদের সবরকমের সহায়তার মধ্য দিয়ে সমাজ সেবার কাজ ক'রে যান গ্রন্থাগারিক। এ যুগের চিন্তাধারা এবং জীবন যাপনের অবস্থাগুলি ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতার দিক থেকে সমষ্টি-গম্যতার দিকে মোড় নিয়েছে। রাষ্ট্রেও একনায়কত্বের অবসান ঘটেছে। সমাজতন্ত্র গণতন্ত্রের প্রাধান্য এসেছে। সর্বসাধারণকে শিক্ষিত ক'রে তোলা এবং সর্বাধিক সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রীয় কর্তব্য। রাষ্ট্র কতকগুলি মাধ্যমে প্রকাশ্যত বা গৌণত কর্তব্য পালন করে। এবং আশা করে প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠবে, হবে জ্ঞানী, উদার, ধৈর্যশীল, শ্রদ্ধাশীল, ন্যায়পরায়ণ, স্বাধীনতা-প্রেমী, সৌন্দর্য ও সত্যের উপাসক ;— এক কথায় দেশপ্রেমী বিশ্বপ্রেমী সুনাগরিক। গ্রন্থাগার ব্যক্তি মানসের এই জাতীয় বিকাশের প্রধান কেন্দ্র। কেননা এটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ সংযোগ। রাসায়নিক মিশ্রণের মধ্যে যেমন কোনো লবণের উপস্থিতি আমরা স্বতন্ত্রভাবে টের পাই না, অথচ মিশ্রিত সামগ্রীটি তার উপস্থিতির জন্যই সম্ভব হয়, তেমনি গ্রন্থাগারিকের নীরব অথচ নিবিষ্ট সেবা আড়ালে থেকে মানুষকে গ'ড়ে তুলতে সাহায্য করে, সমাজকে সুসংহত ও নির্মল করে।

গ্রন্থাগারিক প্রত্যক্ষ ভাবে শিক্ষকের আসন না নিয়েও জনগণকে শিক্ষিত, নীতি পরায়ণ ও বিদ্যোৎসাহী ক'রে তুলতে পারেন। গ্রন্থাগারে বিভিন্ন বিষয়ের বই পড়বার জন্য যেমন পাঠকরা আসেন, তেমনি একই বই ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন পাঠক পড়েন। আর্থনীতিক ইতিহাসের জন্য একজন যে বই পড়েন, অপরে হয়ত সেইটিই পড়েন অর্থনীতির তত্ত্ব বা তথ্যের জন্য, আবার আরেকজন সেটি পড়তে পারেন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে।

যে-পাঠক বিশেষ কোনো বই চান, আর যে পাঠক বিশেষ কোনো বিষয়ের বই চান তাঁদের প্রতি গ্রন্থাগারিকের মনোযোগ ভিন্ন ধরণের হবে। গ্রন্থাগারিক পাঠকের মনের প্রবণতা বুঝে নেবেন। গ্রন্থাগারের কার্যক্রমের মধ্যে বাঁধাধরা আইন কানুন থাকলেও ব্যবহারিক পর্বে বাঁধা গৎ ধরে কাজ চলে না, কেননা সকলের মন বাঁধা একটি খাতে প্রবাহিত হয় না। গ্রন্থ সংগ্রহ এবং গ্রন্থসজ্জা ব্যক্তিগত ধারণা, বিশ্বাস বা মতামত-নির্ভর হবে না। গ্রন্থাগার পরিচালনার মেজাজটা জমিদার স্থলভ হলে চলবে না।

তবুও প্রশ্ন থেকে যায়, গ্রন্থাগারিক কি তাহলে কোনো বই বা কোনো পাঠক সম্পর্কেই কোনো রকম বাছ-বিচার করবেন না? এমন বহু বই আছে যেগুলিকে প্রায় সমাজ-বিরোধিতার পর্যায়ে ফেলা যায়, যেগুলি অপরিণত চিত্তের পক্ষে ক্ষতিকারক। কিছু বইকে অশ্লীল পর্যায়ে ফেলা যায়, কিছু বই রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক। এ জাতীয় বই স্বভাবতই গ্রন্থাগারিক সকলের কাছে উপস্থিত করবেন না। অথচ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করাও তাঁর ব্রতানুকূল নয়। স্থতরাং কখনো তিনি যুক্তি দিয়ে পাঠককে বোঝাবার চেষ্টা করবেন, কখনো পরস্পর বিরোধী বই অথবা বিভিন্ন মতের বই পড়তে তাঁদের উৎসাহিত করবেন। গ্রন্থাগারে সকল মতের সকল পথের বই মজুত রাখাই কর্তব্য। পরিণত-বুদ্ধি পাঠকদের নিয়ে তেমন ভাবনা গ্রন্থাগারিকের নেই। ভালমন্দ বিচারবোধ তাঁদের জন্মেছে ধ'রে নেওয়া যায়। সমস্যা অপরিণত-বুদ্ধি অথবা প্রতিকূল প্রবণতার পাঠকদের নিয়ে। তাঁদের ক্রমিক পর্যায়ে এক বই থেকে অন্য বই এর দিকে ঝোঁক এনে দেবার সতর্ক চেষ্টা করতে হয়। ব্যক্তিক প্রক্ষেপ,— অর্থাৎ ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনা এই সকল ক্ষেত্রে সফলতা আনে।

এতক্ষণ গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারিক ও পাঠক সম্পর্কে যা বলা হল তার প্রায় সবটাই জনগ্রন্থাগারিকের কর্তব্য ও সমস্যার কথা মনে রেখে। জনগ্রন্থাগারে পাঠকদের বিচিত্র প্রবণতার দিকে নজর দিতে হয়। গ্রন্থাদি ছাড়াও বক্তৃতা প্রদর্শনী, আলোকচিত্রাদির মাধ্যমে জনমানস জাগ্রত করবার চেষ্টা করতে হয়। জনগ্রন্থাগারে উপদেষ্টা মণ্ডলী থাকলেও গ্রন্থাগারিকের উপরেই যাবতীয় ভার থাকে। গ্রন্থাগারিককেই তাই বিচক্ষণতার সঙ্গে প্রকল্প প্রস্তুত করতে হয়। গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা জনশিক্ষকের। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে এ সমস্যা অনেক কম। সেখানে প্রাপ্ত বয়স্কদের সমাবেশ হলেও গ্রন্থাগারিকের

উপরে থাকে কার্য নির্বাহক সভা. —যেখানে গ্রন্থাগারের নীতি নিধারণ করা হয়। পুস্তক নির্বাচন এবং পাঠকদের—অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের পাঠ্য-নির্বাচনের প্রায় সবটাই অধ্যাপকদের নির্দেশে উপদেশে চলে। সমস্যামূলক গ্রন্থ সংগ্রহ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে খুব বেশী থাকে না। যে পরিমাণ থাকে তা শিক্ষা এবং গবেষণার প্রয়োজনে। উপরন্তু. প্রয়োজন ঘটলে গ্রন্থাগারিক এ ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো বইপত্র আটকে রাখতেও পারেন। এ কাজ গ্রন্থাগারিকের বৃত্তিগত নীতির বিরুদ্ধ হতে পারে কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরও স্বতন্ত্র নীতি থাকে। গ্রন্থাগার সেই নীতি বহির্ভূত নয়। স্কুল কলেজের গ্রন্থাগারিকের ক্ষেত্রে এ সমস্যা আরো কম। এখানে উঠতি বয়সের শিক্ষার্থীদের প্রবণতা নিয়ে অবশ্যই ভেবে ·দেখতে হয়। তাদের মনে নিষিদ্ধ বই সম্পর্কে বা বিষয় সম্পর্কে কৌতূহল হতে পারে, প্রশ্ন জাগতে পারে,এবং তার উত্তরও তারা আশা করে। সুপরিকল্পিত শিক্ষাক্রমের মধ্য দিয়ে শিক্ষক এবং গ্রন্থাগারিক তাদের যতটুকু প্রয়োজন. যতটুকু তারা গ্রহন করতে পারবে ততটুকু বিশ্লেষণ করবেন। বিদ্যার্থীদের মনে সকল বিষয়ের সপক্ষ বিপক্ষ যুক্তিপূর্ণ বই অবশ্যই দেবেন। এবং এগুলি বুঝতে সহায়তা করবেন গ্রন্থাগারিক। তবে সব রকমের বই পড়তে দেবার প্রশ্ন এখানে ওঠেনা। কতক বই তো গ্রন্থাগারে সংগ্রহেই থাকবে না. যেগুলো থাকবে সেগুলিও বিদ্যার্থীদের বয়স এবং গ্রহন যোগ্যতা বিচার করে ধাপে ধাপে তাদের সামনে দিতে হবে।

গ্রন্থাগার. গ্রন্থাগারিক ও পাঠকের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং পরিপূরকতা সম্পর্কে বিশিষ্ট কিছু চিন্তাবিদের প্রসঙ্গ তুলে ধরা যাক।

## গ্রন্থাগারের পঞ্চনীতি

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ এবং গ্রন্থাগার জগতের উজ্জ্বল জোতিষ্ক ডঃ শিয়ালি রামামৃত রঙ্গনাথনের নাম আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছে। তিনি কেবলমাত্র মাদ্রাজ প্রদেশের নয়, সমগ্র ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের নিরলস কর্মী ছিলেন। তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা গ্রন্থাগার বৃত্তির চির সম্পদ। তাঁর প্রবর্তিত দ্বিবিন্দু পুস্তক বর্গীকরণ পদ্ধতির আলোচনা আগেই করা হয়েছে। তাঁর আরেকটি বিশিষ্ট ব্যাখ্যানের কথা এবারে বলা হচ্ছে। গ্রন্থাগার বৃত্তিকে তিনি পাঁচটি নীতির মধ্যে বিধৃত করেছেন। এই পঞ্চনীতি গ্রন্থাগারের সমগ্র কর্মধারার ইঙ্গিত দেয়। নীতি-পঞ্চক নিম্নরূপ—

১ম। বই ব্যবহারের জন্য ( Books are for use )
২য়। প্রতিটি পাঠকের জন্য বই ( Every reader his book )
৩য়। প্রতিটি বইএর জন্য পাঠক ( Every book its reader )
৪র্থ। পাঠকের সময় বাঁচাও ( Save the time of the reader )
৫ম। গ্রন্থাগার ক্রমবর্ধনশীল (Library is a growing organism)

প্রথম নীতির আলোচনা :

বই ব্যবহারের জন্য। এই নীতির সোজা অর্থ বই কেবলমাত্র সাজিয়ে বা গুদামজাত ক'রে রাখবার জন্য নয়। বই পড়বার ও পড়াবার জন্য। পাঠক যাতে নির্দিষ্ট বই পড়তে পান তার জন্য সবরকম সুযোগ সুবিধা থাকা দরকার। এমন বই গ্রন্থাগারে থাকবেনা যা'র কোনো পড়ুয়া নেই। 'মেহগিনির মঞ্চ জুড়ি পঞ্চ হাজার গ্রন্থ' রাখা অর্থহীন যদি তা কাজে না লাগে। যে বই কেউ পড়েনা, কোনো কাজে লাগেনা, সে বই মৃত বই,—সেটিকে সমাধিস্থ করাই সমীচিন। আবার কোনো বইএর একটি মাত্র পাঠক থাকলেও তাকে বলে জীবিত বই। সেই গ্রন্থাগারই সার্থক ও সফল যা'র মঞ্চে বই উঠতে না উঠতেই আবার বেরিয়ে যায়। বই ব্যবহারের জন্য—এই নীতির তাৎপর্য দ্বিবিধ ; পাঠক বই ব্যবহার করবেন এবং গ্রন্থাগারিক তাঁর ব্যবহারের রাস্তা করে দেবেন। বইএর সঙ্গে পাঠকের যাতে সহজ যোগ থাকে সেজন্য বইএর ঘোষণা বা বিজ্ঞাপন প্রয়োজন, উপযুক্ত সূচীকরণের সহায়তা প্রয়োজন, এবং গ্রন্থাগার মুক্তমঞ্চ ( open access ) হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই নীতিটির থেকে পুস্তক নির্বাচনেব ইঙ্গিত মেলে—অপ্রয়োজনীয় বই বর্জন এবং প্রয়োজনীয় গ্রন্থ গ্রহণ করবার আভাস। পাঠক জুটবেনা এমন বই গ্রন্থাগারে রাখা নিরর্থক। গ্রন্থাগারকে সর্বতোভাবে সজীব ও সফল ক'রে তুলতে হবে। বইএর অনাবশ্যক দ্বিত্ব না হয় সেদিকেও নজর রাখা কর্তব্য। গ্রন্থাগার ভারে কাটেনা, কাটে ধারে। এই দিকে লক্ষ্য রেখে বই বাছাই করলে গ্রন্থাগার কর্মমুখর হয়ে থাকবে।

দ্বিতীয় নীতির আলোচনা :

প্রতিটি পাঠকের জন্য বই। এই নীতির মূলে আছে গণতন্ত্রের প্রত্যয়। প্রত্যেকটি মানুষকে শিক্ষিত ক'রে তুলতে হবে এবং শিক্ষার সব রকম সুযোগ সুবিধা করে দিতে হবে—এটি গণতন্ত্র ব সমাজতন্ত্রের গোড়ার কথা। গ্রন্থাগার

জনশিক্ষার আজীবন ও প্রধান কেন্দ্র। সুতরাং প্রত্যেকটি পাঠকের আকাঙ্খা অনুযায়ী বই এখানে রাখতে হবে। পাঠক যেমন বিভিন্ন ধরণের, বইও তেমনি বিচিত্র রকমের। যে যেমন বই পড়তে চান তাঁর জন্য বিনা দ্বিধায় সে বই সংগ্রহ করা গ্রন্থাগারিকের নীতিগত কর্তব্য। কোনো রকমের সংস্কার বা পক্ষপাত তাঁকে যেন স্পর্শ না করে। তিনি বিচারক নন, নন প্রচারক। এ কথা তাঁর মনে রাখা উচিত যে গ্রন্থাগারের উপরেই পাঠক তৈরীর ভার নয়, পাঠকেরও দায়িত্ব গ্রন্থাগারকে গড়ে তোলা। সে জন্যেই কোনো পাঠককে তিনি বিমুখ করতে পারেন না। বক্ষমান নীতিটি মেনে চলবার জন্য চাই গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের তরফে উপযুক্ত পুস্তক নির্বাচন প্রকল্প এবং উপযুক্ত কর্মী নিয়োগ, গ্রন্থাগার কর্মীদের তরফে সুষ্টুভাবে কর্তব্য পালন, বই সম্পর্কে জ্ঞান এবং পাঠকদের আপ্যায়ন, সরকার তরফে আর্থিক আনুকূল্য ও গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন। পাঠকদের তরফেও কর্তব্য আছে—কেবল মাত্র নিজেদের দাবী বা দরকারকেই বড় ক'রে না দেখে একটু তলিয়ে বুঝে দেখা যে গ্রন্থাগারের বিধি নিষেধ বা নীতি তাঁদেরই সুবিধার জন্য সৃষ্ট, এ গুলি মেনে চলা গ্রন্থাগারিকের কাজে সহায়তা করা এবং এই সঙ্গে নিজেদেরও সুবিধার ক্ষেত্র তৈরি করা। প্রতিটি পাঠকের জন্য উপযুক্ত বই রাখতে হলে ক্রমবর্ধমান জ্ঞান ভাণ্ডারের দিকে গ্রন্থাগারিককে লক্ষ্য রাখতে হবে, বই না পেয়ে কোনো পড়ুয়া যেন ফিরে না যান তা দেখতে হবে এবং পাঠক যাতে অভিরুচি অনুযায়ী বই বেছে নিতে পারেন সে জন্য রাখতে হবে সুষ্টু সূচী বিন্যাস ও নির্দেশ পঞ্জী।

তৃতীয় নীতির আলোচনা :

প্রতিটি বই এর জন্য পাঠক। এই নীতি গ্রন্থাগারের ব্যবহারিক প্রকল্পের দিক নির্দেশ করে। প্রথম শর্ত, গ্রন্থাগারের প্রতিটি বই এর জন্য যেন অন্তত একজনও পাঠক থাকনে। দ্বিতীয় শর্ত, গ্রন্থাগারের প্রতিটি বই এর কাছে যেন পাঠক যেতে পারেন। তৃতীয় শর্ত, প্রার্থিব বইটি যে গ্রন্থাগারের সংগ্রহে আছে তা জেনে নেবার সহজ উপায় যেন পাঠকের থাকে। এই শর্তগুলি পূরণের জন্য প্রথমত দেখতে হবে যেন ব্যবহারিকতার দিকে লক্ষ্য রেখে পুস্তক নির্বাচিত হয়। দ্বিতীয়ত, পাঠক স্বয়ং যেন গ্রন্থমঞ্চে গিয়ে বই বাছাই করতে পারেন বা বইএর উপস্থিতি ও অবস্থান সম্পর্কে সহজ সূত্র পেতে পারেন।

তৃতীয়ত, বর্গীকরণ প্রকল্প যেন সহজ ও সরল হয়, সূচীকরণ হয় পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং আনুষঙ্গিক তালিকা নির্দেশিকা ইত্যাদি যেন হাতের কাছে মেলে। এ ব্যাপারে গ্রন্থাগার কর্মীর সাহায্যের হাতও অবাধ হওয়া উচিত। প্রতিটি বইএর জন্য পাঠক তখনই মিলবে যখন বইএর খবর তাঁর কাছে পৌছাবে। এ জন্যই পাঠককে আহ্বান জানাতে হয়, প্রদর্শনীর আয়োজন করতে হয়, তালিকা প্রভৃতির প্রচারের ব্যবস্থা করতে হয়। এই ভাবে গ'ড়ে তুলতে হয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে পাঠকের প্রত্যক্ষ সংযোগ। দেখতে হয়, গ্রন্থবঞ্চের অন্তরালে একটিও সামগ্রী যেন অব্যবহার্য অবস্থায় প'ড়ে না থাকে। সমগ্র ব্যবহারিক প্রকল্প যেন এই লক্ষ্যে কাজ ক'রে যায় সেই দিকে গ্রন্থাগার কর্মীকে নিবদ্ধ-দৃষ্টি করে উপরোক্ত এই নীতি।

চতুর্থ নীতির আলোচনা:

পাঠকের সময় বাঁচাও। এই নীতি একদিকে যেমন সর্বৈভাবে পাঠকদের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রস্তুত তেমনি এর ব্যবহার সম্পূর্ণভাবেই গ্রন্থাগার কর্মীদের করায়ত্ত। অর্থাৎ, গ্রন্থাগারে পাঠকের প্রবেশ-মুহূর্ত থেকে প্রস্থান মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর প্রয়োজন ও সুযোগ সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখা। পড়ুয়াদের সময় বাঁচাবার জন্য প্রথমেই উচিত তাঁদের সঙ্গে পুস্তক মঞ্চের সরাসরি যোগ স্থাপন করা। এ জন্য মুক্ত মঞ্চ প্রথার প্রথার প্রবর্তন যুক্তিযুক্ত। রুদ্ধমঞ্চ গ্রন্থাগারে বইএর জন্য বরাত দিয়ে পড়ুয়াদের অপেক্ষা করতে হয়, গ্রন্থাগার কর্মী যদি সে বইটি খুঁজে না পান তবে আবার হয়ত দ্বিতীয় পুস্তকের দাবীপত্র পেশ করে আবার অপেক্ষ করতে হয়। এর ফলে কর্মী ও পাঠকউভয়েরই সময় নষ্ট হয়। পাঠক যদি স্বয়ং মঞ্চে গিয়ে বই বাছাই করতে পারেন তাহলে সঠিক বইটি খুঁজে না পেলেও তিনি বিকল্প কোনো বই মনোনীত করতে পারেন। পড়ুয়ার সময় বাঁচাবার জন্য সূচীপত্রক বিন্যাস এবং রচনা পদ্ধতি সরল ও বিশদ করা কর্তব্য। তাহলে আকাঙ্খিত বইটির অবস্থান পাঠক চট করে জেনে নিতে পারেন। মঞ্চ সজ্জার সঙ্গেও বিষয় নির্দেশক পত্র এঁটে দিতে হয়। যাতে পাঠক সহজেই বুঝতে পারেন কোন পদ্ধতিতে মঞ্চগুলি সাজানো আছে এবং কোন মঞ্চে কোন বর্গ সংখ্যার বই রাখা আছে। তৃতীয়ত, তথ্য যেন বিভাগের কাজ সুনিপুন হওয়া প্রয়োজন। যে কোনো তথ্য চটপট পাটকদের সরবরাহ করা যায়। চতুর্থত, পুস্তক ঋনদান প্রকল্প সরল হওয়া দরকার। বইটি নিতে

বা দিতে যেন অযথা সময় নষ্ট না হয়। পঞ্চমত গ্রন্থাগার কর্মীদের সাহায্যের হাত যেন দরাজ হয়, পাঠকদের সহায়তায় যেন কোনো প্রকার কার্পণ্য বা অনিচ্ছা না থাকে। সমগ্র গ্রন্থাগারের পরিবেশ এমন ক'রে তুলতে হবে যাতে পড়ুয়ারা স্বচ্ছন্দ বোধ করতে পারে, গ্রন্থাগারকে নিজেদেরই প্রতিষ্ঠান ব'লে মনে করতে পারে।

পঞ্চম নীতির আলোচনা :

গ্রন্থাগার ক্রমবর্ধমানশীল প্রতিষ্ঠান। এই নীতির মধ্যে সমগ্র গ্রন্থাগারের গৃহীত নীতি ও পরিকল্পনা বিধৃত। পূর্বোক্ত চারটি নীতিতে গ্রন্থাগার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ইঙ্গিত আছে। পঞ্চম নীতিটি গ্রন্থাগারের পরিকল্পনা ও সংগঠনের দিক নির্দেশ করে। যে গ্রন্থাগারের বৃদ্ধি নেই সে গ্রন্থাগার মৃত। বৃদ্ধির দুটি দিক। পাঠকদের পাঠস্পৃহা এবং জ্ঞানানুসন্ধান বৃদ্ধি, পাঠকদের চাহিদা অনুযায়ী এবং জ্ঞান শাখাগুলির চর্চা অনুযায়ী গ্রন্থাদির সংখ্যা বৃদ্ধি। এরই সঙ্গে তৃতীয় এক বৃদ্ধির প্রসঙ্গ জড়িত। গ্রন্থাগারকর্মীদের সংখ্যা এবং মঞ্চ সংখ্যার বৃদ্ধি, পাঠকদেরও সংখ্যা বৃদ্ধি। জ্ঞানের বিভিন্ন দিকের অনুশীলন, নূতন নূতন আবিষ্কারের বিভিন্ন পর্যায়, শিক্ষায় এবং সংস্কৃতিতে রাষ্ট্রের নব নব বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারও বড় হয়ে ওঠে। যতই দিন যায় ততই বইএর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, পাঠকদেরও সংখ্যা বাড়তে থাকে। তার সঙ্গে তাল রেখে মঞ্চ সংখ্যা বাড়াতে হয়, মঞ্চ সংস্থান বাড়াতে হয়, বাড়াতে হয় পাঠকদের পড়বার আসন। সুতরাং গ্রন্থাগার ভবন পরিকল্পনার সময়েই ভবিষ্যৎ বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে মঞ্চাদি প্রসার ও কক্ষ-সংযোজনের কথা ভেবে রাখতে হয়। সেই মতো উপায়েই ব্যবস্থা পূর্বাহ্ণেই ক'রে রাখতে হয়। কক্ষের আভ্যন্তরীন ব্যবস্থাও সম্প্রসারনশলী রাখতে হয়। পাঠক বৃদ্ধির কথা ভেবে ছেড়ে রাখতে হয় পাঠককক্ষের কিছু অংশ। বই বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সূচীপত্রক বাড়ে, বাড়ে পত্রকাধারের সংখ্যা। সুতরাং এজন্যও জায়গা ছেড়ে রাখতে হয়। বই ও পাঠক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই গ্রন্থাগারের কাজও বাড়ে, বাড়াতে হয় কর্মীর সংখ্যা, কর্মীদের কাজের আসন। এক কথায়, সমগ্র গ্রন্থাগারই এই ভাবে ক্রমে ক্রমে আয়তনে বাড়তে থাকে। প্রকৃতিগতভাবেও গ্রন্থাগারের ব্যাপ্তি ঘটে। শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়ে, জ্ঞানের পরিধি বাড়ে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নূতন নূতন দিক খুলে যায়, —এবং শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সঙ্গে

গ্রন্থাগার কর্মীদেরও সেদিকে সচেতন এবং ওয়াকিবহাল থাকতে হয়। বিশ্বের কোথায় কি নূতন মত বা পথের আবিষ্কার হল, কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হল, ইতিহাসের ধারায় কিভাবে পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে এবং এই সব বিষয়ে কোথায় কোন গ্রন্থ রচিত হচ্ছে, সম্পদ বর্ধিত হচ্ছে সে সব বিষয়ে খবর রাখতে হয় গ্রন্থাগারিককে। জ্ঞান-বিবর্ধনের তালে তাল মিলিয়ে গ্রন্থ সম্পদ কাজে লাগানোর কর্তব্য গ্রন্থাগারিকের। এবং এই ভাবে শিক্ষার ও সমাজের বৃদ্ধি এবং উন্নতি-বিধান করেন তিনি। গ্রন্থাগারের পঞ্চনীতি এইভাবেই গ্রন্থাগার বৃত্তিকে সমাজে ও জীবনে প্রয়োজনীয় করে তুলবার পথ বলে দেয়।

## (২) রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার

রবীন্দ্রনাথের চিন্তা শিক্ষা ও সংস্কৃতির, শিল্প ও সঙ্গীতের, দেশ ও কালের সকল দিকেই প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং তাঁর সচেতন মনে যে গ্রন্থাগার সম্পর্কেও কিছু ভাব-ভাবনার উদয় হবে তাতে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। বিশেষত, শিক্ষার সঙ্গে গ্রন্থাগারে যে অঙ্গাঙ্গী যোগ রয়েছে এবং শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় ও বিশ্বভারতী গ'ড়ে তুলবার জন্য সেখানে যে ভাবে গ্রন্থসংগ্রহ এবং গ্রন্থাগার প্রকল্প নেওয়া হয়েছে তা'তে স্বভাবতই এদিকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয়েছে তাঁকে। বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার এদেশে সম্ভবত সর্বপ্রথম গ্রন্থাগার যেখানে এর প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই মুক্তমঞ্চ প্রকল্প চলেছে সার্থকভাবে।

রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার চিন্তা তাঁর রচনার মধ্যে ইতস্তত ছড়ানো রয়েছে। এবং বিশেষ ভাবে তা প্রকাশ পেয়েছে দুটি রচনায়। ১২৯২ বঙ্গাব্দ লিখিত 'লাইব্রেরি' নামক এক প্রবন্ধে, এবং ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে ( ১৯২৮ ইঙ্গাব্দ ) নিখিল বঙ্গ গ্রন্থাগার সম্মিলনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণে—যেটি 'লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য' নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত। এই দুটি প্রবন্ধ পড়লে সন্দেহ থাকেনা যে গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য এবং কর্মপ্রকল্পকে কী নিবিড় ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন তিনি। স্বল্প পরিসরে গ্রন্থাগার-কর্মের সব কথাই তিনি বলেছেন। রঙ্গনাথনকৃত পঞ্চনীতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে বুঝতে পারি এর প্রতিটি পর্যায়েই তাঁর চিন্তাধারা গ্রন্থাগার আন্দোলনের সেই প্রথম যুগেই প্রসারিত ছিল।

গ্রন্থাগার পরিচালনার একদিকে রয়েছে গ্রন্থ-সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিষয়, গ্রন্থাগার সংগঠনের বিবিধ বিভাগ ও পর্যায়, গ্রন্থসংরক্ষণাদি বিবিধ বৈজ্ঞানিক

ব্যবস্থা, অন্যদিকে রয়েছে বর্গীকরণ, সূচীকরণ, সার-সংকলন প্রভৃতি প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে গ্রন্থাগারের সম্পদ সাজিয়ে গুছিয়ে ধারাবাহিক ভাবে পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করাতেই গ্রন্থাগার বৃত্তির সার্থকতা। গ্রন্থাগার একদিকে যেমন গ্রন্থের ভাণ্ডার, অপর দিকে তেমনি গ্রন্থালোচিত বিষয়ের স্মারক ও নির্দেশক। গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য একদিকে যেমন গ্রন্থসমূহের সুষ্ঠু সমাবেশের প্রতি লক্ষ্য রাখা, অন্যদিকে তেমনি সুসমঞ্জস উপায়ে গবেষণা ও আলোচনায় সহায়তা করা।

রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম অনুভূতিতে এই সত্যগুলি সহজেই ধরা পড়েছিল। সামান্য কয়েকটি কথার মধ্যে গ্রন্থাগারের স্বরূপ ও গ্রন্থাগারিকের কর্তব্যের কথা ব'লে গেছেন তিনি। এমনকি, গ্রন্থাগারবিদ্যার সব প্রকল্পেরই ইঙ্গিত রয়েছে তার মধ্যে। 'লাইব্রেরি' প্রবন্ধে লিখছেন, "মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহানন্দের সঙ্গে লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহস্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে।" মানুষের উপলব্ধির ধারক গ্রন্থ, প্রসারকেন্দ্র গ্রন্থাগার। মানুষ অমর নয়, দূরের মানুষের বানী কাছের মানুষের কানে পৌছায় না, কিন্তু গ্রন্থ চিরকাল অন্তত বহুকাল থাকে। গ্রন্থের মাধ্যমেই দূরে দূ'রান্তরে বাণী প্রেরণ করা যায়। গ্রন্থের মধ্যে মানুষ "অতীতকে বর্তমানে বন্দী" ক'রে রাখে, এবং বর্তমানকে ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিক ক'রে দেয়। রবীন্দ্র-চিন্তায় গ্রন্থের এই স্থিতিশীল অথচ চলমান রূপটি প্রকাশ পেয়েছে।

"এখানে জীবিত ও মৃত ব্যক্তির হৃদয় পাশাপাশি এক পাড়ায় বাস করিতেছে, বাদ ও প্রতিবাদ এখানে দুই ভাইয়ের মতো একসঙ্গে থাকে সংশয় ও বিশ্বাস, সন্ধান ও আবিষ্কার এখানে দেহে দেহে লগ্ন হইয়া বাস করে।" রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি গ্রন্থসংগ্রহের স্বরূপ ও নীতি নির্দেশ করছে। গ্রন্থাগারের সংগ্রহে সব মতের, সব পথের, সব বিষয়ের বই থাকবে, —এমনকি একই বিষয় সংক্রান্ত বিভিন্ন মতবাদের বইও থাকবে। বিশেষ দল বা বিশেষ মতবাদের প্রতি গ্রন্থাগারিকের পক্ষপাত থাকবেনা। একই বিষয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে অনুসন্ধিৎসু পাঠক যা'তে চিন্তা করতে পারেন সেই ব্যবস্থাই নিরপেক্ষ ভাবে গ্রন্থাগারিক করবেন

'লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য' বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "অধিকাংশ লাইব্রেরিই সংগ্রহ বাতিক গ্রস্ত। তার বারো আনা বই প্রায়ই ব্যবহারে লাগেনা, ব্যবহার যোগ্য অল্প চার আনা বইকে এই অতিস্ফীত গ্রন্থপুঞ্জ কোনঠাসা করে রাখে।" এই উক্তির মধ্যে জীবিত বা জীবন্ত গ্রন্থাগারের স্বরূপ কেমন হবে তার ইঙ্গিত মেলে। এমন বই দিয়ে গ্রন্থাগারের সংগ্রহ পুষ্ট হবে যেগুলি পাঠকবর্গের কাজে লাগবে। অকেজো বই যতই চটকদার বা নাম-করা হোক না কেন, সেগুলি কেবলমাত্র শোভা বর্ধনের জন্য গ্রন্থাগারে রাখা অনুচিত। রঙ্গনাথনও বলেছেন, 'বই ব্যবহারের জন্য', —ব্যবহার হবে জেনেই বই সংগ্রহ করা, লোক দেখানোর জন্য নয়—নয় কলেবর-গৌরবের জন্য। পুস্তক সংগ্রহের পূর্বে পাঠকগোষ্ঠীর মান এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পুস্তকের পঠন-যোগ্যতা এবং পঠন-সম্ভাবনীয়তা বিবেচনা ক'রে পুস্তক নির্বাচন করতে হবে। বই ক্রমাগত পাঠকদের হাতে হাতে ঘুরে বেড়াবে, তা'তেই গ্রন্থাগারের সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "লাইব্রেরি তার যে অংশে জমা করে সে অংশে তার উপযোগীতা আছে, কিন্তু যে অংশে সে নিত্য ও বিভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত সেই অংশে তার সার্থকতা।"

"লাইবেরিকে ব্যবহার যোগ্য করতে গেলে লাইব্রেরির পরিচয় সুস্পষ্ট ও সর্বাংগ সম্পূর্ণ হওয়া চাই।" রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি থেকে পাওয়া যায় বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে ইঙ্গিত। কোন গ্রন্থাগার কী ধরণের হবে, কী ধরণের বই সেখানে সংগৃহীত হবে সে বিষয়ে স্পষ্ট নীতি থাকা প্রয়োজন। বিভাগীয় সঞ্চয় অথবা বিষয়গত পৃথক সঞ্চয় স্পষ্টভাবে গ্রন্থাগার-সংগ্রহকে চিহ্নিত করতে পারে। গ্রন্থাগারের পরিচয় সুস্পষ্ট ক'রে তোলার জন্য ত্রুটিহীন বর্গীকরণ ও সূচীকরণ প্রণালী চালু রাখতে হবে। শুধু গ্রন্থ সংগ্রহেই গ্রন্থাগার সর্বাংগ সম্পূর্ণ হয় না, তালিকা প্রকরণ এবং সুষ্ঠু বিন্যাস পদ্ধতি তা'কে সম্পূর্ণতা দেয়। গ্রন্থ তালিকার চরিত্র সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। "সাধারণত লাইব্রেরি বলে থাকে, আমার গ্রন্থ তালিকা আছে, স্বয়ং দেখে নেও, বেছে নেও। কিন্তু তালিকার মধ্যে আহ্বান নেই, পরিচয় নেই। তার তরফে কোনো আগ্রহ নেই। যে লাইব্রেরির মধ্যে তার নিজের আগ্রহের পরিচয় পাই, যে নিজে এগিয়ে এসে পাঠককে অভ্যর্থনা ক'রে আনে, তাকেই বলি বদান্য—সেই হল বড় লাইব্রেরি—আকৃতিতে নয়, প্রকৃতিতে।" গ্রন্থ তালিকা তৈরির আধুনিক ধারা ও পদ্ধতির মূল কথাটাও এই।

কেবল মাত্র গ্রন্থকর্তা ও গ্রন্থের গতানুগতিক তালিকা নয়, বিষয় তালিকা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিচয়মূলক তালিকা রাখতে হয়। তালিকা বা সূচীপত্রক সুসম্বদ্ধভাবে সাজিয়ে রাখতে হয় এবং প্রতি গুচ্ছের সঙ্গে পরিচিতি লিখে দিতে হয়। পাঠককে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য পরিবেশ স্বচ্ছন্দ ক'রে তুলতে হয়, প্রদর্শ ফলক রাখতে হয়, পুস্তকের ঘোষণা করতে হয়, —যাতে সংগ্রহটি পাঠকদের মধ্যে – এমনকি যারা সচরাচর গ্রন্থাগারে আসেনা তাদের মধ্যেও প্রচার লাভ করে। রঙ্গনাথন-কৃত দ্বিতীয় ও তৃতীয় নীতিও এই কথাই বলে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছেন, "শুধু পাঠক লাইব্রেরিকে তৈরি করে তা নয়, লাইব্রেরি পাঠককে তৈরি করে তোলে"। অর্থাৎ, প্রত্যেক পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী বই যেমন থাকবে, তেমনি প্রতিটি বইএর 'চাহিদা' অনুযায়ী থাকবে পাঠক। বইএর 'চাহিদা' বলতে বুঝতে হবে বক্তব্য বিষয় কেউ পড়বে সেই আশা করা। সুতরাং প্রতিটি বইএর জন্য পাঠকদের আহ্বান জানিয়ে গ্রন্থাগার পাঠক তৈরি করে, পাঠক তার চাহিদা জানিয়ে গ্রন্থাগার 'তৈরি' করে।

গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য সম্পর্কেও উক্ত ভাষণে রবীন্দ্রনাথ সচেতন মন্তব্য করেছেন। "লাইব্রেরিয়ানের গ্রন্থবোধ থাকা চাই, কেবল ভাণ্ডারী হলে চলবেনা।" বলেছেন, "লাইব্রেরিয়ানের থাকবে গুদাম রক্ষকের যোগ্যতা নয়, আতিথ্য পালনের যোগ্যতা।" এবং, " তাঁর উপরে ভার কেবল গ্রন্থগুলির নয়, গ্রন্থ-পাঠকেরও।" বলেছেন, "লাইব্রেরির নিজের একটা দায় আছে, সে হচ্ছে তার সম্পদের দায়।... সে অক্রিয়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেনা, সক্রিয়-ভাবে যেন সে ডাক দিতে পারে।" এবং "লাইব্রেরীর মুখ্য কর্তব্য গ্রন্থের সঙ্গে পাঠকদের সচেষ্টভবে পরিচয় সাধন করিয়ে দেওয়া।" আরো বলেছেন, যে বইগুলি লাইবেরিয়ান সংগ্রহ করতে পেরেছেন কেবল তাদের সম্বন্ধেই লাইব্রেরিয়ানের কর্তব্য আবদ্ধ নয়। তাঁর জানা থাকা চাই, বিষয় বিশেষের জন্য প্রধান অধ্যয়ন যোগ্য কী কী বই প্রকাশিত হচ্ছে।"

এই উক্তি-কণা গুলির থেকে আভাষ মেলে গ্রন্থাগারিক কিভাবে পাঠকদের তথা সমাজের সেবা করতে পারেন। আধুনিক যুগে জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সংগে বিদ্যার প্রত্যেক শাখাতেই গ্রন্থবৃদ্ধি ঘটছে। সুতরাং সমগ্র জ্ঞানজগৎ এবং গ্রন্থজগৎ সম্পর্কে গ্রন্থাগারিককে খোঁজ রাখতে হয়। 'গ্রন্থবোধ' গুণের ফলে তিনি গ্রন্থের ভাল মন্দ বিচার ক'রে দেখতে পারেন এবং পারেন সামাজিক ভাল-মন্দের যাচাই ক'রে নিতে। 'সচেষ্টভাবে' গ্রন্থাগারের সংগে

পাঠকের পরিচয় সাধন করিয়ে দিতে হলে গ্রন্থের অন্তরংগ পরিচয় বাইরে প্রকট করার প্রকল্প নিতে হবে। গ্রন্থসূচী প্রণয়ন, সার সংকলন, তথ্য বিন্যাস প্রভৃতি এর অঙ্গ। এই সূত্রে পত্র-পত্রিকার সংগ্রহ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "যদি লাইব্রেরির যাচাই-বিভাগের কোনো ব্যক্তি তাদের থেকে বিশেষ পাঠ্য প্রবন্ধগুলিকে শ্রেণীবিভক্ত ভাবে নির্দিষ্ট ক'রে একটা তালিকা পাঠগৃহের দ্বারের কাছে ঝুলিয়ে রাখেন তাহলে সেগুলি পাঠের সম্ভাবনা নিশ্চিত বাড়ে।" রঙ্গনাথন চতুর্থ ও পঞ্চম নীতিকে যে কথা বলেছেন তার সঙ্গে রবীন্দ্র-চিন্তার মিল দেখা যায়। পাঠকদের সময় বাঁচাবার জন্য গ্রন্থসূচী, সার সংকলন, তালিকা বিন্যাস প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকল্প যেমন কাজ করে, তেমনি কাজ করে তথ্য বিন্যাস এবং নানাভাবে গ্রন্থাগার কর্মীদের 'আতিথ্য পালনের যোগ্যতা।' কেবলমাত্র যেসব বই গ্রন্থাগারিক সংগ্রহ করতে পেরেছেন সেগুলি ছাড়াও সর্বত্র অধ্যয়ন যোগ্য কী কী বই প্রকাশিত হচ্ছে তার খবর জানা থাকলে সুপরিকল্পিত ভাবে গ্রন্থাগারকে ক্রমবর্ধনশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ'ড়ে তুলতে পারবেন। রবীন্দ্র চিন্তায় গ্রন্থাগার বৃত্তির মূল সূত্রগুলি এইভাবে রূপায়িত হয়ে আছে।

এই সূত্রে একটি তথ্য প্রণিধান যোগ্য। রঙ্গনাথন গ্রন্থাগারের পঞ্চনীতি প্রণয়ন করেন ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে। রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণের তারিখ ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে। লাইব্রেরি প্রবন্ধটি অবশ্য আরো আগে ১৮৮৬-তে রচিত। রবীন্দ্রনাথ বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিক ছিলেন না। কিন্তু তাঁর চিন্তায় গ্রন্থাগারের মূলতত্ত্ব এবং প্রতিটি কর্মপ্রক্রিয়া সর্বপ্রথম সুস্পষ্ট ভাবে ধরা পড়েছিল।

## (গ) গ্রন্থাগার দর্শন : গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান

আধুনিক সভ্যতার প্রয়োজনেই গ্রন্থাগারের উৎপত্তি। গ্রন্থাগার এযুগে সমাজ দেহের এক বিশেষ অঙ্গ। মানুষের পরিচয় দ্বিবিধ, ব্যক্তিক ও ব্যষ্টিক। ব্যক্তিগত চিন্তা সমাজে প্রতিফলিত হয়, সমাজ থেকে তা প্রতিবিম্বিত হয় সমগ্র দেশে, এবং তা আবার প্রসারিত সারা বিশ্বে। পারিপার্শ্বিক পরিবেশের মধ্যেই মানুষের বিকাশ, ব্যক্তিগত চিন্তা ও সমাজগত চিন্তা পরস্পর পরস্পরের উদ্ভাবক ও পরিপূরক। চিন্তাধারা লিপিবদ্ধ হয় গ্রন্থে, —অধুনা গ্রন্থবৎ সম্ভারের ব্যাপ্তি মুদ্রিত অমুদ্রিত নানাবিধ ধারকে। স্মৃতি মানুষের জীবনে যে কাজ করে

গ্রন্থ সে কাজ করে সমাজ-জীবনে। চিত্তের সঙ্গে চিত্তের মিলন ঘটে গ্রন্থাদির মাধ্যমে। মানুষের সঙ্গে মানুষের বোঝাপাড়া বা যোগাযোগের প্রধান সেতু গ্রন্থ। যুগ-যুগান্তর প্রবাহিত চিন্তাধারার ধারক এই সকল সামগ্রী সঞ্চিত থাকে গ্রন্থাগারে। মানব সমাজে এ গুলির সংরক্ষণ ও প্রসার ঘটায় গ্রন্থাগারবৃত্তি। এ পথে চলবার একটা মতবাদ নিশ্চয় গ'ড়ে ওঠে, যাকে বলতে পারি গ্রন্থাগার দর্শন।

দর্শনের কাজ সত্যানুসন্ধান। বিষয় বিশেষের দর্শন তার অন্তর্নিহিত নীতি ও সূত্রানুন্ধান করে, তা'র উদ্দেশ্য ও কর্তব্য নিরূপণ করে। আর, বিজ্ঞানের কাজ তথ্য নিয়ে, তথ্যের সুসমঞ্জস বিন্যাস ও পারম্পর্যে বস্তু নিরূপণ বিশ্লেষণ। গ্রন্থাগার বৃত্তির মধ্যে এ দুয়েরই প্রভাব আছে, সমন্বয় আছে। এর প্রধান লক্ষ্য জ্ঞানের প্রসার ও বৃদ্ধির সহজ সূত্র প্রণয়ন। এবং এই উদ্দেশ্যেই নানাবিধ তথ্য নির্ণয় ও ব্যবহারবিধি প্রয়োগ করতে হয়। এই ব্যবহারিকতা গ্রন্থাগারবৃত্তিকে প্রযুক্তি-দর্শনের পর্যায়ভুক্ত করে। গ্রন্থাগারিকের কাজের সঠিক উদ্দেশ্য নিরুপন ক'রে ক্রিয়াপর্বের মধ্য দিয়ে বিষয়টিকে বিশেষ স্থান দেয়, বৃত্তিগত বৈশিষ্ট্য এনে দেয়। তথ্য নিয়ে গ্রন্থাগারের যে কাজ তার নির্দিষ্ট রূপ আছে, ধারাবাহিক ক্রিয়াপদ্ধতি আছে। কিন্তু গ্রন্থাগারের সামাজিক ভূমিকা এই ক্রিয়াপর্বের মধ্যে স্পষ্টভাবে উচ্চারিত নয়। শিক্ষা ও জ্ঞানলাভ সংস্কৃতির অঙ্গ, জীবন ধারণের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই অংশে গ্রন্থাগারের সামাজিক ভূমিকা।

গ্রন্থাগারিকের স্মর্তব্য শিক্ষা, গবেষণা, শিল্প, বানিজ্য; বিজ্ঞান, প্রকৌশল, সাহিত্য, সংস্কৃতি সংবলিত মানব সমাজে গ্রন্থাগার একাধারে তথ্য ও প্রয়োগ এবং সমাজ সেবার কেন্দ্র। তিনি তাঁর অধীত বিদ্যা এবং পরিবেশের জ্ঞান বলে গ্রন্থাদির মূল্যায়ন করতে পারেন, বুঝতে পারেন আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল কোথায়, কোন মূল্যবোধের ভিত্তিতে সমাজ দাঁড়িয়ে আছে, কেমন ক'রে সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংকটকালে ব্যক্তির বা ব্যষ্টির কাছে গ্রন্থাগার অনিবার্য সহায়ক হয়ে উঠতে পারে।

গ্রন্থাগার বৃত্তির বৈজ্ঞানিকতা স্বাভাবিক চিন্তাবিকাশ-পদ্ধতির ধারা অনুসরণে, বস্তুবাদী সংগঠন প্রক্রিয়ায় বুদ্ধিবৃত্তির সমন্বয় সাধনে। প্রতিটি বিষয়ের অংশ-বিভক্তি দ্বারা সেগুলির একক ও সংযুক্ত বৃত্তি নিরূপণ, এবং ক্রিয়াপর্বের গুন ও পরিমাণ নির্ণয়। এক পদ্ধতি থেকে আরেক পদ্ধতিতে যাবার, এক যুক্তিবাদ থেকে আরেক যুক্তিবাদে যাবার সেতু গঠন। সমগ্র

জ্ঞান-পরিমণ্ডলকে বাস্তবমুখী করবার প্রেরণা জোগায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান, জ্ঞান-জমিনের জরিপ করে। এইজন্য বিষয় সমূহের বিভিন্ন দিকে লক্ষ্য রাখতে হয় গ্রন্থাগারিককে ; বৈজ্ঞানিক দিক, সামাজিক দিক, মননের ও মনস্তত্ত্বের দিক, এবং—সর্বোপরি—ব্যবহারিক দিক।

## (১) গ্রন্থাগার বৃত্তি ও বিভিন্ন জ্ঞান-বিভাগ

শিক্ষা এবং গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, এ দুটি আঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সকল শাখার জ্ঞান নিয়ে গ্রন্থাগারের কারবার। তাই গ্রন্থাগার বৃত্তির সঙ্গে অন্যান্য শিক্ষাবিভাগের সম্বন্ধ কেমন তা নিয়ে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক নয়। বরঞ্চ এ বিষয়ে গ্রন্থাগারিকদের স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার।

যে কোনো বিষয়েই পড়বার অথবা গবেষণার জন্য গ্রন্থাগার কাজে লাগে, তাই গ্রন্থাগার বৃত্তির সঙ্গে জ্ঞান-বিভাগ গুলির সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। যেমন, ঐতিহাসিকের প্রধান কর্তব্য প্রাচীন ও অধুনিক প্রত্ন নিদর্শন ও ধারা সংরক্ষন, পুস্তক, পত্রিকা ইত্যাদির থেকে কালানুক্রমিক ধারা নিরূপণ ও বিচার। গ্রন্থাগারিকের কাজ ও এই সকল সমগ্রী ও তার লিখিত বিবরণ বা আলোচনা গুছিয়ে রাখা, যাতে ইতিহাসের অনুসন্ধিৎসু পাঠক উপকৃত হন। বৈজ্ঞানিক তার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি বই এবং পত্রিকা থেকে আহরণ করেন। গ্রন্থাগারিক সে গুলি বছাই ক'রে, তালিকা এবং সারসংকলন ক'রে ব্যবহারের উপযোগী ক'রে রাখেন। শিল্প ও সাহিত্যের সঙ্গে গ্রন্থাগার বৃত্তির সম্পর্কটি এত প্রত্যক্ষ না হলেও বিশেষ কিছু অস্পষ্টও নয়। কেননা, শিল্প ও সাহিত্য যে নন্দনতত্ব প্রকাশ করে, আনন্দের খোরাক জোগায়, রুচির যে-মান নির্ণয় করে, গ্রন্থাগারিক ও তাঁর গ্রন্থসজ্জার পারিপাট্যে, পঠন-পাঠন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সেই মানই প্রকাশ করেন। সাহিত্যের ও শিল্পের ইতিহাস রচনায় গ্রন্থপঞ্জী এবং গ্রন্থবিদ্যার যে প্রয়োগ সে-কাজও আধুনিক যুগে গ্রন্থাগারিকের বিশেষ করণীয়। মনোবিদ্যা, মনোবীক্ষণ এবং নীতি বিদ্যার সঙ্গেও গ্রন্থাগার বৃত্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কেবলমাত্র এই সকল জ্ঞানবিভাগের পাঠকদের প্রয়োজনেই নয়। গ্রন্থাগারিককেও নানান ধরণের, নানান মেজাজের পাঠকদের নিয়ে কারবার করতে হয়। তাঁদের সংগে ব্যবহারে এব' সহযোগিতায় গ্রন্থাগারিককে

অনেকাংশেই মনোবিদ্যার ভূমিকা নিতে হয়। আর নীতি বিষয়ের প্রয়োগ দরকার হয় পুস্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রে. ভাল মন্দ বিচারের ব্যাপারে। সমাজ বিজ্ঞান এবং শিক্ষার সঙ্গে তো গ্রন্থাগার ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়েই আছে। গ্রন্থাগার প্রকৃতপক্ষে সমাজ বিজ্ঞানের ব্যবহারিক ক্ষেত্র। মূলত সমাজ সেবাই গ্রন্থাগারের কাজ। সমাজের দশজনকে নিয়েই গ্রন্থাগারের পত্তন এবং পরিচালনা। আর. শিক্ষা বিষয়ক প্রকল্প বা কাজ তো গ্রন্থাগারেরও। শিশু থেকে স্থরু ক'রে বিবিধ পর্য্যায়ের শিক্ষার্থীদের, গবেষকদের, এবং শিক্ষকদেরও শিক্ষাক্রমে ও শিক্ষাপ্রসারে গ্রন্থাগারিক শিক্ষকেরই সম পর্য্যায়ভূক্ত।

স্থতরাং দেখা যায় যে গ্রন্থাগারবৃত্তির সঙ্গে সর্ববিধ জ্ঞান পর্যায়ের নিকট সম্পর্ক। এই বৃত্তির মধ্যে সমগ্র জ্ঞানকাণ্ডের পথগুলি এসে মিশেছে। গ্রন্থাগার রয়েছে জ্ঞানমার্গের কেন্দ্রবিন্দুতে। গ্রন্থাগারিককে তাই সকল বিষয় সম্পর্কেই কিছুটা অভিজ্ঞ হ'তে হয়।

## (২) গ্রন্থাগারের সেবাক্রম

গ্রন্থাগার কোন কোন কাজ দিয়ে পাঠকদের সেবা করে তার হিসেব নিম্নরূপ :—

(১) কর্মীসহযোগ। গ্রন্থাগারকর্মীদের কর্তব্য পাঠকদের সর্ববিধ সহায়তায় এগিয়ে আসা। তথ্যসহায় বিভাগ ছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের বই বাছাইএর ব্যাপারে সাহায্য করা, কোথায় কী আছে তা'র নির্দেশ দেওয়া, বইপত্র ঘেঁটে তথ্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে তাঁদের সঙ্গে সহযোগীতা করা এবং এই জাতীয় ব্যক্তিক সম্পর্ক ও সংযোগ এই কার্যক্রমের অঙ্গীভূত।

(২) প্রচল প্রকল্প। লেনদেন বিভাগ থেকে বই নিয়ে যাবার স্থব্যবস্থা করতে হয়।

(৩) বই ছাড়াও পুস্তক-প্রতিম অন্যান্য সামগ্রী, যেমন পত্র-পত্রিকা, পুস্তিকা, রেকর্ড বা টেপ ইত্যাদির হয় ঋণদান ব্যবস্থা নয় তো গ্রন্থাগারের মধ্যেই ব্যবহারের স্থবন্দোবস্ত করে দেওয়া।

(৪) তথ্যসহায় প্রকল্প। নানা শ্রেণীর তথ্য সহায়ক গ্রন্থের স্থপরিকল্পিত বিন্যাস বাদেও ত্বরিত -তথ্যানুসন্ধান পুস্তক ও গভীরতর তথ্যাদি

সংগ্রহে সাহায্য করতে হয়।

(৫) সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র, পুস্তিকা প্রভৃতির সুবিন্যস্ত বিভাগ রাখতে হয়।

(৬) প্রাচীন পুথি বা পাণ্ডুলিপি ব্যবহারের বিশেষ সুবিধা করে দিতে হয়।

(৭) সাময়িক পত্রে প্রকাশিত বিশেষ বিশেষ প্রবন্ধের সারসংকলন গ্রন্থাগারের বিশিষ্ট সেবাক্রম।

(৮) প্রয়োজন সাপেক্ষে পুস্তক বা পত্রিকার অংশ বিশেষ আলোক চিত্রণে নকল ক'রে দিতে হয়, এবং সেজন্য বিশেষ বিভাগ রাখতে হয়। অণু-আলোক চিত্রণ বা মাইক্রোফিল্মও এরই অন্তর্ভুক্ত।

(৯) প্রয়োজন হলে বিভিন্ন ভাষা থেকে অনুবাদ ক'রে দেবার দায়িত্বও নিতে হয়।

(১০) গ্রন্থপঞ্জী। গ্রন্থসূচী। বিশেষ বিষয়ের গ্রন্থপঞ্জী, এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে গ্রন্থসূচী প্রস্তুত প্রকল্পও গ্রন্থাগার নিয়ে থাকে।

(১১) প্রকাশক। মাঝে মাঝে গ্রন্থ তালিকা, অর্থাৎ গ্রন্থাগারের সংগ্রহ ও সংযোজন তালিকা ছাপিয়ে বার করতে হয়। এটি প্রচারিত হলে গ্রন্থাগারের কথা লোকে জানতে পারে। গ্রন্থাগারের নিজস্ব বৃত্তান্তপত্র বা বুলেটিন প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয়; এই পত্র মাসিক, দ্বিমাসিক বা ত্রিমাসিক হ'তে পারে। এতে থাকবে গ্রন্থাগারের যাবতীয় খবর, বিশেষ ঘটনার বিবরণ, বিবিধ ঘোষণা, কখনো বা ছোটখাট গ্রন্থপঞ্জী বা গ্রন্থসূচী। এছাড়া গ্রন্থাগার পরিচিতি সংবলিত পুস্তিকা প্রচার আবশ্যক,—যা'র থেকে পাঠক গ্রন্থাগারের ইতিবৃত্ত, আভ্যন্তরীন সংস্থান, বর্গীকরণ প্রকল্প, নিয়মকানুন ইত্যাদি সব জানতে পারবে।

(১২) আশেপাশের বিদ্যালয়, সংস্থা বা বিশেষ প্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজনে সাহায্যের প্রসার ও গ্রন্থাগারের করনীয়।

(১৩) বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প। বয়স্ক ও নিরক্ষরদের শিক্ষণের কাজেও গ্রন্থাগারের—বিশেষ ক'রে জন-গ্রন্থাগারের সেবাক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

(১৪ অন্তঃগ্রন্থাগার লেনদেন। আজকাল গ্রন্থ ও পত্রিকার পরিমাণ এত বেড়ে গিয়েছে যে কোনো একক গ্রন্থাগারের পক্ষে যাবতীয় সামগ্রী সঞ্চয় ক'রে রাখা সম্ভব হয় না। এজন্য এক গ্রন্থাগারের প্রয়োজনে অপর গ্রন্থাগার বইপত্র নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ দিয়ে থাকে। সারা-বিশ্বেই আজকাল এই প্রথা চালু হয়ে গিয়েছে। এতে গবেষকদের

প্রভূত উপকার হয়। এমন কি, কোনো একটি অঞ্চলে একেকটি গ্রন্থাগার একেক বিষয়ে বিশেষ সঞ্চয়ের বিশিষ্টতা অর্জন করতে পারে,এবং অন্যান্য গ্রন্থাগার বিষয় বিশেষের জন্য সাহায্য চাইতে পারে। এজন্য গ্রন্থাগার-গুলিতে যৌথ স্থচীপত্রক বা ইউনিয়ন ক্যাটালগ রাখবার রীতিও প্রবর্তিত হয়েছে, —যা'র ফলে যে কোনো গ্রন্থাগারই অপর গ্রন্থাগারের গ্রন্থসঞ্চয় সম্পর্কে অবহিত থাকতে পারে।

(১৫) দেশের বিশেষ অবস্থাগতিকে অথবা বিপর্যায়ের সময়ে গ্রন্থাগার নানাভাবে সাহায্যের হাত প্রসারিত ক'রে দিতে পারে। দুর্যোগ বা মহামারী, যুদ্ধ বা বিপ্লব যাই ঘটুক না কেন, প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র ছাড়াও পরোক্ষ ক্ষেত্র থেকে প্রচুর সাহায্যের প্রয়োজন হয়, সঠিক সংবাদ প্রচারের বা তথ্যাদি সরবরাহ ক'রে সংযোগ রক্ষার। গ্রন্থাগার এই সকল ক্রিয়াকর্মের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করতে পারে।

## (৩) গ্রন্থাগারের ব্যবহারিক নীতি

গ্রন্থাগারের কর্মক্ষেত্রের বিভিন্নতা এবং গ্রন্থাগারিকের বৃত্তিগত কার্যক্রম বিশ্লেষণ ক'রে দেখলে বিশেষ বিশেষ পাঠক গোষ্ঠীতে এবং সমাজে গ্রন্থাগারের স্থান এবং গ্রন্থাগারিকের কর্মনীতি বুঝে দেখা সহজ হবে।

(১ম) জন-গ্রন্থাগার। জনসাধারণের গ্রন্থাগারে সামাজিক উদ্দেশ্যই প্রধান। সমাজ সেবাই মূল লক্ষ্য। শিক্ষা প্রসারের ফলে ব্যক্তিমানস উন্নত হয়, যুক্তি প্রয়োগে বিচারশীলতা বাড়ে, ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় এবং তা'র ফলে সমাজ মানস দৃঢ়তর হয়, নাগরিক হিসাবে দায়িত্বশীলতা আসে।

জনগ্রন্থাগারের কাজ গ্রন্থ এবং শিক্ষার আনুষঙ্গিক সামগ্রীর সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং সর্বজনের ব্যবহারের জন্য সুযোগ, সুবিধা ও সহায়তা করা; স্থানীয় সমাজের যাবতীয় তথ্য সরবরাহের কেন্দ্র হিসেবে গ'ড়ে ওঠা; এবং, আবালবৃদ্ধবনিতার আজীবন জ্ঞানলাভের এবং স্বয়ং শিক্ষার ব্যবস্থাপনা করা।

জন গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে তাই বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ে দক্ষ কর্মী থাকা চাই। গ্রন্থাগারিক হবেন এমন ব্যক্তি যিনি বিদ্যা, বুদ্ধি ও মননশীলতায় সামাজিক ও শিক্ষা জগতের নেতাদের সমগোত্রীয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-

শিক্ষার উপাধি ছাড়াও গ্রন্থাগার বৃত্তির বিশেষ অভিজ্ঞা তাঁর থাকা আবশ্যক। তাঁর থাকবে ত্বরিত সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা, চিন্তাশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তি, দূরদৃষ্টি, উদ্যম ও নির্ভীকতা, আত্মবিশ্বাস, ধৈর্য, অমায়িকতা ও উদারতা। লোককে বুঝে দেখবার ক্ষমতা থাকা যেমন দরকার তেমনি দরকার সকলের প্রতি সহানুভব। নিজের মতই অভ্রান্ত এমন অভিমান না রেখে অন্য মতের গ্রহন যোগ্যতা। একই ব্যক্তির মধ্যে সবরকম গুণ ও বিদ্যার সমাবেশ সচরাচর হয় না বলে গ্রন্থাগারের দায়িত্বশীল কর্মীদের নির্বাচন এমন ভাবে করা উচিত যা'তে এই সকল গুন কারো না কারো মধ্যে কিছু কিছু পরিমাণে থাকে। বিশেষত বিদ্যার বিভিন্ন বিভাগে দক্ষ বিভিন্ন ব্যক্তি নিয়োগ খুবই প্রয়োজন। জনগ্রন্থাগার এমন একটি কেন্দ্র যেখানে জনসাধারণ এসে যেমন মিলিত হতে পারে তেমনি জনসাধারণের মধ্যে গিয়েও শিক্ষার প্রসার করা যেতে পারে। গ্রন্থাগার সম্পর্কে সচেতন ব্যক্তি থেকে সুরু করে গ্রন্থাগারের প্রতি উদাসীন বা নিস্পৃহ ব্যক্তি পর্যন্ত যে কোনো শ্রেণীর সেবাই এর কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। অশিক্ষিতকে শিক্ষিত করাও জনগ্রন্থাগারের নীতি। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য এ ক্ষেত্রে প্রণিধান যোগ্য, তিনি বলেছেন, "শিক্ষা যদি ···তলদেশে প্রবেশ না করে · তবে সমাজের উপরিভাগ যতই অবিশ্রান্ত নৃত্য করুক এবং ফেনাইয়া উঠুক তাহা ক্ষণিক শোভার কারণ হইতে পারে, চিরন্তন জীবনের উৎস হইতে পারে না।" জীবনের এই চিরন্তন উৎস সৃষ্টির কাজ গ্রন্থাগারের।

(২য়) শিশু গ্রন্থাগার। শিশুদের শিক্ষার দায় কেবলমাত্র পিতা-মাতার নয়, সে দায় সমাজেরও। শিশু ভবিষ্যৎ নাগরিক, ভবিষ্যৎ নেতা। শিশুরা স্বাভাবিক ভাবেই পরিবেশ থেকে নানান বিষয় শিখে নেয়। ভালও শেখে মন্দও শেখে। সুতরাং সমাজের কেউই তা'র দায় এড়াতে পারেনা। এবং সেজন্যই বিশেষ ব্যবস্থা থাকা দরকার যা'তে শিশুরা স্বচ্ছন্দ পরিবেশ পায়, এমন জায়গা পায় যেখানে চোখ-রাঙানি নেই, চেঁচামেচি নেই। কেবল ঘরের মধ্যে থাকলেই শিশুরা যেমন মানুষ হয়ে ওঠেনা, তেমনি যত্রতত্র খুশি মতো ঘুরে বেড়ালেই সামাজিক হয়ে ওঠেনা। এ দুয়ের সমন্বয় যেখানে আছে সেখানেই শিশুদের পরিবেশ আনন্দময় হয়ে ওঠে। শিশু গ্রন্থাগার এই পরিবেশ তৈরি করতে পারে, যেখানে মেলামেশা সহজ হবে, পড়াশোনায় মন খুশি হবে।

শিশু গ্রন্থাগারের সাজ-সজ্জা এমন হওয়া উচিত যা'তে সহজেই ছোটদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, উৎফুল্ল হয় মন। ঝকঝকে রঙচঙে বই রাখলে স্বভাবতই শিশুদের নেড়ে চেড়ে দেখতে ইচ্ছে হবে। ঘরখানা ফুলে পাতায় সাজানো থাকলে এবং দেয়ালে ভাল ভাল ছবি টাঙানো থাকলে ছোটদের ভাল লাগবে। ঘর যেন আসবাবে ঠাসা না থাকে, অনেকটা জায়গা ফাঁকা থাকে। খেলার মধ্য দিয়ে শেখা যায় এমন আয়োজন থাকা দরকার। 'যেমন খেলা তেমনি যে কাজ' কথাটা তাহলে তাদের মনের মধ্যে গেঁথে যাবে। নিজেরাই ছবি আঁকবে, কিছু লিখবে এবং সে-লেখা পড়ে শোনাবে, নিজেরাই ঘর সাজাবে, তাহলে শিশুদের উদ্ভাবনী শক্তিও গ'ড়ে উঠতে পারে।

শিশু গ্রন্থাগারিক হবেন স্নেহে মায়ের মতো, ব্যবহারে বন্ধুর মতো। শিশু মনস্তত্ব সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান থাকা আবশ্যক। শিশুদের মধ্যে পাঠস্পৃহা জাগিয়ে তুলবেন তিনি, এবং সেজন্য বই থেকে তাদের কিছু প'ড়ে শোনানো বা আবৃত্তি ক'রে দেখানো দরকার। তারপরে তাদের আবার প'ড়ে শোনাতে এবং আবৃত্তি করতে উৎসাহিত করবেন। নানাবিধ প্রশ্নের মধ্য দিয়ে কোনো বই বা বিষয় সম্পর্কে উৎসাহ জাগিয়ে তোলা যায়। যেমন, বইটির মধ্য থেকে কোনো গল্প পড়ে শোনালে কৌতূহল জাগে। বইটির লেখক কে, তার সম্পর্কে কী জান, কোন জায়গাটা তোমার বেশি ভাল লাগলো, কেন ভাল লাগল, বইটি কোন সময়ে লেখা এবং সেই সময়ের বিশেষত্ব কী ছিল, —ইত্যাদি প্রশ্নে ও প্রসঙ্গে ছোটদের উৎসাহ বৃদ্ধি করা যায়। নিয়ম শৃঙ্খলা শিশুরা সহজেই শেখে এবং মেনে চলে। তবে বেশ বুঝিয়ে মোলায়েম ভাবে সেগুলি বলতে হয়। শিশু গ্রন্থাগারিক অবশ্যই হবেন শিশু প্রেমিক। শিশুদের কৌতূহলের বিস্তৃত জগৎ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান থাকা দরকার। শিশুশিক্ষা এবং গ্রন্থাগারবৃত্তিতে বিশেষ পাঠ তাঁর দক্ষতার অঙ্গস্বরূপ, সেকথা বলাই বাহুল্য।

(৩য়) বিদ্যালয় গ্রন্থাগার। শৈশবোত্তীর্ণ কিশোরদের শিক্ষার ব্যাপকতর জগতে প্রথম পদক্ষেপ বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার গ'ড়ে ওঠে মূলত শিক্ষাবিধি ও পাঠক্রম কেন্দ্র ক'রে। ব্যক্তিত্ব বিকাশের বীজ বোনা হয় এইখানে। পাঠক্রমের মধ্যে ইতিহাস, ভূগোল, ইত্যাদির পাঠ, বিবিধ বিজ্ঞানের প্রয়োগবিদ্যা, শিল্প সাহিত্য প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তি - সবই অন্তর্ভুক্ত। এই বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে বই বাছাই ও ব্যবহার কিভাবে করতে হয় সেই শিক্ষার ভার নিতে পারে গ্রন্থাগারিক। গ্রন্থাগার পড়বার অভ্যাস তৈরি করতে

পারে, তথ্য থেকে মিথ্যাকে আলাদা ক'রে চিনতে শেখায়, বুঝতে শেখায় প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃতের পার্থক্য।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সংগ্রহে পাঠক্রম সংশ্লিষ্ট বই তো থাকবেই, তাছাড়া থাকবে এমন বই যা প্রত্যক্ষ পাঠ্যপুস্তক না হলেও জ্ঞানের বিস্তার ঘটায়, সুকুমার বৃত্তির চর্চার প্রশ্রয় দেয় এবং বিনোদনের আনন্দ দেয়। যেমন, নানাবিধ অভিযান ও আবিষ্কার কাহিনী, জীবনী এবং সাহিত্য ও শিল্প পুস্তক। গ্রন্থাগারে এসে ছাত্রছাত্রীদের মন ছাড়া পায় পাঠক্রমের সুনির্দিষ্ট শৃঙ্খল থেকে, শিক্ষকদের নির্বাচিত শিক্ষাক্রম থেকে। নির্দিষ্ট ও নির্বাচিত পাঠক্রম অবশ্যই বৃহত্তর পাঠের ভূমিকা মাত্র। তাই এখানে জ্ঞানজগতের যাবতীয় সঞ্চয় রাখতে হয়। কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তকে গ্রন্থাগার বোঝাই করলে শিক্ষাও বোঝা থেকে যায়, প্রসারলাভ করেনা। বিদ্যালয়েই শিক্ষার্থীদের রুচি গ'ড়ে ওঠে, চলার পথ প্রস্তুত হয়। এই প্রস্তুতিতে সহায়তা করে গ্রন্থাগার।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকের কাজ সহজ নয়। বস্তুত পক্ষে বেশ কঠিন ও দায়িত্বপূর্ণ। অথচ এতদ্দেশে এখনো পর্যন্ত এদিকে যথোপযুক্ত নজর দেওয়া হয়নি। ছাত্রছাত্রীরা যেন বিদ্যালয়ে এসে নিজেদের শিক্ষা-বন্দী ব'লে ভাবতে না পারে তার জন্য যে সব চেষ্টা করা যায় তা'র মধ্যে গ্রন্থাগার প্রধান। গ্রন্থাগারিক হবেন যিনি, তাঁর পক্ষে সুযোগ্য শিক্ষক হওয়াও প্রয়োজন। তাঁর যুগপৎ শিক্ষক-শিক্ষণ এবং গ্রন্থাগার বৃত্তির অভিজ্ঞা থাকা আবশ্যক। কেননা, গ্রন্থাগারে একাধারে পাঠপর্বে সাহায্য করতে হয় এবং গ্রন্থাগারকে চিনতে জানতে শেখাতে হয়, পাঠকেন্দ্রিক বিস্তৃত বিদ্যার্জনের ভূমিকা রচনা করতে হয়। এজন্য দরকার ছাত্রছাত্রীদের বই থেকে প্রয়োজনীয় অংশ বা'র করবার এবং তা ব্যবহার করবার পদ্ধতি শেখানো, হাতে-কলমে প্রবন্ধসার তৈরি করার পদ্ধতি শেখানো। কেননা, ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য এবং বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ ক'রে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই যাতে গ্রন্থাগারে গিয়ে কাজ করতে পারে তা'র ভূমিকা বিদ্যালয়েই সুরু করা ভাল। বিশেষ ক'রে তাদের চিনিয়ে দিতে হবে গ্রন্থাগারকে—এর কর্ম-পদ্ধতিকে, চিনিয়ে দিতে হবে বর্গীকরণ ও সূচীকরণের প্রক্রিয়া, —কী এর প্রয়োজনীয়তা, কেমন করে এ গুলির সাহায্যে বইএর খবর পাওয়া যায়।

বই কেমন করে পড়তে হয় সেটাও শিক্ষার এবং অভ্যাসের ব্যাপার। পড়বার পদ্ধতি তিন রকমের ; চোখ বুলিয়ে রচনার আভাষ নেওয়া, অংশ-

বিশেষ বেছে নিয়ে পড়া, এবং গভীরভাবে পাঠ। বইটিতে কী আছে, আলোচনার ধারা কীরকম তা জানবার জন্য উপর উপর চোখ বুলিয়ে গেলেই চলে। আবার নিজের কাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় অংশগুলি বাছাই ক'রে প'ড়ে নিলেই চলে, পুরো বইটা পড়বার দরকার হয় না। কিন্তু গবেষণা এবং গভীর জ্ঞানের জন্য বই আদ্যোপান্ত যত্ন ক'রে পড়াই বিধেয়। এভাবে পড়ার কায়দা গ্রন্থাগারিক শিক্ষার্থীদের শিখিয়ে দিতে পারেন সহজেই। গ্রন্থাগারিক স্বয়ং শিক্ষক হলেও শিক্ষকের দৃষ্টি নিয়ে গ্রন্থাগারের পাঠ-নিয়ন্ত্রণ করবেন না, সহযোগীর মতো স্বয়ং পাঠে তাদের সহায়তা করবেন। কেবলমাত্র পড়াশোনা ছাড়াও অন্যান্য অনেক প্রকল্প থাকে যাতে শিক্ষার্থীদের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে, —যাকে বলে সামগ্রিক শিক্ষা। সেজন্য খেলাধুলা, বাগান করা, বিশেষ ঝোঁক বা খেয়াল ( hobbies ), গৃহসজ্জা প্রভৃতির দিকে নজর দিতে হয়, —যা'র অনেকটাই হতে পারে গ্রন্থাগারের প্রচেষ্টায়।

(৪র্থ) মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার। মহাবিদ্যালয় বা কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে যে বয়সে এবং জ্ঞানের যে পর্যায়ে উপনীত হয় সেটা শিক্ষাজীবনের মধ্য পর্যায়। বিদ্যালয় থেকে তারা গ্রন্থাগারকে মোটামুটি জেনে এসেছে, মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগারে তারা ব্যাপকতর এবং গভীরতর পাঠের সুযোগ পেতে চায়। মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার সংগ্রহে প্রথমেই চাই প্রচুর পাঠ্যপুস্তক। এদেশে এখনো ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনীয় বইপত্র কেনার সামর্থ নেই। শিক্ষার খাতে অর্থব্যয়ের উপরে এই চাপ অনেক সময়ে দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। এজন্য গ্রন্থাগারে স্বতন্ত্র পাঠ্যপুস্তক বিভাগ থাকলে ভাল হয়। মূল সংগ্রহে থাকবে পাঠানুষঙ্গিক যাবতীয় পুস্তক সম্ভার। এবং সেই সঙ্গে শিল্প, সাহিত্য, জীবনী, ভ্রমণ প্রভৃতি যাবতীয় রমনীয় বইএর সংগ্রহ। এ ব্যাপারে কার্পণ্য করলে চলবেনা। অথচ এদেশে এখনও এই ওজনবোধের অভাব দেখা যায়, ব্যয়সংকোচের বিহ্বলতায় ভোগেন কর্তৃপক্ষ। মহাবিদ্যালয়ই জ্ঞানের ভিত্তি দৃঢ়তর করবার কেন্দ্র। সর্বতোমুখী জ্ঞানের আকাঙ্খা নিরসন করবে গ্রন্থাগার, —আকাঙ্খা জাগিয়েও তুলবে গ্রন্থাগার। বিবিধ তথ্য সহায়ক গ্রন্থ মজুত করা এবং গবেষণার অনুকূল মানসিকতা গঠন করতে এগুলির ব্যবহারপন্থা নির্দেশ করাও গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য। সাত্বিক চরিত্র গঠন এবং মানসিকতার চর্চা যাতে পূর্ণ হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে গ'ড়ে তুলতে হয় গ্রন্থাগার।

মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক ও যদি বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকের মতো শিক্ষক হন তাহলে ভাল হয়। অন্ততপক্ষে তাঁর অধ্যাপকদের সমতুল্য স্নাতকোত্তর পর্যায়ের উচ্চতম মান এবং সেই সঙ্গে গ্রন্থাগারবৃত্তির বিশেষ অভিজ্ঞা থাকা দরকার। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারে যেন দূরত্বের ভাব না থাকে, বন্ধুর মতো সহায়ক হবেন তিনি। কলেজের পাঠপর্বের কাঠামো থেকে গ্রন্থাগারে এসে তা'রা যেন স্বচ্ছন্দ বোধ করতে পারে, মনকে খেলিয়ে নিতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে সেই মতো ব্যবহার করবেন গ্রন্থাগারিক। গবেষণার জ্ঞানও থাকা উচিত গ্রন্থাগারিকের. বিদ্যাপর্বের অন্দর মহলে ঢোকবার রাস্তা বাৎলে দেওয়া তাঁর অন্যতম কর্তব্য। তাঁর সদাজাগ্রত চেতনা দিয়ে তিনি যেন শিক্ষার্থীদের মন বা প্রবণতাকে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে নিয়ে যেতে পারেন।

(৫ম) বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণকেন্দ্র গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারই উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গৌরব বৃদ্ধি করে। বিদ্যাচর্চার সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকলেও উত্তম গ্রন্থ সংগ্রহ ছাড়া কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ই চলতে পারেনা। গ্রন্থাগার থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষা ও গবেষণার কাজ পুষ্টিলাভ করে। বিশ্বজ্ঞানের শিক্ষাকেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বজ্ঞানের ধারক তা'র গ্রন্থাগার। পাঠ বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়, শিক্ষণ, গবেষণা, বিবিধ প্রকাশন, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার, —সকল কাজের বিস্তার ঘটে এখানে এমন সামগ্রী নেই যা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে বাদ পড়তে পারে। কেননা, বিদ্যাজগতের শেষ ধাপে এসে বাছ-বিচার ক'রে পড়লে চলেনা, সব কিছুই খুঁটিয়ে জানতে হয়। সেজন্য পুস্তক নির্বাচন করতে হয় খুব বিবেচনা ক'রে। তার কারণ, আর্থিক ক্ষমতা জগৎজোড়া বইএর তুলনায় স্বভাবতই সীমাবদ্ধ। সম্ভব মতো সব বই - সব বিষয়ের সকল শাখার বই কিনতে হবে. তবু কোনো একটা জায়গায় এসে থামতেই হয়। সেজন্য সব বিষয়ের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এমন বই বেছে বেছে কেনা দরকার। নিম্নমানের পাঠ্যপুস্তকাদি, শস্তা জনপ্রিয় পুস্তক বা অবান্তর সামগ্রী বর্জনীয়। এজন্য অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বা জনগ্রন্থাগার আছে। তবু ভারসাম্য, —অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের আগ্রহ অনুযায়ী প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সাম্য বজায় রাখবার জন্য পাঠ্য পুস্তকের সঙ্গে সঙ্গে সমমানের অন্যান্য বিষয়ের বই রাখতে হয়। রাখতে হয় বিবিধ পত্র-পত্রিকা এবং সকল শ্রেণীর তথ্য সহায়ক পুস্তক। উপরন্তু উচ্চতর শিক্ষার্থী

ও গবেষকদের সুবিধার জন্য নানা শ্রেণীর গ্রন্থপঞ্জী, সাম্প্রতিকতম প্রকাশন, পত্রিকাদির প্রবন্ধসার সংকলন প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে হয়। ব্যবস্থা করতে হয় আলোকচিত্র ও অনুচিত্রণের সহায়তায় প্রয়োজনীয় গ্রন্থ বা গ্রন্থাংশের প্রতিলিপি প্রস্তুতের, আন্তঃগ্রন্থাগার পুস্তক ঋণপ্রকল্পের। মোটকথা, কোনো শিক্ষা প্রকল্পেই বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার পশ্চাৎপদ হবেনা, কোনো প্রকার সাহায্য দানেই কুণ্ঠিত হবেনা, হবেনা পরাঙ্মুখ বা অপারগ।

তাই স্বভাবতই বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাপনার কাজ জটিল। নির্দিষ্ট সাংগঠনিক ছকের মধ্য দিয়ে না চললে জটিলতা বৃদ্ধি পায়। অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ সমস্যা প্রবল নয়, বিস্তৃত গণ্ডীবদ্ধ। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক বিভাগ এবং সেগুলির সীমাও বিস্তৃত। তাই বিধিবদ্ধ নিয়ম প্রয়োজন। এখানে গ্রন্থাগারিক কার্যত অধিকর্তা হলেও একটি সহায়ক সমিতির মুখপাত্র হিসেবে তাঁকে কাজ করতে হয়। বিভিন্ন বিভাগীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কার্য্যকরী সমিতি তৈরি হয়। গ্রন্থাগারিক যদিচ সরাসরি উপাচার্যের অধীনস্থ কর্মী, — বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সংবিধিবদ্ধ কর্মচারী, তবু গ্রন্থাগার সমিতি থেকেই গ্রন্থাগারের নীতি এবং কার্যক্রম স্থির হয়, বিভিন্ন বিভাগীয় খাতে বইপত্র কেনবার আর্থিক মঞ্জুরী অনুযায়ী ভাগ-বাটোয়ারা ও এখানেই হয়। বিশ্ববিদ্যালয়মঞ্জুরী আয়োগ (University Grant Commission) থেকে আর্থিক অনুদানই প্রধান তহবিল। তাছাড়া থাকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিজস্ব তহবিলের কিছু অংশ, এবং নানাবিধ দান বা সাহায্য। গ্রন্থের সঙ্গে জড়িত থাকে গ্রন্থকক্ষ, পাঠকক্ষ, আসবাব প্রভৃতি সরঞ্জাম এবং কর্মীনিয়োগের ব্যাপার। গ্রন্থবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই এ গুলিরও বৃদ্ধি প্রয়োজন। গ্রন্থাগার কোন কোন প্রকল্প নেবে, কোন কোন দিকে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবে তা স্থির করতে হয় এবং সেই অনুযায়ী কর্মী নিয়োগেরও প্রয়োজন পড়েই। গ্রন্থাগার সমিতির সিদ্ধান্তগুলিকে গ্রন্থাগারিক কার্যকর করেন। কিন্তু ভালমন্দ বুঝে আবশ্যকতা বিবেচনা করে রদ-বদল করার ক্ষমতা তাঁর থাকে। গ্রন্থাগারে তিনিই প্রধান, এবং বলতে গেলে, মূল নীতির নির্ধারকও তিনি। দায়িত্ব সর্বাংশে বর্তায় তাঁরই উপরে। পরিচালনার সুবিধার জন্য বিভিন্ন বিভাগে স্বতন্ত্র বিভাগীয় গ্রন্থাগার রাখার প্রয়োজন হয়। কেবল পরিচালনার সুবিধাই নয়, এতে বিভাগীয় শিক্ষার্থীরা উপকৃত হন বেশি। বিভাগের সংখ্যাধিক্যের জন্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে এগুলির যোগাযোগ রক্ষা সমস্যার সৃষ্টি করে।

পরিচালনার সমস্যা, গ্রন্থ-সংগ্রহ সমস্যা। তাই কিছু পরিমাণে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ বা ভাগাভাগি ক'রে দিতে হয়। গ্রন্থক্রয় বিকেন্দ্রিত হলে বই অনাবশ্যকভাবে দ্বিগুণিত ত্রিগুণিত হয়ে যাবার ভয় থাকে—যা'র ফলে অর্থ ব্যয় হয় অনাবশ্যক। উপরন্তু, এ জাতীয় বিকেন্দ্রীকরণের ফলে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পাঠকের বা কর্মীর পক্ষে বিভাগীয় গ্রন্থাগারের সংগ্রহে কোন কোন কোন বই আছে তা জানা কঠিন হয়ে পড়ে। এ জন্য কেন্দ্রীয় সূচীকরণ প্রথা চালু করতে হয়। বিভাগীয় গ্রন্থাগার ছাড়াও প্রতি শিক্ষা বিভাগে পাঠ্য বিষয়ের শিক্ষামণ্ডল (Saminar) সংগ্রহ থাকে,—যার জন্য পরিচালনার এক স্বতন্ত্র ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়।

সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকের কাজ সহজ নয়। সংগঠন ও পরিচালনা দৃঢ় করবার জন্য উপগ্রন্থাগারিক এবং সহ গ্রন্থাগারিক নিয়োগেথ প্রয়োজন ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক, উপগ্রন্থাগারিক এবং সহগ্রন্থাগারিদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধি এবং গ্রন্থাগারবৃত্তির উচ্চতম অভিজ্ঞার অধিকারী হওয়া দরকার। গবেষণার কৃতী ও তাঁদের থাকা উচিত। গ্রন্থাগারিক শিক্ষাদীক্ষায় হবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের সমান। অন্যরাও হবেন অনুরূপ কৃতী পুরুষ। নেতৃত্ব করবার মতো ব্যক্তিত্ব ও থাকা দরকার। সমগ্র জ্ঞানজগৎ সম্পর্কে এবং সাম্প্রতিকতম আবিষ্কার বা গবেষণা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকতে হয়। প্রশ্নের জট ছাড়াতে, পরিচালনার গিঁট খুলতে হয় ব'লে প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব এবং ধৈর্য্য গ্রন্থাগারিকদের পক্ষে প্রধান গুণ। নিজের গ্রন্থাগারটি যেমন তাঁর নখদর্পণে থাকা কর্তব্য তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কানুন, রীতি নীতিও থাকা উচিত তাঁর নখ দর্পণে প্রশাসনিককর্মে যেমন তাঁর দক্ষতা থাকা কর্তব্য, তেমনি শিক্ষণ কর্মেও তাঁকে অভিজ্ঞ হতে হবে। শিক্ষার্থীদের তিনি বন্ধু ও শিক্ষক, অধ্যাপকদের তিনি সুহৃদ ও সহায়, প্রশাসনযন্ত্রেও তিনি বিশেষ বিশিষ্ট।

(৬ষ্ঠ) বিশেষ গ্রন্থাগার। ব্যবহারিক দিকের বিচারে গবেষণা গ্রন্থাগারকেও বিশেষ গ্রন্থাগারের পর্যায়ে ফেলা উচিত। সাধারণ বিচারে দেখা যায়, গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলি যে ভাবে বিশেষ শিক্ষা কোণ নিয়ে কাজ করে, অন্যান্য সংস্থা গুলির মধ্যেও মূলত সেদিকে লক্ষ্য থাকে। বিশেষ গ্রন্থাগার সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট হতে পারে, বাণিজ্য বা ব্যবসায় সংক্রান্ত হতে পারে. আবার একেবারেই স্বতন্ত্র ধরণের হতে পারে।

প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক গ্রন্থাগার উচ্চশিক্ষা বা গবেষণা বিষয়ক এবং বৃত্তিগত ( professional ) বিষয়ের চর্চাকেন্দ্র হয়। সরকারী গ্রন্থাগারের সংযুক্তি বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগের সঙ্গে। ব্যবসায় সংস্থার গ্রন্থাগার বাণিজ্যিক তথ্য, প্রয়োগশিল্প সম্পর্কিত এবং শিল্প-গবেষণা বিষয়ক। স্বতন্ত্র ধরণের গ্রন্থাগার বলতে হাসপাতাল, কারাগার প্রভৃতির গ্রন্থ সংগ্রহ বোঝায়। এগুলির ক্রিয়াক্রম বিবিধ তথ্যমূলক গ্রন্থ ও পত্রিকা এবং পুস্তক বহির্ভূত তথ্য সামগ্রীর সংগ্রহ, এবং, বলা বাহুল্য, সেগুলির ব্যবহারের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া। অর্থাৎ, যে গ্রন্থাগারের যেমন চরিত্র, যা'র যে ধরণের পাঠক শ্রেণী, তা'র অনুকূলে প্রয়োগ ও বিন্যাস। এ জাতীয় গ্রন্থাগারের বিশেষত্ব অবস্থানগত, —বৃহৎ সংস্থার অঙ্গ হিসেবে, এবং স্বভাবতই নির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রয়োজনের বাইরে এগোয় না, তবে প্রয়োজনের ক্ষেত্রটুকু যথাসম্ভব ব্যাপ্ত ক'রে দেয়। সদস্যরাও বিশেষ শ্রেণীর, —নিজ নিজ সংস্থার অন্তর্ভুক্ত। আকারে ছোট, কিন্তু চোখা চোখা বই নিয়ে কারবার। নিজ নিজ বিষয়গত তথ্যাদি সংরক্ষণ ও বিতরণে এদের কর্মপর্ব বিশিষ্ট, পুঙ্খানুপুঙ্খ। প্রগতিশীল আধুনিক জীবনের ও জগতের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগারের যে-বিবর্তন জ্ঞানের বিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে চলে, বিশেষ গ্রন্থাগার তারই প্রতীক। গ্রন্থ সংগ্রহের বাইরেও গ্রন্থাগারের প্রকৃত কাজের অপর যে ক্ষেত্র আছে তারই প্রকল্প। যে বিশেষ শ্রেণীর জন্য এই গ্রন্থাগার তাদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে সেই অনুযায়ী কাজের যোগান দিতে হয় গ্রন্থাগার কর্মীদের। এ জন্য আলোকচিত্রে নকল তৈরি, বিবিধ ভাষা থেকে অনুবাদ, প্রবন্ধসার সংকলন, ইত্যাদি বিচিত্রতর কাজ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। সে জন্যই বিশেষ গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থাগারিকেরও নিজস্ব বিষয়ে বিদ্বান ও জ্ঞানবান হওয়া দরকার। তাঁর কর্ম-পরিধি সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন না হলে সুষ্ঠুভাবে কর্তব্য সম্পাদন কঠিন হয়ে পড়ে। গ্রন্থাগার কর্মীদেরও নানাবিধ প্রযুক্তি শিল্পে পারদর্শিতা প্রয়োজন। সেবার কাজে গ্রন্থসেবীর সঙ্গে নিজেকে একাত্ম ক'রে না দিলে বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা। গ্রন্থাগারিকতার আধুনিক রূপান্তবর্তন যে পাণ্ডিত্য, প্রযুক্তি কুশলতা এবং মানবিকতার সংমিশ্রন, তা'র পরিপূর্ণ প্রকাশের ক্ষেত্র বিশেষ গ্রন্থাগার। কালের সঙ্গে, জ্ঞান বিস্তারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলাই বিশেষ গ্রন্থাগারিকের কৃতিত্ব। এযুগ বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষত্ব অর্জনের যুগ। এবং স্বীয় বিশেষত্বের ক্ষেত্রগুলির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে

অন্যান্য বিষয় ক্ষেত্রের সংযোগ রক্ষা আধুনিক যুগের অগ্রগতির পক্ষে অপরিহার্য। ক্রিয়াপর্বের মধ্যে পড়ে প্রাচীন ও বর্তমান কালের পুস্তক ও পুথি সংগ্রহ, পত্রিকা সংগ্রহ, প্রবন্ধের বিষয়ানুগ তালিকা প্রণয়ন ও সার-সংকলন, প্রযুক্তিবিদ্যা ও প্রয়োগ শিল্প সংক্রান্ত সামগ্রীর সংগ্রহ ও বিন্যাস, সরকারী প্রতিবেদন, বিবরণী ও নথিপত্রাদির সঞ্চয়, বিবিধ গবেষণা পত্রাদির সঞ্চয়, আলোকচিত্রণ, অনুচিত্রণ, ইত্যাদি। বিশেষ গ্রন্থাগারে 'বিশেষ' কথাটির উপরে জোর পড়ে, এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গিই এর ক্রিয়াপর্বের নির্ধারক।

## (৪) গ্রন্থাগারিক : দায়িত্ব ও কর্মনীতি

আধুনিক সমাজ পরিমণ্ডলে গ্রন্থাগারিকদের কর্মী হিসেবে অতিশয় সচেতন হতে হয়। বিশ্বের চিন্তা ও কৃতী নানাভাবে আবদ্ধ থাকে গ্রন্থাগারে। জনশিক্ষার জীবন্ত ধারার প্রসারেও গ্রন্থাগার। এর আগে সমাজে ও জীবনেও গ্রন্থাগারের স্থান, বিভিন্ন ক্রিয়াপর্ব ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেনীর গ্রন্থাগারধ্যক্ষের কার্যক্রম এবং কুশলতা সম্পর্কেও বলা হয়েছে। এবারে তাঁর কর্মনীতি ও দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব ত্রিবিধ ; সংগঠন ও পরিচালনা, পাঠকদের সেবা, এবং কর্মী সহযোগ। সংগঠন ও পরিচালনার কাজ বিধিবদ্ধ অথচ উদার করে তুলতে হয়, যাতে আইন-কানুনের চাপ বাধা নিষেধে ভারাক্রান্ত হয়ে না ওঠে অথচ নিয়মানুবর্তিতা বজায় থাকে। পাঠকদের সেবাকল্পে একদিকে যেমন তাঁদের সুযোগ-সুবিধার দিকে লক্ষ রাখতে হয়, প্রয়োজন অনুযায়ী জ্ঞান সম্পদ সংগ্রহ ও বিন্যাসের ব্যাপারে সচেতন থাকতে হয়। অন্য দিকে তেমনি গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের ক্ষয়-ক্ষতি রোধের দিকে নজর রাখতে হয়, নিয়ম-শৃঙ্খলা যাতে বজায় থাকে সেদিকে লক্ষ রাখতে হয়। কর্মীসহযোগের দিকটিতে কেবল মাত্র কর্তব্য সম্পাদনের অচলায়তন গ'ড়ে না তুলে তাঁদের ব্যাপক সহযোগীতায় সকল কাজ যৌথভাবে যৌথ দায়িত্বে সম্পন্ন করার প্রচেষ্টা প্রয়োজন। 'দশে মিলে করি কাজ।' প্রধান গ্রন্থাগারিক উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রশাসনিক ব্যাপারের জন্য দায়ী থাকেন। পরিচালন এবং শিক্ষা সংযোগের প্রকল্প গ্রহণে সুষ্ঠু নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা তাঁর থাকা দরকার। গ্রন্থাগারের কর্মী নির্বাচনে তিনিই প্রধান অংশ নেন। সুতরাং তাঁর গৃহীত নীতির পরিপ্রেক্ষিতে

মনোমত এবং উপযুক্ত কর্মী নিয়োগ করে, সকলে মিলে-মিশে ভাগাভাগি ক'রে দায়িত্ব বহন করা বিধেয়, কেননা তাঁর একার পক্ষে সর্ববিষয়ে ধারণা যেমন সম্ভব নয় তেমনি সকল দিকে পুরোপুরি নজর দেওয়াও সম্ভব নয়। এ জন্য গ্রন্থাগারিকের এবং গ্রন্থাগারের অপরাপর দায়িত্বশীল কর্মীদের বৃত্তিগত নীতি মেনে চলা প্রয়োজন। চাকুরী সূত্রে গ্রন্থাগারিককে যেমন কতকগুলি গতানুগতিক কর্মনীতি মেনে চলতে হয়, তেমনি বৃত্তিগত সেবা সূত্রে কতকগুলি মানবিক নীতিও মেনে চলা উচিত। অন্যবিধ কাজের সঙ্গে এই খানে তাঁর প্রভেদ। যে সকল সহজ সূত্র বা নীতি মেনে চলা যায় তা নিচে লিপিবদ্ধ হল।

(১) আদর্শ গ্রন্থাগারিকের একটা রূপ মনের মধ্যে রেখে কাজে প্রবৃত্ত হলে ভাল। পাঠক সাধারণের সেবার জন্য তাঁদের বিদ্যাবত্তা ও রুচির মান সম্পর্কে যথাসম্ভব স্পষ্ট ধারণা নিয়ে চলার চেষ্টা করা উচিত।

(২) জনগণের জীবনকে গ্রন্থাগার উন্নত ক'রে তুলতে পারে এই প্রত্যয় তাঁর থাকা দরকার, বিশ্বাস রাখা দরকার যে মানুষ ও সমাজের মঙ্গল সাধনের জন্যই গ্রন্থাগার। ধন্যবাদ বা সাধুবাদের প্রত্যাশী না হয়ে তাঁকে এই কাজে ব্রতী হতে হবে।

(৩) ক্রিয়াপর্ব সূত্রে তাঁর অবহিত থাকা কর্তব্য যে গ্রন্থাগারিকের পদটি এযুগে রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক এবং প্রযৌক্তিক জটিলতায় অবস্থিত। এবং এই সবের মধ্যে দোলায়িত না হয়ে তাঁকে জ্ঞান বৃদ্ধির নীতিতে অবিচল থাকতে হবে।

(৪) আমাদের সামগ্রিক জীবনে শিক্ষার সকল ধারা স্বতন্ত্রভাবে থেকেও এক হয়ে মিশে যায়। গ্রন্থাগারিকের চিত্তে এই বোধ সুসংহতভাবে যদি বজায় থাকে তাহলে রুচি ও সংস্কৃতির প্রসারে সহায়তা করে।

(৫) গ্রন্থাগারিক সকল রকম রীতি, নীতি, ধর্ম, সংস্কার, মতবাদ সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকবেন। চিন্তা ক্ষেত্রের সকল দিকই তিনি পাঠকদের জন্য উন্মুক্ত রাখবেন।

(৬) চিন্তা ও কর্মজগতের স্বাধীনতায় তিনি হস্তক্ষেপ করবেন না। অধ্যয়ন ও চিন্তনের স্বাধীনতা, বাক্ স্বাধীনতা, শিক্ষণের স্বাধীনতা, প্রকাশের এবং প্রচারের স্বাধীনতার তিনি হবেন প্রবক্তা।

(৭) গ্রন্থাগারিক এই প্রত্যয় নিয়ে চলবেন যে গ্রন্থাগার সমাজের পক্ষে অপরিহার্য। নিজের সম্পর্কে সামাজিক মর্যাদাবোধ তাঁর থাকা দরকার।

বিশ্বাস দরকার যে গ্রন্থাগার যেমন সমাজের ভালর জন্য, তিনি নিজেও তেমনি গ্রন্থাগারের ভালর জন্য আছেন। এক দিকে প্রয়োগ-নৈপুণ্য অন্যদিকে মানবিক বোধ নিয়ে তাঁকে কাজ করে যেতে হবে।

(৮) গ্রন্থাগারিক নিজেও পাঠক হবেন এবং পাঠকদের আনুগত্য করবেন। এ নিয়ে কোনো মোহ বা বড়াই থাকা তাঁর উচিত নয়।

(৯) কেবলমাত্র পাঠকদের প্রয়োজন মেটানোতেই গ্রন্থাগারের কাজ শেষ হয় না, পাঠক তৈরি করতে হয়। প্রয়োজন বা চাহিদা সৃষ্টি করাও গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য। মনের শূন্যতা পূরণ করার জন্য সর্বসাধারণের কাছে গ্রন্থাগারকে জাহির করতে হয়।

(১০) গ্রন্থাগার জ্ঞান ও তথ্যকেন্দ্র। পাঠকরা অভিরুচি অনুযায়ী সেই জ্ঞান ও তথ্য আহরণ করেন। গ্রন্থাগারিকের হাতে সেই জ্ঞান ভাণ্ডারের চাবিকাঠি। যাবতীয় প্রযুক্তি প্রকল্প তারই সহায়ক। ব্যক্তি হিসেবে তাঁর নিজস্ব অস্তিত্বের কথা ভুলে গিয়ে তাঁকে পাঠকদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে হবে। ব্যক্তিগতজ্ঞানের প্রক্ষেপই তাঁর ব্যক্তিত্বের একমাত্র পরিচয় হবে। সমস্যা সমাধানে বা সূত্র আবিষ্কারে তিনি তাঁর ব্যক্তিত্ব—ব্যক্তিগত জ্ঞানের ভাণ্ডার কাজে লাগাবেন।

গ্রন্থাগারিকের বৃত্তিগত নীতি এমন কিছু নয় যেটা হিসেব ক'রে মেনে চলতে হবে। সহানুভূতি এবং সমমর্মিতাই তাঁর প্রধান গুন। সমাজের সর্ব-স্তরে, জ্ঞানের সকল পর্য্যায়ে বিশ্বের সব ব্যাপারে তাঁর সচেতনতা তাঁকে গ্রন্থাগারবৃত্তির এক নূতন দিগন্তের সন্ধান দেবে যার ফলে ঘটতে থাকবে প্রতিভার উন্মেষ।

## (ঘ) গ্রন্থাগার সংগঠনের ভূমিকা

গ্রন্থাগার সংগঠন এবং গ্রন্থাগার পরিচালনা পরস্পরের পরিপূরক। এমন কি অনেক সময় এ পার্থক্য সুপরিস্ফুট নয়। একই গ্রন্থাগারিক যুগপৎ দুয়ের সংগঠন ও পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেন। কিন্তু, সংগঠন ও পরিচালনা এক ধরণের ব্যাপার নয়। পরিচালনার প্রশ্ন তখনই ওঠে যখন কোনো কিছু সংগঠিত হয়। সংগঠন কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রথম পদক্ষেপ। আগে সৃষ্টি, পরে সংরক্ষা। সংগঠন দ্বারা

গ্রন্থাগারের সৃষ্টি হয়, পরিচালনার কাজ সংরক্ষা। সংগঠনের কাজ যেখানে শেষ, পরিচালনার কাজ সেখানে সুরু। গ্রন্থাগার সংগঠন প্রকল্প গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি সংস্থা গড়ে তোলে যার কর্মীরা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে সমবেতভাবে কাজ করে যান। গ্রন্থাগারের কাজ কিভাবে চলবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং বিধিবদ্ধ পদ্ধতি প্রস্তুত করে তা'র জন্য প্রয়োগ সূত্র রচনাই এর ভিত্তি। গ্রন্থাগার ভবন তৈরির ব্যবস্থা, কার্য নির্বাহক সমিতি গঠন, গ্রন্থাগারিক ও দায়িত্বশীল কর্মী নিয়োগ এবং গ্রন্থাগার পরিচালনার ব্যবহারিক নীতি নির্ধারণের ভার নেন সংগঠন কর্তৃপক্ষ। গ্রন্থাগারের যাবতীয় বিভাগ এবং ক্রিয়াপর্বের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে দেয় সংগঠন প্রকল্প। তারপরে, দৈনন্দিক যাবতীয় কাজ শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে নির্বাহ করার প্রকল্পই গ্রন্থাগার পরিচালনা।

## (১) গ্রন্থাগার ভবন : পরিকল্পনা ও নির্মাণ

গ্রন্থাগার সমাজের বিশিষ্ট সংস্কৃতি কেন্দ্র, তাই গ্রন্থাগার গৃহ তৈরি করার সময় স্থানীয় জনগণের সুবিধা অসুবিধার কথা বিবেচনা করে দেখতে হয়। গ্রন্থগৃহ আড়ম্বর হীন, কাজের উপযোগী এবং সম্প্রসারণশীল হওয়া দরকার। কয়েকটি কথা মনে রেখে গৃহ নির্মান করতে হয়। (১) গ্রন্থাগার ভবন গ্রন্থ সংক্রান্ত কাজের উপযোগী হওয়া দরকার। (২) কোন শ্রেণীর জন-সমাজ নিয়ে গ্রন্থাগার এবং এটির কাজ কোন ধরণের হবে সেই পরিপ্রেক্ষিতে গৃহের পরিকল্পনা করতে হয়। (৩) বাইরের চেহারাটা দেখতে কেমন হবে তার উপরে গুরুত্ব না দিয়ে আভ্যন্তরীন ব্যবস্থা কেমন হবে সে কথা সর্বাগ্রে বিবেচ্য। নয়নরঞ্জন স্থাপত্যের মোহে আভ্যন্তরীন বিন্যাস ক্ষুণ্ণ করলে চলবেনা। (৪) ভবনের নক্সা তৈরি করবার সময় ভবিষ্যৎ বিস্তৃতি ও স্ফীতির কথা মনে রাখা আবশ্যক। (৫) কাজের ঘর ও পড়ার ঘরগুলির সজ্জা অনাড়ম্বর হওয়া বাঞ্ছনীয়। (৬) পরিকল্পনা এমন হওয়া উচিত যাতে পরিচালনার ব্যয় বেশী না হয়। (৭) পাঠক সাধারণের ব্যবহার্য অংশের বিন্যাস এমন হওয়া দরকার যেন স্বল্প সংখ্যক কর্মী দিয়েই তত্ত্বাবধানের কাজ চলে। (৮) পুস্তকমঞ্চ থেকে পাঠকক্ষাদি যাতে দূরবর্তী না হয়ে পড়ে সেভাবে নক্সা করা কর্তব্য। (৯) সর্বোপরি, এ কথা মনে রেখে চলতে হবে যে গ্রন্থাগারে সংগৃহীত সামগ্রীর

আকৃতি ও প্রকৃতি দ্বারা পরিকল্পনা, পরিচালনা এবং যাবতীয় প্রযুক্তি বিভাগ প্রভাবিত হয়।

এই সাধারণ সূত্রগুলির সঙ্গে জনগ্রন্থাগার এবং বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রকৃতি কিভাবে জড়িত তারও কয়েকটী সূত্র অনুধাবন যোগ্য।

সাধারণ, গ্রন্থাগারের পরিকল্পনাকালে ভাবতে হয়, (১) পাঠক সাধারণ, গ্রন্থাগার কর্মী এবং মালপত্র যাতায়াতের জন্য স্বতন্ত্র প্রবেশ পথ রাখা আবশ্যক। বক্তৃতা কক্ষ বা বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প থাকলে, কিম্বা শিশুবিভাগ থাকলে সে সব ঘরের সঙ্গে মূল গ্রন্থ সংগ্রহের কোনো যোগ না রাখাই বাঞ্চনীয়। (২) পাঠক সাধারণের ব্যবহার্য বিভাগগুলি যথাসম্ভব কাছাকাছি রাখা বাঞ্চনীয়। পরস্পর সম্পৃক্ত বিভাগগুলি পাশাপাশি থাকলে পাঠকক্ষ অথবা গ্রন্থকক্ষাদির মধ্য দিয়ে কর্মীদের যাতায়াত নিয়ন্ত্রিত থাকে। (৩) বিভিন্ন বিভাগে যাতায়াতের রাস্তা এবং দরজা পৃথকভাবে বিন্যস্ত হওয়া কাম্য। এতে এক বিভাগের কাজ অন্য বিভাগের দ্বারা বিঘ্নিত হবেনা। (৪) বইপত্রাদি বিবিধ সামগ্রী গ্রন্থকক্ষে বা এখানে ওখানে নিয়ে যাবার পথ সরলরেখায় বিন্যস্ত হওয়া উচিত। এতে কাজের গতি ত্বরিত হবে এবং পরিশ্রমেরও লাঘব হবে। (৫) কর্মীদের প্রকোষ্ঠ এবং লেন-দেন প্রভৃতি অংশের মধ্যে সহজ সংযোগ ব্যবস্থা রাখা কর্তব্য।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পরিকল্পনা কালেও কয়েকটি বিশেষ দিক বিবেচনা করতে হয়। যেমন, সাধারণ শিক্ষা ও শিক্ষণ, অধ্যয়ন ও অনুষদ ( faculty ) সম্পর্ক, ছাত্রদের স্থান ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব, গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ প্রকল্প, ইত্যাদি। এগুলি মনে রেখে পাঠকক্ষ এবং গ্রন্থকক্ষের সংস্থান, প্রযুক্তি বিভাগের বিস্তৃতি বা বিভক্তি, বিভাগীয় গ্রন্থাগার ও পাঠমণ্ডল ( Seminar ) গ্রন্থ সংগ্রহ তথ্যগ্রন্থ, পঞ্জী ইত্যাদির ব্যবস্থা ও অবস্থান প্রভৃতি বিশেষ অংশ এবং প্রকল্পের জন্য পরিকল্পনাই সংস্থান সম্ভব।

গ্রন্থাগার ভবন খোলামেলা ঝকঝকে তকতকে হওয়া উচিত। ঘর যদি চারিদিকে আবদ্ধ, অন্ধকার বা স্যাঁতসেঁতে হয় তাহলে একদিকে যেমন বইগুলির আয়ু কমে যাবে—পোকায় কাটবে, তেমনি কর্মীদেরও মেজাজ বিগড়ে যাবে, কাজে মন বসবেনা, স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাবে। উপরন্তু আলো, পাখা, মেরামতি ইত্যাদির খরচ হতে থাকবে ক্রমাগত। কর্মীরা অসুস্থ হয়ে পড়লে সেই খাতেও খরচ বাড়বে। প্রারম্ভিক ব্যায়সংকোচের পরিণামে ভবিষ্যৎ ব্যয়বৃদ্ধিই হবে শুধু। কর্মীদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর দিলে

তাদের মন প্রফুল্ল হবে, কাজের ক্ষমতাও বেড়ে যাবে।

গ্রন্থাগার ভবন শীত-তাপ নিয়ন্ত্রিত হলে ভাল। বিশেষ করে গ্রন্থকক্ষটি শীত-তাপ নিয়ন্ত্রণে থাকলে বই পত্রের আয়ু বাড়ে। এদেশে আবহাওয়ার ত্বরিত তারতম্য এবং ধূলোবালির জন্য বই বড় তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। পুথি সংরক্ষণ এবং অনু-আলোকচিত্রণ, স্বর-ধারক প্রভৃতির জন্য এই বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। অন্যথায় গ্রন্থকক্ষের জানালাগুলি একটু উচুতে তৈরি করা উচিত, যাতে বইএর গায়ে প্রত্যক্ষভাবে হাওয়া বা রোদ এসে না পড়ে। পুস্তকমঞ্চ জানালার সঙ্গে সমান্তরালে না রেখে পাশে রাখতে হয়। গ্রন্থকক্ষটি গ্রন্থাগার ভবনের উত্তরাংশে স্থাপন করা সমীচিন। তাহলে প্রত্যক্ষভাবে রোদ বা ধূলো বালি ভরা বাতাস আসবেনা, উত্তরের আলোও পাওয়া যাবে। কক্ষে কৃত্রিম আলোর প্রয়োজন অবশ্যই হয়। এই আলোর অবস্থান এমন হওয়া দরকার যাতে সবদিকে সমান ভাবে আলো ছড়ায়, আসবাব প্রভৃতির ছায়া এসে বইএর তাকে না পড়ে, এবং আলোর উত্তাপও বইগুলিকে স্পর্শ না করে। দেয়ালের এবং আসবাব পত্রের রং যেন উগ্র না হয়, তাতে চোখ পীড়িত হতে পারে। হালকা ছাই রং বা ঘি রং উপযুক্ত। খুব চকচকে বার্ণিশ করা কাঠও না থাকাই ভাল। ঘরগুলির মেঝে যেন স্যাঁৎসেঁতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। মেঝেতে গালিচা জাতীয় কিছু বিছিয়ে রাখা উচিত, —তার ফলে হাঁটাচলার শব্দ বাধার সৃষ্টি করেনা। আভ্যন্তরীন দরজাগুলিতে নিচের চৌকাঠ যেন না থাকে, —তা'তে চলতে ফিরতে যেমন ঠোক্কর খাওয়ার সম্ভাবনা তেমনি ঠেলাগাড়ীতে ক'রে বই নিয়ে যাওয়া আসার অসুবিধা হয়।

এবারে গ্রন্থাগার ভবনের অবস্থান প্রসঙ্গে আসা যাক। গ্রন্থাগার ভবনের জমি নির্বাচনে বিশেষ বিবেচনার প্রয়োজন। প্রথমত, জমির অবস্থান ও পরিবেশ খোলামেলা হওয়া দরকার। দ্বিতীয়ত, খোলামেলা হলেও যেন বিচ্ছিন্ন না হয়, —সকলের পক্ষে যাতায়াত যেন সহজ হয়। তৃতীয়ত, চলাচলের প্রধান পথের খুব কাছে যেন না হয়। লোকালয়ের গোলমাল থেকে যেন মুক্ত হয়, —অথচ লোকালয়ের থেকে যেন খুব বেশি দূর হয়ে না পড়ে।

এই তিনটি শর্তই বিচার সাপেক্ষ। জনগ্রন্থাগারের পক্ষে চতুর্থ আরেকটি শর্ত, জমিটি যেন আইনগত জটিলতা বা বাধা নিষেধ থেকে মুক্ত হয়। জনগ্রন্থাগার শহরের কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত হলেই সবচেয়ে ভাল হয়। কেন্দ্রস্থল

শহরে গোলমাল থেকে মুক্ত হওয়া কঠিন। তাই এমন কোনো জায়গা বাছাই করা উচিত যেটা কেন্দ্রস্থলে না হলেও যেন এমন দূরত্বে না হয় যাতে সাধারণের যাতায়াত কষ্টকর হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের পক্ষেও এই কেন্দ্রবর্তীতার কথা বিবেচ্য। কেননা, বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দি বিভিন্ন পাঠানুষদ এবং বিভাগ নিয়ে বেশ সুবিস্তীর্ণ হয়। এজন্যই সকলের সুবিধার কথা ভেবে গ্রন্থাগার ভবনের অবস্থান নির্ণয় প্রয়োজন।

জমি নির্বাচনে পঞ্চম শর্ত, জায়গাটি যেন সংকীর্ণ না হয়, চারপাশে অনেকটা খোলা জমি যেন থাকে। এতে গ্রন্থাগারে পর্যাপ্ত পরিমাণে আলো বাতাস আসবে। গ্রন্থাগার ক্রমে বড় হয়ে উঠলে নূতন ঘর বাড়াতে অসুবিধা হবেনা। ঘর বাড়ানোর ব্যবস্থা অবশ্য দু'রকমের, পাশাপাশি এবং উপরে নিচে। উপরের দিকে তলার পরে তলা সংযোজনের যেমন সুবিধা অসুবিধা আছে, পাশাপাশি ঘরের পর ঘর বাড়ানোরও তেমনি সুবিধা অসুবিধা আছে। ভবন পরিকল্পনার প্রারম্ভেই এ বিষয়ে নীতি গ্রহণ করা সঙ্গত। বাড়ি যেদিকেই বাড়ুক, চারপাশে খোলা জমি থাকার আরেকটি গুণ কাছাকাছি অন্য কোনো বাড়ি তৈরি হবে না, গ্রন্থাগারের নিরালা ভাব বজায় থাকবে। কৃত্রিম আলো হাওয়ার বদলে ঘরগুলিতে যথাসম্ভব প্রাকৃতিক আলো বাতাস আসাও বাঞ্ছনীয়।

এবারে গ্রন্থকক্ষ প্রসঙ্গ। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই গ্রন্থমঞ্চের কথা ওঠে। আজকাল প্রমান মাপের যে সকল ইস্পাতের তাক তৈরি হচ্ছে সেগুলির পাশের দিকে পর্যায়ক্রমে ফুটো করা থাকে, যাতে বইএর আকার অনুযায়ী থাকগুলি উচুনিচু করা যায়। একেকটি মঞ্চ ৭´ ফুট উচু, ৮½" ইঞ্চি গভীর, ৩´ ফুট চওড়া এবং দু'পাশে মিলে ১″ ইঞ্চি পুরু হয়ে থাকে। প্রতি মঞ্চে পাঁচটি ক'রে থাক, নিচেরটি মাটি থেকে ৬″ ইঞ্চি উপরে এবং উপরেরটি তুঙ্গ থেকে ৬″ ইঞ্চি নিচে লাগানো থাকে। এই রকম তিনটি তাক বা মঞ্চ এবং তা'র পিঠোপিঠে আরো তিনটি তাক নিয়ে সাধারণত একটি মঞ্চস্তম্ভ তৈরি হয়। অর্থাৎ মঞ্চস্তম্ভের দুই মুখ খোলা থাকে এবং বাকি দুই দিক পরস্পর সঙ্গে থাকে বিলগ্ন। এবং সেখানে—মাঝখানে থাকে ইস্পাতের পাতের আড়াল। এইভাবে একেকটি মঞ্চ ৭´× ১½´× ২″× ৩´ মাপের দাঁড়াচ্ছে। মিলিমিটারের হিসাবে ২২০০ × ৪৫০ × ৫০ × ৯২৫। এ রকম চারটি মঞ্চস্তম্ভ নিয়ে গ্রন্থকক্ষের একেকটি মঞ্চসারি তৈরি হয়। একেকটি তাকে ৭টি ক'রে থাক থাকলে প্রতি

মঞ্চসারির হিসেবে ৮৪ টানা ফুট বা ২৫.৯ মিটার থাক পাই, —যে জায়গায় প্রায় ১০০০টি বই রাখা চলে। দুই মঞ্চস্তম্ভের মাঝে যাতায়াতের জন্য ৪½ ফুট বা ১.৩৫ মিটার রাস্তা থাকা দরকার। তাহলে, মঞ্চের সামগ্রিক মাপ এবং যাতায়াতের টানা পথের মাপ সমেত ১০০০টি বইএর জন্য ৩৯´ বর্গফুট বা ৩.৬ বর্গমিটার জায়গা লাগছে। অর্থাৎ প্রতি বর্গফুটে ২৫টি ক'রে বই। এই হিসাবে ১২০০০ গ্রন্থের জন্য লাগছে ১২টি মঞ্চসারি, —যার জন্য জায়গা লাগছে ৫০০ বর্গফুট। এই হিসাব দেয়ালের লম্বালম্বি খাড়ি পথের হিসাব ছাড়া। খাড়িপথ সুদ্ধ ধরলে ১৫টি বইএর জন্য লাগে ১´ বর্গফুট। সুতরাং, সর্বসাকুল্যে ১২০০০ গ্রন্থের জন্য কক্ষের মাপ হওয়া উচিত ৮০০´ বর্গফুট। গ্রন্থকক্ষ যদি মোটামুটিভাবে ৭৮´×১১´ ফুট, অথবা ৪২´×১৮´ ফুট মাপের হয় তাহলে ১২০০০ বইএর স্থান সঙ্কুলান হতে পারে। মোটামুটিভাবে সওয়া তিনফুটে এক মিটার। এই হিসেবে এটিকে মিটারে পরিবর্তিত ক'রে নেওয়া চলে।

গ্রন্থকক্ষ গ্রন্থাগার ভবনের উত্তর দিকে হওয়া বাঞ্ছনীয় সেকথা আগেই বলা হয়েছে। তাহলেই, কক্ষটি যদি পূব থেকে পশ্চিমে প্রলম্বিত হয় তবে মঞ্চ সংস্থান হবে উত্তর থেকে দক্ষিণে বিন্যস্ত। এবং এভাবে সংস্থানই যুক্তিযুক্ত, তাতে সব কটি মঞ্চসারিই সমান আলো হাওয়া পেতে পারে। জানালা বরাবর পূব থেকে পশ্চিমে টানাভাবে থাকবে যাতায়াতের খাড়িপথ, এবং দেওয়ালের সঙ্গে সমকোণিক ভাবে থাকবে মঞ্চ সারি। দুই মঞ্চ সারির মধ্যবর্তী উত্তরে দক্ষিণে প্রলম্বিত পথ থাকবে জানালার সমকোণে।

বইএর তাক ইস্পাতের বা কাঠের হতে পারে। এককালে কাঠই প্রধান বা একমাত্র উপকরণ ছিল। কাঠ ও ইস্পাত মঞ্চের তুলনামূলক বিচার করা যাক।

কাঠের মঞ্চ : (১) কোণাগুলি চোখা থাকেনা বলে বইপত্র জখম হবার সম্ভাবনা থাকেনা। (২) আবহাওয়া আর্দ্র বা স্যাঁৎসেঁতে হলে মরচে পড়ার ভয় থাকেনা। এদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এটি বিবেচ্য। (৩) নির্দেশক ফলক বা পত্রক ইচ্ছেমতো আলপিন দিয়ে লাগানো যায়। (৪) প্রয়োজন পক্ষে সহজেই মাপ ছোট বড় করা চলে। (৫) মঞ্চের নক্সা খুশি বা রুচিমতো করা চলে। (৬) পোকায় কাটবার ভয় থাকে। (৭) আগুনে পুড়বার ভয় থাকে।

ইস্পাতের মঞ্চ : (১) কাঠের চেয়ে কম ব্যয়সাপেক্ষ। (২) থাকগুলো ইচ্ছেমতো নিয়ন্ত্রিত করা চলে। (৩) কাঠের চেয়ে পাৎলা হয় ব'লে আলো-হাওয়া খেলে বেশি। (৪) সহজেই ধুলোবালি ঝাড়া চলে। (৫) আগুনে পোড়ে না। (৬) থাকগুলো বেশি পুরু হয় না ব'লে বই বেশি ধরে। বইএর ভারে নুয়ে যাবার ভয় কম। (৭) পোকায় কাটে না। (৮) সমগ্র মঞ্চ সারি একই ধরণের হয়, রং করা চলে ইচ্ছেমতো।

এরপরে পাঠকক্ষ বিন্যাসের কথায় আসা যাক। পাঠকক্ষে চেয়ার, টেবিল এবং যাতায়াতের রাস্তা সমেত ধ'রে প্রতি পড়ুয়ার জন্য ১২´ বর্গফুট জায়গা হিসেবে ধরা সঙ্গত। উদাহরণ হিসেবে ৪০ জন পড়ুয়ার জন্য ৪৮০´ বর্গফুট বা ১০৮ বর্গমিটার জায়গা লাগবে। পাঠ কক্ষে কিছু ত্বরিৎ তথ্য পুস্তক রাখতে হয়, তা'র জন্য দু'টি মঞ্চ সারি রাখলে তাইতে ১০০´ বর্গফুট আন্দাজ জায়গা নেবে। পত্রিকার দাঁড়-মঞ্চ থাকলে সেজন্যও ব্যবহারিক হিসেবে ৪০০´ বর্গফুট জায়গা প্রয়োজন ধ'রে নেওয়া ভাল। এবং, যাতায়াতের কেন্দ্রস্থ রাস্তা যদি টানভাবে রাখতে হয় তাহলে জায়গা লাগবে প্রায় ১২০´ বর্গফুট। সুতরাং, ৪০ জন পড়ুয়ার জন্য দরকার ১১০০´ বর্গফুট মাপের একটি ঘর। অর্থাৎ, প্রতি পড়ুয়ার জন্য ২৭´ বর্গফুট জায়গা। ৬৪½´ × ১৮´ ফুট মাপের একটি ঘর হলেই কাজ চলবে। পাঠকক্ষ পুব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়, তা'তে দক্ষিণ দিক খোলা থাকে।

সাময়িকী বিভাগের পাঠকক্ষ বিন্যাসে পড়ুয়া-পিছু ১২´ বর্গফুট জায়গা হিসাবে ধরা যায়। তথ্য বিভাগে প্রতি পড়ুয়ার জন্য ১৮´ বর্গফুট, এবং যাতায়াতের রাস্তা হিসাবে ধ'রে ৩০´ বর্গফুট জায়গা রাখা সঙ্গত। এই হিসাব ভিত্তি ক'রে পাঠক সংখ্যা অনুযায়ী ঘর তৈরি করা যায়।

এবারে গ্রন্থাগার ভবনের আভ্যন্তরীন বিন্যাস সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক। আভ্যন্তরীন বিন্যাসে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় অলিন্দ-কক্ষের ( foyer )। গ্রন্থাগারের সদর দরজা দিয়ে ঢুকলেই যে প্রশস্ত স্থানে পদার্পণ ঘটে সেটিই অলিন্দ-কক্ষ, এবং এটি গ্রন্থাগারের সকল অংশে যাবার যেমন বারান্দা, – এমনকি দোতালায় যাবার সিঁড়ির ও যেখানে অবস্থিত, তেমনি এই কক্ষ কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় বিভাগেরও কর্মকেন্দ্র। সমগ্র গ্রন্থাগার ভবনের মধ্যে অলিন্দ-কক্ষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এই ঘরেই সর্বাগ্রে পদার্পণ ঘটে ব'লে গ্রন্থাগার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা এখানেই গ'ড়ে ওঠে।

স্থতরাং এটির সংস্থান ও সজ্জা সম্পর্কে বিশেষ যত্ন নেওয়া উচিত। অলিন্দ-কক্ষে যে সব বিভাগ বা কর্মকাণ্ড থাকে সেগুলির পরিচয় নেওয়া যাক। (১) তত্ত্বাবধায়কের আসন ; এখানে পাঠকরা তাঁদের ব্যক্তিগত জিনিষপত্র—যেমন বই, নথি, বটুয়া, ছাতা প্রভৃতি জমা রেখে গ্রন্থাগারে ঢোকেন। (২) প্রদর্শ ফলক, বিজ্ঞপ্তি ফলক ইত্যাদির সংস্থান ; নূতন বইএর বহিরাবরণ প্রদর্শন, গ্রন্থাগার সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতি স্থপরিকল্পিত ভাবে এখানে সজ্জিত থাকে। (৩) স্থচীপত্রকাধারক ; স্থচীকৃত পত্রকের বিবিধ পর্যায়ের বিন্যাস রুচিপূর্ণ প্রথায় এবং আসবাবে রাখা হয়। (৪) পুস্তক ঋণ বিভাগ ; লেনদেন প্রকল্পের সবটাই থাকে এই কক্ষে। সেজন্য বিভাগটির সাজসজ্জায় যত্ন নিতে হয়। উপরন্তু, অপেক্ষমান ব্যক্তিদের জন্য এই কক্ষে বসবার ব্যবস্থা রাখাও বাঞ্ছনীয়।

ভিতরে যাবার অলিন্দ-পথ বা বারান্দা অন্তত ৪´ ফুট বা সওয়া এক মিটার চওড়া হওয়া দরকার। এই পথ কোনো ঘরের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া অনুচিত, স্বতন্ত্র অলিন্দ বাঞ্ছনীয়। মঞ্চকক্ষ অন্যান্য বিভাগের কাছাকাছি কিন্তু স্বতন্ত্র হওয়া উচিত। মঞ্চ সংস্থান পাঠকক্ষের এবং অলিন্দ কক্ষের—অর্থাৎ স্থচীপত্রকাধারার গুলির থেকে বেশী দূরে না হলেই ভাল। গ্রন্থাগারিক, উপগ্রন্থাগারিক, প্রযুক্তি বিভাগ, দপ্তর প্রভৃতি কার্যকর কক্ষ পাশাপাশি বিন্যস্ত করা বিধেয়। সমগ্র বিন্যাস এমন হবে যেন প্রতি অংশেই সহজে যাতায়াত করা যায়। গ্রন্থাগারিকের সঙ্গে প্রযুক্তি বিভাগের, এবং তার সঙ্গে মঞ্চকক্ষাদির যোগাযোগ সব সময়েই প্রয়োজন। তথ্য বিভাগ ও সাময়িকী বিভাগ দুটি স্বতন্ত্রভাবে অলিন্দ কক্ষের অথবা প্রবেশ পথের পাশে থাকা ভাল, যা'তে এ দুই বিভাগের যাতায়াতে অন্যান্য কাজ বিঘ্নিত না হয়। পাঠকক্ষের সংস্থান নিরালা হওয়া প্রয়োজন, মঞ্চকক্ষের থেকে বেশি দূরে না রাখাই সঙ্গত।

অতঃপর গ্রন্থাগার ভবনের আসবাব প্রসঙ্গ। আসবাব প্রসঙ্গে প্রথমেই ওঠে পড়ার টেবিলের কথা। প্রতি পাঠকের জন্য পৃথক টেবিল রাখতে হলে তা'র মাপ লম্বায় সওয়া দু'ফুট বা আড়াই ফুট এবং চওড়ায় পৌনে দু'ফুট করলেই যথেষ্ট। তবে সাধারণত ৩´×২´ ফুট টেবিলই তৈরি হয়। টেবিলের দু'ধারে বসবার ব্যবস্থা যদি করা হয় তবে এককেটি টেবিল হবে ৮´ ফুট লম্বা এবং ৩½´ ফুট অথবা ৪´ ফুট চওড়া। যদি দুপাশে দুই পড়ুয়ার মুখোমুখি টেবিলের মাঝ বরাবর বই রাখবার তাকের ব্যবস্থা থাকে তাহলে

চওড়ায় ৫½ ফুট বা ৬´ফুট পর্যন্ত করতে হয়। অনেক সময়ে দেখা যায় পড়বার টেবিল সামনের দিকে ঢালু করে তৈরি হচ্ছে। এ রকম টেবিলের বদলে সমতল টেবিলই বাঞ্ছনীয়। টেবিলের উচ্চতা হবে ৩০˝ইঞ্চি, চেয়ারের উচ্চতা ১৮˝ ইঞ্চি। ছোটদের জন্য ৩½ ফুট বৃত্ত টেবিল করা যেতে পারে, উচ্চতা ২৭ইঞ্চি। চেয়ারের উচ্চতা ১৫ইঞ্চি। পাঠকক্ষের চেয়ার হাতল বিহীন হওয়া সঙ্গত। গবেষকদের জন্য বিশেষ পড়ার টেবিলের ব্যবস্থা থাকা দরকার, —বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে, যেখানে স্বতন্ত্র গবেষক বৃত্তকক্ষও থাকে। টেবিলের মাপ একজনের জন্য ৪½ ফুট চৌকো; দুজনের হিসাবে চওড়ায় ৬½´ ফুট করলে মাঝবরাবর তাক সংবলিত কাঠের পর্দা থাকে বইপত্র এবং আলো রাখবার জন্য।

পত্রিকামঞ্চ প্রস্তুতের পূর্বে কোন ধরণের সজ্জা হবে তা স্থির করে নিয়ে সমগ্র কক্ষে সেই এক ধরণের আসবাব তৈরি বিধেয়। পড়ার টেবিলের সঙ্গে পত্রিকার সংযুক্ত তাক করতে হলে টেবিলের মাঝ বরাবর বিভাজক কাঠ দিয়ে তার দু'ধারেই পত্রিকা রাখার খোপ তৈরি করা যায়। পত্রিকার নাম উক্ত খোপের উপরে খোদাই হতে পারে। তবে, স্বতন্ত্র প্রদর্শমঞ্চে পত্রিকা সাজিয়ে রাখার ব্যবহারিক সুবিধা যেমন আছে তেমনি আছে সজ্জা-সৌকর্য গুণ। এই ব্যবস্থায় হালের পত্রিকার সঙ্গে পুরানো সংখ্যাগুলিও গুছিয়ে রাখা যায়। মঞ্চগুলির নিচে পুরানো সংখ্যা রাখার জন্য টানাবাক্স বা দেরাজ থাকতে পারে, আবার হালের পত্রিকা রাখার হেলানো তাকের উপরের অংশটিকে আলগাভাবে সংবদ্ধ ক'রে তার পিছনেও খোপ থাকতে পারে। সাধারণত দাঁড়া-মঞ্চে হেলানো ভাবে সিঁড়ির মতো ক্রমপর্যায়ে খোপ ক'রে তার ফাঁকে পত্রিকাগুলি সাজিয়ে রাখা হয়। পত্রিকার শিরোনামাংশ বাইরে বেরিয়ে থাকে। অনেকে প্রতি পত্রিকার জন্য পুরো মাপের স্বতন্ত্র খোপ রাখেন। এতে শোভা হয় সন্দেহ নেই, তবে পত্রিকা গুলিকে দাঁড় করিয়ে রাখা যেমন সহজ নয় তেমনি এতে জায়গাও নেয় প্রচুর, আসবাব খরচও বাড়ে। পত্রিকা দাঁড় করিয়ে রাখবার জন্য প্রতি পত্রিকার নামাঙ্কিত স্বতন্ত্র শক্ত মলাট তৈরি করিয়ে তার মধ্যে পুরে রাখার প্রথা আছে। অর্থ সামর্থে কুলালে এটা ভাল। পত্রিকার দাঁড়া-মঞ্চ সাধারণত ৪´ ফুট বা ৪½´ফুট উচু এবং ৩´ফুট বা ৩½´ ফুট চওড়া হয়। তবে এর মাপ, ধরণ এবং গড়ন পাঠকক্ষের সঙ্গে এবং প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ব্যবহারিক সুবিধা অনুযায়ী বানানোই ভাল।

নির্গম-পীঠিকা ( Issue-counter ) ৪´ ফুট থেকে ৪½´ ফুট পর্যন্ত উঁচু এবং ৩ ফুট চওড়া হওয়া দরকার। কেননা, যাঁরা বই নিতে আসেন তাঁরা সাধারণত দাঁড়িয়েই কাজ সারেন। সেজন্য কিছুটা স্থান প্রয়োজন। তাছাড়া পীঠিকা একটু চওড়া হলে নির্গম-নথি এবং বইপত্র রাখতে সুবিধে হয়, কর্মীদের চেয়ারের পায়া পীঠিকার অনুপাতে উঁচু করে নিতে হয়, অথবা তক্তার উপরে চেয়ার বসাতে হয়। পীঠিকার গায়ে দেরাজ এবং বই খাতা রাখবার তাক রাখা প্রয়োজন। ফেরৎ বইএর জন্য পিছন দিকে মঞ্চ থাকবে, সেখান থেকে বাহকরা বই নিয়ে তুলবে মঞ্চে।

তত্ত্বাবধায়কের (Janitor) প্রয়োজনে যে নিয়ন্ত্রণপীঠিকা থাকে তাতে ভিতরের দিকে নানান জিনিষপত্র রাখবার তাক থাকে, এক ধারে থাকে ছাতা বর্ষাতি প্রভৃতির জন্য দাঁড়া মঞ্চ, এবং কর্মীর পশ্চাতে খোপ-যুক্ত সংখ্যা-খচিত মঞ্চ। পাঠকবৃন্দ গ্রন্থাগারে ঢুকবার আগে তাঁদের ব্যক্তিগত জিনিষপত্র জমা দিয়ে তার পরিবর্তে নির্দিষ্ট সংখ্যাযুক্ত চাকতি নিয়ে যান। পাঠশেষে আবার এই চাকতি দিয়ে আপন আপন সামগ্রী ফেরৎ নিয়ে যান।

এবারে সূচীপত্রক বিন্যাসের কথা। সূচীপত্রকাধার এমন জায়গায় রাখতে হয় (যেমন অলিন্দ-কক্ষ) যা'তে সহজেই চোখে পড়ে এবং ব্যবহার করতে অসুবিধা না হয়। পত্রকগুলির মাপ ৭½ × ১২½ সেন্টিমিটার, অর্থাৎ প্রায় ৩″×৫″ ইঞ্চি। আধারের মাপএর চেয়ে একটুখানি বড় করতে হয়, কেননা আঙ্গুল ঢুকিয়ে টেনে টেনে বার করতে হয় এবং নির্দেশক পত্রকগুলির আকারের অনুপাতে কিছুটা জায়গা লাগে। এই জন্য পত্রকাধারের উচ্চতা ৪ ইঞ্চি এবং চওড়ায় ৬ইঞ্চি হলেই চলে। এবং এই আধার যে বাক্সে থাকবে তার মাপ হয় পড়ে উচ্চতায় ৫ ইঞ্চি চওড়ায় ৭ইঞ্চি। ইস্পাতের আধার এবং বাক্স হলে অবশ্য এই মাপ কমে যায়, কেননা কাঠ ইস্পাতের চেয়ে অনেক বেশী পুরু। আধারের আভ্যন্তরীন মাপ, অর্থাৎ গভীরতা সাধারণত ১১½″ ইঞ্চি অথবা ১৪½″ ইঞ্চি হয়ে থাকে। এই সঙ্গে পিছনের কাঠের পুরুত্ব ½″ ইঞ্চি দাঁড়ায়, ১২″ ইঞ্চি অথবা ১৫ ইঞ্চি। অবশ্য, উপরন্তু আরো ১ ইঞ্চি যোগ করতে হবে, ½ ইঞ্চি আধারের সামনের কাঠের জন্য এবং ½ ইঞ্চি আধারের বাক্সটির পিছনের কাঠের জন্য। গভীরতায় পিছনের ½ইঞ্চি পুরু কাঠের প্রয়োজনীয়তা গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি সূচীপত্রকের নিচে যে ফুটো থাকে সেই ফুটোর মধ্য দিয়ে একটি পিতলের বা ইস্পাতের দণ্ড চালিয়ে দিয়ে

পত্রকগুলিকে একসঙ্গে ধরে রাখা হয়, যাতে এগুলি পড়ে না যায় বা চট করে কেউ তুলে নিতে না পারে। এই দণ্ডটির দুই প্রান্তে প্যাঁচ থাকে, সামনের দিকটা আধারের সম্মুখ ভাগের কাঠের মধ্য দিয়ে এনে গাঁঠ বা হাতল দিয়ে আটকানো থাকে। পিছনের দিকটা থাকে পত্রকের মাপে তৈরি একটি কাষ্ঠ-খণ্ডের মধ্য দিয়ে নিয়ে বাইরের দিকে আটকানো। নূতন পত্রক ভরবার সময়ে দণ্ডটিকে খুলে নিয়ে যথাস্থানে পত্রক রেখে আবার এটিকে ফুটোর মধ্য দিয়ে নিয়ে আটকে দেওয়া হয়। সাধারণত প্রত্যেকটি পত্রকাধারকের জন্য স্বতন্ত্র বাক্স থাকে না, কয়েকটি আধার নিয়ে একটি বড় দেরাজের মতো বাক্স তৈরী হয়। সমগ্র আধারটিকে একটি মাপসই টেবিলের উপরে রাখা হয়, যেটির উচ্চতা মেঝে থেকে অন্তত ১½ ফুট। টেবিলের সঙ্গে একটি কাঠের টানা-খণ্ড থাকে, যেটিকে দেরাজের মতো টেনে বার করা আর ঢুকিয়ে রাখা চলে এই কাঠের তক্তার উপরে পত্রকাধারটি নামিয়ে নিয়ে ব্যবহার করতে পারেন পাঠকেরা। পত্রকাধারগুলির প্রত্যেকটির ভিতরে একটি ক'রে ছিটকিনি লাগানো থাকে, যাতে নাড়াচাড়া হলেও পড়ে না যায়। ব্যবহারের সময়ে সহজেই ছিটকিনিটি খুলে আধার বার করে নেন সকলে।

একেকটি পত্রকাধারে প্রায় ৮০০টি পত্রক রাখা চলে। বেশি ঘন ক'রে রাখলে ব্যবহারের অসুবিধা হয়। একেকটি বইএর জন্য গড়ে ৪টি ক'রে সূচীপত্রক প্রস্তুত হয় ব'লে ধ'রে নেওয়া যায়। এই হিসাবে ২০ লক্ষ সূচীপত্রকের জন্য ২৫০০টি পত্রকাধার লাগবে। অর্থাৎ ৫ লক্ষ বইএর পত্রক। এজন্য জায়গা লাগবে ২৩০´ বর্গফুট। এই সঙ্গে আসা যাওয়া এবং দাঁড়িয়ে বা ব'সে ব্যবহার করার জন্য অন্তত আরো পাঁচগুণ বা তারও বেশি জায়গা ছেড়ে রাখা দরকার। তাহলে সব জড়িয়ে উপরোক্ত পরিমাণ পত্রাকাধারের জন্য জায়গা লাগছে কমপক্ষে ১১৫০´ বর্গফুট।

কয়েকটি ছোটখাট অথচ অপরিহার্য আসবার ও যন্ত্র প্রয়োজনে লাগে গ্রন্থাগারে। যেমন, মঞ্চে বই রেখে আসা নিয়ে আসার জন্য ঠেলাগাড়ি; দু'তিনটি তাক বিশিষ্ট একটি ছোটখাট মঞ্চ রবারের চাকার উপরে বসিয়ে এটি তৈরি। দ্বিতীয়ত, বই বা বইএর মলাট প্রদর্শনের জন্য ফলক; এই ফলক সুন্দর নক্সায় তৈরি করে পায়ার উপরে দাঁড় করিয়ে মেঝেতে বসানো যায়, দেয়ালে ঝোলানোর ব্যবস্থা করা যায়, অথবা কাচের আধারে রাখা চলে। গ্রন্থাগারের নানাবিধ বিজ্ঞপ্তির জন্যও দেয়াল-ফলক প্রয়োজন। তৃতীয়ত,

নথিপত্রের জন্য আলমারি ছাড়াও বিশেষ সামগ্রী, যেমন মানচিত্র বা পুথির জন্য স্বতন্ত্র ধরণের কিছু তাক এবং আলনা। চতুর্থ পর্যায়ে নাম করা যায় আরো কয়েকটি জিনিষের, যেমন মই, ঘড়াঞ্চি, মেঝে মুছবার বিশেষ ধরনের শনের বুরুশ, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র এবং জল ও বালি। মেঝে বা মঞ্চাদি পরিষ্কার করবার জন্য অবশ্য চোষণ-মন্ত্র (vacukm cleaner) রাখা উচিত।

এবারে মঞ্চ বিন্যাস সম্পর্কে কয়েকটি সূত্র উপস্থাপন করে এই প্রসঙ্গ শেষ করা যাক। নিজ গ্রন্থাগারের জন্য কী পরিমান মঞ্চ দরকার তার হিসাব করতে হলে গ্রন্থের আপাত-মজুত সংখ্যার সঙ্গে পরিকল্পনা অনুযায়ী বাৎসরিক গ্রন্থ-সংযোজন সংখ্যা যোগ করে নিতে হবে। এই গ্রন্থবৃদ্ধির কথা মনে রেখে প্রত্যেকটি মঞ্চের এক তৃতীয়াংশ খালি রাখা উচিত সাধারণত প্রতি টানা-ফুটে ( running feet ) ৭টি করে বই হিসাবে ধরলেই চলবে। বইগুলিকে তাকের উপরে গাদাগাদি করে রাখা ঠিক নয়। বরঞ্চ হিসাবটা বাড়তির দিকে না ধরে কমতির দিকে ধরা ভাল। তাহলে গ্রন্থবৃদ্ধি জনিত স্থান সমস্যা এড়ানো যাবে। তাকের যে অংশ খালি থাকে সেখানে একটি করে ঠেকনা দিয়ে রাখলে বইএর ঋজুতা বজায় থাকে। ইস্পাতের মঞ্চের সঙ্গেই অবশ্য সঞ্চালনশীল ঠেকনার ব্যবস্থা থাকে, যেমন থাকে নির্দেশক ফলকের ব্যবস্থা।

মঞ্চ বিন্যাসে কয়েকটি কথা মনে রাখা ভাল। (১) সব ধরণের, সকল গড়নের ও মাপের বইএর জন্য তাক তৈরি করতে হবে। (২) বেশি হাঁটা-হাঁটি না করেই এবং হাত বাড়িয়েই যেন বইগুলি মেলে। (৩) মঞ্চাবস্থান সূচী বিভাগ, পত্রকাধার, পাঠকক্ষ, এবং নির্গম-পীঠিকার কাছাকাছি যেন হয়। (৪) মঞ্চকক্ষে দিনে এবং রাত্রে যেন সমানভাবে সমান পরিমাণে আলো থাকে। (৫) টাটকা বাতাস যেন নিয়মিত খেলে এবং তাপসাম্য বজায় থাকে। এদিকে লক্ষ্য রাখলে বইএর ক্ষতি কম হয়। টেঁকে অনেক দিন। (৬) ধুলো যেন জমতে না পারে। (৭) ভবিষ্যৎ বৃদ্ধির উপায় যেন থাকে।

গ্রন্থাগার এবং মঞ্চকক্ষের অবস্থানের উপরে এর ধরণ নির্ভর করে। আধুনিক গ্রন্থাগার জগতে তিন ধরণের মঞ্চকক্ষ দেখা যায়। (১) পাঠকক্ষের পাশে খাড়াভাবে তল-বিশিষ্ট মঞ্চ ব্যবস্থা; এতে পাঠকদের হাতের কাছেই বই থাকে। বৃহদায়তন পাঠকক্ষের চারপাশে উচ্চতলে পুস্তকমঞ্চের অবস্থান ও এরই এক রকমফের। (২) পাঠকক্ষের নিচে ভূগর্ভে লম্বাভাবে মঞ্চ সংস্থান;

পাঠকদের আসনের ঠিক নিচেই বই থাকে। এ ব্যবস্থাকে উপরোক্ত ধরণেরই প্রকারভেদ বলা যায়। (৩) পাঠকক্ষের পাশে সমান্তরাল ভাবে মঞ্চকক্ষ, এতেও পুস্তকমঞ্চ পাঠকদের থেকে বেশি দূরবর্তী হয়না। এই ব্যবস্থা ভবিষ্যৎ বিস্তারের অনুকূল।

## গ্রন্থাগার সমিতি (Library Committee)

গ্রন্থাগার সংগঠন ও পরিচালনার প্রাথমিক পদক্ষেপই গ্রন্থাগার সমিতি গঠন। আপাতদৃষ্টিতে যদিও মনে হয় গ্রন্থাগারিকের উপরেই গ্রন্থাগারের যাবতীয় দায়িত্ব ন্যস্ত, আসলে কিন্তু তাঁকেও উপরস্থ এক পরিচালন সমিতির কাছে দায়ী থাকতে হয়। গ্রন্থাগারিকের কাজের পর্যায় দ্বিবিধ ; তাঁর সঙ্গে এক দিকে আছেন এই পরিচালন—সমিতি গ্রন্থাগারের নীতি নির্ধারন, কর্ম পদ্ধতির পরিকল্পনা এবং সংগঠনের দায়িত্ব নিয়ে, অন্য দিকে আছে সহযোগী কর্মীবৃন্দ উক্ত সমিতির সিদ্ধান্তের রূপায়নে তাঁকে সাহায্য করবার জন্য। গ্রন্থাগার সমিতির কাজ— (১) গ্রন্থাগারের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা এবং আয় ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করা ; (২) পুস্তক ও সাময়িকীর নির্বাচন ; (৩) গ্রন্থাগারের কার্যক্রম ও কানুন প্রণয়ন ; (৪) প্রসার ও উন্নতির প্রকল্পে পরামর্শ দেওয়া ; (৫) গ্রন্থাগার ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ ; (৬) গ্রন্থাগারিকের কাছ থেকে বার্ষিক কাজের প্রতিবেদন গ্রহণ এবং কার্যক্রম পর্যালোচনা ; (৭) গ্রন্থাগারিক এবং অন্যান্য দায়িত্বশীল কর্মীদের নির্বাচন ও নিয়োগ ; এবং (৭) প্রয়োজন মতো বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্মের পরিদর্শন।

গ্রন্থাগার সমিতির গঠণ গ্রন্থাগারের প্রকৃতির উপরে নির্ভর করে। জনগ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে- যেখানে পরিচালনার ভার পৌরপ্রতিষ্ঠান অথবা সরকারের উপরে ন্যস্ত, সেক্ষেত্রে পৌরকর্মচারী, সরকারী কর্মচারী এবং জনসাধারণের প্রতিনিধিদের নিয়ে সমিতি গঠিত হয়। এ ব্যবস্থা বিশেষ করে বিদেশে প্রচলিত আছে, কেননা সেখানে গ্রন্থাগার কর থেকে ব্যয় নির্বাহ হয়। এদেশে কর চালু নেই, তবুও এই ব্যবস্থা কিছু ক্ষেত্রে চালু হচ্ছে। ইংলণ্ডে দশ বা বারো জন সদস্য নিয়ে পরিচালন সমিতি গঠিত, তার মধ্যে সরকারী বা পৌর প্রতিনিধির সংখ্যা অর্ধেক। আমেরিকায় বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রয়োজন অনুযায়ী আইন করে সমিতির হাতে ভার অর্পিত হয়। ভারতবর্ষে মাদ্রাজে

গ্রন্থাগার আইন চালু হবার পর (১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ) এগারো জন সদস্য নিয়ে সমিতি গড়া হচ্ছে। তার মধ্যে তিনজন পৌর প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত সদস্য, বাকি আট জন সরকারী সদস্য—যার মধ্যে গ্রন্থাগার কর্মী এবং স্কুল কলেজের অধ্যক্ষরাও আছেন। দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরীতে সভাপতি ছাড়া বারো জন সদস্য নিয়ে পরিচালন সমিতি গঠিত। তার মধ্যে তিন জন সদস্য ভারত সরকারের নির্বাচিত, দু'জন দিল্লী পৌর প্রতিষ্ঠানের, একজন দিল্লী জিলা পরিষদের প্রতিনিধি এবং একজন ইউনেসকো (UNESCO) তরফের। কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের পরিচালন সমিতিতে গ্রন্থাগারিক ব্যতীত দু'জন প্রতিনিধি আসেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে, একজন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, একজন পর্যায়ক্রমে কোনো কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবং ছয়জন থাকেন ভারত সরকারের প্রতিনিধি।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার সমিতি মূলত কার্যনির্বাহক সমিতিরই একটি অংশ। সদস্য হিসেবে থাকেন উপাচার্য, কর্মসচিব, শিক্ষাসচিব, অর্থসচিব, বিভিন্ন বিভাগীয় অধ্যক্ষ। গ্রন্থাগারিক সমিতির আহ্বায়ক—সচিব হিসেবে কাজ করেন। আয় ব্যয় বরাদ্দ, আইন কানুন প্রণয়ন এবং পুস্তক নির্বাচনে সহায়তাই মূল করনীয়।

গ্রন্থাগার সমিতি নানান ধরণের হতে পারে। গ্রন্থাগারের উপরে কতটা কর্তৃত্ব করবে, কোন অংশে গ্রন্থাগারিকের পুরো দায়িত্ব থাকবে, সেই বিচারে সমিতির গঠন। জনগ্রন্থাগারে সমিতির যতটা দায়িত্ব এবং কতৃর্ত্ব থাকে, প্রতিষ্ঠানিক গ্রন্থাগারে ততটা থাকে না। প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগারে সমিতি মোটা-মুটিভাবে আইন প্রণয়ন ব্যয় এবং বরাদ্দের ভাগাভাগি করেই সাধারণত কর্তব্য শেষ করে। তারপরে যা করবার করেন গ্রন্থাগারিক। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক দায়ী থাকেন উপচার্যের কাছে, এবং তাঁর মাধ্যমে কর্ম সমিতির কাছে। জন গ্রন্থাগারে সমিতি ক্রিয়াপর্বের উপরে এবং গ্রন্থাগার নীতির উপরে একটু বেশী প্রভাব বিস্তার করে থাকে। যে গ্রন্থাগার সমিতি কার্যনির্বাহক সমিতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহন করে সেখানে গ্রন্থাগারিকের এবং স্থানীয় কতৃর্পক্ষের ক্ষমতা খর্ব বা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। তবে কর্ম তৎপরতা বাড়ে। আবার কোনো গ্রন্থাগার সমিতি শুধু কার্য পর্যালোচনা করে এবং তার বিবরণ মন্তব্যসহ স্থানিক কতৃর্পক্ষের কাছে পেশ করে। গ্রন্থাগার সমিতি ব্যবহারিক প্রয়োজনে কয়েকটি উপসমিতি গঠন করতে পারে। যেমন আয়

ব্যয় তদারকির জন্য, পুস্তক ক্রয়ের জন্য, অথবা কর্মী নিয়োগের জন্য উপসমিতি। এই গুলির প্রতিবেদন গ্রন্থাগার সমিতির সভায় দাখিল করতে হয়।

গ্রন্থাগারের ব্যয় বরাদ্দের দুটো অংশ। তা'র মধ্যে একটা নিয়মিত, অপরটি অনিয়মিত। প্রথম পর্যায়ে পড়ে কর্মীদের বেতন, পুস্তক ও পত্রিকা ক্রয়, সূচীপত্রক, গ্রন্থতালিকা, বুলেটিন ইত্যাদি প্রকাশের খরচ, এবং দপ্তরের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয়। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে পড়ে গ্রন্থাগার গৃহ ও প্রাঙ্গণের রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামতি ইত্যাদি খরচ ব্যয়বরাদ্দের হার কর্মীদের বেতনের জন্য শতকরা ৫০ থেকে ৬০ ভাগ, বই পত্রাদি কিনবার জন্য ২৫ থেকে ৩০ ভাগ, অবশিষ্টাংশ বিবিধ খাতের জন্য। বিশ্ববিদ্যালয়ে সমগ্র ব্যয়বরাদ্দের সওয়া ছয় ভাগ, —অথবা ছাত্র পিছু অন্তত ১৫ টাকা,— গ্রন্থাগারের জন্য নির্দিষ্ট থাকা উচিত। গবেষকদের জন্য এই হার আরেকটু বেশী হয়। বিদেশে অবশ্য এই বরাদ্দ আরো অনেক বেশী। কর্মীদের জন্য খরচ কমিয়ে বই পত্রের জন্য বেশী টাকা রাখলেই যে গ্রন্থাগার জমজমাট হয়ে উঠবে এই প্রাচীন ধারণার ভ্রান্তি আজকাল সর্বস্বীকৃত। কর্মীসহযোগ পুস্তক সংগ্রহের পরিপূরক।

গ্রন্থাগারের জন্য সরাসরি বরাদ্দ অর্থ ছাড়াও আয়ের অন্যতর কিছু উৎস আছে। যেমন গ্রন্থাগারে ভর্তির দেয়ক ও মাসিক চাঁদা, বুলেটিন ইত্যাদির মূল্য, যথাসময়ে বই ফেরৎ দিতে না-পারার জন্য জরিমানা, ইত্যাদি। অপরদিকে পুস্তকাদি ক্রয়ের বরাদ্দ ব্যতীত অন্য সূত্রেও গ্রন্থাগারে বই আসে। ব্যক্তিগত দান, প্রতিষ্ঠানের দান, গ্রন্থাগারের প্রকাশনের বিনিময়ে প্রাপ্ত বই পত্রাদি। গচ্ছিত সম্পত্তির আয় থেকেও কিছু অর্থগম হয়।

## গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার সমিতি

গ্রন্থাগার সমিতির অধীন হলেও গ্রন্থাগারিকের উপরে সংগঠন ও পরিচালনার পুরো দায়িত্ব ন্যস্ত। বরাদ্দ অর্থ বণ্টন ও ব্যয় এবং পুস্তক নির্বাচন ও ক্রয় তাঁরই তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়। গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার সংরক্ষণের ভার গ্রন্থাগারিকের। তিনি নিয়মিত ভাবে সমিতির কাছে কাজকর্মের প্রতিবেদন উপস্থিত করেন এবং গ্রন্থাগারের উন্নতি, পরিবর্তন ও বিবর্তনাদির প্রসঙ্গ পেশ করেন। সমিতির মত সাপেক্ষে তিনি কর্মী নিয়োগ ও খারিজ করতে পারেন। কর্মীদের পদোন্নতি ও বেতনাদি বিষয়ে এবং কর্মী বৃদ্ধির প্রয়োজন বোধ করলে

সমিতির কাছে প্রস্তাব পেশ করেন। আয় ব্যয়ের হিসাব রাখার দায়িত্ব ও তাঁর। তাঁর দায়িত্ব দ্বিবিধ। এক দিকে তিনি সমিতির মুখ্য পরামর্শদাতা, অন্যদিকে তিনি সমিতির একনিষ্ঠ সেবক। সমিতির সভার কর্মসূচী প্রস্তুত এবং সভা পরিচালনা তিনিই করেন, অথচ তাঁর মতামত জোর করে সমিতির উপরে চাপানো তাঁর পক্ষে অকর্তব্য। তিনি কর্মীদের উর্দ্ধতন, সমিতির নয়। সমিতির নির্ধারিত নীতির রূপায়নের ভার গ্রন্থাগারিকের। সমিতির কাজ নীতি নির্ধারণ, গ্রন্থাগারিকের কাজ পরিচালন।

## কর্মী নিয়োগ

গ্রন্থাগারের সার্থক রূপায়ন নির্ভর করে কর্মীদের উপরে। অভিজ্ঞ ও বিবেচক কর্মী সুষ্ঠু পরিচালনার প্রধান সোপান। গ্রন্থাগার কর্মী নিজের বৃত্তিতে ও কাজে কুশলী হবেন সেকথা বলাই বাহুল্য। তাঁর মন বিশ্লেষনধর্মী হওয়া প্রয়োজন। হওয়া দরকার উদার, উন্নত, বলিষ্ঠ। তিনি হবেন চারু বাক এবং তৎপর। সিদ্ধান্ত-কুশলী এবং কর্মিষ্ঠ। উন্নত মানের সাধারণ শিক্ষা এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিশেষ শিক্ষায় তিনি হবেন শিক্ষিত। গ্রন্থাগারে দুই ধরণের কর্মী থাকেন। প্রযুক্তি বিভাগগুলির জন্য বৃত্তিকুশল বিশেষজ্ঞ এবং দপ্তর ইত্যাদির জন্য সাধারণ কর্মী। দপ্তরাদির কাজ হলেও গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে অন্যান্য দপ্তরের মতো গতানুগতিক ধাঁচের নয়, কিছুটা বৈশিষ্ট্যযুক্ত। সেজন্য গ্রন্থাগারের যে কোনো বিভাগের কর্মীকেই গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কে পরিমাণ পরিচিত হতে হয়, এবং সেজন্য গ্রন্থাগারিকের তত্ত্বাবধানে কিছু প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা দরকার। গ্রন্থাগার কর্মীদের স্বাস্থ্যবান হওয়া প্রয়োজন। কেননা, সময়ে অসময়ে ধূলোবালি ঘেঁটেও নানাবিধ কাজ করতে হয়, অনেক কাজে দৈহিক পরিশ্রমও এড়ানো যায় না। বইপত্রের ময়লা বা কীট ঝাড়াইও এক কর্ম, এবং এর ফলে শ্বাস প্রশ্বাসে সংক্রামক ঘটাও বিচিত্র নয়। কর্মীদের দৃষ্টিশক্তি এবং স্মরণশক্তি প্রখর হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা সব সময়ে পড়ে দেখার কাজ এঁদের—এমন কি স্বল্পালোকেও অনেক সময় কাজ করতে হয়। এবং প্রযুক্তি কর্মের যাবতীয় ধারা মনে না রাখলে স্বভাবতই ভুল ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে, বর্গ সংখ্যায়ন প্রভৃতিতে পার্থক্য ঘটে যেতে পারে। মর্যাদায় গ্রন্থাগার কর্মীরা অধ্যাপকদের সমান বলে তাঁদের গুণ, মান এবং ব্যক্তিত্ব সেই

মতো থাকা উচিত। এদেশে যেকোনো শ্রেণীর চাকুরী প্রার্থীকেই গ্রন্থাগারে নিযুক্ত করবার প্রবণতা দেখা যায়। এর ফলে প্রায়ই সন্তোষজনক কাজ পাওয়া যায় না, কাজে বিলম্ব হয়। বেশি লোক থাকলেও কাজ মেলে কম, পাঠকবর্গ অসন্তুষ্ট হন, গ্রন্থাগার হয়ে পড়ে শৃঙ্খলাহীন। গ্রন্থাগার কর্মীদের পুস্তক প্রেমী হতে হবে, হতে হবে মানব দরদী, শৃঙ্খলায় ও বিন্যাসে বিশিষ্ট, নীতিতে অটল। এমন কি, এই সকল গুণকে নিয়োগের বিচারে অগ্রাধিকার দেয়াও অনুচিত নয়। আত্মকেন্দ্রিক প্রকৃতির লোক গ্রন্থাগারের অনুপযুক্ত। কর্মীরা হবেন জনসেবার উদ্বুদ্ধ। গ্রন্থাগারবৃত্তি চিকিৎসক বা আইনজীবি, পূর্তবিদ বা প্রশাসনিক বা অধ্যাপক বা গাণনিকদের মতো সীমিত পরিসরের নয়। তাঁর কর্মের পরিধি সুবিস্তৃত, জীবনের ও জগতের যাবতীয় শাখায় প্রশাখায় প্রসারিত। কেবলমাত্র গ্রন্থাগারের প্রযুক্তি বিদ্যার বিভাগই তাঁর বিশেষতার ক্ষেত্র। তার বাইরে তাঁর জ্ঞানের ও কর্মের ক্ষেত্র বিশাল।

পরিচালন সমিতি নিয়ন্ত্রিত গ্রন্থাগারে মূল গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার সমিতি। বিশ্ববিদ্যালয়ে এ কাজ কর্মসমিতির। গ্রন্থাগারের অন্যান্য কর্মীনিয়োগে গ্রন্থাগারিক ও নিয়োগ সমিতির অন্যতম সদস্য—বলতে গেলে প্রধান সদস্য হিসেবে থাকেন। নিজ গ্রন্থাগারের উপযুক্ত কর্মী নির্বাচনে স্বভাবতই তাঁর বিচার ও মতামত অগ্রাধিকার পায়। আগেই বলা হয়েছে গ্রন্থাগারিক যেমন শিক্ষার উচ্চতম অভিজ্ঞানের অধিকারী, গবেষণার উপাধি এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিশেষ অভিজ্ঞতার অধিকারী হবেন, এবং তেমনি অন্যান্য দায়িত্বশীল এবং বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কর্মীদেরও থাকবে অনুরূপ উচ্চশিক্ষার অভিজ্ঞান। বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান সামগ্রীর ভাণ্ডার গ্রন্থাগার, তাই বিভিন্ন কর্মী যদি বিভিন্ন বিষয়ের বিদ্যায় উচ্চশিক্ষিত হন তাহলে গ্রন্থাগারের নানান ধরণের পাঠকদের সহায়তার কাজ দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করা যায়। কর্মী নিয়োগের সময় এদিকে লক্ষ্য রাখলে ভাল। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগের বিধানে গ্রন্থাগারিক ও অপরাপর কর্মীদের মর্যদা শিক্ষা বিভাগের প্রফেসর, রীডার ও লেকচারার পদের সমতুল। জনগ্রন্থাগারেও কর্মীদের অনুরূপ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া বিধেয়।

গ্রন্থাগারের প্রকার ও আয়তন অনুযায়ী কর্মী সংখ্যার হিসেব ধরতে হয়। কাজের প্রয়োজন বুঝে নিয়োগ। স্বভাবতই একটা সর্বনিম্ন হার থাকে—যার কমে কোনো গ্রন্থাগারেই কাজ চলে না। রঙ্গনাথন স্বয়ং, এবং তাঁর

পরিচালনায় গ্রন্থাগার উপদেষ্টা সমিতি মোটামুটি একটা মান বা সূত্র স্থির করেছেন। যথাস্থানে সে বিষয়ের উল্লেখ করা যাবে। কোন কর্মীকে কোন ধরণের কাজের ভার দেওয়া হবে, অথবা কোন কাজের জন্য কোন ধরণের কর্মী দরকার সেটা স্থির করেন গ্রন্থাগারিক। কোনো কর্মী নীতি নিয়ন্ত্রণে বা পরিচালনায় পটু হন, কেউ বা হন প্রযুক্তি বিদ্যায় পারদর্শী।

## গ্রন্থাগারের নিয়মাবলী

গ্রন্থাগারের ব্যবহারিক নিয়ম থাকা অত্যাবশ্যক। জনগ্রন্থাগারের এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগারের নিয়মে স্বভাবতই পার্থক্য থাকে। তবে মোটামুটি নীতি একই রকমের। গ্রন্থাগারের মধ্যে কাজের বাঁধুনি ঠিক রাখার এবং গ্রন্থাদি সম্পদের সংরক্ষণের ভারথাকে গ্রন্থাগারিকের উপরে, এবং তিনি দায়িত্ববদ্ধ থাকেন গ্রন্থাগার সমিতির কাছে। একদিকে গ্রন্থাগারের স্বার্থ এবং অপর দিকে পাঠকদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ রেখে নিয়মাবলী তৈরি করেন গ্রন্থাগারিক, অনুমোদন করিয়ে নেন সমিতির কাছে। গ্রন্থাগার-নিয়ম গ্রন্থসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারে সহায়তা করে, অপব্যবহার নিবারণ করে এবং সম্পত্তির বিনষ্টি রোধ করে। নিয়ম এমন হওয়া উচিত যাতে পাঠকবর্গ এগুলিকে বাধা বা গ্রন্থব্যবহারের অন্তরায় বলে মনে না করেন, তাদের স্বাধীনতা খর্ব করা হচ্ছে বলে না ভাবেন। পরন্তু বিশ্বাস করেন তাঁদেরই সুবিধার জন্য নিয়মের সৃষ্টি। গ্রন্থাগার ব্যবহারে পাঠকবর্গকে যতটা সম্ভব স্বাধীনতা দিয়ে কেবলমাত্র অপব্যবহার নিবারণের প্রতি নজর রেখে নিয়ম প্রণয়ন বিধেয়। নিয়মের নিগড় পাঠকদের জন্য না রেখে বরঞ্চ কর্মীদের জন্য রাখা যুক্তিযুক্ত। কেননা পাঠকরা সহায়তা এবং নির্দেশই কামনা করে বেশী। গ্রন্থাগার কর্মীদের সঙ্গে পাঠকদের সহজ সম্পর্ক থাকলে নিয়ম লঙ্ঘনের সম্ভাবনা কমে।

গ্রন্থাগার সমিতি নিয়ম গঠন করে রূপায়নের ভার ছেড়ে দেয় গ্রন্থাগারিকের উপরে। সাধারণত যে সকল বিষয়ের জন্য নিয়মাবলীর প্রয়োজন হয় সেগুলি নিম্নরূপ। (১) গ্রন্থাগারের সময়। গ্রন্থাগার কতক্ষণ খোলা থাকবে তা স্থির হয় গ্রন্থাগারের এবং সদস্যদের প্রকৃতি অনুযায়ী। জনগ্রন্থাগার এবং বিশ্ববিদ্যালয়াদির গ্রন্থাগার যত বেশীক্ষণ খোলা থাকে ততই

ভাল। অন্যান্য কাজকর্মের ফাঁকে অবসর সময়টুকু গ্রন্থাগারে পড়াশোনা করে কাটাতে পারেন যেকোনো শ্রেনীর পাঠক। বিশেষ গবেষণা জাতীয় পাঠের সুযোগও জনসাধারণকে দেওয়া কর্তব্য। জনগ্রন্থাগারে বিশেষ পাঠক বা সাধারণ কাজকর্মের শেষে আসেন, সেজন্য দুয়ার উন্মুক্ত রাখতে হয় রাত্রেও। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে অধ্যাপক ও গবেষকদের জন্য স্বতন্ত্র পাঠকক্ষের ব্যবস্থাও করার উচিত, এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে স্বতন্ত্র প্রবেশ পথ রাখাও বাঞ্ছনীয়। স্থানীয় অবস্থা, পাঠকদের সুবিধা ও কর্মীসংস্থানের ভিত্তিতে গ্রন্থাগারের সময় নিরূপিত হয়ে থাকে। (২) সদস্যীকরণ। যে সকল জন গ্রন্থাগার বিশেষ শুল্ক সমর্থিত সেগুলির সদস্য পদের জন্য চাঁদা অথবা ভর্তি হবার জন্য দেয়ক গ্রহণ অনুচিত। তবে প্রয়োজন সাপেক্ষে বিশেষ কোনো বই ধার দেবার জন্য বন্ধকী অর্থ নেওয়ার রীতি আছে। চাঁদা ভিত্তিক গ্রন্থাগারে সদস্যদের কাছ থেকে সদস্য পদে প্রবেশ দেয়ক নেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে সদস্য পদভুক্তির দেয়ক দেওয়াই রীতি। সদস্যদের একটি করে সদস্যপত্র দেওয়া হয়। জনগ্রন্থাগারে সদস্য পদের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই একটা বয়সের সীমা বেঁধে দেবার প্রয়োজন হয়। বিশেষ গ্রন্থাগারের সদস্য পদের জন্য কোন ধরণের ব্যক্তি যোগ্য তাও বেঁধে দেওয়া হয়। যেমন, কোনো সংস্থা বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে কেবলমাত্র কর্মীদেরই প্রবেশাধিকার থাকে, এবং সেই অধিকার নিঃশর্ত। শিশু বা নাবলকদের প্রবেশাধিকার সব গ্রন্থাগারে থাকে না। (৩) সঞ্চারন। বই ধার নেবার জন্য কিছু নিয়ম স্বভাবতই থাকে। পাঠকরা এককালীন কয়টি করে বই নিতে পারবেন, কতদিনের মেয়াদে নিতে পারবেন, কোন শ্রেণীর পাঠক অধিক সংখ্যায় বই পাবেন তার জন্য নিয়ম করে দিলে পাঠক এবং গ্রন্থাগারিক উভয় তরফেরই সুবিধা। জনগ্রন্থাগারে যেমন বেশী বই ঋণ দেবার অসুবিধা থাকে, বিশেষ গ্রন্থাগারে তেমনি ঋণ সংখ্যা সীমিত না রাখাই বিধেয়। বিশ্ববিদ্যালয়াদিতে সাধারণত ছাত্রছাত্রীদের পাঠশ্রেণীর ক্রম অনুসারে বইএর সংখ্যা ধার্য হয়। বই ফেরৎ দেবার কালসীমায়ও একটু কড়াকড়ি প্রয়োজন হয়, সময় মতো ফেরৎ না দিলে অন্যান্য ছাত্রছাত্রী অসুবিধায় পড়েন। সেজন্য নির্ধারিত সময়ে জমা না দিলে জরিমানা—এমন কি সাময়িকভাবে বই দেওয়া বন্ধ ক'রেও রাখার রীতি বর্তমান। এই ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে সকলের স্বার্থের অনুকূল বলে কারো কিছু মনে করা

উচিত নয়। (৪) ব্যবহার। গ্রন্থাগার ব্যবহার করার এবং গ্রন্থাগারে পাঠকদের ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে কয়েকটি আইন বা রীতির প্রবর্তন প্রয়োজন। 'আইন' না বলে 'অনুরোধ' বলা বোধ করি ভাল। যেমন, পাঠকক্ষে এবং অন্যত্র যথাসম্ভব মৌনতা অবলম্বন, গ্রন্থাগারের অভ্যন্তরে বেপরোয়া আলাপ আলোচনার অভ্যাস বর্জন, কর্মীদের প্রতিও কাজের সময়ে গল্পসল্প না করার অনুরোধ, গৃহপালিত জন্তুটন্তু নিয়ে গ্রন্থাগারে প্রবেশ নিষেধ, ছোঁয়াচে রোগী, বিকৃত মস্তিষ্ক বা মানসিক বিকলতা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের অথবা কোলের ছেলে সমেত প্রবেশ নিষেধ, পাঠকক্ষ, মঞ্চকক্ষ ইত্যাদিতে ধূমপানের নিষেধাজ্ঞা, বইএর মধ্যে দাগ দেওয়া বা পাতা মুড়ে রাখবার নিষেধাজ্ঞা, ইত্যাদি। তথ্য পুস্তক এবং দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, পাণ্ডুলিপি বা পুথি, সাময়িক পত্র-পত্রিকা, মানচিত্র অথবা শিল্প নিদর্শনাদি, এবং গ্রন্থাগার বিশেষের প্রয়োজন বোধে অন্যান্য সামগ্রী গ্রন্থাগারের বাইরে নিয়ে যাবার ব্যাপারেও বিধি নিষেধ আবশ্যক। ব্যক্তিগত বই, থলি বা বটুয়া, ছাতা বা বর্ষাতি প্রভৃতিও গ্রন্থাগারের মধ্যে নিয়ে যাওয়া বারণ। এগুলি তত্ত্বাবধায়কের জিম্মা করে তাঁর বদলে সংখ্যাযুক্ত নিদর্শন ফলক নেবার ব্যবস্থা থাকে।

গ্রন্থাগার নিয়ম যে বিভাগের জন্য যে ভাবেই তৈরি করা হোক না কেন খেয়াল রাখতে হয় এই নিয়ম যেন নিগড় না হয়ে ওঠে। যাকে বলে 'লাল ফিতের বাঁধন' তাতে যেন পর্যবসিত না হয়। গ্রন্থাগারের প্রধান লক্ষ্য যেহেতু জনগণের সেবা এবং প্রধান কাজ পাঠকদের সন্তোষ ও তৃপ্তি বিধান, যেহেতু পাঠকবর্গের সুখ সুবিধার প্রতি নজর রেখেই যাবতীয় বিধি নিষেধের প্রবর্তন করা উচিত। তাঁদের মঙ্গলের জন্যই যে নিয়মগুলি চালু করা দরকার সে কথা তাঁদের বুঝিয়ে দেওয়া এবং এ ব্যাপারে সর্বপ্রকার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া প্রতিটি গ্রন্থাগারকর্মীর নৈতিক এবং বৃত্তিগত কর্তব্য।

## গ্রন্থাগার পরিচালনা

গ্রন্থাগার সংগঠনের পর্যায় শেষ হবার পর সুরু পরিচালনার পর্যায়। সংগঠন ও পরিচালনা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সংগঠনের নানান প্রসঙ্গ পরিচালনার প্রকল্পে বারবার দাবি নিয়ে উপস্থিত হয়। যেমন, গ্রন্থাগার

ভবনের বিন্যাস ও বৃদ্ধির প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আসে গ্রন্থ ও পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধির সূত্রে। নূতন-বিভাগ সংযোজনের সময়ে সেটির সাংগঠনিক বিন্যাস নিয়ে ভাবতে হয়। গ্রন্থাগার নিয়মাবলীর ও সংশোধন দরকার হয় প্রয়োজন বুঝে। পরিচালনার কাজ প্রশাসন এবং প্রযুক্তি বিভাগ-গুলিকে নিয়ে। লক্ষ্য ন্যূনতম আয়াসে যথাসম্ভব কম সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব বেশী কাজ এবং সাহায্য করা। অপর দিকে বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান, কর্মীদের মধ্যে কর্ম্মবন্টন, আর্থিক ব্যয় বরাদ্দ খতিয়ান এবং নথিপত্র সংরক্ষণ ও দপ্তর পরিচালনা। স্বষ্ঠু পরিচালনার জন্য সাংগঠনিক ঐক্য প্রয়োজন। প্রধান দায়িত্ব থাকবে কোনো একজনের উপরে, —ভারপ্রাপ্ত কর্মী হিসেবে তিনি যাবতীয় আদেশ দেবেন, প্রয়োজন হলে প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব অর্পন করবেন অপর কর্মী বা কর্মীবৃন্দের উপরে। গ্রন্থাগারিকের হাতে মূল দায়িত্ব, এই দায়িত্ব বিভক্ত হতে পারে এক বা একাধিক উপগ্রন্থাগারিক বা সহযোগী গ্রন্থাগারিকের মধ্যে, —একেকজন একেক দিকের ভার নিতে পারেন।

পরিচালনা ও প্রযুক্তির বিভিন্ন বিভাগ আছে (১) পুস্তক বিভাগ (Book section) (ক) পুস্তক নির্বাচন (Book selection), (খ) পুস্তক সংগ্রহ (Acquisition), (গ) পরিগ্রহন (Accession), (২) প্রযুক্তি বিভাগ (Technical section), (ক) বর্গীকরণ (Classification), (খ) সূচীকরণ (Cataloguing (৩) সঞ্চারণ বিভাগ (Circulation); (৪) জিজ্ঞাসা বিভাগ (Reference) ;(৫) সাময়িকী বিভাগ (Periodicals); (৬) পরিপোষণ বিভাগ (Maintenance); (ক) মঞ্চকক্ষ (Stack), (খ) সংরক্ষণ (Preservation), (গ) বাঁধাই (Book binding); (৭) দপ্তর (Office); (৮) গ্রন্থন ও প্রদর্শনী (Publications & Display); (৯) আলোক চিত্রণ ও অনুচিত্রণ (Photocopying & Microfilming)।

এই বিভাগগুলির কার্য-পর্যালোচনার পূর্বে বিভিন্ন বিভাগের প্রযুক্তিতত্ত্ব সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকা দরকার।

## (১) প্রযুক্তি তত্ত্ব ( Operational philosophy )

গ্রন্থাগারবৃত্তি একদিকে পুস্তক ও আনুষঙ্গিক জ্ঞান সামগ্রী এবং অপর দিকে পাঠকদের মধ্যে যোগাযোগ ও ভাব বিনিময়ের কর্তব্য সম্পাদন করে।

তাই গ্রন্থাগারের বিভিন্ন প্রয়োগ প্রকল্পের ব্যবহারিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা সর্বাগ্রে আবশ্যক। একে একে এগুলির পরিচয় নেওয়া যাক।

(১) পুস্তক নির্বাচন। পুস্তক নির্বাচন এবং গ্রন্থ সংগ্রহের সঙ্গে বই বাতিল করবার প্রশ্নও জড়িত। ভাল বই গ্রহণ, খারাপ বই বর্জন। অথবা, বলা উচিত, উপযুক্ত এবং প্রয়োজনীয় বইগুলিই কেবলমাত্র সংগ্রহ করে অপ্রয়োজনীয় বই বাতিল করা। এটি বাস্তব পদ্ধতি, উদ্দেশ্য স্পষ্ট। নিজ নিজ গ্রন্থাগারের প্রয়োজন বুঝে বই বাছাই করা।

(২) পুস্তক বর্গীকরণের উদ্দেশ্য সহজ ও সরল ব্যবহারিক পদ্ধতিতে বইএর বিন্যাস। যে পদ্ধতি সহজে প্রয়োগ করা যাবে এবং যেটি অনুধাবন করতে সর্বসাধারণের অসুবিধা হবে না সেটিই গ্রহনীয়। কুশলী গ্রন্থাগারিক অকুশলীদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে দেখেন।

(৩) পুস্তক সূচীকরণ প্রক্রিয়া যেন প্রকৃতপক্ষে সূচী নির্দেশক হয়ে ওঠে। দর্শন মাত্রই যেন বই সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হয়। লেখক, আখ্যা, বিষয় প্রভৃতির সূচীকরণে যেন অস্পষ্টতা না থাকে। সূচীপত্রক বিন্যাস এমন হওয়া দরকার যেন ব্যবহার অনায়াস হয়, সহজ বোধ্য হয়।

(৪) একথা বিশেষ ক'রে স্মর্তব্য যে বর্গীকরণ ও সূচীকরণ মূলত স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া নয়, পরস্পরের পরিপূরক। দুটিরই লক্ষ্য এক, পুস্তক সংক্রান্ত বিবরণ এবং বিন্যাস পদ্ধতি পাঠকদের গোচরে আনা। একটির অপূর্ণতা অপরটি দিয়ে পূর্ণ করা।

(৫) সঞ্চারণ। প্রচলন পন্থা (Charging) খুবই সরল হওয়া বাঞ্ছনীয়। পুস্তক চলাচল কর্মীদের পক্ষে যেন ঝামেলার ব্যাপার না হয়, তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করা যায়, পাঠকদের সময় যেন অযথা নষ্ট না হয়।

(৬) মঞ্চকক্ষ। মঞ্চ ব্যবস্থা রুদ্ধ না হয়ে মুক্ত হওয়া ভাল। সঠিক বইটি বেছে নেওয়া যেখানে উদ্দেশ্য, এবং সময় বাঁচানো যেহেতু লক্ষ্য সেখানে পাঠকদেরই বাছাইএর সুযোগ দেওয়া উচিত।

(৭) জিজ্ঞাসা বিভাগের বিন্যাস ব্যাপক ভিত্তিতে করতে হয়। সামান্যতম তথ্য আহরণ থেকে সুরু করে বিষয় বিশেষের জটিলতম গ্রন্থি মোচন পর্যন্ত এই বিভাগের কর্মপরিসর। যে কোনো শ্রেণীর গ্রন্থাগারেই উক্ত দ্বিবিধ তথ্যানুসন্ধানী আসতে পারেন।

(৮) বইএর বরাত দেওয়া ও পরিগ্রহন থেকে স্থরু ক'রে প্রযুক্তি পর্যায় ও মঞ্চ সংস্থান পর্যন্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ড মসৃণভাবে যাতে একের পর এক সম্পন্ন হয় এবং পাঠকরা চটপট বই পান সেই দিকে নিবদ্ধ-লক্ষ্য হয়ে কর্মপরিচালনা করা প্রয়োজন। একটার সঙ্গে আরেকটা যেন জড়িয়ে না যায়।

(৯) গ্রন্থ সংগ্রহ এবং অন্যান্য কাজ বিচ্ছিন্নভাবে বা বিকেন্দ্রিত পদ্ধতিতে না করে যথাসম্ভব কেন্দ্রীভূত করা দরকার। কেন্দ্রীকৃত কাজে সংহতি বজায় থাকে, ভুলভ্রান্তি এড়ানো সহজ হয়। যে সব ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রিত ভাবে শাখা গ্রন্থাগার বা বিভাগীয় গ্রন্থাগার গঠনের প্রয়োজন এড়ানো যায় না সে সব ক্ষেত্রে ক্ষমতার লোভে সমগ্র ভার কেন্দ্রের করায়ত্ত না রেখে বিভাগীয় কর্মীদের উপরে স্বাধীনতা অর্পন করা বিধেয়। এ সব স্থলে লক্ষ রাখা দরকার অর্থবণ্টন এবং পুস্তকাদি পরিগ্রহণে সামগ্রিক সমস্যার সৃষ্টি না হয়।

(১০) গ্রন্থাগার নিয়ম নেতি মূলক না হয়ে ইতি মূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়। নিষেধের পরিবর্তে সহায়ক বিধি। করণীয় প্রকরণের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখে এবং ব্যবহারিক স্থবিধার প্রতি উদাসীন না থেকে গ্রন্থাগারিক নিয়ম গঠন করবেন।

প্রযুক্তি তত্ত্বের মূল কথা, গ্রন্থাগার বৃত্তি জ্ঞানসামগ্রীর এবং জ্ঞানপ্রার্থীর মধ্যে সেতু নির্মান করে, সংযোগ বিধান করে। এই সংযোগের উপকরণ হিসেবে গ্রন্থাগার নিয়ম, গ্রন্থ ভবনের বন্দোবস্ত, ব্যবহার্য সামগ্রীর বিন্যাস, প্রযুক্তির যাবতীয় কৌশল ও অনুষঙ্গ, এবং—সর্বোপরি কর্মীদের ব্যবহার ও চালচলন যেন কোনো বাধার সৃষ্টি না করে সেদিকে নজর রাখতে হয়, সেই দিক থেকে বিচার বিবেচনা করে দেখতে হয়।

## (২) কর্মী নিয়োগের সূত্র

গ্রন্থাগারের বিভাগগুলিতে কর্মী সংখ্যা নির্ভর করে কাজের পরিমান ও ব্যাপ্তির উপরে। সাধারণত সমগ্র পুস্তক সংখ্যা এবং ব্যবহারক পাঠক সংখ্যার বিচারেই কর্মী নিযুক্ত হন। কোনো গ্রন্থাগারে সামগ্রিক ভাবে সবগুলি প্রয়োজনীয় বিভাগ আছে, ধরে নিয়ে প্রত্যেকটির কত সংখ্যক কর্মী থাকা উচিত তার একটা ব্যবহারিক সূত্র আছে। রঙ্গনাথন-কৃত এই সূত্রে দেখা

যায় গ্রন্থাগারের দৈনন্দিন কর্ম সময়ের অনুপাতে সঞ্চারণ বিভাগের কর্মী সংখ্যা নির্ধারিত হয়। পুস্তক বিভাগের কর্মী সংখ্যা স্থির হয় প্রতি বছরে সংগৃহীত বইএর অনুপাতে। এই হিসাব অনুযায়ী বাৎসরিক ৬০০০ গ্রন্থ সংযোজনের জন্য একজন কর্মী, বাৎসরিক ১৫০০ কর্ম- ঘণ্টার জন্য একজন করে সঞ্চারন বিভাগীয় কর্মী. ৩০০০ বই এর তদারকির জন্য একজন করে পরিপোষণ বিভাগের কর্মী, ৫০০ পত্রিকার জন্য একজন হিসাবে, ২০০০ গ্রন্থ সংযোজনের জন্য প্রযুক্তি বিভাগে একজন হিসাবে কর্মী নিয়োগ যুক্তিযুক্ত।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ নিয়োজিত গ্রন্থাগার উপদেষ্টা সমিতি [১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দ] যে সূত্র নির্দেশ করেছে তাতে দেখা যায়, ১] পুস্তক বিভাগে প্রতি ৬০০০ গ্রন্থ সংযোজনের জন্য একজন হিসেবে কর্মী, ২] সাময়িকী বিভাগে প্রতি ৫০০ চালু পত্রিকার জন্য একজন ক'রে কর্মী ৩] নথিকরন [Documentation] বিভাগে প্রতি হাজার আখ্যা পিছু একজন কর্মী, ৪] প্রযুক্তি বিভাগে প্রতি দু'হাজার সংযোজিত গ্রন্থের জন্য একজন, ৫] জিজ্ঞাসা বিভাগে প্রতি ৫০ জন জ্ঞানার্থীর সহায়তায় একজন, ৬] সঞ্চারণ বিভাগে প্রতি দেড় হাজার ঘণ্টা কাজের হিসেবে একজন, ৭] পরিপোষণ বিভাগে প্রতি ৬০০০ সংযোজিত গ্রন্থের হিসাবে একজন, প্রতি ৫০০ গ্রন্থ চলাচলের দৈনিক হিসাবে একজন এবং প্রতি একলক্ষ গ্রন্থ সংগ্রহের ভিত্তিতে একজন করে কর্মী, ৮] পরিচালনা বা দপ্তরের কাজের জন্য ন্যূনপক্ষে একজন হিসাবরক্ষক, একজন ষ্টেনোটাইপিষ্ট এবং একজন কেরানি, ৯] সামগ্রিক তত্ত্বাবধানের জন্য মূল গ্রন্থাগারিক এবং অন্তত একজন উপগ্রন্থাগারিক, প্রতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত একজন ক'রে সহকারী গ্রন্থাগারিক, ১০] সাধারণ কাজকর্মের জন্য প্রতি ৩০,০০০ গ্রন্থের হিসাবে একজন পরিষ্কারক, প্রতি ৬০০০ গ্রন্থ সংযোজনের হিসাবে একজন, প্রতি ৫০০ চালু পত্রিকার পিছনে একজন এবং সঞ্চারণের এককেটি কালপর্যায়ের [shift] জন্য একজন করে পরিচালক প্রয়োজন। এছাড়াও অবকাশী কর্মীর পরিপূরক হিসেবে আনুপাতিক উদ্ধৃত্ত কর্মী, দ্বারবান, দপ্তর পরিচালক এবং এ জাতীয় অন্যান্য কাজের জন্য প্রয়োজন মতো কর্মী নিয়োগের কথা বলাই বাহুল্য।

উপরোক্ত সংস্থারই ব্যবস্থাপনায় একটি আলোচক মণ্ডল [seminar] গ্রন্থাগার কর্মীদের যে মান নির্ধারণ করেছিলেন [১৯৫৯ খ্রীঃ] তার মধ্যে

উল্লেখযোগ্য : ১) পুস্তক বিভাগে প্রতি ২০০০ গ্রন্থের জন্য একজন করেকর্মী প্রয়োজন ; তার মধ্যে অন্ততপক্ষে একজন বৃত্তি কুশলী (professional) কর্মী থাকা আবশ্যক। ১) প্রযুক্তি বিভাগে বর্গীকরণ ও সূচীকরণ প্রকল্পের জন্য বছরে ৫০০ বই সংযোজিত হয় ধরে নিলে চারজন কর্মী আবশ্যক ; এবং তার মধ্যে অন্তত দু'জন, – অর্থাৎ এই বিভাগের সমগ্র কর্মীর অন্তত অর্ধেক,—বৃত্তি কুশলী কর্মী থাকা দরকার, বাকি অংশ অর্ধকুশলী (semi-professional) হতে পারেন। ৩) সাময়িকী বিভাগে প্রতি ৫০০ পত্রিকার জন্য একজন করে কর্মী ; এই বিভাগেও অন্তত একজন বৃত্তিকুশলী কর্মী আবশ্যক। ৪] পরিপোষণ বিভাগের জন্যও পূর্ব অনুচ্ছেদে প্রদত্ত হিসাবের পরিপ্রেক্ষিতে অন্তত একজন কর্মীর বৃত্তিকুশলী এবং বাকিদের অর্ধকুশলী হওয়া প্রয়োজন। ৫] ঐ একই নিয়মে সঞ্চারণ বিভাগেও অন্তত একজন বৃত্তিকুশলী; বাকিরা অর্ধকুশলী। ৬] তথ্য বিভাগের যাবতীয় কর্মীরই বৃত্তিকুশলী হওয়া প্রয়োজন। ৭] পুস্তক সংগ্রহ এবং পরিগ্রহণের জন্য প্রতি ১৫,০০০ বই হিসাবে একজন কর্মী ; এই বিভাগেও অন্তত একজন বৃত্তিকুশলী থাকবেন। গ্রন্থ সংখ্যা লিখবার জন্য প্রতি ১৫০০০ গ্রন্থ পিছু একজন কর্মী থাকা দরকার, —ইনি অর্ধকুশলী হতে পারেন।

বৃত্তি কুশলী গ্রন্থাগারিক দুই ধরণের। উচ্চমানের কুশলতার জন্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উচ্চতম উপাধি এম. লিব., অথবা সাধারণ শিক্ষাক্রমের এম. এ, এবং ঐ সঙ্গে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বি. লিব. উপাধিধারী হওয়া দরকার। দ্বিতীয় পর্যায়ের কুশলীরা হবেন সাধারণ বি. এ. এবং ঐ সঙ্গে বি. লিব. উপাধিধারী। অর্ধকুশলী কর্মীদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শংসাপত্রের [certificate] অধিধারী হতে হয়। এছাড়াও গ্রন্থসেবক এবং পরিচারক শ্রেণীর কর্মীদেরও চাকুরিক বৃত্তিকুশলতা থাকা উচিত। কেননা সমগ্র গ্রন্থাগার প্রকল্পই প্রযুক্তিক কর্ম। এজন্য গ্রন্থাগারের অভ্যন্তরেই উপরোক্ত শ্রেণীর কর্মীদের বৃত্তিশিক্ষা আয়ত্ত করার ব্যবস্থা গ্রহনীয়। কর্মী নিয়োগের এই সূত্র জনগ্রন্থাগার এবং অন্যান্য শ্রেণীর গ্রন্থাগারেও প্রযোজ্য। জনগ্রন্থাগারে অবশ্য জনসংযোগের জন্যও কিছু কর্মীর প্রয়োজন হয়। যেমন দৃষ্টি-শ্রুতি সহায় [audio-visual aids] প্রকল্পের জন্য অথবা গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থসম্ভার নিয়ে যাবার জন্য। বিশেষ গ্রন্থাগারে সার-সংকলন বা নথিকরণের প্রয়োজনে বাড়তি কুশলী কর্মী নিয়োগ করতে হয়।

## (৩) অর্থ বন্টনের সূত্র

গ্রন্থাগারের প্রধান অর্থাগমের সূত্র সরকার অথবা সংস্থা। এছাড়াও অবশ্যই অন্যান্য অপ্রধান আয়ের উৎস থাকতে পারে। জনগ্রন্থাগারের অর্থ মঞ্জুরী সরাসরি ভাবে গ্রন্থাগারের জন্যই আসে। বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল অর্থ-মঞ্জুরী সামগ্রিক ভাবে প্রতিষ্ঠানের জন্য আসে এবং সেই অর্থেরই অংশ বিশেষ বরাদ্দ করা হয় গ্রন্থাগারের জন্য। জনগ্রন্থাগারে বিভিন্ন খাতে খরচের হার সাধারণত কর্মীদের বেতন বাবদ শতকরা ৬০ ভাগ, পুস্তক ও পত্রিকা বাবদ শতকরা ২০ ভাগ, এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচের জন্য বাকি ২০ ভাগ রাখলেই ভাল। গ্রন্থাগার বিশেষে এই হারে তারতম্য ঘটতে পারে। পরিচালনার খরচ এবং পুস্তকাদি ক্রয়ের খরচ সমান পরিমাণের হতে পারে। তবে বইএর জন্য বরাদ্দ বাড়িয়ে পরিচালনার খরচ কমালেই ভাল ফল হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বমোট অর্থ থেকে শতকরা পাঁচ থেকে সাড়ে সাত হারে গ্রন্থাগারের বরাদ্দ থাকা উচিত। নূতন বিভাগ প্রবর্তন এবং দ্রুত উন্নয়ন প্রকল্পের প্রয়োজনে এই হার বাড়ানোও সমীচীন। উত্তম গ্রন্থাগার পুস্তক-খাতের দ্বিগুন পরিমাণ অর্থ কর্মী-খাতে বরাদ্দ করে। রঙ্গনাথনের সূত্র অনুযায়ী পঠন-সামগ্রী, কর্মী-বেতন ও অন্যান্য খরচের হার নূতন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ৫ : ৪ : ১ এবং চালু প্রতিষ্ঠানে ৪ : ৫ : ১ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্য শিক্ষার্থীর হিসাবে আরেকটি আর্থিক সূত্র আছে। প্রতি ছাত্র বাবদ ১৫্ টাকা এবং প্রত্যেক শিক্ষক ও গবেষক বাবদ ২০০্ টাকা। অনেকে পুস্তক খাতে অর্থ বরাদ্দের মধ্যে কোন কোন বিষয়ের জন্য কী পরিমাণ টাকা খরচ হতে পারে বা খরচ করলে চলে তারও একটা হিসাব ধরেন। এই হিসাবে সমগ্র ধার্য অর্থের শতকরা ৩ ভাগ সাধারণ শ্রেণীর গ্রন্থের জন্য, শতকরা ৪ ভাগ দর্শন বিষয়ক গ্রন্থের জন্য, শতকরা ৫ ভাগ ধর্মগ্রন্থ বাবদ, ৭ ভাগ সমাজ বিজ্ঞান, ৪ ভাগ ভাষা বিজ্ঞান, ৯ ভাগ সাধারণ বিজ্ঞান, ৯ ভাগ ব্যবহারিক বিজ্ঞান, ৭ ভাগ চারুকলা, সংগীত ও বিনোদন বিষয় সমূহের জন্য, ২৮ ভাগ সাহিত্য, ৮ ভাগ ইতিহাস, ৮ ভাগ জীবনী গ্রন্থ এবং ৮ ভাগ ভ্রমণ সংক্রান্ত পুস্তকের জন্য ব্যয়িতব্য। এ জাতীয় ব্যয়ের ধরাবাঁধা নিয়ম করা কঠিন হলেও প্রত্যেক বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট অর্থাঙ্ক রাখতেই হয়।

## (৪) আন্তঃ গ্রন্থাগার পুস্তক ঋণ

যে কোনো দেশে যে কোনো গ্রন্থাগারই কখনো কখনো এমন অবস্থার সম্মুখীন হয় যখন দেখা যায় সেটির সংগ্রহে নির্দিষ্ট কোন বই নেই। বই নানা কারণেই না-থাকা সম্ভব। হয়ত অর্থাভাব বশত কেনা হয়নি, অথবা দুষ্প্রাপ্য ব'লে সংগ্রহ করা যায়নি, অথবা হারিয়ে বা নষ্ট হয়ে গিয়েছে এমনও হ'তে পারে বইটি ফরমাশ দিয়েও মেলেনি বা পেতে দেরি হচ্ছে। কারণ যাই হোক না কেন, পাঠকের প্রয়োজনে বইটি সম্ভব পক্ষে সংগ্রহ ক'রে দিতে গ্রন্থাগারকে এক হিসেবে চুক্তিবদ্ধ বলা যায়। এই রকম পরিস্থিতিতে কাছের বা দূরের কোনো গ্রন্থাগার থেকে বইটি ঋণ ক'রে এনে দেন গ্রন্থাগারিক। নির্দিষ্ট সময় সীমার চুক্তিতে এ জাতীয় ঋণ প্রকল্প সব দেশের গ্রন্থাগারেই আজকাল চালু হয়েছে। গ্রন্থাগারগুলি পারস্পরিক লেন-দেন প্রকল্পকে সম্মান দেয়। পুস্তক ঋণের এই ব্যবস্থায় স্বভাবতই খরচের প্রশ্ন জড়িত থাকে। তাই গ্রন্থাগারের ব্যয় বরাদ্দ খাতে এ জন্যও কিছু অর্থের বন্দোবস্ত থাকে। অলিখিত নিয়মে যে গ্রন্থাগার ঋণ নেয় সে-গ্রন্থাগারই নেওয়া ও ফেরৎ দেওয়ার খরচ বহণ করে। আন্তঃ গ্রন্থাগার ঋণ প্রকল্প ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম তৈরি এবং চালু করেন রঙ্গনাথন তাঁর রাজ্য মাদ্রাজে। সর্বগ্রাহ্য এই প্রকল্পের কয়েকটি কানুন বা নীতি নিম্নরূপ : (১) স্বল্প মূল্যের বই এবং যে বই বাজারে সুলভ সেগুলি ঋণ যোগ্য নয় ; (২) দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ অথবা সাময়িক পত্র ঋণ দান বা প্রত্যাখ্যান গ্রন্থাগারিকের ইচ্ছা অনুযায়ী হবে ; (৩) গ্রহীতা গ্রন্থাগার বইটি নিয়ে আসা ও ফেরৎ দেবার যাবতীয় ব্যয় বহণ করবে, এবং বইটি জখম হলে বা হারিয়ে গেলে সেজন্য দায়ী থাকবে ; (৪) বইটি গ্রহীতা গ্রন্থাগারের চৌহদ্দীর মধ্যে ব্যবহার করতে হবে, বাইরে নিয়ে যাওয়া বারণ ; (৫) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, অথবা দাতা গ্রন্থাগারের বিশেষ প্রয়োজন ঘটলে তা'র আগেই বইটি ফেরৎ দিতে হবে।

এই প্রকল্পের ফলে স্বভাবতই বিদ্যার্থীদের সুবিধা খুবই বেড়েছে, গ্রন্থাগারও তাঁদের সেবায় বিশিষ্টতা অর্জন করবার সুযোগ পাচ্ছে। বিশেষ একটি বইএর সন্ধানে বিদ্যার্থীদের ইতস্তত দৌড়াদৌড়ি করতে হচ্ছেনা, কাজের ক্ষতি ক'মে গতি ক্ষিপ্র হয়ে উঠেছে। উপরন্তু, এই সুবাদে কোনো গ্রন্থাগার ইচ্ছে করলে কোনো একটি বিষয়ের সংগ্রহ পূর্ণতর করার দিকে নজর দিতে পারে, যা'র

ফলে একেক দেশে বা একেক অঞ্চলে বিষয়-কেন্দ্রিক গ্রন্থাগারও গ'ড়ে উঠতে পারে। বিষয়ান্তরের জন্য পরস্পর ঋণ-প্রকল্প চালু থাকলে বিদ্যার্থীদেরও ব্যাঘাত ঘটেনা।

## সংযুক্ত গ্রন্থসূচী

বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সুবিধার জন্য, বিশেষ করে আন্তঃ গ্রন্থাগার ঋণ-প্রকল্পের সুবিধার্থ আজকাল প্রায় সব দেশেই সংযুক্ত গ্রন্থসূচী বা গ্রন্থ তালিকার ( Union catalogue ) প্রথা চালু হয়েছে। এর ফলে কোনো গ্রন্থাগার সহজেই জানতে পারে অন্যান্য গ্রন্থাগারের সংগ্রহে কী কী বই আছে। এই প্রকল্পের জন্য গ্রন্থাগার গুলিকে প্রচলিত গ্রন্থসূচী বা গ্রন্থতালিকা ছাড়াও বাড়তি সূচী প্রস্তুতের জন্য অর্থের সংস্থান রাখতে হয়। পাঠ্যপুস্তক বা সাধারণ শ্রেণীর বই ঋণ প্রকল্পে পড়েনা। কেননা এগুলি স্থায়ী মূল্য সাধারণত কম হয়, সাধারণত এগুলি সহজ লভ্যও। যে সব বইএর স্থায়ী এবং গবেষণা মূল্য আছে সেগুলিই বিশেষ করে সংযুক্ত সূচী প্রকল্পের আওতায় আসে। যেমন, (১) গবেষণা মূলক পত্রিকা, (২) অপ্রচলিত বা স্বল্প প্রচলিত ভাষার বই (৩) অধিক মূল্যের গবেষণা গ্রন্থ, এবং (৪) দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ।

প্রতি গ্রন্থাগার যদি অপরাপর গ্রন্থাগারের যাবতীয় সম্পদ সম্পর্কে তালিকা রাখতে পারে তাহলে অবশ্যই উপকার হয়। কিন্তু ব্যাপারটা এত বৃহৎ হয়ে পড়ে যে সামলানো দায় হয়ে ওঠে। বহু গ্রন্থাগারই তাদের গ্রন্থতালিকা ছাপিয়ে বইএর আকারে বা'র করে, বিশেষত যে সব প্রাচীন গ্রন্থের সংগ্রহ। সমগ্র-ভাবে মুদ্রিত তালিকা প্রস্তুতও বিরাট কাণ্ড। এ জাতীয় তালিকার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিয়েও নির্বাচিত কার্যকর তালিকার সপক্ষে যুক্তি রাখা যায়। আজকাল সূচীপত্রকই প্রকৃষ্ট তালিকা। সুতরাং তা'র কার্যকর সম্ভাব্য আকার বিবেচনা করতে হয়। এবং খরচের দিকটাও উপেক্ষা করা যায়না। সেজন্যই আংশিক পুস্তক তালিকা অথবা সূচীপত্রকের আংশিক সঞ্চয় বিবেচনার বিষয়। বিশেষ শ্রেণীর পুস্তকের তালিকা রাখা যেতে পারে, অথবা কেবলমাত্র গ্রন্থাগার পত্রক বা বিষয় পত্রক রাখা যেতে পারে।

## (৫) পুস্তক নির্বাচন (Book Selection)

গ্রন্থাগারের প্রথম ও প্রধানতম কাজ গ্রন্থ সংগ্রহ। গ্রন্থ না থাকলে কী নিয়ে চলবে গ্রন্থাগার? গ্রন্থ সংগ্রহের ব্যবহারিক কর্মক্রমের আরম্ভই পুস্তক নির্বাচন দিয়ে। উপযুক্ত বইটি উপযুক্ত পাঠকের হাতে ঠিক সময় মতো জুগিয়ে দেওয়াই পুস্তক নির্বাচনের লক্ষ্য। পুস্তক নির্বাচনের মধ্যে বই ও পড়ুয়ার সুষ্ঠু সংযোগ প্রচেষ্টা বিদ্যমান। গ্রন্থাগারের মূল্য নির্ভর করে নির্বাচিত পুস্তকের মানের উপরে। গ্রন্থাগার পরিচালনা যতই নিখুঁত হোক না কেন, নিকৃষ্ট দরের বই দিয়ে ভরাট করলে তার কদর হয় না। এজন্য নির্বাচনে নীতি মেনে চলতে হয়। পুস্তক নির্বাচনের নিজস্ব দার্শনিক ভিত্তি এবং প্রয়োগবিধি আছে। পুস্তক সংগ্রহ ও পরিগ্রহন, বর্গীকরণ ও সূচীকরণ, সঞ্চারন ও নথিকরণ—সব প্রকল্পের পুরোভাগে আছে পুস্তক নির্বাচন। নির্বাচনের জন্য প্রথমেই গ্রন্থাগারিককে তাঁর পাঠকমণ্ডলীর মানসিক গঠন, প্রবণতা ও চাহিদা সম্পর্কে ধারণা ক'রে নিতে হয়। কেননা, তিনি কেবলমাত্র বইএর অছিদার নন, তিনি জ্ঞানার্থীদের দরদী সেবক। তাই গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক পরিপার্শ্ব ও সমাজের কাঠামো এবং গঠন অনুযায়ী গ'ড়ে তুলতে হয় গ্রন্থসম্ভার।

পুস্তক নির্বাচনের তিনটি উপাদান; বই, পাঠক এবং আর্থিক সঙ্গতি। বইএর গুণাগুণ বিচারের ক্ষমতা নির্বাচকের থাকা দরকার, থাকা দরকার পাঠক সাধারণের প্রবণতার স্বরূপ এবং চাহিদার যাথার্থ নির্ণয় করবার ক্ষমতা। গ্রন্থাগারের আর্থিক সঙ্গতির পরিমাণ বুঝে নির্বাচনের পূর্বে তিনি দেখে নেবেন কোন বইগুলি ইতিপূর্বেই গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হয়েছে, বিচার করবেন কোন বইএর দ্বিত্ব অবাঞ্ছিত, বিষয় বিশেষের প্রতিনিধিত্ব করবার পক্ষে কোন বই উপযুক্ত, এবং কোন বই না কিনেও প্রয়োজন হলে আশে পাশের গ্রন্থাগার থেকে ঋণ নেওয়া সম্ভব। তাঁর নীতি সর্বাধিক পাঠকের জন্য সর্বনিম্ন অর্থব্যয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক সংগ্রহ।

পুস্তক নির্বাচনের উপাদান হিসেবে প্রথমেই পাই চাহিদা—পাঠকদের কাছ থেকে বইএর জন্য চাহিদা। এই চাহিদা স্বতস্ফূর্ত হতে পারে অবশ্যই, আবার গ্রন্থাগারও চাহিদার সৃষ্টি করে। বইএর বস্তুগত কোনো মূল্য থাকে না যদি সেটি কেউ না পড়ে। পড়া না হলে বইএর সঙ্গে শাদা কাগজের মূল্যগত পার্থক্য কিছু নেই। তাই নির্বাচকের সামনে তাঁর কাজের কয়েকটি

পর্যায় বা ধাপ থাকে। তিনি উপলব্ধি করেন—অনুভূতি প্রয়োগে জানতে পারেন সমাজে কোনো বইএর জন্য অথবা কোনো বিষয় সম্পর্কে জানবার জন্য আগ্রহ দেখা দিয়েছে। এই আগ্রহের তিনি পরিমাপ করেন, স্বরূপ যাচাই ক'রে দেখেন এবং বিষয়টির মূল্যায়ন করেন। মূল্যায়ন এবং চাহিদার মাত্রা নির্ণীত হবার পর তিনি এর বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নিশ্চিত হবার চেষ্টা করেন। জ্ঞানস্পৃহা বিষয়টির ঠিক কোন অংশে বা কোন দিকে নিবদ্ধ, যাঁরা জানতে বা পড়তে চান তাঁদের সংখ্যা কত এবং তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতার মান কোন ধরণের, ইত্যাদি তিনি বিশ্লেষণ করেন। তারপরে আর্থিক সঙ্গতি অনুসারে তিনি এমন বই বাছাই করেন যেটিতে বক্ষ্যমান বিষয়ের সার্বিক বা প্রাসঙ্গিক আলোচনা থাকে। বিশেষ কোন একটি বইএর চাহিদার ক্ষেত্রে এতগুলি দিক বিবেচনা বা বিচার করবার প্রয়োজন অবশ্য হয়না। কিন্তু একটি বই আরো অনেক বই টেনে আনে ; একই বিষয়ের বিভিন্ন বই অথবা বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যাবার আকাঙ্খা জনিত বই। এই কারণেই নির্বিচার নির্বাচন চলেনা। বইএর সংখ্যা বৃদ্ধি আর্থিক ক্ষমতা নির্ভর, কিন্তু সংখ্যা বৃদ্ধিই মান নিয়ামক নয়। বড় গ্রন্থাগার হলেই যে ভাল গ্রন্থাগার হবে তা নয়, বরঞ্চ তাতে গ্রন্থাগার গ্রন্থাগারিক ও পাঠকের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। সুনির্বাচিত ছোট গ্রন্থাগারও কাজের বেলায় 'বড়' হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেন, "ছোট লাইব্রেরি বলতে আমি এই বুঝি, তাতে সকল বিভাগের বই থাকবে, কিন্তু একেবারে চোখা চোখা বই। বিপুলায়তন গণনার বেদীতে নৈবেদ্য জোগাবার কাজে একটি বইও থাকবে না, প্রত্যেক বই থাকবে নিজের বিশিষ্ট্য মহিমা নিয়ে।" রঙ্গনাথনের প্রথম নীতিও বলে, বই ব্যবহারের জন্য (Books are for use)। তাই খুব ভেবে-চিন্তে বই বাছাই ক'রে কেনা দরকার।

চাহিদা নির্ধারণের তিনটি বিশেষ সূত্র বর্তমান। চাহিদার অনুপাত নির্ণয়ে বিচার ক'রে দেখতে হয় মূল্য, —বিষয়-ভর মূল্য (Value), পরিমান (Volume) এবং প্রকার বা বৈচিত্র্য (Variety)। আগ্রহ থেকেই চাহিদার সৃষ্টি। এই আগ্রহ দুই তরফেরই ; কোনো বই পড়বার জন্য বা কোনো বিষয়ে জানবার জন্য পাঠক ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারেন, অথবা সমাজসেবী গ্রন্থাগারিক সেই ইচ্ছার প্রেরণা জোগাতে পারেন। এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণযোগ্য :—"শুধু পাঠক লাইব্রেরিকে তৈরি করে তা নয়, লাইব্রেরি

পাঠককে তৈরি ক'রে তোলে"। চাহিদা নিরূপণে প্রকৃত চাহিদা এবং সম্ভাব্য চাহিদা উভয়ই বিচার ক'রে দেখতে হয়; যে সব বিষয়ের বই পূর্ব থেকেই সংগ্রহে আছে তা'র ভিত্তিতে আরো বইএর জোগান দেবার দরকার হয়। এমন অনেক বই থাকে যেগুলি সাধারণের গোচরে আনতে হয়। তাই চাহিদার মূল্যায়নে কোনো বিশেষ বই বা বিশেষ বিষয়ের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়ে অন্যগুলিকে তুচ্ছ করা চলেনা। আবার একথাও সত্য যে নির্বাচক বিচার ক'রে যাচাই ক'রে বোঝেন কোন বই আকাঙ্খিত. কোন বই অবাঞ্ছিত, কোন বই মোটামুটি ভাবে কাম্য। তিনি সেই যুক্তি বুদ্ধিতে নির্বাচন কার্যকরী ক'রে তুলবেন। চাহিদার পরিমাণ নির্ণয়ে প্রকাশিত চাহিদা এবং অপ্রকাশিত চাহিদা, —অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে যে সব বইএর জন্য দাবি জানানো হয়েছে এবং যে সব বই সম্ভাব্য দাবি নিয়ে হাজির হতে পারে, —সে সবই বিবেচনার পর্যায়ে আসে। মূল্যায়ন এবং পরিমাণ নির্ধারণ নির্বাচকের সংগ্রহ সূত্রের কাজ করে। ঐ সঙ্গে চাহিদার প্রকার ও বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ আবশ্যক। একই বিষয়ের জন্য আগ্রহ নানা প্রকার হতে পারে। কেউ বা কেবলমাত্র সাধারণ ভাবে জ্ঞান আহরণ করতে চান, কেউ বা চান গবেষণার প্রয়োজনে, কেউ হয়ত চাইবেন প্রয়োগ কৌশলের জন্য। সুতরাং নির্বাচককে এই বৈচিত্র্যের দিকটাও ভেবে দেখতে হয়, নানান দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিবেচনা করতে হয়। অবশ্য বৈচিত্র্য প্রসঙ্গ চাহিদার পরিমাণকে প্রভাবিত করেনা, পুরোপুরি সাম্য বজায় রেখে কোনো সংগ্রহ গ'ড়ে উঠতে পারেনা। তবু বৈচিত্র্যের দিকটা উপেক্ষনীয় নয়। কোনো একটি বিশেষ বিষয়ের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রকারের বই যেমন রাখা দরকার তেমনি সবগুলি বিষয়েরই বিভিন্ন দিকের বই রাখা দরকার। যেমন, বিজ্ঞান বিভাগে শব্দের গতি নিরূপণ বা মানুষের জীবনে শব্দের প্রভাব বা ধ্বনির আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ইত্যাদি।

প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত চাহিদা, —অর্থাৎ সরাসরি ভাবে বই পড়াবার আগ্রহ এবং কোনো বইএর প্রতি সম্ভাব্য আগ্রহ বিচার ক'রে দেখতে গ্রন্থ-নির্বাচক কয়েকটি পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন। ব্যক্তিগত যোগাযোগের ভিত্তিতে জনগণের আগ্রহ বা দাবি জেনে নিতে পারেন, বা সরাসরি ভাবে বইএর জন্য দাবি-পত্র আহ্বান করতে পারেন। দ্বিতীয়ত, পাঠকরা কিভাবে কত পরিমাণে গ্রন্থাগার ব্যবহার করছেন তা'র হিসাব নিয়ে দেখতে পারেন, —কোন বই কয়বার কতজন পাঠক পড়েছেন, কোন পাঠক কতবার কোন

ধরণের বই পড়তে নিয়েছেন, কোন ধরণের তথ্য জিজ্ঞাসা নিয়ে পাঠকরা আসেন, ইত্যাদি। তৃতীয়ত, গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক সমাজের একটা পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা যায়। গ্রন্থাগারের প্রসঙ্গ নিয়ে জনসাধারণের কাছে উপস্থিত হয়ে তাদের প্রবণতা জেনে নেওয়া যায়।

উক্ত সব প্রকল্পই জনগ্রন্থাগারে প্রযোজ্য কর্মক্ষেত্র। বিশ্ববিদ্যালয়াদি বা বিশেষ গ্রন্থাগারের বেলায় এ সমস্যা জটিল নয়। সেখানে পাঠকেন্দ্রিক পুস্তক নির্বাচন সাধারণত একটা বাঁধা খাতে চলে। এমন কি, চাহিদা থাকা সত্বেও কোনো বিশেষ বই গ্রন্থাগারে রাখা বা না-রাখার দায়িত্ব গ্রন্থাগারিক অথবা গ্রন্থাগার সমিতি সহজেই নিতে পারেন। শিক্ষায়তনের গ্রন্থসংগ্রহ পাঠ্য বিষয়কে কেন্দ্র করেই মূলত গ'ড়ে ওঠে, এবং সাধারণ পাঠের বই সীমিত সংখ্যায় সংগ্রহ করা যায়, —খুব একটা ধরা-বাঁধা নিয়ম না মানলেও চলে। কিন্তু জনগ্রন্থাগারে পাঠক আসেন বিচিত্র ধরণের। বাজারে বইও বিচিত্রতর শ্রেণীর। চাহিদারও শেষ নেই। এক্ষেত্রে নীতি বজায় রেখে নির্বাচন সমস্যার সমাধান করা কঠিন কর্ম। তাছাড়া সর্বনিম্ন খরচে সর্বাধিক পড়ুয়ার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ বই বাছাই করতে গিয়ে মূলগত একটি সমস্যারও সম্মুখীন হতে হয়। সর্বশ্রেষ্ঠ বই ব'লে ছাপমারা কিছু নেই। ব্যাপারটা আপেক্ষিক। এক বিষয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ বই অন্য বিষয়ের পক্ষে অনুপযুক্ত। সর্বশ্রেষ্ঠ ব'লে বহুল বিজ্ঞাপিত এবং প্রচুর বিক্রীত বইও মূল্যায়নে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে নাও পারে। সুতরাং, প্রতি বিষয়ের জন্য স্বতন্ত্রভাবে শ্রেষ্ঠতার মান নির্ণয় করতে হয়। একই বিষয়ের মধ্যে কোন বই শ্রেষ্ঠতর তাও বিচার ক'রে দেখতে হয়। দ্বিতীয়ত, সর্বশ্রেষ্ঠ বই সর্বনিম্ন খরচে নাও মিলতে পারে। বিষয় বিশেষও দামের তারতম্য হতে পারে। তাই একটু বেশি দাম পড়লেও কোনো কোনো বইএর ব্যাপারে সেটাকেই উৎকৃষ্ট পন্থা ব'লে মেনে নেওয়া উচিত। শস্তার তো আবার তিন অবস্থাও হতে পারে। বই সুমুদ্রিত এবং টেঁকসই কিনা তাও দেখা দরকার। তৃতীয়ত, সর্বাধিক লোক হয়ত সর্বশ্রেষ্ঠ বই পড়ে না। এক্ষেত্রেও প্রবণতা এবং পুস্তকের মধ্যে যুক্তি-বুদ্ধি খাটিয়ে সামঞ্জস্য রাখতে হয়। সংখ্যাবৃদ্ধি হবার ভয় মনে না রেখে উত্তম বই অনেক সময়ে দ্বিগুণিত করাও সূত্র বিরোধী নয়। সমগ্র পৃথিবীর কথা না ভেবে স্থানিক ইতিহাস, ভূগোল, সমাজ সংস্থান প্রভৃতির বই বেশি পরিমাণে রাখলে গ্রন্থাগারের শ্রীবৃদ্ধিই হবে। পলকা কাগজে খারাপ ভাবে ছাপানো

শস্তা বই কিনে একটু বেশি দাম দিয়ে পোক্ত সংস্করণ—যাকে বলে গ্রন্থাগার সংস্করণ কিনলে পরিমাণে ব্যায়ের লাঘবতারই সহায়ক হবে নিঃসন্দেহ। স্থানীয় বই শ্রেণী ও মত নির্বিশেষে সংগ্রহ করলে সকলেই উপকৃত হবেন। আন্তঃ গ্রন্থাগার সংযোগ রেখে চললে অনেক অনাবশ্যক সাধ্যাতীত পুস্তক ক্রয় রোধ করা যায়।

পুস্তক নির্বাচনের উদ্দেশ্য জনসমাজের প্রয়োজনে বইএর বিচিত্র জ্ঞানসম্ভার সুষ্ঠুভাবে উপস্থিত করা। গ্রন্থাগারের পদ্ধতি, —অর্থাৎ ব্যবহারক পাঠকবর্গের প্রবৃত্তি অনুযায়ী বই মজুত করা। এজন্য বইএর যথাযথ মূল্যায়ন প্রয়োজন। যে কোনো বিষয়ের বইই বাজারে অজস্র। প্রত্যেক বিষয়ের বইএর মূল্য বিচার ক'রে বাছাই করতে তাই কয়েকটি নীতি মেনে চলতে হয়। যেমন, বিজ্ঞানের বই বাছাই করার সময়ে দেখতে হয় সেটি যথেষ্ট সাম্প্রতিক প্রকাশন কিনা, বইটিতে তত্ত্বের ভার কতটা এবং সহজবোধ্য ক'রে লেখার চেষ্টাই বা কতটুকু, উদাহরণাদি যথোপযুক্ত কিনা। সাধারণ পড়ুয়ার কৌতুহল বা জ্ঞানতৃষ্ণা মিটাবার জন্য বেশি পাণ্ডিত্যপূর্ণ বইএর প্রয়োজন নেই। আবার নিবিষ্ট পাঠকের জন্য চাই বিস্তৃত আলোচনা। সংগীত বা চারুশিল্পের ক্ষেত্রেও এই দৃষ্টিভঙ্গি খাটে। দর্শন, ধর্ম, অর্থনীতি, ভাষা ও ইতিহাস বিষয়েও একই বিচার পদ্ধতি। জীবনী গ্রন্থ ও ভ্রমণ কাহিনীর ক্ষেত্রে সন তারিখের বা স্থান বিশেষের নির্ভুল তথ্যের সঙ্গে সঙ্গে বইটি সুখপাঠ্য কিনা তাও বিবেচ্য, এমন কিছু গুণও থাকা বাঞ্ছনীয় যা'কে 'নাটকীয়' ব'লে অভিহিত করা যায়। আজকাল জীবনী ও ভ্রমণ কাহিনীকে কেন্দ্র ক'রে বাংলা ভাষায় যে ধরণের বর্ণনা মূলক বই লেখা হচ্ছে সেগুলির ধরণ একটু বেশি মাত্রায় নাটকীয়, ভ্রমণ ছাপিয়ে গল্প উপন্যাসের মেজাজ এসে যাচ্ছে। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রেই তথ্য চাপা পড়ে যায় বা ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়, এমনকি তথ্যের অভাবও ঘটে। তা'তে উপযোগীতার দিকটা ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ে। সাধারণ হালকা মেজাজের পড়ুয়ার পক্ষে এ বই হয়ত উপযোগী। এর গুণকীর্তনে বলা যায় এ জাতীয় বই প্রচাচিত হয় বহুল ভাবে। নীরস ধরণের লেখা হ'লে এঁদের মধ্যে অনেকেই হয়ত বইটা পড়তেন না। আর ঝুঁকি বা আশঙ্কা এই যে তথ্যাদি সম্পর্কে ভ্রান্ত বা অস্পষ্ট ধারণা গ'ড়ে উঠতে পারে। সাহিত্য বিষয়ক বই বাছাই নিয়ে নানান দিক থেকেই সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। ধরাবাঁধা কোনো ছক নেই। চাহিদাও অফুরন্ত। তাই লেখার

ধরণ, উপস্থাপনের কায়দা, রুচির মান, বাস্তবানুগতা, জীবন মাত্রায় ও সমাজে উপযোগীতা প্রভৃতি দিক বিচার্য। সুনীতি বা দুর্নীতি, সুরুচি বা কুরুচি প্রশ্রয় পায় সাহিত্য কর্মেই বেশি। অন্যান্য বিষয়ে এর প্রবেশ কম। সাহিত্য জনগণের। সেজন্য এই ব্যাপারে ভেবেচিন্তে এগোতে হয়। অশ্লীলতা নিবারণ গ্রন্থাগারের কর্মধারার অন্তর্ভুক্ত না হলেও গ্রন্থাগারিকের সমাজ-সচেতনতা এবং দায়িত্ববোধের প্রসঙ্গ অনস্বীকার্য। যে কোনো রচনা নিরপেক্ষ ভাবে পাঠকদের কাছে দেওয়া গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য হলেও সমাজ কল্যাণ বিষয়ে অন্ধ নিরপেক্ষতা অকর্তব্য।

নির্বাচনের সূত্রে লেখকের পরিচয় ও পাণ্ডিত্যের মান, বিষয়ে প্রবেশের ক্ষমতা, বিষয়টির সম্যক জরিপ, উৎস ও উদ্ধৃতি, রচনারীতি প্রভৃতিরও বিচার অপ্রাসঙ্গিক নয়। অপ্রাসঙ্গিক নয় বইএর বহিরঙ্গ বিচার, – আখ্যাপত্রের বিবরণ, ছাপাই, বাঁধাই, কাগজ, চিত্র ও মানচিত্রাদি, গ্রন্থপঞ্জী, নির্দেশিকা ইত্যাদিও দেখে নেওয়া।

পুস্তক নির্বাচনে আরেকটি সমস্যা হয় দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ নিয়ে। বই নানা কারণেই বিরল হতে পারে। পুথি তো এমনিতেই দুর্লভ। কিন্তু এমন অনেক বই আছে যেগুলি সীমিত সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল, অথবা একটির পরে আর সংস্করণ বেরোয়নি। সেগুলিও প্রায় পুথিরই পর্যায়ে গিয়ে পড়ে। এ জাতীয় বই গবেষণার কাজে লাগে ব'লে গ্রন্থাগারের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। গ্রন্থাগারের প্রকার বা শ্রেণীর উপরে নির্ভর করে কোন ধরণের বই রাখা কর্তব্য। অনেক বেশি দাম দিয়ে কিনতে হলেও সেই খরচকে সঙ্গত এবং অনিবার্য মনে করতে হবে। আবার, কোনো বইএর চলতি সংস্করণ বাজারে সুলভ হলেও সেটিব প্রথম সংস্করণ অথবা বিশেষ কোনো সংস্করণ গবেষণার কাজে অপরিহার্য হয়ে পড়ে, এবং যেকোনো মূল্যে সেই বিরল বইটি সংগ্রহ করতে হয়। সময়ের পরিবর্তন বা দেশের অবস্থার পরিবর্তনের ফলেও পূর্ব প্রকাশিত কোনো বইএর জন্য হঠাৎ চাহিদা দেখা দিতে পারে। সে কালে হয়ত বিষয়টি তত বিশিষ্ট অথবা চাঞ্চল্যকর মনে হয়নি, একালে আবিষ্কৃত হয়েছে তার অমূল্যতা। রাজনৈতিক কারণে অনেক বই বাজেয়াপ্ত হয়, আবার রাষ্ট্রিক পরিবর্তনে নূতন ক'রে তার চাহিদা দেখা দেয়। এসব ক্ষেত্রে যাবতীয় খোঁজ খবর রাখা এবং বইটি সংগ্রহ করা সুযোগ্য নির্বাচকের কর্তব্য।

বই বাছাইএর সঙ্গে বই বাতিলের প্রশ্নও অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। কোন বই কেনা হবে যখন পছন্দ করতে বসা হয় তখন স্বভাবতই কোন পছন্দ করা হবেনা তাও বিবেচিত হয়। একটিকে বাছাই করা মানেই আরেকটিকে বাতিল করা। এছাড়াও বাতিলের কাজ গ্রন্থাগারের কর্মসূচীতে বরাবরই লেগে থাকে। গ্রন্থাগারের সংগ্রহ থেকেও নানান কারণে বই বাতিল করতে হয়। এর উদ্দেশ্য অনাবশ্যক ভার কমানো, এবং সেই শূন্যস্থান প্রয়োজনীয় বই দিয়ে ভরাট করা। বই একেবারে ছিঁড়ে খুঁড়ে গেলে, ব্যবহারের অনুপযুক্ত হলে বদল করতে হয়। অনেক বইএর প্রয়োজন সময় সীমানায় আবদ্ধ, সময় পেরিয়ে গেলে সে বই অকেজো হয়ে যায়। তখন বাতিল করতে হয়। নূতন সংস্করণ অথবা নবপ্রকাশিত গ্রন্থ কিনতে হয়। বাড়তি বইএর বোঝা দিয়ে গ্রন্থাগার ভ'রে তুললে সঠিক বইটি হয়ত কোন আড়ালে চাপা পড়ে থাকবে। বই মাত্রই প্রয়োজনীয় নিঃসন্দেহ, এবং বাতিল না করে রেখে দিলে কোনো একদিন হয়ত কারো কাজে লেগে যাবে সেকথাও মিথ্যা নয়, একথাও সত্য যে গ্রন্থাগারের কাজই বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন সংস্করণের বই গুছিয়ে রাখা। তবু অনেক বিষয়ের অনেক বইই কালক্রমে মূল্যহীন হয়ে পড়ে। পাঠ্য পুস্তক এবং বিজ্ঞান বিষয়ক বই নূতন ধারার সঙ্গে সঙ্গে পুরানো হয়ে যায়। আবার দর্শন, ধর্ম, সাহিত্য, ললিতকলার বই কখনোই পুরোনো হয়না। তাই এসব ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিক বিবেচনার সঙ্গে তাঁর নির্বাচন নীতি প্রয়োগ করেন। গ্রন্থাগারের ভার কমান, ধার বাড়ান। চিরন্তন মূলের বই জীর্ণ হয়ে গেলে বিশেষ যত্নে বাঁধিয়ে রাখেন, সাময়িক মূল্যের বই সংগ্রহ থেকে সরিয়ে ফেলেন।

পুস্তক নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন ভাষায় ও বিভিন্ন দেশে পুস্তক ব্যবসায়ীদের তালিকার সাহায্য নেওয়া যায়। তাছাড়া কোনো সংস্থা থেকে প্রকাশিত গ্রন্থপঞ্জীও রয়েছে। নমুনা হিসেবে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তালিকা বা পঞ্জীর নাম করা চলে। যেমন :—

(১) লণ্ডন থেকে প্রকাশিত 'লুইটেকার্স কিউম্যুলেটিভ বুক ইনডেক্স'; ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক সংকলনে প্রকাশিত হচ্ছে।

(২) 'ব্রিটিশ বুক্‌স্ ইন প্রিণ্ট'; বার্ষিক সংকলন।

(৩) 'এসলিব ( ASLIB ) বুক লিস্ট'; ১৯৫৩ থেকে মাসিক সংকলনে প্রকাশিত হচ্ছে।

(৪) 'ব্রিটিশ নেশনেল বিবলিওগ্রাফি'।

(৫) নিউয়র্ক থেকে বাত্তকার কোং কর্তৃক বার্ষিক সংকলনে প্রকাশিত 'বুক্‌স্ ইন প্রিণ্ট'।

(৬) নিউয়র্ক থেকে উইলসন কোং কর্তৃক মাসিক সংকলনে প্রকাশিত 'কিউম্যুলেটিভ বুক ইনডেক্স'।

(৭) লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস প্রকাশিত মাসিক সংকলন 'দি নেশনেল ইউনিয়ন ক্যাটালগ'।

(৮) 'ইণ্ডিয়ান নেশনেল বিবলিও গ্রাফি'।

(৯) সাহিত্য আকাদেমি, দিল্লী, প্রকাশিত 'দি নেশনেল বিবলিওগ্রাফি অফ ইণ্ডিয়ান লিটারেচার, ১৯১০—১৯৫৩।

(১০) 'নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা'; — বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ১৯৬২।

(১১) 'শিশু গ্রন্থপঞ্জী' —বানী বসু ; বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ।

(১২) 'পুস্তক তালিকা' —বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা ; ১৯৬৩।

(১৩) 'হিন্দি গ্রন্থসূচী' —সিংহ লাইব্রেরি, পাটনা।

## (৬) পুস্তক বিভাগের কর্মধারা

গ্রন্থাগার পরিচালনায় পুস্তক সংগ্রহ ও নিয়ন্ত্রণ প্রধান কাজ। সংগ্রহের নিয়মিত ধারা বজায় রাখা এবং নিয়মিত সঞ্চারণ ব্যবস্থা অবলম্বনের দায়িত্ব নিয়ে তৈরি পুস্তক বিভাগ। বই বাছাই করা, বই কেনা, নথিভুক্তি কাজের প্রথম পর্যায়। বর্গীকরণ ও সূচীকরণের পর সে বই মঞ্চে বিন্যস্ত করা, সঞ্চারণ বিভাগের আনাগোনা নিয়ন্ত্রিণ করা, সংগ্রহের হিসাব মিলিয়ে দেখা, বিনষ্টি থেকে বই রক্ষা করা এবং বাঁধানো—সবই এই বিভাগের আওতায় আসে।

পুস্তক বিভাগের প্রথম কাজ পুস্তক সংগ্রহ। পুস্তক দু'ভাবে গ্রন্থাগারে আসে, ক্রয় এবং উপহার। কোন বই কেনা হবে সেটা স্থির করবার ভার গ্রন্থাগারিকের উপরে থাকাই উচিত। তিনি অন্যান্য কেন্দ্র কর্তাদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে পুস্তক নির্বাচন করবেন। অনেকে মিলে নির্বাচন করা

ঠিক নয়, তা'তে গোলমাল ঘটতে পারে। তবে অনেকের কাছ থেকে পছন্দ মতো বই কেনবার প্রস্তাব -আহ্বান করতে হয়। বলা বাহুল্য, এর মধ্যে পাঠকরাও থাকবেন। বিশেষ করে জন গ্রন্থাগারে এ ধরণের প্রস্তাব ব্যাপক ভাবেই আহ্বান করা উচিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে বিভিন্ন বিভাগীয় অধ্যক্ষদের মাধ্যমে প্রস্তাব আসে। বই বাছাই-এর জন্য প্রকাশকদের গ্রন্থ-তালিকা, বিভিন্ন সংস্থা থেকে প্রকাশিত সমগ্র গ্রন্থ তালিকা, জাতীয় গ্রন্থসূচী —ভারতে যেমন ইণ্ডিয়ান নেশনেল বিবলিওগ্রাফি, এবং প্রকাশক সমিতি, গ্রন্থাগার সমিতি প্রভৃতির প্রকাশিত যৌথ গ্রন্থ তালিকার সাহায্য নেওয়া যায়। বাছাই-এর পরে পুস্তক নির্বাচন সমিতি অথবা গ্রন্থাগার সমিতির অনুমোদন নিয়ে পুস্তক বিক্রেতাদের কাছে বরাত দিতে হয়। প্রস্তাবকদের জন্য খাতা বা নথি রাখা যেতে পারে। তবে সুষ্ঠু কাজের জন্য পত্রক ব্যবহারই বিধেয়। এই পত্রক কোনো আধারে সুবিধেমতো পর্যায়ে সাজানো থাকলে কার্যকালে চটপট বা'র করা যায়। প্রস্তাব পত্রকে লেখক ও গ্রন্থের নাম, প্রকাশক ও দামের উল্লেখ এবং তারিখ সহ প্রস্তাবকের নাম ও ঠিকানা লেখা থাকবে। ঐ সঙ্গে গ্রন্থাগারিকের ব্যবহারের জন্য কয়েকটি অংশ থাকে। ক্রয়ের জন্য অনুমোদন, বরাতি ব্যবসায়ীর নাম, বরাতের তারিখ, এবং—পরিশেষে বইটির প্রাপ্তি সমাচারে —ক্রীত/প্রকাশিতব্য/অপ্রাপ্য ইত্যাদি মন্তব্য। ভবিষ্যৎ সুবিধা ও নির্দেশের জন্য যেগুলি কেনা হ'ল এবং যেগুলি পাওয়া গেলনা সেই পত্রকগুলি স্বতন্ত্র ভাগে রাখা আবশ্যক। ক্রীত বই মঞ্চস্থ করার পর পত্রকগুলি বাতিল অথবা চিহ্নিত করা কর্তব্য।

অনুজ্ঞাকর্ম বা বইএর বরাত দেবার ব্যাপারে বিক্রেতা বাছাই করতে হয় নিপুণ নিয়মে। সেই বিক্রেতাই বরণীয় যিনি অবিলম্বে বই জোগাতে পারবেন, শতকরা অধিক ছাড় বা অবহারে বিক্রয় করবেন। বিভিন্ন বিক্রেতার কাছ থেকে দরপত্র নিয়ে বিক্রেতা নির্বাচন করতে হয়। দুষ্প্রাপ্য বই এবং বিদেশী বই কেনার ব্যাপারে কিছু সমস্যা দেখা দেয়। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের জন্য সাধারণত স্বতন্ত্র বিক্রেতা-সংস্থা থাকে। এই রকম বিশেষ সংস্থা বিদেশী বইএর জন্যও আছে। সহজ বন্দোবস্তে কম সময়ের মধ্যে বই সরবরাহ করবে এমন বিক্রেতার সঙ্গে কারবার করা বাঞ্ছনীয়। বিদেশী বইএর ক্ষেত্রে একটি বিষয়ে সচেতন থাকা দরকার। বিদেশ থেকে বই আনিয়ে দিতে কম পক্ষে দেড় মাস দু'মাস সময় লাগে। সুতরাং এক অর্থ-বৎসরের মধ্যে এই

খাতে খরচ করতে হলে এই সময় হিসাবে ধ'রে কাজে এগোতে হয়।

অনুজ্ঞাপত্রের মূলটি বিক্রেতাকে দিয়ে নকলটি নথিভুক্ত ক'রে রেখে দিতে হয়। সমস্ত বই হয়ত একসঙ্গে সরবরাহ করা সম্ভব হয়না, তাই যেগুলি দেওয়া হল সেগুলির পাশে 'প্রাপ্ত' ব'লে লিখে রাখা কর্তব্য। বিক্রেতা বইএর জন্য তিন প্রস্থ আদেয়ক বা বিক্রয়পত্র দাখিল করলে ভাল হয়। তার মধ্যে একটি পুস্তক বিভাগে নথিভুক্ত থাকবে, একটি যাবে সংশ্লিষ্ট বিভাগে এবং তৃতীয় বা মূলটি মঞ্জুরীপত্র সহ পাঠাতে হবে অর্থদপ্তরে।

ক্রয় নির্দেশ পত্র

পুস্তক / পত্রিকা

গ্রন্থাগারের নাম— বিভাগ—

মঞ্জুরীর পরিমাণ—

| ক্রমিক সংখ্যা | গ্রন্থাখ্যা | লেখক বা সম্পাদক | প্রকাশক | প্রাপ্তিস্থান (এ দেশীয় সরবরাহকারী | মূল্য | প্রস্তাবক বা নির্দেশক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

অনুজ্ঞাপত্র

গ্রন্থাগারের নাম

তারিখ— অনুজ্ঞা সংখ্যা—

( সরবরাহ কালে উল্লেখ্য )

অনুজ্ঞাকৃত সংস্থার নাম—

ঠিকানা—

অনুগ্রহ পূর্বক মূল্য উল্লেখ করুন / সরবরাহ করুন

সরবরাহের প্রকার: লোক মারফৎ / রেজেষ্ট্রি ডাকযোগে / ভি.পি.পি. যোগে / রেল পার্সেল যোগে

পালিতব্য নির্দেশ ক্রম :

১। সরবরাহের সঙ্গে অনুগ্রহপূর্বক তিন প্রস্থ আদেয়ক দেবেন।

২। এই অনুজ্ঞার সঙ্গে নিম্নোক্ত কোনো গ্রন্থের জন্য পূর্বপ্রেরিত অনুজ্ঞাপত্রাদি বাতিল করা হচ্ছে।

৩। সর্বশেষ সংস্করণ প্রেরিতব্য।

৪। পার্সেলের ক্ষেত্রে একটি চালান ঐ সঙ্গে পাঠাবেন, এবং অনুজ্ঞা সংখ্যা লিখবেন।

৫। ......... সপ্তাহ/মাসের মধ্যে সরবরাহ করা না গেলে আবার অনুমতি নেবেন / অনুজ্ঞা বাতিল বিবেচনা করবেন

| পুস্তকের প্রস্থ সংখ্যা | গ্রন্থকার/সম্পাদক | গ্রন্থাখ্যা | মন্তব্যাদি |
|---|---|---|---|
| | | | |

## পরিগ্রহণ (Accession)

গ্রন্থাগারে বই আসার পর পরিগ্রহণের কাজ সুরু। প্রথমেই বিক্রয় পত্রানুযায়ী বইগুলি মিলিয়ে দেখে নেওয়া অনুজ্ঞাপত্রানুসারে সঠিক সরবরাহ হয়েছে কিনা। তারপরে প্রতিটি বই উল্টে পাল্টে ভাল করে পরীক্ষা করে নিতে হয় অনুজ্ঞানুযায়ী সংস্করণ কিনা, আখ্যাপত্র থেকে সুরু করে শেষ পর্যন্ত সব অংশ ঠিক ভাবে বিন্যস্ত আছে কিনা. পত্র সংখ্যা ও পত্র পর্যায় নির্ভুল কিনা, বাঁধাই সুদৃঢ় কিনা, পাতাগুলো ছেঁড়া খোঁড়া নয় তো, চিত্র, মানচিত্রাদি ঠিক আছে তো, ইত্যাদি। অনেক সময়ে চাড় দিয়ে নূতন বই খুলতে গেলে জখম হবার ভয় থাকে, সেলাই কেটে বা আল্গা হয়ে যেতে পারে। নূতন বই খুলে দেখে নেবার একটা পদ্ধতি আছে। বইটিকে চিৎ করে টেবিলের উপরে রেখে পর্য্যায় ক্রমে প্রথম দিকের কিছু পাতা এবং শেষ দিকের কিছু পাতা খুলে যেতে হয়, এবং এইভাবে বইটির মাঝামাঝি পর্য্যন্ত এগিয়ে আসতে হয়। এতে বাঁধাই বা সেলাইয়ের উপরে চাপ পড়ে না, বা ভবিষ্যতেও চাপ প'ড়ে জখম হবার ভয় কমে। যদি কোনো পাতা অকর্তিত থাকে তবে ঈষৎ ধারালো ছুরি দিয়ে সাবধানে কেটে নিতে হয়।

বইগুলি এভাবে মিলিয়ে পরীক্ষা ক'রে নেবার পর পরিগ্রহণ পঞ্জীতে বিক্রয় পত্রানুযায়ী নথিভুক্তি। পরিগ্রহন খাতায় পর্যায়ক্রমে তারিখ. ক্রমিক সংখ্যা, (এই ক্রমিক সংখ্যাই পুস্তকের পরিগ্রহন সংখ্যা), লেখকের নাম, বইএর নাম সংস্করণ, পত্র সংখ্যা ও বাঁধাই, প্রকাশকের নাম, প্রকাশ কাল, দর, দাম, বিক্রেতার নাম এবং অনুজ্ঞালিপির নির্দেশক সংখ্যা, গ্রন্থসংলেখ এবং মন্তব্য লেখবার ঘর থাকে। গ্রন্থসংলেখ ছাড়া আর সবই পরিগ্রহনকালে লিখতে হয়, এবং বইটির বর্গীকরনাদি ক্রিয়া চুকে যাবার পর গ্রন্থসংলেখ লিখে রাখা হয়। পরিগ্রহন নথিভুক্তির পরে বইএর আখ্যাপত্রে পরিগ্রহন সংখ্যাটি লিখে সেখানে গ্রন্থাগারের নামছাপ দিতে হয়। এছাড়াও বইএর অভ্যন্তরে বিশেষ কোনো পত্রাঙ্কে নামছাপ সমেত পরিগ্রহন সংখ্যা লিখে রাখা উচিত। কোনোক্রমে আখ্যাপত্র নষ্ট হলে এই থেকে গ্রন্থটিকে সনাক্ত করা যায়। সম্ভাব্য গ্রন্থাপহারককেও কিছুটা ধোঁকা দেওয়া যায়।

পরিগ্রহন পঞ্জী

| তারিখ | পরিগ্রহণ সংখ্যা | লেখক | আখ্যা | সংস্করণ/খণ্ড | পত্র সংখ্যা | বাঁধাই ও মাপ | প্রকাশক ও প্রকাশস্থল | সরবরাহকারীর নাম ও ঠিকানা | দর | দাম | আদেশক সংখ্যা ও তারিখ | গ্রন্থসংলেখ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |

আজকাল পরিগ্রহণের কাজ খাতার পরিবর্তে পত্রকে গ্রন্থিত করা হচ্ছে —বিশেষ ক'রে বড় গ্রন্থাগারে। বিদেশে খাতা লেখার কাজ উঠেই গিয়েছে। সূচীকরণের মূল পত্রকে গ্রন্থের যাবতীয় বিবরণ থাকে, এবং এই পত্রককেই পরিগ্রহণ নথি হিসেবে গণ্য করা যায়। তবে পত্রককের অসুবিধা, বইএর দর এবং দাম, বিক্রেতার নাম ও অনুজ্ঞার বিবরণ ইত্যাদি থাকেনা। এজন্য স্বতন্ত্র পত্রক রক্ষিত হয়। এর ফলে কোনো বইএর সমগ্র তথ্য জানতে হলে একাধিক পত্রক হাতড়াতে হয়। উপরন্তু কোনো পত্রক হারিয়ে গেলে বা বিন্যাসে গোলমাল হ'লে বইটির সন্ধান মেলে না, বিবরণ থাকে অজ্ঞাত। পক্ষান্তরে খাতায় লিপিবদ্ধ করলে সমগ্র বিবরণ এক নজরে পাওয়া যায়। মূল পত্রকের পরিপূরক বা দ্বিত্ব হিসেবেও এটি কাজ করে। কিন্তু বৃহদাকার খাতা রাখাও বৃহৎ ব্যাপার। এতে জায়গা লাগে প্রচুর

এবং কর্মীর প্রয়োজন হয় বেশী। খাতার পাতা দুমড়ে যায় বা কালের ব্যবধানে বিবর্ণ বা জীর্ণ হয়ে যায়। পত্রক জীর্ণ হয়ে গেলে সেটির বদলে নূতন পত্রক রচনার কাজ সহজ, কিন্তু খাতার পাতা বা খাতা বদলানো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

পরিগ্রহন সমাপ্ত হলে বইটির মুখ-মলাটের ভিতরের দিকে গ্রন্থাগারের নিরূপণ পত্র (label) এবং পুস্তকপুটের নিচের অংশে একখণ্ড কাগজ বা চিরকুট সেঁটে সেটিকে পাঠিয়ে দেওয়া হল বর্গীকরণ বিভাগে। এখানে উপরোক্ত নিরূপন পত্রে বর্গ সংখ্যা এবং গ্রন্থ সংলেখ লিখে সূচীকৃত হবার পরে চিরকুটে গ্রন্থসংলেখ লিখে দিলেই কাজ শেষ। এবারে পরিপোষণ কর্মী সেটিকে মঞ্চে বিন্যস্ত করবেন।

## প্রচারণ (Circulation)

পুস্তক প্রচলন বা প্রচারণ বিভাগের কাজ পাঠকদের সঙ্গে পুস্তকের সংযোগ ঘটানো, লেনদেন চালানো। এই বিভাগের প্রথম কাজই তাই সদস্য-ভুক্তি। সদস্য পদের জন্য গ্রন্থাগারে আবেদন করতে হয়। আবেদন পত্রে ন্যূনপক্ষে থাকবে প্রার্থীর পুরো নাম, ঠিকানা, বৃত্তিগত পরিচয় এবং আবেদনের তারিখ। জনগ্রন্থাগারে বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা পূর্ব-সদস্যের পরিচয় ও প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করতে হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরণের কোনো অভিজ্ঞান লাগেনা, এমন কি স্বতন্ত্র আবেদন পত্রেরও প্রয়োজন পড়েনা। কেননা ভর্তি হবার সময়েই ছাত্র-পরিচায়ক পত্র দেওয়া হয়। সদস্য পদের আবেদনের সঙ্গে গ্রন্থাগারের নিয়মাবলী মেনে চলবার প্রতিজ্ঞাপত্রেও স্বাক্ষর করতে হয়। আবেদন গ্রাহ্য হলে তাঁকে একটি সদস্যপত্র দেওয়া হয়। এই পত্রে নির্দিষ্ট সদস্য সংখ্যা থাকে এবং সদস্য নিবন্ধন খাতায়ও তাঁর জন্য ঐ সংখ্যাটি নির্দিষ্ট থাকে। নিবন্ধন খাতায় সদস্যের নাম ঠিকানা প্রভৃতি যাবতীয় বিবরণ খেলা থাকে সদস্যের স্বাক্ষর সমেত। সদস্যকাল শেষ হলে সেই তারিখে তাঁর হিসাব চুকিয়ে নাম খারিজ হয়ে যায়। সাম্প্রত কালে গ্রন্থাগারে নিবন্ধন খাতার বদলে প্রমান মাপের পত্রকের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। পত্রকাধারে এগুলি ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে রাখলে কাজের সুবিধা হয়। এমন কি আবেদন পত্রও পত্রকাকারে নিবন্ধক হিসেবে পত্রকাধারে রেখে দিলে কাজের জটিলতা

ও খাটুনি অনেকটা কমে। সদস্যকাল সমাপ্ত হবার পর এটি বাতিল করে দিলেই হল। তবে নিবন্ধন খাতার একটা সুবিধা এই যে এখানে সদস্য পরিচয় এবং তাঁর ঋণকৃত বইএর হিসাব সবই এক নজরে পাওয়া যায়। পত্রক পদ্ধতিতে এই সমাচার বিভিন্ন পত্রকে ছড়িয়ে থাকে।

সদস্যভুক্তির পর পাঠক তাঁর প্রয়োজন মতো বই বাছাই করেন। বই বেছে নেবার দু'রকম পদ্ধতি বর্তমান। পাঠক স্বয়ং মঞ্চকক্ষে গিয়ে পছন্দ মতো বই নিয়ে আসতে পারেন, অথবা আবেদন-পত্রকে প্রার্থিত বইটির বিবরণ লিখে দিতে পারেন, —গ্রন্থাগার কর্মী মঞ্চ থেকে বইটি এনে দেন। অর্থাৎ, গ্রন্থমঞ্চ দুই ধরণের, রুদ্ধ এবং মুক্ত। রুদ্ধমঞ্চে পাঠকদের প্রবেশ নিষেধ, মুক্তমঞ্চ অবারিতদ্বার।

## মঞ্চ পদ্ধতি Shelf System)

সঞ্চারণ বা লেনদেন প্রকল্পের অনেকখানি জুড়ে আছে মঞ্চপদ্ধতি। মঞ্চ ব্যবস্থার সুবিধা অসুবিধার উপর এর মান নির্ভর করে। নির্ভর করে কর্ম তৎপরতাও। পাঠকের সময় বাঁচাতে হলে বই আনা নেওয়ার কাজ ত্বরিত হওয়া দরকার। এই বিচারে মুক্তমঞ্চ এবং রুদ্ধমঞ্চ উভয় প্রথারই সপক্ষে বিপক্ষে যুক্তি আছে। মুক্তমঞ্চ যেমন পাঠকদের সুবিধার দিক খুলে দেয়, রুদ্ধমঞ্চ তেমনি দেখে পরিচালনার সুবিধার দিক।

মুক্তমঞ্চের সপক্ষে বক্তব্য : (১) পাঠক স্বয়ং মঞ্চে গিয়ে পছন্দ মতো বই খুঁজে আনতে পারেন। যদি তাঁর প্রার্থিত বইটি না পান তাহলে পাশাপাশি ঐ বিষয়ের অন্যান্য বই দেখে বিকল্প হিসেবে অন্য বই আনতে পারেন। এতে তাঁর সময় বাঁচে। তাছাড়া; একই বিষয়ের বিভিন্ন বই নেড়েচেড়ে দেখবার সুযোগ তিনি পান, যেটা স্বভাবতই তাঁর জ্ঞান প্রসারের সহায়ক। (২) কোনো পাঠক যদি কোনো সঠিক উদ্দেশ্য না নিয়েও মঞ্চকক্ষে পদার্পন করেন তাহলেও তিনি উপকৃত হন, নানান বই দেখে তাঁর কৌতুহল ও আকাঙ্খা বেড়ে উঠতে পারে, এবং তিনি আগ্রহী হয়ে উঠতে পারেন, প্রবণতা অনুযায়ী বই পেয়ে যেতে পারেন। (৩) গ্রন্থাগার পরিচালক মুক্ত মঞ্চের সুবাদে কম সংখ্যক কর্মী নিয়ে পুস্তক প্রচলনের কাজ চালাতে পারেন। পাঠকদের নানাবিধ প্রশ্ন এবং দাবীও এর ফলে কমে, জটিলতার লাঘব হয়।

মুক্ত মঞ্চের বিপক্ষে বক্তব্য : (১) সাধারণ পাঠক স্বভাবতই বই এলোমেলো করে রাখেন। যথাস্থানে বইটি মেলে না, খুঁজতে হয়। বই বার করবার এবং গুছিয়ে তুলে রাখবার যত্ন স্বভাবতই তাঁদের কাছে কম আশা করা যায় ব'লে বইএরও ক্ষতি হয়। (২) এলোমেলো বই নিয়মিত ভাবে পুণর্বিন্যাসের জন্য বাড়তি কর্মীর প্রয়োজন পড়ে। যত্নহীন ব্যবহারে বই ছিঁড়ে গেলে বাঁধাই খরচও বাড়ে। (৩) গ্রন্থদরদ-ছুট এবং সমাজ বোধহীন পাঠক মুক্তমঞ্চের অবাধ বিচরণের সুযোগে বই থেকে পাতা কেটে নেবার বা ছবি চুরি করবার কাজও অবাধে চালাতে পারে।

রুদ্ধমঞ্চের সপক্ষে বক্তব্য : (১) মঞ্চের নির্দিষ্ট পর্যায়ে অভিজ্ঞ কর্মী বইগুলিকে যথাস্থানে সাজিয়ে রাখতে পারেন। এলোমেলো হবার আশঙ্কা থাকেনা, খুঁজে বার করতে দেরি হয় না। (২) বইগুলি পরিচ্ছন্ন রাখা যায়, আয়ু বাড়ে। (৩) যদিও বই এনে দেওয়া তুলে রাখার খাটুনি থাকে, তবু মঞ্চ গোছাবার বাড়তি খাটুনি কম।

রুদ্ধ মঞ্চের বিপক্ষে বক্তব্য : (১) পুস্তকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে পাঠকের সংযোগ ক'মে যায় ফলে পাঠস্পৃহা বাড়েনা, অপরিহার্য না হলে পাঠক উৎসাহ বোধ করেনা। (২) প্রার্থিত বইটি হাতে পেতে পাঠকের অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। নির্দিষ্ট বইটি যদি মঞ্চে গিয়ে না পাওয়া যায় তবে ফিরে এসে অন্য বইএর অনুরোধ পত্র নিয়ে আবার মঞ্চে যেতে হয়। এই প্রথা পাঠকের বিরক্তি জনক। (৩) স্বভাবতই একযোগে অনেক প্রার্থী আসেন। তাই কর্ম তৎপরতার জন্য অনেক কর্মীর প্রয়োজন পড়ে।

এ কালের গ্রন্থাগার সেবার ক্রম-প্রসার প্রকল্পের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে মুক্তমঞ্চ পদ্ধতিই সমাজের পক্ষে উপযোগী। পাঠকের সঙ্গে বইএর প্রত্যক্ষ সংযোগ অবশ্যই কাম্য। তা'তে পাঠক তৃপ্ত হন, গ্রন্থাগারকে নিজের ব'লে ভাবতে পারেন, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পরাঙ্মুখ হন না। এর ফলে হয়ত বইএর অযত্ন ও অপচয় কিছুটা হয়। তবে সে ক্ষতিকে নগণ্য বলা চলে। আধুনিক গ্রন্থাগার প্রথায় ক্ষয়ক্ষতির আনুপাতিক হিসাবে শতকরা দু'টি বা তিনটি বই নষ্ট বা নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপার ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। পাঠকদের বঞ্চিত রাখলেই যে অপচয় বাঁচে সে ধারণাও ঠিক নয়। সুযোগ এবং বিশ্বাস সমাজ সেবীর মূলধন। তবুও মুক্তমঞ্চ গ্রন্থাগারে যাতে বই চুরি না যায় বা পাতা কেটে বই অব্যবহার্য

না করা হয় সে জন্য অবশ্যই ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। প্রবেশ ও প্রস্থানের একটি মাত্র দুয়ার খোলা রেখে সেখানে নিয়ন্ত্রক কর্মী রাখা দরকার মঞ্চকক্ষের অভ্যন্তরেও নজর রাখা বিধেয়। এবং প্রতিটি গ্রন্থ নির্গমনের সময়ে এবং ফেরৎ এলে পরে দেখে নেওয়া উচিত এর কোনো পাতা কর্তিত বা ছবি বিলুপ্ত হয়েছে কিনা। ব্যক্তিগত নথি, বই, বটুয়া বা ব্যাগ মঞ্চকক্ষের মধ্যে নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ থাকে।

## প্রচলন প্রক্রিয়া (Charging system)

বই বাছাইএর পরবর্তী পর্যায় প্রচলন প্রক্রিয়া, অর্থাৎ পাঠকদের পুস্তক ঋণ দান প্রকল্প। নির্গম ব্যবস্থা সহজ, সরল এবং যথোবুক্ত কার্যকরী হওয়া দরকাব, যাতে এক নজরেই জানা যায় (১) নির্দিষ্ট তারিখে কোন বিষয়ের কতগুলি বই নির্গত হবেছে, (২) কোন বই কে নিয়েছেন, (৩) কবে এগুলি ফেরৎ আসবে। ছোটখাট গ্রন্থাগারে এ কাজ দুটি নিবন্ধন খাতা রেখেই স্বষ্ঠভাবে চালানো সম্ভব। একটি খাতায় গ্রাহকদের নাম ও গ্রাহক-সংখ্যা লেখা থাকে। পরে কয়েকটি ঘর কেটে তা'তে নির্গমন তারিখ, গ্রন্থসংলেখ, ফেরৎ দেবার তারিখ এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মীর স্বাক্ষরের ব্যবস্থা থাকে। দ্বিতীয় খাতাটি দৈনন্দিন নির্গমনের হিসাব। এই খাতায় নির্গমন তারিখ, নির্গত বইএর গ্রন্থ সংলেখ, গ্রাহক সংখ্যা এবং ফেরৎ দেবার তারিখ লেখার জন্য ঘরকাটা থাকে। গ্রাহক যখন বই নেন তখন গ্রন্থ মধ্যস্থ নির্গম পত্রকে ( Issue card ) নাম সই ক'রে গ্রাহক সংখ্যা ও তারিখ লিখে দেন। নির্গম পত্রকই পুস্তকের প্রতিভূ হিসেবে কাজ করে। নির্গম-কর্মী গ্রাহকের নিজস্ব সদস্যপত্রে বইটির গ্রন্থসংলেখ ও তারিখ লিখে দেন। এটিই সদস্যের ঋণ-স্মারক। সদস্যপত্রে পুস্তক ঋণের তারিখ, গ্রন্থ সংলেখ, প্রত্যর্পন তারিখ ভারপ্রাপ্ত কর্মীর স্বাক্ষরের জন্য ঘর কাটা থাকে। বই ফেরৎ দিলে পরে সেই তারিখ লিখে কর্মী সই ক'রে দেন, গ্রাহক সেটি তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞান হিসেবে রেখে দেন। এরূপ সদস্য পত্রের সুবিধা এক নজরে দেখেই জানা যায় গ্রাহক ক'টি বই ঋণ নিয়েছেন বা ক'টি ফেরৎ দিয়েছেন। গ্রাহক নিবন্ধন খাতা থেকেও এই হিসাব এক নজরে গ্রন্থাগারিক জেনে নিতে পারেন।

বইটি গ্রাহক খাতায় লেখা হবার পরে নির্গম পত্রকটি চলে যায় দ্বিতীয় কর্মীর কাছে। তিনি দৈনিক খাতায় যথারীতি লিপিবদ্ধ করার পর পত্রকটি একটি আধারে গ্রন্থসংলেখ অনুক্রমে সাজিয়ে রাখেন। কখনো যদি কোনো বই সম্পর্কে জানবার প্রয়োজন হয় বইটি কে নিয়েছেন, কবে নিয়েছেন তাহলে পত্রকটি দেখে অতি সহজেই সেই তথ্য জানা যায়। গ্রাহক যখন বইটি ফেরৎ দেন তখন গ্রাহক খাতা ও দৈনন্দিন খাতায় প্রত্যর্পন চিহ্নিত ক'রে আধার থেকে পুস্তক পত্রকটি নিয়ে তা'তে প্রত্যর্পণ তারিখ লিখে সেটি আবার বইএর মধ্যে যথারীতি রেখে মঞ্চস্থ করা হয়।

গ্রাহক খতিয়ান

গ্রন্থাগারের নাম

সদস্য সংখ্যা— নাম—

বিভাগ— পরিচয়—

তারিখ— ঠিকানা—

স্বাক্ষর—

| নির্গম তারিখ | গ্রন্থ-সংলেখ | আগম তারিখ | কর্মীর স্বাক্ষর | নির্গম তারিখ | গ্রন্থ-সংলেখ | আগম তারিখ | কর্মীর স্বাক্ষর |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

## দিনাঙ্ক খতিয়ান

গ্রন্থাগার— নির্গম-দিন (তারিখ)—

| গ্রন্থসংলেখ | সদস্য সংখ্যা | আগম তাং | গ্রন্থসংলেখ | সদস্য সংখ্যা | আগম তাং |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

নির্গত – মোট দৈনিক পরিসংখ্যান আগত – মোট

| পূর্বদিনের জের | ০০০ | ১০০ | ২০০ | ৩০০ | ৪০০ | ৫০০ | ৬০০ | ৭০০ | ৮০০ | ৮২৩ | ৯০০ | বাংলা | হিন্দি | সংস্কৃত | অন্য ভাষা | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নির্গত... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| আগত | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

উপরোক্ত নির্গম প্রক্রিয়াসময় সাপেক্ষ হলেও পদ্ধতি হিসেবে পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং নির্ভরযোগ্য। দু'টি খাতায় নির্গম নিবদ্ধিত হবার দরুন ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা কমে যায়। কোনো কারণে পুস্তক নির্গম পত্রক হারিয়ে গেলেও নথি লুপ্ত হয় না। কোনো একটি খাতায় যদি ভুল লেখা হয় বা লিখতেই ভুল হয় তবুও অন্য খাতাটির থেকে তথ্য মেলে। গ্রাহকের কাছে ক'টি বই আছে তার হিসাব এক নজরে ধরা পড়ে। দৈনন্দিন নথি থাকার আরো একটি বিশেষ সুবিধা প্রতিদিন কতগুলি বই বেরোল, কোন বিষয়ের কতগুলি বই বেরোল, কোন ধরণের পাঠক—মহিলা বা পুরুষ, ছাত্র বা শিক্ষক ইত্যাদি। কে কতগুলি বই নিচ্ছেন তার হিসাবও এক নজরে পাওয়া যায়। উপরোক্ত হিসাব সংকলনের জন্য এই খাতার নিচে ঘর থাকা বাঞ্ছনীয়। এর ফলে গ্রন্থাগারিক মাসিক হিসাব পেয়ে যান, বুঝতে পারেন গ্রন্থাগারে কে কী ভাবে ব্যবহার করছে, চাহিদা ও প্রবণতার ধরণ কি প্রকার।

নিবন্ধন খাতার ব্যবহার ব্যতীত সহজ আরেকটি নির্গম পদ্ধতির নাম করা যায়। রসিদ প্রথা। বই ধার নেবার সময়ে পাঠকের নাম, গ্রাহক সংখ্যা, গ্রন্থের বিবরণ ও গ্রন্থ সংলেখ সমেত একটি রসিদে সই করিয়ে রেখে বইটি ফেরৎ দেবার সময়ে সেটি ছিঁড়ে ফেলে অথবা পাঠককে ফেরৎ দিলেই ঝঞ্ঝাট চুকে যায়। রসিদগুলি তারিখ অনুক্রমে, অথবা সদস্যের নাম বা সংখ্যা অনুক্রমে, অথবা গ্রন্থসংলেখ অনুক্রমে সাজিয়ে রাখা যেতে পারে। গ্রন্থ মধ্যে একটি চিরকুট সেঁটে তাতে নির্গম তারিখ এবং। অথবা ফেরৎ কবে দিতে হবে সেই তারিখ লিখে দিতে হয়। এই প্রথার কাজ চটপট হয় বটে, তবে কে ক'টি বই নিচ্ছেন তার হিসাব পাওয়া দুষ্কর হয়ে ওঠে। কোনোক্রমে একটি রসিদ হারিয়ে গেলে এ সম্পর্কে সংকেত লুপ্ত হয়ে যায়।

আরেকটি নির্গম পদ্ধতির উল্লেখ করা যায়। প্রতিরূপ প্রথা (Dummy System)। এই প্রথার প্রয়োজনে বইএর মাপের অনুরূপ কতকগুলি নকল কাঠামো তৈরি ক'রে পংক্তিবদ্ধ কাগজ চিটিয়ে মুড়ে রাখা হয়। পাঠকের প্রার্থিত পুস্তক যখন মঞ্চ থেকে তুলে আনা হয় তখন এই কাঠামোর গায়ে গ্রন্থ সংলেখ সহ বইটির বিবরণ, গ্রহীতার নাম এবং। বা সদস্য সংখ্যা লিখে পুস্তকটির শূন্য স্থানে মঞ্চে রাখা হয়। বইটি ফেরৎ এলে আবার কাঠামোটি সরিয়ে সেখানে বইটি তুলে রাখা হয়। এই প্রথার ব্যবহারিক সরলতা থাকলেও গ্রাহকের তরফে বইএর হিসাব থাকে না, গ্রন্থাগারের প্রয়োজনেও

হিসাবে জটিলতা এসে যায়। গ্রাহককেও সমগ্র ক্রিয়াপর্বের জন্য অযথা অপেক্ষা করতে হয়। মঞ্চে পুস্তকের প্রতিরূপ বিন্যাসের একটা গুনের দিক এর ফলে তাকের বইগুলি এলিয়ে বা হেলে পড়ে না, বইগুলির ক্ষতি নিবারণ হয়। তবে সেটা অন্য প্রসঙ্গ। উপরোক্ত দুটি প্রথার কোনোটিতেই গ্রন্থ নির্গমনের এবং গ্রন্থ ব্যবহারের খতিয়ান রাখা যায় না, রাখা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হয়ে পড়ে।

সাম্প্রতকালে এই সকল প্রথার পরিবর্তে কেবল মাত্র পত্রক সংবলিত প্রথারই প্রচল বেশি। এই প্রথার বিবরণ দেবার সূত্রে উল্লেখ করা যায় এই প্রথাতেও স্থায়ী হিসাব পত্তনের দিকটা দুর্বলই থাকে, যেটা নিবন্ধন খতিয়ানের ক্ষেত্রে হয় না। তবে পত্রক যুক্ত প্রথার নির্গমনের বিভিন্ন দিকে সতর্কতা রেখে চলা সম্ভব। খাতা পত্রের ঝামেলা এড়িয়ে কাজ সহজ করে নেওয়া এবং সময় সংক্ষেপ করাই পাঠক-সহায়ের লক্ষ্যনীয় দিক। আধুনিক কালে বহুল প্রচলিত এ জাতীয় দু'টি পদ্ধতির বিষয়ে এবারে আলোচনা করা যাক। একটি নিউআর্ক ( Newark ) পদ্ধতি, অপরটি ব্রাউন ( Brown ) পদ্ধতি।

## নিউ আর্ক

নিউআর্ক প্রচলন প্রক্রিয়া। এই পদ্ধতির উদ্ভব ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিউআর্ক জনগ্রন্থাগারে (Newark Public Library) এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য পুস্তকের ঋনকাল-ভিত্তিক একক লিপিভূক্তি। অর্থাৎ, গ্রাহক বইটি যে কয়দিনের জন্য ধার নেবেন তারই ভিত্তিতে একবার মাত্র নির্গমন নথিভুক্ত হবে এর জন্য প্রয়োজন (১) সদস্যপত্র ( গ্রাহক-সংখ্যা সংবলিত ) —যেটি বরাবর গ্রহীতার কাছে থাকবে, (২) পুস্তক পত্রক—যেটি বইএর মধ্যে একটি পকেটে থাকবে, এবং (৩) তারিখ-তালিকা—যেটি স্থায়ীভাবে সাঁটা থাকবে বইএর মধ্যে। বই নির্গমনের সময়ে নির্গমন তারিখ অথবা প্রত্যর্পণের তারিখ উক্ত তিনটি পত্রকেই লিখতে হয়। তারপরে পুস্তক পত্রকটিতে তারিখের পাশে গ্রাহক-সংখ্যা লিখে সাজিয়ে রাখা হয় বাক্সে। এই পুস্তক-পত্রকই গ্রন্থাগারের একমাত্র নির্গমন নথি। প্রতিদিন যত বই নির্গত হয় সেগুলির পত্রক সমূহ উক্ত দিনের তারিখ নির্দেশক ফলকের পিছনে বিষয়ানুক্রমে সাজানো থাকে। বই ফেরৎ এলে গ্রাহকের নিজস্ব পত্রকে প্রত্যর্পন তারিখ বসিয়ে তাঁকে বিদায় করবার পর সংশ্লিষ্ট পুস্তক-পত্রকটি

বইএর মধ্যে রেখে যথারীতি পুর্ণমঞ্চস্থ করলেই নির্গম-চক্রের পরিসমাপ্তি।

এই পদ্ধতির সুবিধা, একই সদস্যপত্রে গ্রাহক একাধিক বই নিতে পারেন, খাতাপত্র লেখবার ঝামেলা থাকেনা, বইএর তারিখ তালিকা দেখলেই বোঝা যায় বইটি কত দিনে কতবার ব্যবহৃত হয়েছে, এবং দৈনিক কত বই নির্গত হ'ল তা'র হিসাবও সহজে মেলে। কিন্তু অসুবিধা, সময় মতো বই ফেরৎ না দিলে গ্রাহককে তাগাদা দেবার জন্য সদস্য নিবন্ধন খাতা ঘেঁটে ঠিকানা বা'র করতে হয়, তিনপ্রস্থ তারিখ সঠিক লেখাও সময় এবং অভিনিবেশ সাপেক্ষ, গ্রাহক সংখ্যা লিখতে যদি কোনক্রমে ভুল হয় তাহলে বিপদে পড়তে হয়—নির্গত বই সংগ্রহে থেকেও না-থাকার সামিল হয়ে ওঠে, এবং পত্রকাধার তারিখ অনুসারে সাজানো থাকার দরুন কোনো বই সম্পর্কে খোঁজ নিতে হলে তার উদ্দেশ্য মেলে না।

ব্রাউন প্রচলন প্রক্রিয়া। এই পদ্ধতির প্রবর্তন করেন ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বস্টন শহরের জনৈকা গ্রন্থাগারিক নিনা ব্রাউন। এই পদ্ধতি অনুসারে প্রতি গ্রাহকের কাছে গ্রাহক পত্রকের পরিবর্তে কাগজের পকেটে একটি করে টিকিট দেওয়া হয়। গ্রাহক যে কয়টি বই নেবেন সেই কয়টি টিকিট তাঁকে দিতে হবে। অর্থাৎ প্রতি বইএর হিসেবে একটি টিকিট। এই টিকিটে গ্রাহক সংখ্যা এবং গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা লেখা থাকে। কোনো বই নিতে হলে বইএর মধ্যেকার তারিখ-পত্রকে নির্গম তারিখ লিখে পুস্তক পত্রকটি গ্রাহক টিকিটের সঙ্গে পকেটে রেখে দিলেই চলে। প্রাসঙ্গিক তারিখ ছাড়া আর কিছু লিখবার দরকার হয় না, তবে ইচ্ছে করলে পুস্তক-পত্রকেও গ্রাহক-সংখ্যা ও তারিখ টুকে রাখা যায়। প্রতিদিন নির্গমনের কাজের শেষে গ্রাহক-টিকিটগুলি গ্রন্থসংলেখ অথবা লেখক অথবা আখ্যা অনুসারে নির্গম তারিখের ভিত্তিতে পত্রকাধারে গুছিয়ে রাখা হয়। বই ফেরৎ এলে পরে সেটির তারিখ তালিকা থেকে নির্গম তারিখ দেখে নিয়ে সংশ্লিষ্ট টিকিটটি পত্রকাধার থেকে বা'র ক'রে গ্রাহককে ফিরিয়ে দিয়ে বইটি মঞ্চে প্রেরণ করলেই কাজ শেষ।

এই পদ্ধতির প্রধান সুবিধা সময় সংক্ষেপ। কেবলমাত্র বইএর মধ্যে নির্গম তারিখ লিখলেই চলে। বই ফেরৎ নেবার সময়েও শুধু সংশ্লিষ্ট-টিকিটটি বের ক'রে দিলেই চুকে যায়। তারিখ অনুক্রমে উক্ত টিকিটগুলি সাজানো থাকার ফলে ফেরৎ দেবার নির্দিষ্ট তারিখ অতিক্রান্ত হ'লে সহজেই গ্রাহকের

## নিউআর্ক প্রচলন প্রক্রিয়া পত্রক

### গ্রাহক পত্রক

গ্রন্থাগারের নাম—
গ্রাহক সংখ্যা—
মেয়াদের শেষ তারিখ—

গ্রাহকের স্বাক্ষর

| নির্গম বা প্রত্যর্পণ তাং | নির্গম বা প্রত্যর্পণ তাং | নির্গম বা প্রত্যর্পণ তাং |
|---|---|---|
| | | |

### পুস্তক পত্রক

গ্রন্থাগারের নাম—
গ্রন্থকার—
গ্রন্থাখ্যা—
গ্রন্থ সংলেখ—
পরিগ্রহণ সংখ্যা—

| নির্গম বা প্রত্যর্পণ তাং | নির্গম বা প্রত্যর্পণ তাং | নির্গম বা প্রত্যর্পণ তাং |
|---|---|---|
| | | |

### দিনাঙ্ক পত্রক

গ্রন্থাগারের নাম—
গ্রন্থসংলেখ—
পরিগ্রহণ সংখ্যা—

| নির্গম বা প্রত্যর্পণ তাং | নির্গম বা প্রত্যর্পণ তাং | নির্গম বা প্রত্যর্পণ তাং |
|---|---|---|
| | | |

## ব্রাউন প্রচলন প্রক্রিয়া পত্রক

### গ্রাহক টিকিট

গ্রন্থাগারের নাম—

গ্রাহকের নাম—

ও ঠিকানা—

মেয়াদের শেষ তারিখ—

গ্রাহকের স্বাক্ষর

### পুস্তক পত্রক

গ্রন্থাগার—

গ্রন্থকার—

গ্রন্থাখ্যা—

গ্রন্থসংলেখ—

পরিগ্রহণ—

### তারিখ তালিকা

( পুস্তকাভ্যন্তরস্থ পত্রক )

গ্রন্থাগারের নাম—

গ্রন্থ সংলেখ—

পরিগ্রহণ সং—

| নির্গম বা প্রত্যর্পণ তাং | নির্গম বা প্রত্যর্পণ তাং | নির্গম বা প্রত্যর্পণ তাং |
|---|---|---|
| | | |

কাছে বিজ্ঞপ্তি পাঠানো যায়। এই পদ্ধতির কিছু অসুবিধার দিকও আছে। কোনো গ্রাহকের হিসাবে কতগুলি বই নির্গত হয়েছে তা স্থির করা যায় না। এর প্রতিষেধক হিসাবে অবশ্য বলা চলে নির্দিষ্ট সংখ্যক টিকিট থাকার দরুন গ্রাহক তা'র বেশি বই নিতে পারেন না। আরো একটি অসুবিধা, টিকিট সঙ্গে নিয়ে আসতে ভুলে গেলে পাঠকের পক্ষে বই নেবার কোনো উপায় থাকেনা। টিকিট হারিয়ে গেলে সমস্যা আরো জটিল হয়ে পড়ে। তাছাড়া, যদিচ দৈনিক কত বই নির্গত হচ্ছে তা'র হিসাব সহজে পাওয়া যায়, কিন্তু কোন বিষয়ের কত বই নির্গত হ'ল তা জানবার উপায় থাকে না। কোনো বিশেষ বই সংগ্রহে আছে না নির্গত হয়েছে তাও জানা যায় না। এগুলি জানবার একমাত্র উপায় সমগ্র তারিখ ধ'রে ধ'রে যাবতীয় নির্গত বইএর হিসাব করা। এই পদ্ধতিতে ব্যবহৃত পত্রকাধারের জন্য জায়গাও লাগে বেশি, যেটা পূর্বোক্ত পদ্ধতি অনুযায়ী কেবলমাত্র পুস্তক-পত্রক রাখলে লাগে না।

বলা বাহুল্য, এই সকল নির্গম প্রক্রিয়া গ্রন্থাগারের আকার অনুযায়ী প্রযোজ্য। যেখানে সংখ্যায় পাঠক ও গ্রাহক প্রচুর সেখানে সময় বাঁচাবার প্রক্রিয়া-সংক্ষেপ আবশ্যক। অবশ্য দুটি স্বতন্ত্র নির্গম তালিকা রাখা সবচেয়ে নিরাপদ, কিন্তু ব্যবহারিক সুবিধার্থ কোনো একটা দিকে কিছু অসুবিধা ভোগ করতেই হয়।

পরিগ্রহণ পরিসংখ্যান

মাস ............ ....                                        বৎসর ... ... ............

| পুস্তকাদি সামগ্রী | ০০০ | ১০০ | ২০০ | ৩০০ | ৪০০ | ৫০০ | ৬০০ | ৭০০ | ৮০০ | ৯০০ | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১। ক্রীত সামগ্রী | | | | | | | | | | | |
| পুস্তক | | | | | | | | | | | |
| পুস্তিকা | | | | | | | | | | | |
| অন্যান্য | | | | | | | | | | | |
| — মোট | | | | | | | | | | | |
| ২। বিনিময় সামগ্রী | | | | | | | | | | | |
| পুস্তক | | | | | | | | | | | |
| পুস্তিকা | | | | | | | | | | | |
| অন্যান্য | | | | | | | | | | | |
| — মোট | | | | | | | | | | | |
| ৩। উপহৃত সামগ্রী | | | | | | | | | | | |
| পুস্তক | | | | | | | | | | | |
| পুস্তিকা | | | | | | | | | | | |
| অন্যান্য | | | | | | | | | | | |
| — মোট | | | | | | | | | | | |
| সর্বমোট | | | | | | | | | | | |

নির্গম পরিসংখ্যান ( Issue statistics )

| তারিখ | বিষয় | নির্গত পুস্তক সংখ্যা | আগত (প্রত্যর্পিত) পুস্তক সংখ্যা | পুণর্নিগত পুস্তক সংখ্যা | নিরুদ্দিষ্ট পুস্তক সংখ্যা | মেয়াদোত্তীর্ণ অনর্পিত পুস্তক সংখ্যা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

পত্রিকা পরিসংখ্যান

| প্রকাশক্রম | প্রাপ্তব্য পত্রিকার পরিমাণ | প্রাপ্ত পত্রিকার পরিমাণ | প্রেরিত স্মারক পত্রের পরিমাণ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| দৈনিক— | | | | |
| সাপ্তাহিক— | | | | |
| পাক্ষিক— | | | | |
| মাসিক— | | | | |
| ত্রৈমাসিক— | | | | |
| অন্যান্য ক্রম— | | | | |
| মোট— | | | | |

গ্রন্থন খতিয়ান

| | |
|---|---|
| ক্রমিক সংখ্যা | |
| গ্রন্থনায় প্রেরণের তারিখ | |
| দপ্তরীর নাম ঠিকানা | |
| গ্রন্থসংলেখ | |
| লেখক | |
| আখ্যা | |
| বাঁধাইএর প্রকার | |
| প্রত্যর্পণের তারিখ | |
| বাঁধাইএর দর/দাম | |
| আদেয়ক/রসিদ সংখ্যা ও তারিখ | |
| অর্থ প্রদানের তারিখ | |
| মন্তব্য | |

অর্থবণ্টন খতিয়ান ( **Allocation Register** )

| ক্রমিক সংখ্যা | আদেয়ক সংখ্যা ও তারিখ | সরবরাহ-কারীর নাম ঠিকানা | আদেয়ক অর্থের পরিমাণ | অবহার | আদেয়কের মোট পরিমাণ | সংশ্লিষ্ট বিভাগের মঞ্জুরীকৃত অর্থের পরিমাণ | উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

আদেয়ক খতিয়ান ( Bill register )

| ক্রমিক সংখ্যা | আদেয়ক মঞ্জুরী তারিখ | আদেয়ক সংখ্যা তারিখ সহ | সরবরাহ-কারীর নাম ঠিকানা | আদেয়কের অর্থ পরিমাণ | মঞ্জুরীকৃত বিভাগের নাম | মোট মঞ্জুরীর পরিমাণ | উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

## (৭) পরিপোষণ বিভাগ

পুস্তক বিভাগের জটিল এবং প্রয়োজনীয় কাজ পরিপোষণ ( Maintenance )। এই শাখার কর্মীরা সারা বছর নিরলস তীক্ষ্ণতায় সমগ্র গ্রন্থ সংগ্রহের তদারকি করেন। বইগুলির বাহ্যিক খুঁটিনাটি নিয়ে এঁদের কারবার। প্রযুক্তি বিভাগ থেকে বইগুলি তৈরি হয়ে যাবার পর থেকে এই শাখার কাজ সুরু হয় এবং বরাবর চলতে থাকে একই নিয়মে ও শৃঙ্খলায়। ক্রিয়া পর্বের তালিকায় আছে। (১) বইএর সূচীপত্রক গুলিকে পত্রকাধারে নির্দিষ্ট ধারায় বিন্যস্ত করা। (২) মঞ্চপত্রক দেখে গ্রন্থসংলেখ পরিগ্রহন খাতায় ঠিকমতো লেখা বা লেখা হ'ল কিনা দেখা। (৩) মঞ্চপত্রকগুলিকে বিষয়ানুক্রমে সাজিয়ে সেগুলিকে গ্রন্থাগারের প্রকাশন দপ্তরে তালিকা মুদ্রনের জন্য পাঠানো। (৪) নবাগত বইগুলিকে যথানুক্রমে মঞ্চস্থ করা। (৫) দৈনিক যে সকল বই ফেরৎ আসে সেগুলিকে পুনরায় গুছিয়ে তাকে তুলে রাখা। (৬) মঞ্চনির্দেশক পত্রাদির যথাবিহিত স্থাপন। (৭) মঞ্চসংরক্ষণ,—মেরামতের প্রয়োজন হলে ব্যবস্থা করা, নিয়মিত মঞ্চ পরিষ্কার করা। (৮) নিয়মিত ভাবে মঞ্চ পরিদর্শন ও তদারকি, বই এলোমেলো হয়ে গেলে—বিশেষত মুক্তমঞ্চ গ্রন্থাগারে—সেগুলিকে যথাবিন্যস্ত করা। (৯) বই তাকে তুলবার সময়ে খুঁটিয়ে দেখা ছিঁড়েখুঁড়ে গেছে কিনা, এবং ছেঁড়া বই মেরামতির জন্য বা বাঁধাই এর জন্য দপ্তরী বিভাগে পাঠানো, এবং বাঁধিয়ে আসার পর সেগুলি মিলিয়ে দেখে নিয়ে পুনর্মঞ্চস্থ করা। (১০) পুস্তক সংরক্ষণের যাবতীয় উপায় অবলম্বন, মঞ্চে নিয়মিত কীট প্রতিষেধক ঔষধ প্রয়োগ এবং ক্ষতিগ্রস্ত বইপত্র সংরক্ষণ শাখায় পাঠানো ও ফেরৎ আনা। (১১) নিয়মিত কাল-ব্যবধানে পুস্তক সম্ভার গণন। (১২) অব্যবহার্য বইপত্র বাতিল করতে হলে তার ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি। অর্থাৎ, পুস্তক সংক্রান্ত যাবতীয় পরিদর্শনের সাং বাৎসরিক দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে এই বিভাগের উপরে। সুতরাং গ্রন্থসম্ভারের রক্ষণাবেক্ষণ এবং সঞ্চারণের কাজে এই বিভাগ সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বই সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যার উদ্ভব হলেই এই বিভাগের দৃষ্টিগোচর করা হয়। কোনো বই স্থান ভ্রষ্ট হ'লে, খুঁজে পাওয়া না গেলে, গ্রন্থ সংলেখ বা সূচীপত্রকে কোনো অসামঞ্জস্য বা ত্রুটি থাকলে এই বিভাগের কর্মীরা সংশ্লিষ্ট শাখাকে সে বিষয়ে অবহিত করেন।

## পুস্তক সম্ভার গণন ( Stock taking )

পরিপোষণ বিভাগের উপরোক্ত কর্মসূচীর মধ্যে অধিকাংশ অংশেরই আলোচনা ইতিপূর্বে প্রাসঙ্গিক পর্যায়ে হয়েছে। এবারে সংগৃহীত পুস্তকের সংখ্যা গণনা পদ্ধতি নিয়ে কিছু বলা যাচ্ছে। প্রতি বছর অন্তত একবার গ্রন্থাগারের যাবতীয় বই এর হিসাব মিলিয়ে নেওয়া কর্তব্য। এর প্রধান উদ্দেশ্য পরিগৃহীত সব বই মজুত আছে কিনা দেখা। এবং এই সূত্রেই যে বই মঞ্চে নেই তার তালিকা তৈরী করা এবং বইটি নির্গত হয়েছে কিনা তা নির্গম পত্রক থেকে যাচাই ক'রে নেওয়া. বাঁধাই বা বাতিলের উপযোগী বই গুলিও সরিয়ে রেখে সেগুলির তালিকা তৈরী করা। সংখ্যা গণনার হিসাব গ্রন্থাগার সমিতিতে ও পেশ করতে হয় গ্রন্থাগারিক মহাশয়কে। গণন ক্রিয়ার ফলে যে সব বই পাওয়া যায় না সেগুলিরও স্বতন্ত্র তালিকা প্রস্তুত করতে হয়, এবং সেগুলি প্রকৃতই খোয়া গেছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে হয়।

গণন ক্রিয়ার জন্য গ্রন্থ সঞ্চারণের কাজ কিছুদিন বন্ধ রাখাই সুবিধাজনক। কিন্তু ব্যবহারিক দিক থেকে পাঠকবর্গ তা'তে অসুবিধা ভোগ করেন। তাই আজকাল এজন্য গ্রন্থাগারের দৈনন্দিন কাজ বড় একটা বিঘ্নিত করা হয় না। এমনকি, সমগ্র সম্ভারের পরিসংখ্যান ও এককালে নেওয়া হয়না বা নেওয়া সম্ভব হয়না। অনেকেই তাই সময় ভাগ ক'রে আংশিক সংগ্রহের গণনক্রিয়া চালান।

মজুত বইএর সংখ্যা গণনা নানান দিক থেকে প্রয়োজনীয়। এর ফলে সূচীপত্রকগুলির সাম্প্রত-করণ হয় এবং ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলে সংশোধন হয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত বইগুলি নজরে আসে। বই হারালে তা ধরা পড়ে এবং তার কারণ অনুসন্ধান ক'রে সেগুলি পুনরায় ঘটবার সম্ভাবনা দূর করবার চেষ্টা করা যায়। প্রয়োগ বিধির খুঁটিনাটি ভুল বা অসঙ্গতি অসম্পূর্ণতা ধরা পড়ে এবং তা বন্ধ করবার দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। আরেকটি উপকারিতা এই সূত্রে মঞ্চ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং বইগুলির সঙ্গে কর্মীদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে।

তবে গণন ক্রিয়ায় যে সময় লাগে, যত কর্মী লাগে এবং যে বাড়তি খরচ হয় তা উপেক্ষনীয় নয়। হয়ত কর্মীরা এই বাড়তি সময়টুকু অন্য কাজে লাগাতে পারতেন। প্রকৃতপক্ষে, সুষ্ঠু পরিপোষণ ব্যবস্থা থাকলে এ জাতীয় সংখ্যা গণনের তেমন দরকার হয় না। বিশেষ ক'রে বড় গ্রন্থাগারে একাজ

প্রায় অসম্ভব। পরিপোষণ কর্মীরা প্রতিদিনের কাজে যদি তৎপর হন এবং সঞ্চারণ কর্মীরা দৈনন্দিন লেনদেনের সময়ে অবহিত থাকেন তাহলে ভুলচুক-গুলো সেখানেই ধরা পড়তে পারে এবং বাঁধাই এর জন্যও বই আলাদা ক'রে রাখা যেতে পারে। তবুও সম্ভব হলে মঞ্চ ঝাড়াইএর কাজ করা ভাল, বইএ পোকা মাকড় লাগল কিনা তা দেখা হয়ে যায়, তাকগুলো থাকে পরিপাটি। গণনার কাজ অনেক ক্ষেত্রেই সাময়িক ভাবে বাড়তি লোক নিয়োগ ক'রে সম্পন্ন হয়। শিক্ষায়তন ইত্যাদিতে আংশিক কর্মী হিসাবে ছাত্ররা এই জাতীয় কাজে লাগতে পারেন।

পুস্তক সম্ভার গণনের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। গ্রন্থ সংলেখ বা লেখক অনুসারে তালিকা করে নিয়ে মঞ্চে প্রাপ্ত বইগুলির ভিত্তিতে দাগ দিয়ে রাখা, মঞ্চ পত্রক নিয়ে তাকের সারির সঙ্গে একেকটি করে পত্রক মিলিয়ে নেওয়া, সরাসরি মঞ্চে গিয়ে যে সব বই পাওয়া গেল তার তালিকা তৈরী করা, ইত্যাদি। সবচেয়ে সরল উপায় বোধকরি মঞ্চপত্রক দেখে মিলিয়ে নেওয়া। এতে তালিকা লেখবার বাড়তি হাঙ্গামা থাকেনা। তালিকা লিখে মেলানোর কাজে ফাঁক থেকে যেতে পারে, লিখবার ভুলও হতে পারে। সে সম্ভাবনা এক্ষেত্রে নেই। মঞ্চে বই যে পদ্ধতিতে সাজানো থাকে মঞ্চপত্রকও বিন্যস্ত থাকে সেই একই পদ্ধতিতে। গণনার জন্য একজন কর্মী মঞ্চের তাকে সাজানো বই দেখে গ্রন্থ সংলেখ, লেখক ও গ্রন্থাখ্যা এবং পরিগ্রহণ সংখ্যা একটির পর একটি ব'লে যাবেন, অপর এক কর্মী মঞ্চপত্রকের সঙ্গে একটির পর একটি ক'রে মিলিয়ে নেবেন। যে বই মঞ্চে মিলবে না সে বইএর পত্রক আলাদা ক'রে অন্য একটি আধারে পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে রাখবেন, অথবা মূল পত্রকাধারেরই যথাস্থানে আড়াআড়ি ভাবে খাড়া করে রাখবেন। কোনো গ্রন্থাগারেই সাধারণত যাবতীয় বই একই মঞ্চগৃহে রাখা হয়না। রাখা সম্ভবও না। তথ্যগ্রন্থাদি থাকে জিজ্ঞাসা বিভাগে, সরকারী নথিপত্রও সাধারণত স্বতন্ত্র পর্যায়ে থাকে, কিছু বই থাকে পাঠকক্ষে এবং দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি রাখা হয় স্বতন্ত্র কোনো কক্ষে। মূল মঞ্চের গণন ক্রিয়া শেষ হবার পর এই সকল সংগ্রহের সঙ্গেও পত্রক মিলিয়ে দেখতে হয়। তারপরে দেখতে হয় সঞ্চারণ বিভাগের নির্গম তালিকা—যে সব বই পাঠকদের কাছে আছে সেই সব পত্রকের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া। এর পর বাঁধাইএর তালিকার সঙ্গে মঞ্চপত্রক মিলিয়ে দেখে সে দিকটার সম্পর্কেও নিশ্চিত হবেন গণন-কর্মী। সবশেষে বাতিল

বইএর তালিকা—যদি কোনো বই বাতিল পর্য্যায়ভুক্ত হয়ে থাকে। এই সকল ক্রিয়া পর্বের পরে সম্ভার গণনের কাজ সমাপ্ত। সমাপ্তির পরেও অপ্রাপ্ত গ্রন্থের তালিকা আরো কিছুকাল রেখে দিতে হয়, নজর রাখতে হয় কোনো অভাবিত স্থান থেকে বইটি বেরিয়ে পড়ে কিনা। অনেক সময়েই এরকম অসম্ভব কাণ্ড ঘটে, হারানো বই হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে। বিশেষ ক'রে আংশিক সংগ্রহ গণনায় এ ব্যাপার ঘটে, এক মঞ্চের বই ভুল ক'রে অন্য মঞ্চের তাকে চ'লে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। এজন্যই গ্রন্থাগারিক নিরুদ্দিষ্ট বই মাত্রই সেটিকে হিসাব থেকে চট ক'রে খারিজ করেন না।

## মঞ্চ সজ্জা ( Shelf arrangement )

এই সূত্রে প্রাসঙ্গিক ভাবেই মঞ্চে পুস্তক বিন্যাস পদ্ধাতর কথা ওঠে। পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে সূচীপত্রক বিন্যাসের কথা বলা হয়েছে। সেটা গ্রন্থাগার, আখ্যা, বিষয় প্রভৃতির পত্রক বর্ণানুক্রমে সাজানোর প্রসঙ্গ। কিন্তু গ্রন্থাগারের যাবতীয় কাজের প্রকৃত ভিত্তি মূল পত্রক বা মঞ্চ পত্রক ( main card, shelf list )। গ্রন্থসংলেখ ( Call No. ) অনুক্রমে মঞ্চে বই সাজানো হয় এবং সঠিক সেই অনুক্রমেই সজ্জিত থাকে মূল পত্রকাধার। এই পত্রকই গ্রন্থাগারের পুস্তক সম্ভারের প্রকৃত তালিকা।

মঞ্চে বই সাজানোর ধারা কেমন হবে উদাহরণ নিয়ে দেখা যাক। ধরা যাক নিম্নোক্ত গ্রন্থসংলেখের বইগুলি তাকে তুলতে হবে :—

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 820.2 | 820.01 | 820 1 | 820.12 | 820.012 | 820.1 |
| C387 | B273 | B222 | C388 | B213 | B232 |

এগুলির মঞ্চ সংস্থান হবে নিম্নরূপ :—

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 820.01 | 820.012 | 820.1 | 820.1 | 820.12 | 820.2 |
| B273 | B213 | B222 | B232 | C388 | C387 |

অর্থাৎ সাজাবার জন্য প্রথম বিচার ধরতে হবে বর্গ সংখ্যা ( যেমন 820.01, 820.012 ইত্যাদি ) এবং দ্বিতীয় বিচারে ধরতে হবে লেখক সংখ্যা ( অর্থাৎ B273, B213 ইত্যাদি )। গাণিতিক সংখ্যা বিচারে দশমিকের পরবর্তী সংখ্যা, .১ বা .২ বা .৩ ইত্যাদি পর্য্যায় শেষ হবার পর বিচারে আসছে

.২ বা .৩ বা .৪ ইত্যাদি পর্য্যায় ; অর্থাৎ .১, .১০১, .১০০১, .১০১২, ইত্যাদি পর্ব চুকে যাবার পরে আসবে ২, এবং এই ভাবেই .২, .২০১, .২০০১, .২০১২ ইত্যাদি পর্ব চুকে যাবার পরে আসবে '৩ ( যেমন .820.01, 820.012, 820.1 ইত্যাদি )। লেখক চিহ্নের ধারানুসরণে প্রথমে বর্ণ ( A,B,C,D, ইত্যাদি ) এবং পরে গাণিতিক সংখ্যা ( ১, ১২, ১২৩, ২, ২৩ ইত্যাদি )।

## (৮) পুস্তক সংরক্ষণ ( Book Preservation )

গ্রন্থাগারে সংগৃহীত বইপত্র, পুথি, মানচিত্র এবংঅন্যান্য যাবতীয় সামগ্রী ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা থাকা দরকার সে কথা বলা বাহুল্য। সংরক্ষণের কাজে সমস্যা দেখা দেয়, বেশ কঠিন ব্যাপার হয়ে পড়ে। নিজেদের বাড়িতে এক আলমারি বই এরই ধূলোবালি ঝাড়া, পোকা মাকড় বা ছাতা-পড়া থেকে বাঁচানো নিয়ে হাঙ্গামা পোহাতে হয়, হাজার হাজার রকমারি সামগ্রী নিয়ে তো হিমসিম খাবার অবস্থা। গ্রন্থাগারের বই বা অন্য সঞ্চয়ের ক্ষতি ঘটে নানারকমের। বই ব্যবহার করতে করতে ছিঁড়েখুঁড়ে যায়। ব্যবহার না করলে পোকায় কাটে, ছাতায় ধরে। চিত্র বা মানচিত্রগুলিতে বিশেষ ধরণের কাগজ এবং রং থাকে ব'লে সেগুলির বিশেষ ধরণের যত্ন নিতে হয়। অতিরিক্ত স্যাঁৎসেতে বা বেশী খটখটে—দুরকমের আবহাওয়া বা স্থানই বর্জন করতে হয়। স্বরধারক বা রেকর্ড ইত্যাদির ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যাপার। মোটকথা, মানবিক বা অমানবিক উভয় ধরণের শত্রুর হাত থেকেই এগুলিকে রক্ষা করার জন্য সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। পরিহাস ছলে বলা হয়ে থাকে, বইপত্র উই আর পণ্ডিত উভয়ের হাত থেকেই রক্ষণীয়। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেবার মতো নয়।

গ্রন্থ-সম্ভারের সংহারক প্রধানত দুই শ্রেণীর; আবহাওয়া এবং কীট। বই এর কাগজ, রং, বাঁধাই প্রভৃতি বস্তুর উপরে পারিপার্শ্বিক জলবায়ুর প্রভূত প্রভাব। দেশ ভেদে এই প্রভাবের প্রভেদ দেখা যায়। বাংলার আদ্র' আবহাওয়ায় বইএর যে ক্ষতি হতে পারে পাঞ্জাবের শুষ্ক পরিমণ্ডলে সে ক্ষতির ধরণ হবে অন্যরকম। সুতরাং স্থানিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। পারিপার্শ্বিক অবস্থার কয়েকটি উপাদানের মধ্যে আছে : ১) আলো, যার তারতম্যের উপরে গ্রন্থাদির আয়ু নির্ভর করে। সূর্যের আলোয় কীট বা

বীজানু ধ্বংস হয়, কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত সূর্য রশ্মি গ্রন্থের ক্ষতি করে। কোনো প্রয়োজনে,—বীজানু অথবা ছত্রাক থেকে মুক্ত করার জন্য, অথবা ভিজে গেলে,—বই রোদে রাখা বিধেয়। কিন্তু সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য রাখতে হবে, বেশিক্ষণ রাখলে বই ছুমড়ে যায় এবং পাতাগুলি তাড়াতাড়ি মুড়মুড়ে হয়ে যায়। এই কারণেই গ্রন্থমঞ্চে আলোকপাতেরও নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। বই অন্ধকারেও রাখা যায় না, অন্ধকার কীটবর্ধক। আলো প্রখর হ'লে বইএর রং জলে যায়, পাতার রস টেনে শুকিয়ে ফেলে। আলোর বিকীরণে হলদে রংই সবচেয়ে নিরাপদ। (২) আবহাওয়া, অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলের হালচালের উপরেও বইএর ভালমন্দ নির্ভর করে। আবহাওয়া কীট বা বীজানুর জন্ম-মৃত্যু প্রভাবিত করে। তাপমাত্রা বেশী হ'লে যেমন ক্ষতি কম হলেও আবার তেমনি ক্ষতিকর। বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি হ'লে কাগজপত্র নরম হয়, ছাতা ধ'রে যায়, পোকার জন্ম দেয়। বিশুষ্ক বায়ুও বইএর কাগজ কুঁকড়ে ভঙ্গুর ক'রে দেয়। বর্ষাকালে এবং প্রখর গ্রীষ্মে সমানভাবেই সাবধান হওয়া দরকার। আবার বাইরের হাওয়া বেশি চলাচল করলেও নানাধরণের কীটানু বীজানু বায়ুবাহিত হয়ে বইপত্রের মধ্যে আশ্রয় নেয়। (৩) ধুলোবালি জ'মে গেলে বইএর রং ঝলসে যায় তা সকলেরই জানা আছে। এতে বইএর প্রত্যক্ষ ক্ষতি না হলেও ময়লা জমতে থাকলে ক্রমে তাতে কীট জন্ম নিতে পারে। এজন্য নিয়মিতভাবে ঝাড়পোছ করা প্রয়োজন।

উপরোক্ত ক্ষতিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যাচ্ছে যে গ্রন্থাদি আলমারিতে আবদ্ধ থাকলেও ক্ষতি হয়, খোলা তাকে রাখলেও ক্ষতির হাত থেকে নিষ্কৃতি মেলে না। এর অনেকটাই আজকাল প্রতিরোধ করা সম্ভব শীততাপ নিয়ন্ত্রিত মঞ্চকক্ষের নির্মাণে। তা হলেও কীটাদির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতেই হয়। মোটামুটিভাবে সব শত্রুকেই প্রতিহত দমিত করা যায় নিয়মিত যত্ন নিয়ে ঝাড়-পোঁছ করলে, বই এবং তাক উভয়ই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখলে, এবং মাঝে মধ্যে একটু রোদে রাখলে। এছাড়া মাঝে মাঝে কীটনাশক বা ডি ডি টি পিচকারি দিয়ে মঞ্চগুলিকে সামান্য সিক্ত করা। একটা পাত্রে গুঁড়ো চুণ রেখে দিলে বাতাসের বাষ্প শোষণ করে। গ্রন্থ মঞ্চে—বিশেষ ক'রে আবদ্ধ আলমারিতে প্রতি তাকে কিছুটা ক'রে ন্যাপথলিন কাপড়ে জড়িয়ে রেখে দেওয়া ভাল। বইএর প্রথম ও শেষ মলাটের ভাঁজে, বা বইএর মাঝখানেও শুকনো নিমপাতা এবং তামাক পাতা রাখলে পোকার জন্ম রোধ করে। গ্রেমাকসিন

জাতীয় গুঁড়োও ছড়িয়ে অথবা পুটুলি ক'রে মঞ্চে রাখলে কাজ হয়। আরেকটি প্রতিষেধক লবঙ্গ, দারুচিনি, বচ এবং গোলমরিচ সমান পরিমাণে নিয়ে গুঁড়ো বা প্রায়-গুঁড়ো অবস্থায় কাপড়ের পুঁটুলিতে পুরে আলমারিতে প্রতি তাকে রেখে দেওয়া। এগুলি সবই দু'এক মাস পরে পরেই পালটে নতুন ক'রে রাখতে হয়।

বইএর শত্রু: (১) আরশোলা,—এই জীবটি পুস্তকস্থ রঙীন পদার্থের ভক্ত; বাঁধাইএর উপরকার আস্তরণ খেয়ে ফেলে, আর্ট-কাগজ প্রভৃতির জেল্লাদার প্রলেপ খেয়ে দেয়। বইএর মারাত্মক ক্ষতি না করলেও বাঁধাই এবং ছবি বিকৃত ও নষ্ট করে ফেলে। সোহাগা আরশোলার প্রতিষেধক. ছড়িয়ে রাখলে এরা খুৎ করতে পারে না। আরশোলা নিধনের জন্য আজকাল নানা-রকম বাণিজ্যিক মারণ পদার্থও বেরিয়েছে। তার মধ্যে দু'একটি বইএর পক্ষে উপযুক্ত নয়, তবে মেঝেতে ছড়িয়ে রাখলে কাজ হয়।

(২) খুদে গুবরে জাতীয় পোকা (borer),—অতি ক্ষুদ্র এই কীট বইএর মধ্যে এফোঁড় ওফোঁড় গর্ত ক'রে দেয়। বইএর এমন ক্ষতিকর পোকা খুব কমই আছে। এই কীটাক্রান্ত বই বাইরে বের ক'রে বেশ ক'রে ঝেড়ে মুছে কেরোসিন তেল অথবা বেনজিন (benzene) প্রলেপ দিয়ে হয়। বিশেষ ক'রে অন্ধকারে এবং আর্দ্র আবহাওয়ায় এই কীট বংশ জন্মলাভ করে এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। একবার একটি বইকে ধরলে সে বই সম্পূর্ণ ফুটো ক'রে তার পাশের বইতে হাজির হয়, এবং এইভাবে সমগ্র তাকের সারিবদ্ধ বই ফুটো ক'রে ফেলে। একটার সঙ্গে আরেকটা বই চাপাচাপিভাবে রাখা থাকলে সহজে সংক্রামিত হয়। এই কীটের জন্য সবসময়ে নিয়মিত নজর রাখা আবশ্যক। (৩) উকুনের মতো খুদে পোকা,—আঠা খেয়ে বইএর জোড় আলগা ক'রে দেয়। ছিদ্রও করে। উপরোক্ত কীটেরই সগোত্র, তাই উপরোক্ত ব্যবস্থাই এই কীটের উপরেও প্রযোজ্য। (৪) রূপালি খুদে মাছ-পোকা (Silver fish), —এরা আরশোলারই মতো রং ও জেল্লা শুষে নেয়, বিশেষতঃ মানচিত্রগুলিকে খুবলে খেতে ওস্তাদ। রজন-বার্নিশ প্রলেপ দিলে এর অত্যাচার কমে। (৫ ছত্রাক (mildew),—অর্থাৎ, স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়ায় বইএর মলাটে বা ভিতরে ছাতলা ধ'রে যায়। এক ধরণের সূক্ষ্ম বীজাণু এই কাজ করে, বিশেষ ক'রে চামড়ার ক্ষতি করে। প্রতিষেধক হিসেবে ভূর্জগাছের (birch) তেল অথবা সিডার (ceder) গাছের তেল দিয়ে ঘষতে হয়। তারপিন তেলে তুলো

ভিজিয়ে মঞ্চে রেখে দিলে পোকা মাকড়ের উৎপাত কমে। (৬) উইপোকা (termite).—একবার ধরলে মারাত্মক ক্ষতি করে। মাটির বহু নিচে এদের বাস, হঠাৎ সুড়ঙ্গ খুঁড়ে দল বেঁধে যেখানে সেখানে এসে হাজির হয়। ছোট বড় কোনো সামগ্রীকেই বাদ দেয়না, খেয়ে শেষ ক'রে দেয়। অন্যান্য পোকায় আক্রান্ত বইএর অংশ বিশেষ,—এমনকি মোটা অংশটাও তবু ব্যবহার করা যায়, কিন্তু উইএ কাটা বই সর্বাংশে অব্যবহার্য হয়ে পড়ে। শুধু বই নয়, সমগ্র গ্রন্থাগারেরই এটা বিশেষ সমস্যার ব্যাপার। আসবাবপত্র ও এদের থেকে রক্ষা পায় না। উইএর প্রতিরোধে কেরোসিন তেল কিছুটা কাজ করে, কীট নাশক তেল এবং ডি ডি টি উই নিবারণ করে। ভূর্জগাছ এবং উইলো ( willow ) গাছের তেলেও কাজ হয়। তবে এ সবই সাময়িক। তাই নিয়মিতভাবে নজর রাখতে হয় এই পোকা ধারে কাছে কোথাও তেড়েফুঁড়ে বেরোচ্ছে কি না। আজকাল কীট বিশেষজ্ঞরা গ্রন্থাগার প্রভৃতি ভবনের দরজায় দেয়ালে ফুটো ক'রে কিছু ফলপ্রসূ প্রতিষেধক দিচ্ছেন। (৭) ইঁদুর,—শুধু গ্রন্থ বা আসবাবই নয়, পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর শত্রু। কেটে তছনছ করে। যা খায় না তাও ছারখার করে। ইঁদুর-মারা কল পেতে রাখা একটি বহুল ব্যবহৃত প্রথা মঞ্চের পাশে কর্পূর ছড়িয়ে রাখলে ইঁদুর আসে না, —তবে এটা খরচে পোষায় না খুব। তারপিন তেল বা যুকালিপ্‌টাস্‌ তেলের গন্ধ এরা সইতে পারে না। সাবধানে সালফিউরিক এসিড, কষ্টিক সোডা বা কার্বন ডাই সালফাইট যদি রাখা যায় তাহলেও উপকার হয়। ইঁদুর মারবার মোক্ষম ওষুধ বিষ মেশানো মাংস বা অন্য খাবার,—যার সঙ্গে ইঁদুরের রুচিকর নারকোল তেল বা ক্যান্থারাইডিন মেখে দিলে প্রলুব্ধ হবেই, এবং খেয়ে মারা যাবেই।

পোকার আক্রমণ প্রতিরোধে এবং নিরাময়ে ধূলো ঝাড়া, রোদে রাখা, নিমপাতা বা তামাক পাতার ব্যবহার ইত্যাদি প্রসঙ্গ আগেই বলা হয়েছে। এ ছাড়া, কেরোসিন তেলের মধ্যে সামান্য ফিনাইল এবং ক্রিয়োজোট মিশিয়ে পিচকারিতে ক'রে মঞ্চে ছিটিয়ে দিলে উপকার হয়। এক গ্যালন পরিশোধিত স্পিরিটের সঙ্গে এক আউন্স মারকিউরিক ক্লোরাইড এবং এক আউন্স ফিনাইল মিশিয়ে সিঞ্চন করলেও পোকার উপদ্রব কমে।

কীটদষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত বই বাঁচাবার জন্য বিশেষ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া আছে। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বই বা পুথির মধ্যে বাষ্প চালিত ক'রে পোকামাকড় সব মেরে ফেলা হয়। এরকম দু'টি প্রক্রিয়ার কথা বলা হচ্ছে।

(১) ফরমাল ডি হাইড কক্ষ ( Formaldehyde chamber ) প্রক্রিয়া। ফরমাল ডিহাইড বস্তুটি কার্বন বা অঙ্গারক, অক্সিজেন বা অম্লজান এবং হাই-ড্রোজেন বা উদযান-এর মিশ্রণ। এই প্রক্রিয়ার জন্য কক্ষ হিসেবে কাঠের বা টিনের বাক্স হলেই কাজ চলে। দৈর্ঘে প্রস্থে ৪ ফুট এবং উচ্চতায় ৬ ফুট আন্দাজ মাপের বাক্সের ভিতরে তলা থেকে ইঞ্চি ছয়েক উপরে চারপাশে চারটি ছোট তাক তৈরি করতে হয়। টিনের গায়ে ঝালাই ক'রে চারটি টিনের খণ্ড লাগিয়ে নিলেই চলে। বাক্সের ভিতরটা কালো কাপড় অথবা খয়েরি ধরণের কাগজের দেয়ালে ঢাকা থাকা প্রয়োজন। পূর্বোক্ত চারটি তাকের উপরে পাৎলা কাঠের তক্তায় তৈরি আরেকটি বাক্স বসানো হয়, —এই বাক্সের নিচের তক্তায় পাঁচ ইঞ্চি আন্দাজ ব্যাসের একটি ফুটো থাকে এবং বাক্সের উপরে ঢাকনার বদলে থাকে একটি তারের জাল। সমগ্র বাক্সটির উপরে একেবারে খাপে খাপে বসে যায় এমন একটি ঢাকনা লাগাতে হয়। এই বাক্সের নিচে কাচের পাত্রে শতকরা ৪০ ভাগ দ্রাবণের ( 40% Solution ) বাণিজ্যিক ফরমালডিহাইড ২ আউন্সের সঙ্গে ২০ আউন্স জল মিশিয়ে রেখে উপরোক্ত কাঠের ছোট বাক্সটি মধ্যস্থ তাকের উপরে বসিয়ে দিতে হয়। কীটদষ্ট বই বা পুথি তারের জালের উপরে বিছিয়ে রেখে কক্ষমুখ বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। সমগ্র কক্ষ বায়ু শূন্য ক'রে নেওয়া প্রয়োজন। অতঃপর কক্ষটিকে আগুনের আঁচের উপরে দশ পনেরো মিনিট রেখে সরিয়ে ফেলতে হয়। তারপরে কক্ষটিকে চব্বিশ ঘণ্টা বন্ধ অবস্থায় রেখে দিয়ে শেষে ঢাকনা খুলে পুথি পত্তর বা'র ক'রে খোলা জায়গায় কিছুক্ষণ রেখে দিলেই ভেজা-ভেজা ভাবটুকু শুকিয়ে যায়। এই অবস্থায় কখনোই বইগুলিকে পাখার হাওয়ার নিচে বা রোদের তাপে রাখা উচিত নয়। এই প্রক্রিয়ার ফলে বইএর ভিতরের পোকা পোকার বাচ্চা বা ডিম সব ম'রে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। ফরমালডিহাইড বাষ্প প্রয়োগে তুলো, রেশম ও পশমের দ্রব্যাদির পোকাও খতম করা যায়।

(২) থাইমল কক্ষ ( Thymol chamber ) প্রক্রিয়া। থাইমল বাষ্প প্রয়োগ রঙীন বস্তুর পক্ষেও নিরাপদ। রং জলে যাবার ভয় থাকে না। সূক্ষ্ম বা পলকা সামগ্রীও নির্দ্বিধায় বাষ্প-জাত করা চলে। এই প্রক্রিয়ার ফলে থাইমলের যে বাষ্প সঞ্চারিত হয় তা আবার তাপ প্রয়োগে দূর হয়ে যায়। প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে বর্ণিত ধরণের প্রয়োজন মতো গড়নের বায়ুশূন্য বাক্সের মধ্যে মাঝামাঝি জায়গায় একটি কাঠের জালি-তাক লাগানো থাকে। বাক্সের

নিচে মাঝামাঝি স্থানে পাটাতনের সঙ্গে সংলগ্ন থাকে ৬০ মোম-শক্তির একটি আলো বা বাল্‌ব্, এবং এই আলোর উপরে একটি ত্রিপদে রাখা হয় থাইমল দানা। বাক্সটির বাঁদিকের কোণেও অনুরূপভাবে দ্বিতীয় এক ত্রিপদে থাকে থাইমল দানা এবং কাচের পিরিচে ৬০ শক্তির আলো। শোধিতব্য সামগ্রী যথোপযুক্তভাবে বিছানো থাকে কাঠের জালি পাটাতনের উপরে। এবারে বায়ুশূন্য বাক্সটি বন্ধ ক'রে রেখে পরপর তিনদিন একই সময়ে দু' ঘণ্টা ক'রে বাতি দু'টি জ্বালিয়ে রাখতে হয়। এই তিনদিনের মধ্যে বাক্সটিকে একবারও খোলা চলবে না বা নাড়াচাড়া করা চলবে না তিন দিন পরে বইপত্র বা'র ক'রে নিলেই হ'ল। শুকোবার দরকার হয় না। এই পদ্ধতি কিছু ব্যয় সাপেক্ষ হলেও খুব কার্যকর।

আজকাল অবশ্য নির্বাত প্রকোষ্ঠে পরিশোধনই বিজ্ঞানসম্মত এবং শ্রেষ্ঠ ব'লে স্বীকৃত। শোধিতব্য সামগ্রী ইস্পাতের প্রকোষ্ঠে রেখে সেটিকে প্রথমে নির্বাত ক'রে নিতে হয়। অর্থাৎ ভিতর থেকে সমস্ত বাতাস বা'র ক'রে দিতে হয়। তারপরে কীটনাশক গ্যাস বা বাষ্প দিয়ে কক্ষটি ভরাট ক'রে দেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়ায় বই বা পুথির সব অংশে খাঁজে খোঁদলে বাষ্প ঢুকে যায়। ভঙ্গুর পাতার বই হলেও আশঙ্কা থাকে না, কেননা বইপত্র খুলে রাখবার দরকার হয় না। হাইড্রোসায়নিক এসিড, এথিলিন ক্লোরাইড, কার্বন টেক্লোরাইড, কার্বন ডাইসালফাইড প্রভৃতির বাষ্প ব্যবহৃত হয়। পোকা বা বীজাণু ম'রে যায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে।

গ্রন্থাগারের সংগ্রহে বই ছাড়াও বিভিন্ন রকমের সামগ্রী থাকে। স্বভাবতই সেগুলিরও সংরক্ষণ প্রয়োজন। এই সকল বস্তুর মধ্যে প্রথমেই বলা যায় কাঠের তাক বা আলমারির কথা, এবং আলমারির কাচের কথা। কাঠের তাকে পোকা লাগলে প্রথমেই সাফ সুতরো ক'রে পরে কার্বন ডাইসাল-ফাইড কক্ষে পরিশোধন করা যায়। ৬´×৪´×৪´ ফুট মাপের একটি বাক্সকে কালো বনাত আর পাতলা মলাট-কাগজ দিয়ে মুড়ে বায়ুশূন্য ক'রে নিয়ে এই কক্ষ তৈরী করা যেতে পারে। তলা থেকে ৮" ইঞ্চি উপরে চার কোণে চারিটি নাগদণ্ড বা ব্রাকেট লাগিয়ে তা'র উপরে আলগা কাষ্ঠজালিক তক্তা চাপিয়ে তা'র উপরে শোধিতব্য বা সামগ্রী রেখে তক্তাটির নিচে ২ আউন্স করে কার্বন ডাইসালফাইড দ্রাবণ সমেত তিনটি বাটি তিন কোণে সাজিয়ে রেখে বাক্সটি সাত দিন, অথবা প্রয়োজনে চৌদ্দ দিন ঐ অবস্থায় রেখে দিতে হয়।

কাঠের বা বাঁশের আসবাবপত্রের উপরে প্রায়ই ময়লা জ'মে আঠার মতো আটকে থাকে। এই উৎপাত দূর করতে শতকরা পাঁচ ভাগ কার্বলিক সাবানের ফেনার প্রলেপ লাগিয়ে একখণ্ড তুলো জলে ভিজিয়ে নিয়ে ঘ'সে ঘ'সে সাফ করতে হয়,—জলে ধোয়া চলবে না। খাঁটি দেশী কায়দায় সাজিমাটির প্রলেপও ঐভাবে দিলে পরিষ্কার হয়,—সাবানের চেয়েও ভাল সাফ হয়। তবে কার্বলিকের বাড়তি গুন আছে. পোকা বা পোকার ডিম থাকলে তাও ম'রে যায়। এইভাবে সাফ করার পর বস্তুটিকে শুকোবার সময় দিতে হয়. —কিন্তু রোদে বা পাখার হাওয়ায় শুকোনো বারণ। রোদে রাখলে কাঠে টান ধরে, সঙ্কুচিত হয়ে সূক্ষ্ম ফাটল দেখা দিতে পারে। পাখার হাওয়ায় শুকোলে কোনো অজ্ঞাত কারণে এক ধরণের পোকা জন্মাতে দেখা যায়। শুকিয়ে যেতে ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় লাগেনা। কাঠের বা বাঁশের মধ্যে ঘুন-জনিত হলদে গুঁড়ো বেরোতে দেখলে অপরিশ্রুত ক্রিয়োজোট ( ঘন কালো রং) দুই, তিন বা চার ভাগ কেরোসিনের সঙ্গে মিশিয়ে প্রলেপ দিলে কাজ হয়। তবে এই পদার্থটি মনুষ্য চর্মের পক্ষে ক্ষতিকর, তাই খুব সাবধান হওয়া দরকার এই প্রলেপ লাগাবার পর ৭২ ঘণ্টা, অর্থাৎ তিন দিন ফেলে রাখতে হয় শুকোবার জন্য।

রঙীন অথবা কারুকাজ করা কাঠের মধ্যে পোকা লাগলে সেগুলোকে সাবাড় করবার জন্য পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে থাইমল প্রকোষ্ঠে পরিশোধন প্রয়োজন। এখানেও ৬´×৪´×৪´ ফুট মাপের একটি বায়ুশূন্য বাক্সের নিচে দুটি ৬০ মোম-শক্তি তড়িৎ-বাল্‌বের উপরে ত্রিপদে থাইমল-দানা রেখে কাষ্ঠজালিক তক্তার উপরে জিনিষটি চাপিয়ে তিনদিন বন্ধ ক'রে রাখতে হয়, এবং প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে দু'ঘণ্টা ক'রে বাতি দুটি জালাতে হয়।

কাপড়ের জিনিস পুরানো হ'লে শক্ত এবং ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। বেনজিনে ডুবিয়ে রেখে অথবা বেনজিন-বাষ্প চালিত ক'রে এই দোষ দূর করা যায়। কাপড়ে, বিশেষ ক'রে বাঁধাইএর কাপড়ে মাড় থাকে, এবং পোকারা এই মাড়ের বিশেষ ভক্ত। ফরমালডিহাইড প্রথায় এটিকে কীট রোধক ক'রে নেওয়া যায়। তেল চিটচিটে হয়ে গেলে বেনজিন ও পেট্রোল সমান পরিমানে নিয়ে তুলোয় করে মুছে দিলেই তেল উঠে যায়।

চামড়া গ্রন্থাগারের আরেকটি অপরিহার্য সামগ্রী। বিশেষ ক'রে বই বাঁধানোর কাজে। কিন্তু কালক্রমে আবহাওয়ার তারতম্যে, ব্যবহারের ফলে

তেল-ময়লা লেগে অথবা ত্রুটিপূর্ণ উৎপাদনের জন্য ক্ষয় পায় বা জখম হয়। শুকনো হাওয়ায় বা রোদের তাপে শুকিয়ে কড়া হয়ে যায়, ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। চামড়াকে এই সকল ক্ষয় ক্ষতির থেকে বাঁচানোর জন্য মাঝে মাঝে নিবারক ওষুধের প্রলেপ লাগানো উচিৎ। যেমন রেড়ির তেল, ভেসেলিন বা লেনোলিন। অনেকে তিসির তেল দেন, কিন্তু তিসির তেলের প্রলেপে একেবারেই ফাঁক থাকেনা ব'লে একটুও বাতাস ঢুকতে পারেনা. তার ফলে চামড়ার ফাট ধরে। চামড়া ভঙ্গুর হ'লে শতকরা ৪০ ভাগ রেডির তেল এবং ৬০ ভাগ সুরাসার (alcohal) মিশ্রণের মধ্যে তুলোর খণ্ড ডুবিয়ে নিংড়ে নিয়ে চামড়ার উপরে বুলিয়ে দিলে অন্তত মাস কয়েকের জন্য নিশ্চিন্ত। চামড়ায় ছাতা পড়লে তুলোর খণ্ড শতকরা পাঁচ ভাগ কার্বলিক সাবানের ফেনায় ভিজিয়ে কিছুক্ষণ ভাল করে ঘ'ষে শেষে তুলো জলে ভিজিয়ে আর একবার ঘষতে হয়। তা না হ'লে কার্বলিক চামড়ার মধ্যে জমে গিয়ে ক্ষতি করতে পারে।

কাচ গ্রন্থাগারের আসবাবের আরেকটি অপরিহার্য সামগ্রী। কখনো কখনো কাচের মধ্যে ছিটছিটে দাগ ধরতে দেখা যায়। এটি দূর করবার জন্য পর্যায়ক্রমে শতকরা একভাগ সালফিউরিক এসিড মিশ্রিত দ্রাবণে এবং পরে জলে ডুবিয়ে নিতে হয়। পর্যায়ক্রমে এসিডে ডোবানো এবং জলে ডুবিয়ে ধুয়ে নেবার কাল-মাত্রা বাড়িয়ে চার ঘণ্টা বা ছয় ঘণ্টা করলে ছিটের তারতম্য অনুযায়ী ফল মিলবে এই প্রক্রিয়ার পর সেলুলোজ বা ঐ জাতীয় কোনো পদার্থের প্রলেপ দিয়ে নিলে ভাল। কাচের উপরে ছাতা ধরলে জাইলল ( Xylol ) কয়েক ফোঁটা দিয়ে শাময় ( Chamois ) চামড়া দিয়ে ঘষলেই উঠে যায়। কাচে ধূলো জমে বসে গেলে মেথিলেটেড স্পিরিটে খড়ির গুঁড়ো দিয়ে দ্রাবণ তৈরি ক'রে কাচের উপর লাগিয়ে কিছুক্ষণ রেখে পরে শুকিয়ে গেলে তোয়ালে দিয়ে ঘষলেই পরিষ্কার।

ছোটখাট আরো কয়েকটি জিনিস—যা গ্রন্থাগারে থাকতে পারে—সম্পর্কে কিছু জেনে রাখা ভাল। তালপাতার পুথি পরিচ্ছন্ন করতে হলে সেলুলোজ জতীয় জিনিস, অথবা আলু বা পেঁয়াজের রস ব্যবহারে কাজ হয়। পুঁইশাকের রস একাজের খুবই উপযোগী। পুথিতে পোকা লাগলে ফরমাল ডিহাইড প্রকোষ্ঠ পদ্ধতিই প্রশস্ত।

ডেলরঙের চিত্র গ্রন্থাগার সজ্জায় থাকা বিচিত্র নয়। এগুলি পরিষ্কার

করা নৈপুণ্যের ব্যাপার। স্থুরাসার, বেনজিন, পেট্রল, তারপিন তেল প্রভৃতির ক্রমিক প্রয়োগে কাজ হয়। তবে অবিশ্বাস যোগ্য হলেও, পেঁয়াজ বা আলু মাঝখানে কেটে দু'ভাগ করে নিয়ে সেই কাটা দিকটা দিয়ে রবারের মতো ক'রে সাবধানে ছবিটা ঘ'ষে দিলেই ময়লা উঠে যায়, ছবির উজ্জ্বলতা ফিরে আসে। টাট্‌কা পাউরুটির গুঁড়ো ( বাসি হলে চলবেনা ) দিয়ে ঘষলেও সাফ হয়ে যায়। পুরানো দলিল পত্রও রুটির গুঁড়ো দিয়ে পরিষ্কার করা চলে।

সংবাদ পত্র, অর্থাৎ খবরের কাগজ বা ঐ জাতীয় মুদ্রিত সাময়িক সামগ্রী বা বই বহু বছর ধ'রে জমা ক'রে রাখা যায় না,—মুচমুচে হয়ে যায়, গুঁড়ো হয়ে যেতে চায়। সম্প্রতি এগুলি সংরক্ষণের একটি সহজ উপায়ের কথা বলা হয়েছে। বোতল দুয়েক সোডা ওয়াটারে একটি মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়া ( Milk of Magnesia ) বড়ি ফেলে দিয়ে রাত ভোর দ্রাবণটি রেখে দিতে হয়। বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গেলে সংবাদ পত্র বা মুদ্রিত পাতাগুলির আকার অনুযায়ী পাত্রে ঢেলে তার মধ্যে একঘণ্টা কাগজগুলিকে চুবিয়ে রেখে তারপরে শুকিয়ে নিতে হয়। একবার এই প্রক্রিয়া প্রয়োগ করলে পঞ্চাশ বছর কাগজ অক্ষত থাকে। প্রতি পঞ্চাশ বছরে একবার এই প্রক্রিয়া প্রয়োগ করলে বংশানুক্রমে টিকে থাকে। তবে পাণ্ডুলিপির বেলায় এটি খাটবেনা।

## (৯) গ্রন্থাগার দপ্তর ; গ্রন্থণ বিভাগ

গ্রন্থাগার পরিচালনায় গ্রন্থাগারিকের দপ্তর থাকবে সেটা জানা কথা। এবং সাধারণত দপ্তরের যা কার্যক্রম, যেমন প্রয়োজনীয় চিঠি পত্রাদির প্রাপ্তি এবং উত্তর নথিভুক্ত করা, সেকাজও এ দপ্তরে থাকবেই। গ্রন্থাগার দপ্তরের ক্ষেত্রে যে সব বিশেষ নথিপত্রের সংরক্ষণ আবশ্যক সেগুলি নিম্নরূপ : (১) পুস্তকের অনুজ্ঞা নথি, – প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত পুস্তকের হিসাব সমেত। বিভিন্ন বিষয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নথি রাখতে হয়। (২) আর্থিক প্রসঙ্গের নথি ; গ্রন্থাগার সামগ্রিক আয় ব্যায়ের হিসাব, পুস্তক খাতে বিভিন্ন বিভাগ এবং বা বিষয়ের স্বতন্ত্র হিসাব। (৩) আন্তঃ গ্রন্থাগার লেনদেনের নথি। (৪) গ্রন্থাগার সমিতি সংক্রান্ত নথি। (৫) গ্রন্থাগারের যাবতীয় আসবাবের তালিকা। (৬) দপ্তর সামগ্রীর মজুতি নথি ; কাগজ কালি থেকে শুরু করে

নিবন্ধন খাতা, সূচীপত্রকাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। (৭) কর্মী নিবন্ধন খাতা এবং বিবিধ ব্যবস্থাপন নথি।

এছাড়া যে সকল বিবরণের খতিয়ান মূল দপ্তরে এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের দপ্তরের পক্ষে রাখতে হয় সেগুলির তালিকা নিম্নরূপ : (১) পরিগ্রহণ পঞ্জী.—বর্ষ হিসেবে ; (২) উপহার বা দান—গ্রন্থের তালিকা ; (৩) সাময়িক পত্রিকাদির তালিকা ; (৪) সঞ্চারণ বিভাগীয় আগমন নির্গমনের বিভিন্ন খাতা ; (৫) কর্মীদের দৈনন্দিন কর্মের তালিকা, —রোজনামচা জাতীয় ; (৬) পুস্তক নির্গমনের মাসিক তালিকা ; হিসাবটি গ্রন্থাগার ব্যবহারের নিদর্শন হিসেবে গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার সমিতি পর্যবেক্ষণ করেন ; (৭) বাঁধাইএর হিসাব ; (৮) পুস্তক সম্ভার গণনের নথি।

সাধারণ ভাবে দপ্তর পরিচালনার জন্য যে সব .সামগ্রীর দরকার সে সব ছাড়াও গ্রন্থাগারের বিশেষ কার্যক্রমের জন্য বিশেষ ধরণের ছাপানো পত্রাদি, পত্রক, নির্গম প্রক্রিয়ার বিশেষ নির্দেশক পত্রক, সাময়িকীর বিশেষ নিদর্শন পত্র, পত্রকাধার ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। এসব মজুত রাখা, নমুনা মতো ছাপানো. বরাত দেবার দিকে নজর রাখা, হঠাৎ কোনোটা যেন ফুরিয়ে গিয়ে কাজ অচল ক'রে না দেয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা দপ্তরের বিশেষ কর্তব্য।

গ্রন্থাগারের প্রয়োজনে কিছু গ্রন্থন—অর্থাৎ পুস্তিকা বা প্রচার পত্র জাতীয় কিছু প্রকাশন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যেমন. গ্রন্থাগার পরিচিতি পুস্তিকা, নবাগত পুস্তক তালিকার সাময়িক সংকলন বা গ্রন্থসূচী. গ্রন্থাগার পত্রিকা বা বুলেটিন, কিছু বিষয়-কেন্দ্রিক গ্রন্থপঞ্জী এবং প্রবন্ধসার. ইত্যাদি। গ্রন্থাগার-পরিচিতি-পুস্তিকায় গ্রন্থাগারের বিবরণ, বর্গীকরণ পদ্ধতি. সংগ্রহের উল্লেখযোগ্য ইতিবৃত্ত, গ্রন্থাগার ভবনের পরিকল্পনা বা নক্সা, নিয়মাবলী ইত্যদি যাবতীয় তথ্য সন্নিবেশ ক'রে প্রচার আবশ্যক। গ্রন্থাগারের ক্রিয়াকলাপ এবং বিশেষ ঘটনা বা বিজ্ঞপ্তি নিয়ে পত্রিকা বা বুলেটিন তৈরি ক'রে সেটিরও প্রচার কর্তব্য। কোনো কোনো গ্রন্থাগার বাৎসরিক গ্রন্থসূচী বা ক্যাটালগ প্রকাশ করে। এই সকল প্রকাশন মুদ্রিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বিকল্পে কিছু কিছু সাইক্লোস্টাইল প্রতিলিপিও করা যায়। গ্রন্থাগার দপ্তরের সঙ্গেই এই কাজ সংশ্লিষ্ট থাকে। অনেক গ্রন্থাগার থেকেই—বিশেষত বিদেশে—নানান বিষয়ের বইও ছাপানো হয়। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা জাতীয় প্রকাশন বা পত্রিকা প্রণয়ণের ভারও গ্রন্থাগারের উপরে ন্যস্ত থাকে। এই জাতীয় বই পত্র অন্যান্য

বিশ্ববিদ্যালয়ে বা গ্রন্থাগারে উপহার হিসেবে অথবা তা'দেরও প্রকাশনের বিনিময়ে পাঠানোর ভার থাকে গ্রন্থাগারের উপরে। এজন্য যাবতীয় তালিকা ও নথি গ্রন্থাগার দপ্তরে রাখতে হয়, —দান প্রতিদানের হিসাব রাখতে হয়। জাতীয় গ্রন্থাগার যেমন গ্রন্থপঞ্জী বা'র করে তেমনি জনগ্রন্থাগারের থেকে শিশু ও বয়স্ক শিক্ষণের জন্য বই পত্র প্রকাশ করা সঙ্গত। গ্রন্থাগার দপ্তরের সঙ্গে স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থন-শাখা রাখা খুবই উচিত।

## (ছ) সাময়িকী বিভাগ পুস্তিকা

সাময়িক পত্র পত্রিকা গ্রন্থাগার সংগ্রহে বইএর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে। বিচিত্রতায় গ্রন্থ সংগ্রহকেও ছাড়িয়ে যায়। পত্রিকার প্রদর্শন, সংরক্ষণ এবং হিসাবপত্র স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে চলে। দৈনিক, সাপ্তাহিক, অর্ধসাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, দ্বৈমাসিক, ত্রৈমাসিক, চতুর্মাসিক, ষান্মাসিক, বার্ষিক—নানান ধরণের প্রকাশন রীতি। তাই এর নথিকরণের পদ্ধতিও ভিন্ন। সাময়িকীর সময় সীমার মধ্যে প্রকাশিত সাময়িক বা অস্থায়ী মূল্যের রচনা থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলির মূল্য হেলাফেলার যোগ্য নয়। দৈনন্দিন সংবাদ থেকে স্থুরু ক'রে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ এদের অন্তর্ভুক্ত। আজকের দিনে দৈনিক সমাচার বা সমাচার-কেন্দ্রিক সমালোচনাও ইতিহাসের সামগ্রী হয়ে ওঠে। বৈচিত্র্যে এবং গুরুত্বে পত্রিকার বহিরাঙ্গিক বিচার এবং অন্তরাঙ্গিক পরিচয় নানাবিধ জটিল কাজের জন্ম দেয়।

সাময়িকী বলতে কোন জাতীয় প্রকাশন বোঝায় সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। সোজা কথায় তাকেই বলে সাময়িকী যে প্রকাশন একটি নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতা রেখে চলে। এই ধারাবাহিকতা কালের ধারা সীমাবদ্ধ হ'তে পারে, বিষয় বিশেষেও সীমাবদ্ধ হ'তে পারে। কিন্তু কোনো চলতি পরিকল্পনার অঙ্গ বা অংশ হিসাবে প্রকাশিত হওয়া দরকার। খণ্ডবদ্ধ বই— তা সে যত খণ্ডে এবং যত দিন ধরেই প্রকাশিত হোক না কেন, তা'কে সাময়িকী বলা যাবে না। কেননা সে সমগ্রতা বজায় রাখে, একটা নির্ধারিত পর্যায়ে এসে শেষ হয়ে যায়। নিঃশেষিত হবার পর নূতন ভাবে নূতন সংস্করণে প্রকাশিত হ'তে পারে। কিন্তু মাসিকী বা বার্ষিকী জাতীয় প্রকাশন আপাত-

দৃষ্টিতে সমগ্র ব'লে মনে হলেও কালের ধারায় তা নিরবচ্ছিন্ন। এর সংস্করণ হয় না। তাই মহাকোষ বা কোষগ্রন্থাদি—যেমন Encyclopedia Britannica, ভারতকোষ—সাময়িকী নয়, কিন্তু লোকগণনার বিবৃতিকে সাময়িকীর পর্যায়ে ফেলতে পারি। সরকারী বিবরণ বা রাজ্যসভার বিবৃতি সাময়িকী নয়, কিন্তু Calcutta Gazette জাতীয় সামগ্রী সাময়িকী।

সাময়িকী তাহলে কত রকমের হতে পারে,—বিশেষ করে কোন ধরণের সামগ্রী সাময়িকী বিভাগের আওতায় পড়ে,—তা'র হিসেব নেওয়া যাক। পূর্ব অনুচ্ছেদে উক্ত দৈনিক থেকে সুরু করে বার্ষিক পর্যন্ত পত্রিকা এর অন্তর্ভুক্ত সে কথা বলাই বাহুল্য। এ ছাড়াও আছে বার্ষিকী বা বর্ষপঞ্জী ও পঞ্জিকা। অনিয়মিত পর্যায়ে প্রকাশিত সভা, সমিতি ইত্যাদির প্রতিবেদন, সরকারী বিবৃতি, ব্যবসায়িক বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের বিবরণী, বিশ্ববিদ্যালয়াদির নানাবিধ সূচী ও বিবরণাদি এবং নানাবিধ স্মারক ( Souvenir ) এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া রয়েছে পুস্তিকা (Pamphlets),—যাকে কোনোভাবেই সাময়িকী পর্যায়ভুক্ত করা যায় না, অথচ যার মূল্য সাময়িক, আলোচনার পরিমণ্ডলও সাময়িক। বর্ষপঞ্জী, পঞ্জিকা এবং পুস্তিকা সাময়িকী বিভাগের পরিবর্তে জিজ্ঞাসা বিভাগে রাখা অসমীচীন নয়। বিশেষ ক'রে বর্ষপঞ্জী এই বিভাগে থাকাই ভাল।

পত্রিকা সংগৃহীত হয় তিনটি উপায়ে। গ্রাহক-চাঁদার সূত্রে, বিনিময়ের ভিত্তিতে এবং উপহার হিসেবে। যে সব পত্রিকা কেনা হয় সেগুলির নির্বাচন পদ্ধতি গ্রন্থ নির্বাচন পদ্ধতিরই মতো। তবে বই একবার কিনলেই যেমন চুকে যায়। পত্রিকার ক্ষেত্রে তা হয় না। একবার গ্রাহক হ'লে বরাবরই বহাল রাখতে হয়। ক্রমাগত গ্রহণ বদলালে মূল্য কিছু থাকে না। আবার বৎসরান্তে বা বিবেচিত কালান্তে এগুলিকে একসঙ্গে বাঁধিয়ে মূল গ্রন্থ মঞ্চের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ক্রীত পত্রিকার চাঁদা বছরের নির্দিষ্ট সময়ে না জমা দিলে ছেদ ঘটে যায়। এবং একবার ছেদ ঘটে গেলে প্রায় সব পত্রিকারই মূল্য লাঘব হয়। বিনিময় প্রথায় যেসব পত্রিকা মেলে সেগুলি যাতে বন্ধ না হয়ে যায় তা'র জন্য বিনিময়ের অন্তর্গত নিজ নিজ পত্রিকাদি নিয়মিত পাঠাবার দিকেও লক্ষ্য রাখতে হয়।

গ্রন্থাগারের সাময়িকী সংগ্রহের নীতি নির্ভর করে গ্রন্থাগারের ধরণের উপর। বিশ্ববিদ্যালয়াদির সাময়িকী সংগ্রহ গবেষনা প্রতিষ্ঠানের সংগ্রহ থেকে

স্বতন্ত্র। আবার জনগ্রন্থাগারের সাময়িকী সম্ভারের প্রকৃতি আলাদা। যে পরিবেশে বা যে-অঞ্চলে গ্রন্থাগার স্থাপিত তার বৈশিষ্ট্য. জনগণের প্রবৃত্তি প্রবণতা অনুযায়ী সংগ্রহই সমীচীন। পত্রিকা নির্বাচনের জন্য প্রকাশকদের বা অন্যান্য সংস্থার তালিকা হাতের কাছে থাকা দরকার। এজাতীয় তালিকাও বাজারে আছে। যেমন. Ulrich's Periodicals Directory, Nitor Guide to Indian Periodicals, Annual Index to Indian Periodicals. ইত্যাদি। এছাড়া দেশী ও বিদেশী সাময়িকীর গ্রাহক-সংস্থা আছে এ ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য।

পত্রপত্রিকার জন্য গ্রন্থাগারে স্বতন্ত্র বিভাগ রাখা বাঞ্ছনীয়। বাঞ্ছনীয়ই শুধু নয়, কর্তব্য। কেননা এর বিন্যাস, ব্যবহার এবং পরিচালনা স্বতন্ত্র নীতি মেনে চলে। এমনও হয় যে সাময়িকী বিভাগের পড়ুয়ারা মূল গ্রন্থাগার থেকে বই নেন না। শুধু পত্রিকা পড়তে আসেন অবসর সময়ে। এই বিভাগের কার্যকালও সেজন্য যথাসম্ভব বিস্তৃত থাকা দরকার। সাময়িকী বিভাগে দৈনিক পত্রিকার জন্য একটু আলাদা এবং বিশেষ ব্যবস্থা থাকে। অন্যান্য সাময়িকী বিষয়ানুক্রমে অথবা বর্ণানুক্রমে সজ্জিত থাকে পত্রিকার জন্য বিশেষ ধরণের তাকে। পত্রিকা গ্রন্থাগার থেকে ঋণ নেওয়া সাধারণতঃ বারণ থাকে। নির্গমক্রিয়া এই বিভাগের কর্মসূচীতে নেই। কেননা চলতি পত্রিকার কোনো একটি সংখ্যা অথবা বাঁধানো পত্রিকার কোনো একটি খণ্ড হারিয়ে গেলে পুনরায় পাওয়া দুরূহ। পত্রিকায় প্রকাশিত এমন সব বিষয়ের নিবন্ধাদি থাকে, থাকে ক্রমশ প্রকাশ্য রচনা, যার জন্য একটি খণ্ড হারিয়ে গেলে সমগ্র সংগ্রহই অপূর্ণ থেকে যায়। বিশেষ প্রবন্ধাদি গ্রন্থাকারে বেরোতে সময় লাগে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রন্থাকারে প্রকাশিতই হয়না, তাই এ গুলির মূল্য অপরিসীম। তাছাড়া যে কোনো সময়ে কোনো পাঠক এসে পত্রিকা চাইতে পারেন, ঋণ দেওয়া হলে তাঁর অসুবিধা হয়।

সাময়িকী বিভাগের আসবাবও অন্য ধরণের হয়, মূল মঞ্চ ইত্যাদির থেকে স্বতন্ত্র ধরণের। দৈনিক পত্রিকার জন্য বিশেষ উচ্চতা বিশিষ্ট দাঁড়া-টেবিল অথবা দেওয়ালে সংলগ্ন হেলানো পাটাতনের ব্যবস্থা করা ভাল। অন্যান্য সাময়িক পত্রের জন্য বিশেষ ধরণের প্রদর্শমঞ্চ থাকে, এ গুলির কোনোটা পর্যায়ক্রমে কেবলমাত্র পত্রিকার আখ্যা প্রদর্শন করে. কোনটাই পুরো পত্রিকাই প্রদর্শিত হয়। পড়বার জন্য টেবিল এবং চেয়ারের ধরণও নানা রকমের

হয়ে থাকে। স্বতন্ত্র ভাবে চেয়ার টেবিল রাখা যায়, আবার বড় টেবিলের মাঝখানে পত্রিকার তাক রেখে তা'র দুদিকেও চেয়ার দিয়ে উক্ত পত্রিকাগুলি পড়বার ব্যবস্থা করা যায়। পত্রিকার যে প্রদর্শমঞ্চ খাঁজ-কাটা ও তাক বিশিষ্ট হয় তার পিছনে অথবা নিচে পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলি রেখে দেবার ব্যবস্থাও করা সম্ভব ; প্রয়োজন পক্ষে বা'র ক'রে দেখা যায়, —অন্যত্র সরিয়ে রাখলে আবার সেগুলি নিয়ে আসার হাঙ্গামা থাকে। অনেক গ্রন্থাগারে চলতি পত্রিকার জন্য মঞ্চে এমন তাক থাকে যেগুলির উপরের দিকে কব্জা থাকে এবং তাকটি তুলে তার পিছনে পূর্ববর্তী সংখ্যা গুলি রাখা চলে। এক বছরের পত্রিকা জমলে পরে সেগুলি বাঁধিয়ে পুস্তকাকারে মূল মঞ্চে সরিয়ে রাখাই নিয়ম। তবে ভালো হয় যদি সাময়িকী বিভাগেরই একাংশে এগুলির জন্য স্বতন্ত্র মঞ্চের ব্যবস্থা থাকে। এক ধারে রইল পত্রিকার বাঁধানো খণ্ডবদ্ধ মঞ্চ, অপর দিকে চলতি সংখ্যাগুলির মঞ্চ, মাঝখানে অথবা দুধারেই ব'সে পড়বার ব্যবস্থা।

সাময়িকীর নথিভুক্তি ও সূচীকরণ পদ্ধতি গ্রন্থ পরিগ্রহণ ও সূচীকরণের থেকে পৃথক ধরণের। বই এর সূচীপত্রক একবার তৈরি ক'রে পত্রকাধারে রেখে দিলেই চলে, আর বড় একটা বা'র করবার দরকার পড়েনা। কিন্তু পত্রিকার পত্রক নির্দিষ্ট সময়ে আধার থেকে বা'র ক'রে নিয়মিত ভাবে দেখতে ও ভরাট করতে হয়। গ্রন্থসূচী স্থিতিশীল, সাময়িকীসূচী গতিশীল। বইএর সূচীকরণে গ্রন্থকার প্রধান, পত্রিকার সূচীকরণে সম্পাদক গৌন,— পত্রিকার আখ্যাই প্রধান। সাপ্তাহিক, মাসিক প্রভৃতি যথাযথ পর্যায়ে ভাগ ক'রে বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিতে সাময়িকী পত্রক সাজিয়ে রাখতে হয়। কবে কোন সংখ্যা এল তা টুকে রাখতে হয়, কোনো সংখ্যা যথাসময়ে না এলে স্মারকপত্র পাঠাতে হয়। সাময়িকী সূচীর প্রয়োজনে ৫″×৩″ ইঞ্চি পত্রক নেওয়া চলে, কিন্তু এতে সব বিবরণের স্থান সঙ্কুলান হয়ে ওঠেনা। সেজন্য ৬″×৪″ ইঞ্চি অথবা ৮″×৬″ ইঞ্চি পত্রক ব্যবহার করাই শ্রেয়। প্রত্যেক সাময়িকীর জন্য একটি ক'রে পত্রক। এতে লিপিবদ্ধ হয় পত্রিকার আখ্যা, প্রকাশকের নাম ঠিকানা, চাঁদার হার, প্রাপ্তির সূত্র, প্রকাশক্রম, বর্ষারম্ভ, প্রাপ্তির তারিখ। সাময়িকী সূচীকরণের জন্য বিশেষ ধরণের ইস্পাতের আধার আছে যার মধ্যে বর্ণানুক্রমে পত্রক রাখার ব্যবস্থা থাকে এবং অতি সহজে পত্রিকা সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায়।

উপরোক্ত এক-পত্রক নথি ভুক্তি পদ্ধতির পত্রক নমুনা নিম্নরূপ :—

পত্রকের মূল পৃষ্ঠ

গ্রন্থাগার : ____________ স্থান : ____________

পত্রিকা : ____________ প্রকাশ-ক্রম : ____________

প্রকাশক : ____________ যোগানদার : ____________

| বর্ষ / খণ্ড | বৈশাখ | জ্যৈষ্ঠ | আষাঢ় | শ্রাবন | ভাদ্র | আশ্বিন | কার্ত্তিক | অগ্রঃ | পৌষ | মাঘ | ফাল্গুন | চৈত্র |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

পত্রকের অপর পৃষ্ঠ

পত্রিকা ঃ

| বর্ষ / খণ্ড | চাঁদার হার | বিল সংখ্যা ও তারিখ | রসিদ সংখ্যা ও তারিখ | স্মারক প্রেরণের তাং | বাঁধাই সমাচার | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

সাময়িকীর নথিভুক্তি নিবন্ধ খাতায়ও সম্ভব। ছোটখাট গ্রন্থাগারের পক্ষে খরচের দিক থেকেও অনুকূল। বাঁধানো অথবা অলগ্ন পত্রের খাতা ব্যবহার করা যায়। কিন্তু এর অসুবিধা অনেক। খাতার মধ্যে কোন পত্রিকার জন্য ক'টি পাতা লাগবে তা আগে থেকে স্থির করা যায় না, তাই কয়েকটি ক'রে পাতা ছেড়ে রেখে আবার অন্য পত্রিকা তালিকাভুক্ত করতে হয়। আবার যদি কোনো পত্রিকার জন্য রক্ষিত পাতা শেষ হয়ে যায় তা হলে 'অমুক পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য' লিখে নূতন পাতা সুরু করতে হয়। বর্ণানুক্রমিক সূচী রেখে খাতা সাজানো হলে যখন কোনো নূতন পত্রিকার নাম যোগ করবার প্রয়োজন পড়ে তখন পরম্পরা বিঘ্নিত হয়। অলগ্ন পত্রের নথি হলে অবশ্য এই অসুবিধা কমে। তবে এই দুই পদ্ধতিই ব্যবহারে সময় সাপেক্ষ ও ক্লান্তিকর। বারবার পাতা উল্টে যেতে যেতে বা টানা-হ্যাঁচড়ায় ছিঁড়েখুঁড়ে গেলে বিভ্রাট ঘটে।

পত্রিকার পরিমাণ কম হলে নিবন্ধ খাতা বা পূর্বোল্লিখিত পত্রক প্রথায় কাজ ভালই চলে। কিন্তু সাময়িকী সম্ভার বেশি হয়ে গেলে একই পত্রকের সহায়তায় নিয়ন্ত্রণ জটিল হয়ে পড়ে। সুষ্ঠু কর্মসম্পাদনের জন্য রঙ্গনাথন ত্রিপত্রক প্রথার Three cards system) উদ্ভাবন করেছেন। এই পদ্ধতিতে প্রতি পত্রিকার জন্য তিনটি ক'রে পত্রক থাকে। নিবন্ধ পত্রক ( Register card ), নিরূপণ পত্রক ( Check card ) এবং বিষয়ানুক্রমিক সূচীপত্রক ( Classified index card )।

নিবন্ধ পত্রকে পত্রিকার আখ্যা, বর্ষ বা খণ্ড, সংখ্যা. প্রকাশের তারিখ, প্রকাশক ক্রম ( সাপ্তাহিক, মাসিক ইত্যাদি ) এবং প্রাপ্তির তারিখ লিপিবদ্ধ করা হয়। পত্রিকার দাম বা চাঁদা দেবার তারিখ এবং রসিদ সংখ্যারও উল্লেখ থাকে। এছাড়া থাকে পত্রিকার যোগানদারের নাম ঠিকানা. পত্রিকার বর্গ-সংখ্যা (যদি বর্গীকৃত হয়ে থাকে ). অনুজ্ঞা বা বরাতি সংখ্যা এবং বরাতের তারিখ। পত্রক বিন্যাসের রীতি পত্রিকার আখ্যানুযায়ী বর্ণক্রমে। উপহার-প্রাপ্ত পত্রিকার জন্য একটু স্বতন্ত্র পত্রক– যেমন কালো পাড় ঘেরা পত্রক ব্যবহার করলে সুবিধা হয়. চট করে সনাক্ত করা যায়। পত্রক নমুনা চল্লিশ পাতায় দেখুন।

নিরূপণ-পত্রকের ব্যবহার পত্রিকার প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি নির্ধারণের সূত্রে। এতে পত্রিকার নাম এবং সেই সঙ্গে প্রকাশক্রম, প্রকাশ-তারিখ ও প্রাপ্তি-তারিখ লেখা থাকে। আর লেখা থাকে যোগানদারের নাম ও ঠিকানা, কিম্বা সরাসরি

নিবন্ধ পত্রক

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পত্রিকার নাম :<br>যোগানদার :<br>বর্গসংখ্যা : | | প্রকাশক্রম : | | অনুজ্ঞা সংখ্যা ও তারিখ | | মূল্য প্রদান<br>বর্ষ/খণ্ড \| রসিদ সং ও তারিখ<br>বার্ষিক চাঁদা : | |
| বর্ষ/খণ্ড | সংখ্যা | প্রকাশ তারিখ | প্রাপ্তি তারিখ | বর্ষ/খণ্ড | সংখ্যা | প্রকাশ তারিখ | প্রাপ্তি তারিখ |
| | | | | | | | |

প্রকাশকের কাছ থেকে এলে তাঁর নাম ও ঠিকানা। পত্রিকাগুলি দৈনিক. সাপ্তাহিক. মাসিক প্রভৃতি নির্দেশ পত্রক দিয়ে পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে রাখা হয়। এবং, এই পর্যায়ের মধ্যেও আরো তিনটি উপভাগে বিভক্ত ক'রে "প্রাপ্ত", "প্রাপ্তব্য" এবং "প্রাপ্তির মেয়াদোত্তীর্ণ" নির্দেশক দিয়ে রাখা যায় কাজের সুবিধার জন্য। এর বিন্যাস বর্ণানুক্রমিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। নিরূপণ-পত্রক

দেখে পত্রিকার প্রাপ্তি বিষয়ক খবর গ্রন্থাগারকর্মী চটপট পেয়ে যান, প্রাপ্ত পত্রিকার খবর হাতের কাছে থাকে। এবং মেয়াদোত্তীর্ণ পত্রিকার জন্য স্মারক-পত্র পাঠানোর কাজ ত্বরান্বিত হয়। পত্রক নমুনা নিম্নরূপ :—

পত্রিকার নাম :

প্রকাশক্রম :

নিরূপণ কাল —

| বর্ষ/খণ্ড | প্রাপ্তব্য মাস/সপ্তাহ | স্মারক প্রেরণ তারিখ | ভারপ্রাপ্ত কর্মীর স্বাক্ষর | বর্ষ খণ্ড | প্রাপ্তব্য মাস/সপ্তাহ | স্মারক প্রেরণ তারিখ | ভারপ্রাপ্ত কর্মীর স্বাক্ষর |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

বিষয় সূচী পত্রকের সাহায্যে জানা যায় কোন বিষয়ের কোন পত্রিকার সাম্প্রতিকতম সংখ্যা, এবং কোন কোন সংখ্যা সাময়িকী বিভাগের সংগ্রহে রয়েছে। এর মধ্যে পত্রিকা-সূচী, সংযোজন ইত্যাদির খবরও থাকে। পত্রক নমুনা নিম্নরূপ :—

বর্গ সংখ্যা ______ বার্ষিক চাঁদা ______

পত্রিকার নাম ______

যোগানদার ______

প্রকাশক ______

গ্রন্থাগারে প্রাপ্তব্য খণ্ড সমূহ ______

সূচী, পঞ্জী, ইত্যাদি ______

সংযোজন ______

উপরোক্ত তিনরকম পত্রকের ব্যবস্থায় পত্রিকার যাবতীয় সমাচার এক নজরে মেলে। কর্মী ও পাঠক উভয় পক্ষেরই সুবিধা হয়।

এক দিকে এ যুগে পত্রিকা সম্ভারের ব্যাপকতা ও বহুলতা, অন্যদিকে সাধারণের পাঠস্পৃহা ও পঠন ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ার জন্য সব গ্রন্থাগারেই দৈনিক পত্রিকা অথবা সাধারণ মানের পত্রিকা রাখা হবে কিনা অথবা কী পরিমাণ রাখা হবে সে বিষয়ে অনেকেই ভিন্ন মত পোষণ করেন। দৈনিক পত্রিকা রাখার, বিশেষত জমিয়ে রাখার ঝামেলা অনেক। অথচ এর প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। ব্যক্তিগতভাবে সব পত্রিকা কেউ রাখতে পারেন না, অথচ পড়বার আগ্রহও স্বাভাবিক। তাই সংবাদপত্র গ্রন্থাগারে রাখা বাঞ্ছনীয়। সংবাদপত্র বাঁধিয়ে রাখা এক বৃহৎ ব্যাপার। সংরক্ষণের যেমন অসুবিধা,

তেমনি সমস্যা স্থানসঙ্কুলানের। তাই আজকাল খরচে কুলালে এগুলির মাই ক্রোফিল্ম অনুলিপি রাখাই অনেক গ্রন্থাগার পছন্দ করে। অনেক গ্রন্থাগার পত্রিকা শাখাকে জিজ্ঞাসা বিভাগের সঙ্গে জুড়ে দেয়। এভাবে রাখা অযৌক্তিক বলা চলেনা বাছাই-করা অংশের কর্তন সঞ্চয় এই বিভাগের কাজ ব'লে গণ্য হওয়া উচিত. এবং সে জন্যও সংবাদপত্র প্রয়োজন হয়। সাময়িকী বিভাগের সঙ্গে প্রবন্ধসার প্রণয়নের কাজকে যুক্ত না ক'রে এটি তথ্যবিভাগের সঙ্গে যুক্ত করা সমীচীন। বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংবাদপত্র না রেখে এগুলিকে ছাত্রাবাসের সঙ্গে রাখা ভাল।

সাময়িকী বিভাগের আরেকটি সমস্যা অস্থায়ী বা অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত পত্রিকা নিয়ে। সাময়িকী জগতে ছোটখাট পত্রিকা যাকে little magazine বলে—তার প্রকাশ নগণ্য নয়। সাহিত্য ক্ষেত্রে এগুলির স্থান নেই বলা চলে না. বরঞ্চ বলা চলে এগুলিই সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারাকে জীবন্ত ক'রে রেখেছে। কিন্তু এই সকল পত্রিকা—সাধারণত যা উৎসাহী যুব প্রয়াস সে গুলির নিয়মিত ক্রম ব'লে কিছুই অনেক সময়ে থাকে না। কখনো বা প্রথম সংকলন. দ্বিতীয় বা তৃতীয়াদি পর্যায়ে সংকলন হিসেবে প্রকাশ পায়। কখনো বা কিছুকাল চলার পরেই বন্ধ হয়ে যায়। কতকগুলি আবার অনিয়মিত কাল ব্যবধানে মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করে। এগুলিকে স্থায়ীভাবে জমিয়ে রাখার সমস্যা কম নয়। জমানো হবে কিনা তা অবশ্যই গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ স্থির করবেন। জমিয়ে রাখলে সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ কোন নীতিতে হবে। বাঁধানো যাবে কিনা. খুচরো ভাবে রাখলে টি'কবে কিনা ইত্যাদি ব্যাপার জটিলতার সৃষ্টি করে। মনে হয়, বিশেষ ভাবে খোপ-বদ্ধ ক'রে রেখে দেওয়াই একমাত্র সমাধান। এজন্য সূচীনির্দেশ রেখে দিতে হবে সেকথা বলাই বাহুল্য। জাতীয় গ্রন্থাগারে অথবা অনুরূপ কোনো প্রতিষ্ঠানে এ ধরণের পত্রিকার অন্তত প্রথম সংখ্যাটি রেখে দেওয়া হয় পরিসংখ্যান এবং ভবিষ্যৎ ইতিহাসের প্রয়োজনে।

সাময়িকী বিষয়ে রাখার ব্যাপারে কতকগুলি নীতি মেনে চলা প্রয়োজন। মাসিক পত্রিকা যেমন তিন বা ছয় মাসের গুচ্ছ ক'রে বাঁধানো যায়, সাপ্তাহিক বা অর্ধসাপ্তাহিকের বেলায় তা হয় না। খুব বেশি মোটা খণ্ড হয়ে গেলে টে'কসই হয় না, ব্যবহারেও অসুবিধা ঘটে। পত্রিকায় ব্যবহৃত কাগজ সাধারণত বই এর কাগজ থেকে নিকৃষ্ট ধরণের হয়, সেজন্য এমনিতেই বহুকাল স্থায়ী হয়না। তার উপরে যদি বাঁধাই এর ইতর বিশেষ কোনো প্রকার চোট পড়ে

তাহলে জখম হবার ভয় থাকেই। একসঙ্গে কয় মাসের পত্রিকা জড় ক'রে বাঁধানো হবে সেই নীতি ঠিক ক'রে নিয়ে বরাবর সেটি অনুসরণ করাই সঙ্গত। তবে সাধারণত পত্রিকাগুলিই নির্দিষ্টকাল ব্যবধানে যৌথ সূচীপত্র প্রকাশ ক'রে বাঁধাইএর ইঙ্গিত দেয়। এবং সেখানেই বর্ষ বা খণ্ডের পরিচয়ও দিয়ে থাকে। বাঁধানোর পরে পত্রিকা পটে বর্ষ এবং খণ্ড পরিচিতি মুদ্রিত থাকা বাঞ্ছনীয়। বাঁধানোর পরে সাময়িকী খণ্ডটি মূল গ্রন্থসংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, পরিগ্রহণ খাতায় তালিকাভূক্তি ও প্রযুক্তি-পর্ব পার হয়ে নির্দিষ্ট মঞ্চে চলে যায়।

বাঁধানো সাময়িকী যেহেতু মূল গ্রন্থ সংগ্রহের সামিল হয়ে যায় সেহেতু কয়েকটি সমস্যার সমাধান পূর্বাহ্ণেই ক'রে নিতে হয়। যদিও গ্রন্থাগারে সর্ব শ্রেণীর সর্ব জাতির সাময়িকী আসে, তবুও সবগুলিই গ্রন্থাগারে বাঁধিয়ে রাখা হবে এমন কোন কথা নেই। পত্রিকার বিশেষত্ব এবং গ্রন্থাগারের ধরণ ও প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ রেখে সিদ্ধান্ত নিতে হয় কোন পত্রিকা মঞ্চভুক্ত হবে, কোনগুলো কিছুকাল রাখার পরেই বাতিল করা সঙ্গত। এমন কোন গ্রন্থাগারই বোধ করি নেই যেখানে তাবৎ পত্রিকা বরাবরকার মতো মজুত রাখার দরকার হয়। যেগুলি বরাবর থাকবে সেগুলিকে পোক্ত করে বাঁধিয়ে রাখা উচিত। ভঙ্গুর বা নিকৃষ্ট শ্রেণীর পাতা খরচ সাপেক্ষ হলেও দু'ধারে স্বচ্ছ কাগজ সেঁটে পাতাগুলি এঁটে রাখা উচিত. —যাকেlamination বলে। দ্বিতীয়ত, পত্রিকায় প্রচুর বিজ্ঞাপন থাকে। অনেক পত্রিকায় প্রারম্ভে এবং শেষ ভাগে পৃথক পৃষ্ঠা জুড়ে দেওয়া হয় বিজ্ঞাপনের জন্য, আবার ভিতরে প্রবন্ধাদির সঙ্গেও বিজ্ঞাপন থাকে। বাণিজ্য বা বিশেষ প্রতিষ্ঠানাদির পক্ষে বিজ্ঞাপনও অনেক সময়েই অবহেলার যোগ্য নয়। অথচ, সাধারণ ভাবে, বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠাগুলি বাদ দিয়ে বাঁধানোই বিধেয়। নচেৎ পত্রিকা অনাবশ্যক ভাবে স্ফীত হয়ে পড়ে এবং পত্র সংখ্যার হিসাবেও বিভ্রান্তি ঘটায়। সাধারণত একই বিজ্ঞাপনের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে দেখা যায় প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই। তাই যেসব গ্রন্থাগার বিজ্ঞাপন সংরক্ষণ প্রয়োজন মনে করে তারাও বাছাই করে এগুলি রাখে।

পত্রিকার প্রতি সংখ্যা স্বতন্ত্র ভাবে রাখা ভাল না বাঁধিয়ে রাখা ভাল এ বিষয়েও মতভেদ আছে। বাঁধাইএর সপক্ষে বক্তব্য একসঙ্গে অনেক সংখ্যা সুবদ্ধ থাকে বলে ব্যবহার করতে সুবিধা হয়, সংখ্যাগুলি খুঁজে খুঁজে বা'র করতে হয় না এবং ছটকে হারিয়ে যাবার ভয় থাকেনা, ছিঁড়েখুঁড়ে যাবার আশঙ্কা কমে, গুছিয়ে রাখতে জায়গা লাগে কম। বাঁধাইএর বিপক্ষে বক্তব্য,

একজন যখন একটি খণ্ড পড়তে থাকে তখন অন্য কোনো পাঠক তাঁর প্রয়োজন ঘটলেও অপর কোনো সংখ্যা দেখবার সুযোগ পায়না, আন্তঃগ্রন্থাগার ঋণের প্রয়োজনেও ঐ অসুবিধা হয়—পাঠাবার খরচও বেশি পড়ে, সংখ্যাগুলি বাঁধিয়ে আনতে অনেক সময় নেয়—তার ফলে ব্যবহার বিঘ্নিত হয়, পাঠকরা বঞ্চিত থাকেন।

দৈনিক সংবাদ পত্র নানা কারণেই মজুত ক'রে রাখার প্রয়োজন হয়। কিন্তু এগুলি বাঁধানো এক বিপুল ব্যাপার। যেমন খরচ সাপেক্ষ তেমনি সংরক্ষণ সমস্যা। সংবাদ পত্রের কাগজ একেবারেই টেকসই নয়, কালক্রমে অকেজো হয়ে পড়ে। যদিবা বাঁধানো হল তো সাজিয়ে রাখা আরেক সমস্যা খাড়া ভাবে রাখা যাবেনা—তা তাকের মাপ পত্রিকার আকারের অনুকূল হলেও না—এতে বাঁধাই বেঁকে যায়, কাগজ ফেটে যেতে পারে। উপযুক্ত মাপের তাকে একটার উপরে আরেকটা শুইয়ে রাখা ভাল, কিন্তু একসঙ্গে বেশি খণ্ড রাখা চলবেনা.—তাতে নিচের খণ্ড গুলি অতিরিক্ত চাপের ফলে নষ্ট হয়ে যায়। এক একটি খণ্ড নামিয়ে আনাও যেমন কাণ্ড বিশেষ, ব্যবহার করতেও তেমনি লম্বা-চওড়া জায়গা লাগে। বিকল্প হিসেবে বিশেষ বিশেষ কর্তৃতাংশ কাগজে সেঁটে নথিভুক্ত ক'রে, অথবা বই হিসেবে বাঁধিয়ে রাখা যায়, তাতে এর প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখা সম্ভব। কিন্তু একাজও আংশিক ভাবেই সম্ভব। নির্বিশেষ ভাবে নয়। গ্রন্থাগারের ধরণ এবং প্রয়োজন বিচার ক'রে উপরোক্ত প্রকল্প স্থির করা ভাল। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ভেবে কোন কোন সংবাদ পত্রের সম্পূর্ণ খণ্ড, অথবা কোনো কোনো গ্রন্থাগারে সকল সংবাদ পত্রের পুরা সংগ্রহ রাখা অবশ্যই কর্তব্য। সেজন্য অসুবিধা হলেও এভাবে সাবধানে বাঁধিয়ে রাখার ব্যবস্থা নিতেই হয়। এখানকার বহু গ্রন্থাগারেই এই ব্যবস্থা আছে। তবে একালে এ ব্যাপারে একটি সমাধান হয়েছে, —সমগ্র পত্রিকা মাইক্রোফিল্মে নকল ক'রে রাখা। প্রথমটায় খরচ সাপেক্ষ হলেও আখেরে লাভজনক। কয়েকফুট ফিল্মের মধ্যে কয়েক মাসের সংবাদপত্র-প্রতিলিপি ধ'রে রাখা যায়। সংগ্রহের জন্য জায়গা খুবই কম লাগে, —একটি মাত্র মঞ্চে বেশ কয়েক বছরের সংগ্রহ রাখা সম্ভব।

সাময়িকী বিভাগের আরেকটি প্রয়োজনীয় দিক প্রবন্ধসার তৈরি করা। বিভিন্ন পত্রিকায়—বিশেষত গবেষণা কেন্দ্রিক পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রবন্ধ গুলির সংক্ষিপ্ত ভাষ্য তৈরি করে সেগুলি লেখক, বিষয়,

প্রবন্ধ শিরোনাম, প্রকাশিত পত্রিকার খণ্ড বা সংখ্যা, পত্রাঙ্ক প্রভৃতির বিবরণসহ গুছিয়ে রাখার। এজন্য পত্রক ব্যবহার চলতে পারে। বিন্যাস বিষয়ানুক্রমিক হওয়াই সঙ্গত। উপরন্তু লেখকের নামানুসারেও আরেক প্রস্থ পত্রক রাখা ভাল।

প্রবন্ধসার সংগ্রহ গবেষণার কাজ বা উচ্চতর জ্ঞান আহরণের জন্য আজকাল অপরিহার্য্য। বিশেষ, গ্রন্থাগার গুলির ক্ষেত্রে এটি অবশ্য করনীয়। কেন না, একালে জ্ঞানের বিভিন্ন ধারার এত দ্রুত উন্নতি সাধন হচ্ছে, নানান বিষয়ে এত বেশী কাজ হচ্ছে এবং এই সব কাজের ফলাফল পত্রিকাতে বিচিত্র এবং ব্যাপক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে যে এক জনের পক্ষে সব খুঁটিয়ে পড়া কঠিন হয়ে পড়ছে। সাম্প্রতিকতম বই প'ড়েও পুরোপুরি সমাচার মেলে না। কেন না বই হয়ে বেরোতে যে সময় লাগছে তার মধ্যেই পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ আরো এগিয়ে যাচ্ছে। অনেক প্রবন্ধ হয়তো গ্রন্থাকারে আর ছাপানোই হয় না। তাই গ্রন্থাগারের পত্রিকা সংগ্রহই একমাত্র ভরসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানেও সব পত্রিকা ঘেঁটে সব প্রবন্ধ পড়ে দেখবার সময় মেলে না। গ্রন্থাগার এক্ষেত্রে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারে প্রবন্ধসার তৈরি ক'রে এবং তালিকা প্রস্তুত ক'রে। দেশে বিদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রবন্ধসার প্রস্তুতির কাজ করছে, বিষয় বিশেষের সার পত্রিকাও প্রকাশিত হচ্ছে। বিশ্বের তাবৎ পত্রিকা সংগ্রহ করা কোনো একটি গ্রন্থাগারের পক্ষে সম্ভব হয়না; এমন কি প্রচুর টাকা থাকলেও পত্রিকা কাজে লাগাবার ব্যাপারে সমস্যা দেখা দেয়। পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কোনো একক গবেষকের পক্ষে সব ভাষা জানা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি কোনো একটি গ্রন্থাগার বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষেও সব ভাষার পণ্ডিত নিয়োগ সম্ভব হয়ে ওঠে না। এ কাজ যৌথ উদ্যো'গে সমবায় ভিত্তিতে করা যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশেষ প্রতিষ্ঠান এ জাতীয় প্রকল্প নিতে পারে। একই এলাকার বিভিন্ন গ্রন্থাগার বা সংস্থা একেকটি প্রসঙ্গের ভার নিলে যৌথভাবে কাজ চালানো সম্ভব হয়। প্রবন্ধসার তৈরীর জন্য এবং বিভিন্ন পত্রিকার বা গ্রন্থের – বিশেষ করে দুর্মূল্য বা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের অংশ বিশেষের প্রতিলিপি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সব দেশেই বিশেষ সংস্থা থাকে। গবেষকরা এখান থেকে তাঁদের প্রয়োজনীয় লেখা সংগ্রহ করতে পারেন। এ দেশে সরকারী উদ্যোগে জাতীয় নথিনিবেশ কেন্দ্র (INSDOC) স্থাপিত হয়েছে দিল্লীতে। সেখানে জানালেই নামমাত্র মূল্যে

প্রতিলিপি পাওয়া যায়। আজকাল বিভিন্ন বিষয়ের প্রবন্ধসার সংকলিত পত্রিকাও বেরোচ্ছে। যেমন, Social Science Abstract, Chemical Abstract, Indian Educational Abstract ইত্যাদি। সর্বসাধারণের জন্য ও এ জাতীয়পত্রিকা প্রকাশিত হয়, যেমন Reader's Digest, Science Digest Imprint, অনন্য (বাংলা), নবনীত (হিন্দি), ইত্যাদি।

প্রবন্ধসার ছাড়াও সাধারণ সূচী বা নির্দেশ তালিকা তৈরি ক'রে তথ্য সন্ধানে সহায়তা সম্ভব। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিকে প্রথমে বিষয়ানুক্রমে সাজিয়ে লেখক, শিরোনাম ও পত্রিকার প্রাসঙ্গিক পরিচিতি সমেত লিপিবদ্ধ ক'রে রাখা। সাধারণ মাপের পত্রকে এই তথ্যাবলী লিখে স্বতন্ত্র আধারে বিন্যস্ত থাকলে গবেষক জানতে পারেন কোন বিষয়ে কোন পত্রিকায় কোন লেখা আছে। এই তালিকা পুস্তকাকারেও প্রকাশ করা যায়। গ্রন্থাগারের বাইরের পড়ুয়ারাও এটি সংগ্রহ করতে পারেন। এ জাতীয় সূচীতে বিষয়ের সঙ্গে প্রকাশিত প্রবন্ধের মূল বক্তব্যের পরিচয় দু'চার পংক্তিতে অনায়াসেই দেওয়া যায়, এবং দেওয়া উচিতও। তাহলে সম্ভাব্য পাঠক পূর্বাহ্ণেই জানতে পারেন তিনি ঐ প্রবন্ধ থেকে কতটা উপকৃত হবেন বা আদৌ কাজে লাগবে কিনা।

এই সূত্রে নথিনিবেশ বা Documentation কর্মের কথা বলা যায়। বই ছাড়া যাবতীয় প্রকাশিত অপ্রকাশিত পত্র পত্রিকা, দলিল, বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি জ্ঞাতব্য তথ্যের সংরক্ষণের কাজ করে নথিনিবেশ কেন্দ্র। বিজ্ঞান বা ব্যবহারিক শিল্প প্রভৃতি বিষয়ের সাম্প্রতিকতম খবর বা ক্রিয়াকলাপের প্রকাশ কেবলমাত্র সাময়িকীগুলির মাধ্যমেই হয় না, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষণা সংক্রান্ত বিবৃতি, ব্যবহারিক শিল্প ও বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠানাদির বিজ্ঞপ্তি বা কর্মসূচী ও নানাবিধ তথ্য প্রকাশ করে। অথচ এগুলির কোনো সংগ্রহধারা থাকেনা। নথিনিবেশ কেন্দ্রই এসব ব্যাপারে একমাত্র সম্বল। ভারতে Indian National Scientific Documentation Centre (INSDOC) এই কাজ করে কৃতিত্বের সঙ্গে। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে এটির প্রতিষ্ঠা। কার্যক্রম, দেশের প্রয়োজনে সর্বাধিক বৈজ্ঞানিক সাময়িকীর সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, বিভিন্ন ক্ষেত্রের বৈজ্ঞানিকদের জন্য মাসিক প্রবন্ধসার পত্র সংকলন, যাবতীয় অনুসন্ধানের সমাধান, সকল গবেষককে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রবন্ধাদির অনুবাদ এবং আলোকচিত্র নকল সরবরাহ, দেশের বৈজ্ঞানিক কাজ ও গবেষণার

প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত সংবাদ এবং অগ্রগতির বিবরণ সংগ্রহ এবং এই সকল সমাচার সারা জগতের গোচরীভূত করা। এই সংস্থা আবেদক মাত্রকেই নামমাত্র মূল্যে যাবতীয় নকল বা অনুবাদের কাজ ক'রে দেয়। সাম্প্রতিকতম বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের তালিকা (INSDOC List of Current Scientific Literature) নামে একটি প্রচার পত্রিকা (bulletin) এখান থেকে প্রকাশিত হয়। আর প্রকাশিত হয় ভারতীয় বিজ্ঞান সার (Indian Science Abstract, ভারতীয় শিক্ষা পঞ্জী ইত্যাদি। এ জাতীয় বিশেষ প্রতিষ্ঠান আরো কিছু কিছু স্থাপিত হয়েছে ভারতে,—নিজ নিজ জ্ঞানের ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য।

## পুস্তিকা / স্মারক / ইস্তাহার

সাময়িকী বিভাগে সমস্যার এবং জটিলতার সৃষ্টি করে অনিয়মিত ক্রমে প্রকাশিত বিবিধ পুস্তিকা। এই জাতীয় প্রকাশনের তালিকায় পাই নানান সভা, সমিতি ও সংস্থার প্রতিবেদন ও স্মারক পুস্তিকা, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বিবৃতি ও বিবরণ, নানাবিধ বিষয় সংক্রান্ত পুস্তিকা। এ গুলির মধ্যে সাময়িক মূল্যের এবং স্থায়ী মূল্যেরও কিছু প্রবন্ধাদি থাকে। অথচ এদের না রাখা যায় গ্রন্থ হিসেবে, না রাখা যায় পুরোপুরি সাময়িকী হিসেবে। অনেক ক্ষেত্রে সাময়িকী বিভাগের পরিবর্তে এগুলিকে জিজ্ঞাসা বিভাগে রাখাও অযৌক্তিক নয়। তবু সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের সমস্যা নিয়ে বিব্রত হতেই হয়।

পুস্তিকা সম্ভারের বৈচিত্র অনুধাবন করা যাক। প্রথমেই ধরা যাক কোনো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথবা রাজনৈতিক সংস্থার প্রকাশিত পুস্তিকা। এ গুলি অনেক সময়ে ধারাবাহিক পর্যায়ে বেরোয়। তবু ও এ গুলিকে পত্রিকা আখ্যা দেওয়া যায় না। কেননা আকারে ছোট হলেও এরা স্বয়ং সম্পূর্ণ, কালকেন্দ্রিক। স্বয়ং সম্পূর্ণতার জন্য এরা প্রায়-পুস্তক, প্রকাশন ধারায় প্রায় পত্রিকা। কোনো কোনো প্রকাশন বিষয় গৌরবে কালাতিক্রমী হলেও অধিকাংশই সাময়িক মূল্যের। রাজনৈতিক সংস্থার পুস্তিকা সাধারণত ইস্তাহার জাতীয়। দেশী ও বিদেশী সরকারের এবং রাজনৈতিক দলের সভাসমিতির বিবৃতি, ক্রিয়াকলাপের প্রচার মূলক বিবরণ এত বেশী সংখ্যায় আসতে থাকে যে গ্রন্থাগারের বোঝা বেড়েই চলে। এ গুলির পত্র সংখ্যাও অনেক ক্ষেত্রে প্রায় গ্রন্থকে ছুঁয়ে যায়। তবুও গ্রন্থাগারিককে বিচার করে দেখতে হয়,

সেগুলিকে স্থায়ী পুস্তকের মর্যাদা দেবেন কিনা। সাধারণ ভাবে ৩২ পৃষ্ঠার বা মতান্তরে ৫০ পৃষ্ঠার কম হলে প্রকাশনকে পুস্তিকার পর্যায়ে ফেলা হয়না। কিন্তু সব ক্ষেত্রে এই নিয়ম মেনে চলা সম্ভব হয়না। লেখার বিষয় ও আলোচনার পরিধি বিচার করে তবে মূল্য নির্ধারণ করা উচিত। আকারের উপরে মূল্য নির্ভর করে না। প্রকারই প্রধান। সুতরাং এই ভাবে যাচাই বাছাই ক'রে বিবৃতি মূলক পুস্তিকা উপস্থাপিত করাই নিয়ম। কিছু পরিমাণ পুস্তিকা কিছুদিন প্রদর্শমঞ্চে রাখার পর বাতিল ক'রে দেওয়া যুক্তিযুক্ত, কিছু পরিমাণ রেখে দিতে হয় স্থায়ী ভাবে, —বিষয় ও তথ্য বিচারে। সরকারী বিবৃতি অধিকাংশই গ্রন্থাগারে সঞ্চিত থাকে। এগুলি রাখবার বিশেষ বিধি এবং নীতি আছে। স্বতন্ত্র পর্যায়ে বিন্যস্ত থাকে। তবে উপরোক্ত সব ধরণের পুস্তিকাই বিশেষ বিশেষ গ্রন্থাগার তার ধরণ, প্রয়োজন এবং নীতি অনুযায়ী সংগ্রহ করবে। যেমন, ভারতবর্ষের সব রাজ্যের সব সরকারী বিভাগের বিবৃতি অথবা আধাসরকারী বিবৃতির তাবৎ প্রকাশন কোনো কোনো শ্রেণীর গ্রন্থাগারের পক্ষে অপরিহার্য না হতে পারে। এলাকা অনুযায়ী সংগ্রহ নীতি বিধেয়।

আরেক ধরণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের নানাবিধ বিবরণ। যেমন শিক্ষাসারণি ( Prospectus ), পাঠক্রম ( Syllabus ), বার্ষিক বিবৃতি ( Annual report ), সমাবর্তন ভাষণ ( Convocation addresses ), গবেষকদের নিবন্ধ তালিকা ( List of doctoral theses ), শিক্ষা প্রসার বক্তৃতা মালা ( Extension lectures ), ইত্যাদি। বিশেষ ক'রে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পক্ষে এগুলি অপরিহার্য বলা চলে। এগুলি সংখ্যায় প্রচুর, অথচ কোনটাই বাতিল করবার মতো নয়। অনেক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক পঞ্জী ( Calendar ) গ্রন্থে এগুলি একত্রে গ্রথিত হয়ে প্রকাশ পায়। সেক্ষেত্রে বর্গীকরণের পরে মূল গ্রন্থসংগ্রহের সামিল করতে অসুবিধা হয় না। অন্যথায় এগুলিকে কোনো একটা ক্রম অনুযায়ী গ্রথিত ক'রে রাখা যায়। শিক্ষাপ্রসার বক্তৃতা মালা বিষয়ানুক্রমে গুচ্ছবদ্ধ ক'রে – এমনকি বাঁধিয়েও রাখা যেতে পারে। এবং বর্গসংখ্যা দিয়ে বিশ্লেষ পত্রক তৈরি করে ব্যবহারোপযোগী ক'রে তোলা যায়। গবেষকদের নিবন্ধ তালিকাও এইভাবে বিন্যস্ত করে জিজ্ঞাসা বা প্রসঙ্গ নির্ণয় বিভাগে রাখা যুক্তিযুক্ত।

স্মারক পুস্তিকা ( Souvenirs ) কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের প্রকাশন এবং

গ্রন্থাগারের জটিল সমস্যা। স্মারক পুস্তিকা নানা রকমের। কোনো ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানের বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে যেমন প্রকাশ ঘটে তেমনি প্রকাশ ঘটে সভা, সমিতি, অনুষ্ঠান প্রভৃতির উপলক্ষে। সংখ্যায় এরা যেমন প্রচুর তেমনি বিচিত্র এদের প্রকৃতি। মূলত বিজ্ঞাপন আকর্ষণ ক'রে অর্থলাভের জন্যই এদের প্রকাশ। কিন্তু সভা সমিতির কর্মধারা এবং অনুষ্ঠানাদির পরিচিতি ছাড়াও প্রায় ক্ষেত্রেই এগুলির মধ্যে নানাবিধ গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়, এবং প্রায়শই এদের মূল্য উপেক্ষনীয় নয় দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রবন্ধগুলি অন্য কোনো সংকলনে বা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়না। সেজন্যই এ গুলিকে সর্বাংশে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা যায় না। আবার নির্বিশেষ ভাবে জমিয়ে রাখাও বৃহৎ ব্যাপার। গ্রন্থাগারিক প্রয়োজন পক্ষে বাছাই করতে পারেন। সংগ্রহের জন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অনুযায়ী নামের ক্রমানুসারে নথিজাত ক'রে রাখা যায়। এবং বিশেষ প্রবন্ধাদির জন্যও স্বতন্ত্র তালিকা করা যায়। মাল-মশলা অনির্দিষ্ট বলেই এগুলিকে স্বতন্ত্র এবং বিচিত্র ধরণের সাময়িকী হিসাবে গণ্য করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকেনা।

এবারে পুস্তিকা ( Pamphlets ) প্রসঙ্গে আসা যাক। এতক্ষণ যে ধরণের সাময়িকীর কথা বলা হ'ল সেগুলি পত্রিকা থেকে স্বতন্ত্র তো বটেই, একই শ্রেণীর মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ হয়েও কোনটা বই এরই মতো স্বয়ং সম্পূর্ণ বা তথ্যনিদানে বিশিষ্ট, কোনোটা বা সমসাময়িক প্রয়োজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ, কতকগুলি বরাবরের মতো সঞ্চয়ের উপযুক্ত, কতকগুলি নির্দিষ্ট সময়ের পরেই পরিত্যাজ্য। কিন্তু পুস্তিকা কিছুটা অভিনব। পুস্তিকা পত্রিকারই মতো সাময়িক চিন্তা ও জ্ঞানসম্ভারে যেমন বৈশিষ্টের দাবি রাখে তেমনি আবার অনেকাংশেই সময় ফুরোলে বোঝা হয়ে ওঠে। তা হলেও এমন কিছু বিবরণ গ্রথিত থাকে যেগুলি কোনো না কোনো সূত্রে ইতিহাসের গ্রন্থনে কাজে লেগে যেতে পারে। এবং এই সুবাদেই সৃষ্টি করে সঞ্চয় সমস্যার। কিছু পুস্তিকা অবশ্যই সর্বতোভাবে বিশিষ্ট। যেমন, বিভিন্ন রাজ্য সরকার বা ভারত সরকারের কোনো কোনো দপ্তরের—যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, উন্নয়ন ইত্যাদির—প্রকাশিত পুস্তিকা, নবজীবন প্রকাশন সংস্থার পুস্তিকা, Oxford Pamphlet Series, Torum of free Enterprise, Pandle Hill ইত্যাদি পুস্তিকা মালা। এগুলি কাল পর্যায় পার হয়ে যাবার পরেও বই-এর মতো স্থায়ীভাবে রাখার উপযুক্ত। অথচ এত ছোট যে আলাদা ভাবে বই হিসাবে রাখাও

নিরাপদ নয়। এগুলিকে বিষয় অনুসারে বা প্রকাশের কালক্রম ধ'রে গুচ্ছবদ্ধ ক'রে বাঁধিয়ে রাখা যায়। তবে সমস্যা হয় সূচীকরণের। বিষয়, লেখক ও আখ্যা ধরে পত্রক প্রস্তুত করা অবশ্যই বিধেয়, কিন্তু প্রত্যেকটি পুস্তিকার জন্য স্বতন্ত্র ভাবে ঐ জাতীয় বিশ্লেষ পত্রক তৈরি করা সহজ কাজ নয়। আজকাল পুস্তিকা রাখার জন্য এক ধরণের প্রদর্শ-মঞ্চ পাওয়া যায়। তাতে বিষয় বা আখ্যা অনুসারে স্বতন্ত্র পুস্তিকা সাজানো সম্ভব, কিন্তু তাও চলতি পুস্তিকার জন্যই কাজে লাগে। পুস্তিকা বাঁধানোর বদলে বই-এরই মতো বাক্সবন্দী করে মঞ্চের তাকে রাখা যায়। এর মধ্যে একই শ্রেণীর পুস্তিকা মালা আলগা ভাবে রেখে বাক্স বন্ধ করা থাকে, বাক্সের পাশে উপযুক্ত শিরোনাম বা বর্গসংখ্যা লেখা যেতে পারে। যেসব পুস্তিকা কোনো প্রকাশন ক্রমের আওতায় পড়েনা, প্রকীর্ণভাবে ইতস্তত প্রকাশিত হয় সেগুলি সমস্যার সৃষ্টি করেই। স্বতন্ত্র ভাবে না রেখে এভাবে বাক্সবন্দী ক'রে রাখা সেগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নিঃসন্দেহ। এভাবে রাখলে গ্রন্থাগারের অভ্যন্তরে এমনকি বাইরের পাঠকদের কাছে প্রয়োজনে পাঠানোর ব্যাপারেও ব্যবহার সহজ হয়।

## (জ) জিজ্ঞাসা বিভাগ ( Reference )

জিজ্ঞাসা বিভাগের কাজ (Reference Service) আধুনিক গ্রন্থাগারের বোধকরি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং দায়িত্বশীল কাজ। এখানে অনুসন্ধিৎসু পাঠক আসেন তাঁদের মনের নানান জিজ্ঞাসা ও প্রশ্নের সমাধানের জন্য। বিদ্যা ও জ্ঞান বিষয়ের নানাবিধ সূত্র সন্ধানের, তথ্য আহরণের এবং প্রসঙ্গ নির্ণয়ের কেন্দ্র এই বিভাগ। এককালে জিজ্ঞাসু পাঠকের হাতে প্রার্থিত এবং প্রয়োজন মতো বই তুলে দিয়েই কর্মীরা সূত্র সন্ধান বা তথ্য সহায়তার কাজ শেষ করত। কিন্তু এ যুগে জ্ঞানের ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এবং গ্রন্থাগার কর্মের দৃষ্টিভঙ্গি বদলের সঙ্গে সঙ্গে এ কাজের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন হয়েছে। এখন আর এই বিভাগে তথ্য সহায়ক বইপত্র সাজিয়ে বসে থাকলেই কাজ শেষ হয় না। কর্মীদের ব্যক্তিগত সহায়তা ও প্রচেষ্টা পাঠকের প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িয়ে মিশিয়ে যায়। গ্রন্থ এবং সাময়িকী সংগ্রহ যদি গ্রন্থাগারের স্থিতিশীল কাজ ব'লে মনে করা যায় তাহলে জিজ্ঞাসা বিভাগের কাজকে বলা যায় গতিশীল প্রকল্প। এই বিভাগের মধ্য দিয়ে গ্রন্থাগার জীবন্ত হয়ে ওঠে।

জনগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ প্রধানত এই বিভাগের মাধ্যমেই বিশেষভাবে সম্পন্ন হয়।

জিজ্ঞাসা বিভাগের কাজ বিশেষ পাঠ এবং গবেষণার প্রয়োজনে গ্রন্থাগার সম্পদের ব্যবহারে এবং বিশ্লেষণে পড়ুয়াদের যথোপযুক্ত এবং যথাসম্ভব সহায়তা করা। মূল বিষয়ের সঙ্গে জড়িত প্রসঙ্গ নির্ণয়ে ও প্রশ্নের সমাধানে এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যসহায়ক গ্রন্থাদির ব্যবহারে পাঠকদের সাহায্য করা। তথ্য সহায় প্রকল্প গ্রন্থাগারের অপরিহার্য অঙ্গ. কেননা গ্রন্থাদি সম্পদ কখনোই কোনো গ্রন্থাগারে এমন পরিপূর্ণ উপায়ে গুছিয়ে এবং নির্বিশেষভাবে তথ্য জাহির ক'রে রাখা যায় না যা'তে কোনো ব্যক্তি অপরের সাহায্য ছাড়াই সব কিছু খুঁজে বেছে নিতে পারেন, নিয়ে আসতে পারেন নখদর্পণে। তথ্যসহায় কর্মী সহায়তার হাত বাড়িয়ে তাঁর কাজের গতি এগিয়ে দিতে পারেন, কর্ম্মধারা মসৃণ ক'রে দিতে পারেন। তাঁর ভূমিকা সহস্রভুজের; প্রতিটি তথ্যগ্রন্থ তাঁর একেকটি হাতের কাজ করে।

জিজ্ঞাসা বিভাগের কাজ মূলত তিন পর্যায়ের। তথ্যনির্দেশ, তথ্যসহায় এবং তথ্যনির্ণয়। বেশিদূর যাঁরা এগোতে চাননা,—প্রকারান্তরে যদি তাঁদের বলা যায় রক্ষণশীল,—তাঁরা বলেন সূত্রসন্ধান এবং তথ্য বিশ্লেষণ গ্রন্থাগারিকের কাজ নয়,—সে কাজ পাঠক বা গবেষকের। গ্রন্থাগারিকের কাজ শুধু উপযুক্ত তথ্যপুস্তক যুগিয়ে দেওয়া, কোন গ্রন্থে কোন ধরণের তথ্য আছে কেবলমাত্র তা'র সন্ধান দেওয়া। কিন্তু আরেকটু দরাজ যাঁদের চিন্তাধারা,—তাঁদের হয়ত মধ্যপন্থী বলা চলে,—তাঁরা বলবেন, গবেষণা বা বিশেষ পাঠের জন্য তথ্যাদির নির্দেশ মাত্র দিলেই গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব চুকে যায় না, নিজে এগিয়ে এসে সূত্র সন্ধানে কার্যকর সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে হয়, পাঠকের সামিল হয়ে যেতে হয়।

কিন্তু আধুনিক যুগের উদার ও মুক্তমনের গ্রন্থাগারিক তারও বেশি করেন, তথ্য নির্ণয়ে পাঠকের সঙ্গে একীভূত হয়ে যান,—জিজ্ঞাসুর ভূমিকা নেন নিজেই। শুধু খেটেখুটে তাঁর হয়ে কাজটা করেন তাই নয়, দরকার হলে নিজের গ্রন্থাগারেই জ্ঞাতব্য প্রশ্নের পরিধি সীমায়িত না রেখে সূত্র নির্ণয়ে যাবতীয় সম্ভাব্য পথ খুঁজে দেখেন। এই সূত্রে আমেরিকার গ্রভার্‌স্‌ভিল গ্রন্থাগারের একটি ঘটনা স্মরণীয় হয়ে আছে। স্থানীয় এক নিরক্ষর গোয়ালা নবনির্মিত গ্রন্থাগারের পাশ দিয়ে যেতে যেতে হেঁকে শুধালেন, তাঁর দুগ্ধবতী

গাভীটির রোগ নিরাময় করতে পারলে বুঝবেন গ্রন্থাগারিকের বিদ্যার দৌড় কত। কথাটা শুনে গ্রন্থাগারিক রাগ না ক'রে বা নির্লিপ্ত না থেকে তাঁকে ডেকে নিয়ে প্রশ্ন ক'রে জেনে নিলেন গাভীটির রোগের ধরণ ও বিবরণ। তারপরে পশু চিকিৎসার বইপত্র ঘেঁটে তাঁকে ওষুধ বাৎলে দিলেন। পরিনামে গাভীটি সত্যিই রোগমুক্ত হয়ে গেল। এবং গোয়ালাটি তাঁর সত্তর হাজার ডলারের সম্পত্তি দান ক'রে যান গ্রন্থাগারে। জিজ্ঞাসা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের প্রকৃত স্বরূপ এই রকম হওয়া উচিত। সূত্র সন্ধান থেকে সুরু ক'রে পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁর কর্তব্য।

সাধারণত যে সকল পাঠক গ্রন্থাগারিকের কাছে প্রশ্ন নিয়ে আসেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাননা. আত্মসম্মানে লাগে অথবা সংকোচ হয়। এক্ষেত্রে আন্দাজে কিছু তথ্যগ্রন্থ হাতড়ে না বেড়িয়ে গ্রন্থাগারিকের উচিৎ তথ্যজিজ্ঞাসুর সচেতনতায় আঘাত না দিয়ে সুচতুর সহানুভূতিতে মূল প্রশ্নটি বা'র ক'রে নেওয়া, জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া।

দ্বিতীয়ত, প্রশ্নটির সমাধান করতে হবে নির্দিষ্ট ধারায়, ধাপে ধাপে এগোতে হবে সমাধানের পথে। তথ্য গ্রন্থগুলির প্রত্যেকটিরই নিজস্ব ব্যবহারিক ধারা আছে, সেই ধারা অনুসরণ করতে হবে।

তৃতীয়ত, প্রশ্নটির গভীরতা এবং ব্যাপকতা ভালভাবে অনুধাবন ক'রে নিয়ে সেই মতো সমাধানের ব্যবস্থা করতে হয়। অর্থাৎ, তথ্যভিত্তিক সাম্প্রতিকতম বই সম্পর্কে যথোপযুক্ত জ্ঞান রাখলেই গ্রন্থাগারিক প্রশ্নটির পুরোপুরি সমাধান করতে পারবেন।

চতুর্থত, উক্ত সমাধানের প্রয়োজনে গ্রন্থাগারিককে অবজ্ঞাত থাকতে হবে সকল বিষয়ের সকল ধরণের তথ্য গ্রন্থ সম্পর্কে। অর্থাৎ কত শ্রেণীর তথ্য গ্রন্থ আছে, কোন তথ্যগ্রন্থের তথ্যবৃত্ত কোন ধরণের, জ্ঞানের কোন এলাকায় কোনটির বিচরণ সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা রাখা গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য।

জিজ্ঞাসা বিভাগের কার্যক্রমের মধ্যে নিম্নোক্ত সাহায্য প্রকল্পগুলি গ্রহণীয়। :—

১) পাঠকদের কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে, চিঠিপত্রের মারফতে বা টেলিফোনে কোনো অনুসন্ধানের অনুরোধ এলে তা রক্ষা করা।

২) সকল শ্রেণীর পাঠকদেরই গ্রন্থাগারের যাবতীয় তথ্য সম্ভার ব্যবহারে

সহায়তা করা।

৩) অনুরোধ ক্রমে পাঠ্যতালিকা বা ছোটখাট গ্রন্থ বা বিষয়পঞ্জী তৈরি করা।

৪) প্রবন্ধসার বা সূচী, নির্দেশিকা ইত্যাদি তৈরি ক'রে গবেষণার সহায়তা করা।

৫) কোন প্রবন্ধ, দলিল, পুঁথি ইত্যাদির প্রয়োজন হলে পাঠক ও গবেষকদের জন্য সেগুলির নকল তৈরি করানো, এবং ঐ সব সামগ্রীর অনুবাদের কাজ করা বা সরবরাহ করা।

৬) আন্তঃ গ্রন্থাগার পুস্তকাদি ঋন করা—এমনকি আন্তর্জাতিক ঋণেরও ব্যবস্থা করা।

৭) গবেষণার কাজের জন্য নানাবিধ সাময়িক প্রকাশনের সুষ্ঠু সংরক্ষণ।

৮) দেশে এবং বিদেশে বিশেষ গ্রন্থ সংগ্রহাদির খবর রাখা, এবং সংযুক্ত গ্রন্থ-সূচী প্রকল্পের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা।

৯) গবেষণামূলক এবং গবেষণার কাজকর্মের সংবাদ সংগ্রহ।

তথ্যজিজ্ঞাসা বা তথ্যবিষয়ক প্রশ্ন তা'কেই বলে যার উত্তর প্রশ্নকর্তা গ্রন্থাগার সম্পদের মধ্যে পাবেন ব'লে ভরসা রাখেন। প্রশ্নসূত্রে চারটি উপাদান জড়িত থাকে; প্রশ্নকর্তা, গ্রন্থাগারিক, তথ্যপুস্তক এবং জ্ঞাতব্য বিষয়। এর মধ্যে প্রথম দু'টি ব্যক্তিক, শেষ দু'টি নৈর্ব্যক্তিক। প্রথম দুই অংশে পারস্পরিক সহযোগিতা দরকার, যা'র ফলে প্রশ্নটি স্পষ্ট ও যথাযথ হয়ে উঠবে। এবং তখন তথ্যপুস্তকের নির্বাচনও সহজ হয়ে উঠবে, সমাধান করা সম্ভব হবে তাড়াতাড়ি। এজন্য জিজ্ঞাসা বিভাগের গ্রন্থাগারিকের কয়েকটি নীতি মেনে চলা দরকার। যেমন, কোনো অবস্থাতেই যেন তিনি বিরক্ত না হন, নির্লিপ্ত ভাব না দেখান, এমন ভাব যেন না দেখান যা'তে জিজ্ঞাসুরা মনে করতে পারেন তিনি খুব ব্যস্ত এবং তাঁর কাজে ব্যাঘাত ঘটানো হচ্ছে বা তাঁকে বিব্রত করা হচ্ছে, আগন্তুক সূত্রান্বেষীকে তিনি যেন সৌজন্য সহকারে অভ্যর্থনা করেন, তিনি নিজে এসব ক্ষেত্রে যেমন ব্যবহার প্রত্যাশা করতেন সেইরকম ব্যবহার যেন আগন্তুকের প্রতি করেন। জিজ্ঞাসুদের প্রতি অবজ্ঞার বা তাচ্ছিল্যের ভাব যেন না দেখান, এমন ভাব দেখাবেন না যাতে মনে হবে প্রশ্নকর্তার অজ্ঞতায় তিনি কৌতুক বোধ করছেন অথবা যেন পিঠ-চাপড়ানো ভাব দেখাচ্ছেন, তাঁদের মনে বা অহং-বোধকে আঘাত দেবেন না তিনি।

তথ্যজিজ্ঞাসা স্বল্পবৃত্ত ( short range ) অথবা ব্যাপ্তবৃত্ত (long range)

হ'তে পারে। কতকগুলি প্রশ্ন আছে যেগুলো সাধারণ তথ্যসংক্রান্ত,—নানান বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধান শাখার অনুরূপ। বেশির ভাগই ব্যক্তিগত প্রয়োজন বা কৌতূহল। আরেকটু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন দৈনন্দিন ছোটখাট তথ্য-সংক্রান্ত, যেমন কোনো শব্দের অর্থ বা বানান, কোনো গুণীর জন্মদিন বা কোনো ঘটনার তারিখ, কোনো ভৌগোলিক বৃত্তান্ত ইত্যাদি। এজাতীয় অনুসন্ধিৎসার নির্ণয়কৃত্য সরল ধারায় চলে, সময় নেয় না, প্রশ্নের বৃত্তও স্বল্প,—নানাবিধ অভিধান বা কোষ গ্রন্থাদি থেকেই চটপট উত্তর বেরিয়ে আসে। এছাড়া আরেকটু ব্যাপক ধরণের সূত্র সন্ধানের কাজও আছে যার নির্ণয়কৃত্যে বিভাগীয় কর্মীকে একটু বইপত্র ঘেঁটে দেখতে হয়। যেমন, অমুক বছরে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অমুক বিষয়ের স্নাতক পর্যায়ে কতজন ছাত্রী কৃতকার্য হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ কোন বছরে কোন উপলক্ষে 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন, কিম্বা এযাবৎ হিমালয় শৃঙ্গ জয়ে কতগুলি অভিযান হয়েছে এবং তা'তে কতজন ভারতীয় অংশ নিয়েছেন, ইত্যাদি। এগুলির জন্য বিবিধ ধর্ম্মপঞ্জী, বা বিবরণী বা জীবনীপঞ্জীর সাহায্য নিতে হয়। অনেক সময়ে বার্ষিক কোনো সংকলন গ্রন্থে এই তথ্য না পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বইপত্র ও ঘেঁটে দেখতে হয়। তবুও এগুলিকে স্বল্পবৃত্ত জিজ্ঞাসার পর্যায়েই ফেলা যায়।

কিন্তু বিশেষ পাঠ বা গবেষণার সহায়ক যে সকল নির্ণয়কৃত্য এই বিভাগের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে সেগুলি ছোটখাট গবেষণারই সগোত্র হয়ে ওঠে। এজন্য কর্মী পাঠকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান, যেন মিলেমিশে গবেষণার কাজ করেন। এক্ষেত্রে কোন তথ্যগ্রন্থ যে কখন কী পরিমাণ কাজে লাগবে তা বলা কঠিন। তথ্য নির্ণয়ের প্রসার মূল পুস্তক—এমনকি গ্রন্থাগারের বাইরে অন্যান্য সংগ্রহের পুস্তক পর্যন্তও ঘটে। পত্রিকা, নথি, পুথি ইত্যাদির খবরও এনে দিতে হয়। এই জিজ্ঞাসার বৃত্ত বহু ব্যাপ্ত। এবং আধুনিক গ্রন্থাগার প্রকল্পে এই কাজই বিশিষ্টতম বলে স্বীকৃত।

সূত্র সন্ধানে কয়েকটি পদ্ধতি বা নীতি স্থির ক'রে নিলে ভাল হয়। নির্ণয়কৃত্যে প্রথমেই প্রশ্নটির চৌহদ্দি নির্ণয় ক'রে সংশ্লিষ্ট সঠিক তথ্য গ্রন্থটি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। প্রশ্নকর্তাকে অকারণে অপেক্ষমান রাখা অনুচিত। প্রশ্নটির পরিপ্রেক্ষিতে অন্ততপক্ষে কোষগ্রন্থ তাঁর কাছে তুলে ধ'রে নির্ণয়কর্মী অন্যান্য সূত্রগ্রন্থ সন্ধান করতে পারেন। নানাবিধ বই ঘেঁটে সূত্র নির্ণয়ের পরিপ্রেক্ষিতে যে সব তথ্য মিলবে সেগুলি লিপিবদ্ধ ক'রে রাখা

তাঁর উচিত।

নির্ণয়কৃত্য প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা বিভাগীয় কর্মীর ব্যবহারিক কয়েকটি সূত্র থাকে। যেমন—

(১) ভাষা সংক্রান্ত প্রশ্নের জন্য, অর্থাৎ শব্দার্থ, বুৎপত্তি, ব্যাকরণাদির সূত্র সন্ধানে বিবিধ অভিধান দ্রষ্টব্য।

(২) ঘটনাদির ধারা অনুসরণে, অর্থাৎ দেশের বিদেশের স্থায়ী, অনুষ্ঠানিক বা ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ধারা নির্ণয়ের জন্য বর্ষপঞ্জী এবং ঘটনাপঞ্জী জাতীয় বই দ্রষ্টব্য।

(৩) সাধারণভাবে সব কিছু জানবার প্রয়োজনে কোষগ্রন্থ।

(৪) কোনো বিষয়ের প্রকৃত তথ্য, অর্থাৎ কী ক'রে কী হল বা কী ক'রে কী করতে হয় এই জাতীয় জ্ঞাতব্যের জন্য সার-গ্রন্থ (hand-books) দ্রষ্টব্য।

(৫) ব্যক্তি, স্থান বা প্রতিষ্ঠানাদির জন্য দ্রষ্টব্য বিবিধ জীবনী অভিধান, ভৌগোলিক অভিধান, ডাইরেক্টরি জাতীয় গ্রন্থ। বিশেষ বিষয়ের জন্য এজাতীয় অনেক বই আছে, যেমন পৌরানিক অভিধান, ধর্ম অভিধান, লোক সাহিত্য বা সঙ্গীত অভিধান, ইত্যাদি।

(৬) মুদ্রিত বিষয়াবলীর সূত্র সন্ধানের জন্য গ্রন্থ পঞ্জী, নির্দেশিকা গ্রন্থ।

উপরোক্ত সূত্রাবলী ত্বরিত নির্ণয়ের জন্য প্রাথমিক ভাবে সহায়ক। বিশেষ সূত্রের জন্য এরই ভিত্তিতে অভিনিবেশ সহকারে অনুসন্ধানের কাজ করতে হয়।

যদিও প্রায় সব গ্রন্থাগারেই নির্ণয়কৃত্য মূলত একই প্রকার। তবু গ্রন্থাগারের প্রকৃতিভেদে প্রশ্নের অথবা জ্ঞাতব্য তথ্যের প্রকৃতি বদলায়। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সমূহে প্রায় সব জিজ্ঞাসাই এক ধরণের। মোটামুটি ভাবে পাঠ্য বিষয় কেন্দ্রিক। বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশেষ গ্রন্থাগারে উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণামূলক প্রশ্ন আসে। এখানে কর্মীকে নির্ভরযোগ্য এবং জটিল সূত্র সন্ধানের কাজে প্রায়ই ব্যাপৃত থাকতে হয়। জনগ্রন্থাগারে বিচিত্র ধরণের প্রশ্নের সমাধান করতে হয়,—বিষয়ও ব্যাপক। অধিকাংশই সাধারণ এবং সরল অনুসন্ধান। এবং শতকরা নব্বই ভাগই এই জাতীয় প্রশ্ন হলেও জীবনের নানান সমস্যা বিজড়িত জিজ্ঞাসার নিরসন ও জনসাধারণ এখানে এসে করতে চান। তথ্য সহায়মূলক হয়ে ওঠে। তবে তথ্যনির্ণয়ের পর্যায়ে উঠে গবেষণার সহায়তায় গবেষকদের সামিল হয়ে যাবার প্রচেষ্টা বিশেষ গ্রন্থাগার বা বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রন্থাগার কর্মীর প্রসঙ্গভুক্ত। কিন্তু জনগ্রন্থাগারের জিজ্ঞাসা বিভাগের কর্মীর যে সেজন্য এই জাতীয় পারদর্শিতা অর্জন করার প্রয়োজন নেই তা নয়। কেননা জনগ্রন্থাগারের কার্যক্রম ব্যাপক, এখানে অধিকাংশ আগন্তুক সাধারণ জিজ্ঞাসু হলেও সকল মানের ব্যক্তিই এর কর্মপরিধির অন্তর্ভুক্ত। অনেকেই হয়ত নানা কারণে বিশেষ গ্রন্থাগার প্রভৃতিতে যেতে পারেন না, তাঁদের একমাত্র আশ্রয়স্থল জনগ্রন্থাগার। সেজন্যই প্রস্তুতির প্রয়োজন, এবং প্রয়োজনে গ্রন্থাগারিকই জিজ্ঞাসু পাঠকের হয়ে অন্যান্য গ্রন্থাগারের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে তাঁর সন্তুষ্টি বিধান করবেন।

জিজ্ঞাসা বিভাগ সমগ্র গ্রন্থাগার বৃত্তেরই অঙ্গ, স্বতন্ত্র কিছু নয়। কোনো গ্রন্থাগারে এটির গঠন এবং অবস্থান স্বতন্ত্র ধরণের, কোথাও বা তা নয়। পরিচালনার সুবিধার উপর গঠন ও অবস্থান নির্ভর করে। গ্রন্থাগারের সকল বিভাগেরই লক্ষ্য জনগণের পরিচর্যা। মঞ্চে মঞ্চে সুবিন্যস্ত বর্গীকৃত গ্রন্থরাজি কিভাবে ব্যবহার করতে হবে, কোথায় কোন বই পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে স্বভাবতই পাঠক সাধারণের ধারণা থাকে না। পাঠক এবং গ্রন্থসংগ্রহের মধ্যে একটা যোজক দরকার। গ্রন্থাগারিক সেই সংযোগ-সেতুর কাজ করেন। জিজ্ঞাসা বিভাগ বইএর ব্যবহারে পাঠকদের সাহায্য করে। জ্ঞানসামগ্রীর প্রকাশিত মাধ্যমের সাহায্যে জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের সমস্যার সমাধানই এই বিভাগের কাজ। সুতরাং এর গঠন, অবস্থান, সংগ্রহ ও কর্মধারা সম্পর্কে ভেবেচিন্তে বিভাগটিকে সাজাতে হয়। কার্যকরিতার দিক থেকে কিছু আলোচনা করা যাক।

জিজ্ঞাসা বিভাগের পীঠিকার (Reference desk) অবস্থান গ্রন্থাগারের প্রবেশ পথের কাছাকাছি হওয়া বাঞ্ছনীয়। সূচীপত্রকাধারের অবস্থানও পীঠিকার পাশে হওয়া উচিত। বিভাগটি প্রবেশ পথের অদূরে অবস্থিত হলে পাঠকদের আসা যাওয়া সহজ হয়। এবং অন্যান্য বিভাগের কাজে বিঘ্ন হয় না,—অন্যান্য বিভাগের বিধি নিষেধের বেড়াও পার হতে হয় না। কেননা, কোনো প্রশ্ন নিয়ে আসতে হলেই পাঠককে যে গ্রন্থাগারের সব আইনকানুন মেনে এবং তজ্জনিত সময় নষ্ট ক'রে চলতে হবে তার কোনো কথা নেই। এমনকি গ্রন্থাগারের সদস্য ছাড়াও যে কোনো ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসু হিসেবে অনাহূত মনে করা অনুচিত। সূচীপত্রকাধারও কাছেপিঠে থাকা দরকার, কেননা সূচীপত্রক উত্তম গ্রন্থপঞ্জী এবং গ্রন্থাগার সংগ্রহের নিপুণ নির্দেশক, গ্রন্থ

সম্পদের দিক নির্ণয় যন্ত্র। জিজ্ঞাসা বিভাগের পক্ষে এটি অপরিহার্য।

জিজ্ঞাসা বিভাগের গঠন কেমন হবে তাও পূর্বাহ্নে স্থির করতে হয়। বিভাগের প্রধান লক্ষ্য সঠিক বই সংগ্রহ এবং সেগুলির সঠিক ব্যবহার প্রণালী। এই দুটি দিকে প্রখর হলে বাড়তি বোঝা – তা সে বইএর হোক বা কর্মীর হোক— না বাড়িয়ে কাজ সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে। সুতরাং তথ্যগ্রন্থ নির্বাচন এবং ক্রয় নিপুণ বিচারে সম্পন্ন করতে হয়। সংগ্রহের পরিপূর্ণতাই লক্ষ্য হবে, তবে সামর্থ অনুযায়ীই একাজ সম্ভব ব'লে নির্ব্বাচন যথাযথ যাতে হয়—সেদিকে সজাগ থাকা প্রয়োজন। বিভাগের সামগ্রিক গঠন ও পরিচালনার জন্য স্বতন্ত্র অর্থ তহবিল থাকা আবশ্যক, কেননা এই বিভাগের সংগ্রহ, কর্ম্মতৎপরতা এবং ধরণ গ্রন্থাগারের অন্যান্য বিভাগ থেকে বিচ্যুত না হয়েও পৃথক। বিভাগীয় কর্মীরাও বিশেষরূপে কুশল, এবং সে কুশলতাও কিছুটা পৃথক ধরণের। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বিশেষ পাঠ ছাড়াও উপযুক্ত বিশিষ্টতা অর্জন করতে হয়। গ্রন্থাগারের সূচীকরণ নীতি ছাড়াও এই বিভাগের সংগ্রহ বিশেষ পন্থায় এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সূচীকৃত থাকা প্রয়োজন, অন্যথায় কাজ চালাতে অসুবিধা হতে পারে। বিভাগীয় গ্রন্থাগারিক পাঠকদের উপদেষ্টার কাজ করেন। সুতরাং তাঁর জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত এবং গভীর হওয়া আবশ্যক। নানাবিধ তথ্যের সন্ধান ও নির্ণয় সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। ব্যক্তিত্ব; সহানুভূতি, উৎসাহ এবং কৌশল প্রভৃতি গুণের সমন্বয় থাকবে তাঁর মধ্যে। বই এর প্রতি যেমন তেমনি জনগণের প্রতি তাঁর দরদ থাকবে। স্বভাবত শৃঙ্খলা পরায়ণ হবেন তিনি, হবেন সৌজন্য-পরায়ণ এবং ধৈর্যশীল।

জিজ্ঞাসা বিভাগের সঙ্গে গ্রন্থাগারের অন্যান্য বিভাগের সংযোগ ঘনিষ্ঠ। পুস্তক বিভাগের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগের কথা বলাই 'বাহুল্য। এই বিভাগেরই মধ্যস্থতায় পুস্তক ক্রয় এবং পরিগ্রহণের কাজ হয়। পরিপোষণ বিভাগ বিশেষ ক'রে জিজ্ঞাসা বিভাগের সংগ্রহের খবরদারী করে। বইপত্র আবচ্ছিন্ন ভাবে ব্যবহারের জন্য সদাপ্রস্তুত রাখতে হয়। সূচীকরণ বিভাগের সঙ্গে এটির যোগ গুরুত্বপূর্ণ। সুষ্ঠু এবং ব্যাপক সূচীকরণ নির্ণয়কৃত্যের অপরিহার্য উপাদান। তাছাড়া পাঠ্যতালিকা বা গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়নেও এই বিভাগের সাহায্য প্রয়োজন। সঞ্চারণ বিভাগের সঙ্গে জিজ্ঞাসা বিভাগের সংযোগও অপরিহার্য। এই দুই বিভাগই পাঠকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। তাই কোনো প্রশ্নের প্রয়োজনে

একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই থাকে। নির্ণয়কৃত্যের জন্য মূল মঞ্চের কোনো বইএর দরকার পড়লে সঞ্চারণ বিভাগের সহায়তা নিতে হয়। সাময়িকী বিভাগের সঙ্গে জিজ্ঞাসা বিভাগকে প্রতি পদে পদে সংযোগ স্থাপন করতে হয়। চলতি পত্র পত্রিকা সব সময়েই দেখবার দরকার হতে পারে, কেননা প্রকাশিত গ্রন্থের পরবর্তী কালের সংবাদ একমাত্র সাময়িকীর মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব।

যদিও পাঠকদের সর্বতোভাবে সাহায্য ও নির্বাধ স্বাধীনতা দেওয়াই জিজ্ঞাসা বিভাগের নীতি, তবু পরিচালনার সুবিধা ও মসৃনতার প্রয়োজনে কিছু নিয়ম প্রবর্তন করতে হয়। পাঠক এবং তথ্যগ্রন্থ—উভয় দিকেই দৃষ্টি রেখে এই নিয়ম প্রণয়ন। তথ্য পুস্তক ঋণ দেওয়া হয় না, বিভাগের মধ্যেই ব্যবহার সীমিত থাকে। কেননা যে কোনো দিন যে কোনো মূহূর্তে যে কোনো বই ই কাজে লাগতে পারে। এজন্য সংগৃহীত প্রত্যেকটি পুস্তকে বিশেষ কোনো চিহ্ন দিয়ে রাখা বিধেয়। কোনো কোনো বই পাঠকের পক্ষে এখানে ব'সে না প'ড়ে বাড়িতে নিয়ে যেতে পারলে সুবিধা হয়। যেমন বৃহৎ এবং খণ্ডবদ্ধ কোষগ্রন্থের কোনো খণ্ড। যাতে বিশেষ কোনো বিষয়ের নাতিক্ষুদ্র প্রবন্ধ থাকে যা পড়তে সময়ও লাগে প্রচুর। তবুও এগুলি কেন বাইরে নেওয়া যাবেনা সেকথা দরকার হ'লে পাঠককে বুঝিয়ে বলা প্রয়োজন। অপর পাঠকদের সম্ভাব্য অসুবিধার প্রশ্ন ছাড়াও আরেকটি আশঙ্কা এর সঙ্গে জড়িত। খণ্ডবদ্ধ গ্রন্থের কোনো একটি খণ্ড হারিয়ে গেলে বা জখম হলে পুনরায় সেটি সংগ্রহ করা দুষ্কর। একটি খণ্ডের জন্য হয়ত সমগ্র গ্রন্থমালাটিই পুনরায় কিনতে হয়, যেটা খরচ ও সময় সাপেক্ষ। অনেক সময়ে গ্রন্থমালাটি দুষ্প্রাপ্যও হয়ে যায়। এই একই কারণে পত্রিকাও ঋণ দেওয়া অকর্তব্য। আরেকটি বিবেচ্য বিষয় এই জাতীয় পুরানো কোনো তথ্যগ্রন্থ, যে গুলির পাতা জীর্ণ হয়ে যায় এবং সাবধানে ব্যবহার না করলে ছিঁড়ে যাবার ভয় থাকে। জিজ্ঞাসা বিভাগে ধূমপান নিষেধ। বস্তুতপক্ষে সমগ্র গ্রন্থাগারেই ধূমপান অবশ্য বর্জনীয়। বর্জনীয় গল্প গুজব করা। ব্যক্তিগত বইপত্র নিয়ে এই বিভাগে ব'সে পড়াশুনা করাও বারণ। কেননা তা'তে অনির্দিষ্ট কালের জন্য আসন গুলি আটক থাকে। এ ধরণের পাঠের জন্য গ্রন্থাগারে স্বতন্ত্র পাঠকক্ষ থাকে। পত্রিকা বিভাগে বসে যে কাজ করবার সেটা এই বিভাগে না করাই বাঞ্ছনীয়। তা'তে জটিলতার সৃষ্টি হয়। সাধারণ ভাবে গ্রন্থাগারের সদস্যদের জন্যই এই বিভাগ গঠিত, কিন্তু কোনো আগন্তুক এসে সাহায্য চাইলে তাঁকে নিরাশ করাও

উচিত নয়। এজন্য মূল গ্রন্থাগারিকের কাছ থেকে অনুমতি পত্র সংগ্রহের ব্যবস্থা থাকা ভাল। মোট কথা, তথ্য পুস্তকের নিরাপত্তা এবং পাঠকদের অবাধ ব্যবহারের স্থবিধা এই দুই দিকে লক্ষ্য রেখে এমন ভাবে নিয়ম গুলি চালু করা কর্তব্য যা'তে গ্রন্থাগারেরও ক্ষতি না হয় এবং পাঠকরাও স্বচ্ছন্দ বোধ করেন।

তথ্য সরবরাহের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই অন্যান্য গ্রন্থাগারের সাহায্য নিতে হয়। কোনো প্রশ্নের সমাধান যদি স্ব-গ্রান্থাগারের সংগ্রহে না মেলে তাহলে গ্রন্থাগারিককে ভেবে দেখতে হয় উক্ত সমাধান কোথায় গেলে মিলতে পারে, কোন গ্রন্থাগারে সংশ্লিষ্ট বই আছে। বইটির সন্ধান পেলে গ্রন্থাগারিক স্থির করবেন সেটি কর্জ ক'রে আনা যাবে কিনা, অথবা নকল বা প্রতিলিপি করিয়ে আনতে হবে। অথবা কিনেই ফেলবেন কিনা। দুষ্পাপ্য পুস্তকের টাইপ প্রতিলিপি করানো যেতে পারে। অংশ বিশেষের আলোক চিত্র-প্রতিলিপি করানো যায়। আকাঙ্খিত পুস্তকের সূত্র মেলে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারের মুদ্রিত গ্রন্থ তালিকায়, সংযুক্ত সাময়িকী তালিকায়, সংযুক্ত সূচীপত্রকের সহায়তায়। একই অঞ্চলের গ্রন্থাগার হ'লে বিনিময় প্রথায় বই আনা সম্ভব হতে পারে। অথবা টেলিফোনের মারফতে সমাধান মিলতে পারে।

জনগ্রন্থাগারের জিজ্ঞাসা বিভাগে নির্ণয়কৃত্য বিস্তৃত, কিছু বা জটিল। বিভিন্ন ও বিচিত্র ধরণের জিজ্ঞাসা জনগণের তরফে থাকে, এবং সমাধানের জন্য তথ্য পুস্তকের ব্যবহার-রীতি অনেকেই জানেন না। তাই প্রশ্নটি অনুধাবন ক'রে নিয়ে কর্মী সহযোগে সমাধান করতে হয়। সমগ্র এলাকায় যে ধরণের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান থাকে, —যেমন ছাত্র, শিক্ষক, ডাক্তার, উকিল ইত্যাদি, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, কৃষি ও শিল্প উদ্যোগ ইত্যাদি, —তাদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই গ্রন্থসজ্জা করতে হয়। স্থানীয় ইতিহাস ও অর্থনীতির দিক বিশেষ ভাবে বিবেচনীয়। এবং এই জ্ঞান বিভাগীয় গ্রন্থাগারিকের পক্ষে অত্যাবশ্যক। জিজ্ঞাসা বিভাগে নিরক্ষর বা সদ্যসাক্ষরদের জন্যও কিছু তথ্য সামগ্রী রাখা উচিত, এবং এজন্য গ্রন্থাগারিকের অবহিত থাকা উচিত।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জিজ্ঞাসা বিভাগ ব্যাপ্তিতে এবং বৈচিত্র্যে হয়ত জনগ্রন্থাগারের মতো নয়, কিন্তু গভীরতায় বিশিষ্ট। পাঠকরাও এখানে অনেক বেশি সাব্যস্ত ও সংযত। তাঁরা নিজেরাই মোটামুটি ভাবে জানেন কেমন ক'রে তথ্যাদি নির্ণয় করতে হয়। এব্যাপারে নির্দেশ এবং পরিচালনার অংশ কম। কিন্তু বিশেষ পাঠ ও গবেষণার প্রয়োজনে নির্ণয়কৃত্যের ধারা বিশিষ্ট

পথ ধ'রে বিশদ বা পুঙ্খানুপুঙ্খ খাতে চলে। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কাজ চার শ্রেণীর পাঠকবর্গে নিবদ্ধ; শিক্ষাবিভাগ (faculty), ছাত্র, প্রাক্তন ছাত্র ও কর্মী এবং এলাকাভুক্ত বাসিন্দা। সুতরাং বিভাগীয় গ্রন্থাগারিক যদি বিভিন্ন শিক্ষাবিভাগীর পাঠক্রম, শিক্ষকদের কাজকর্মের ধারা এবং কর্মী ও বাসিন্দাদের আগ্রহ সম্পর্কে খোঁজ রাখেন বা ওয়াকিবহাল থাকেন তাহলে তাঁর কাজ সুষ্ঠু ও সহজ হয়।

মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জিজ্ঞাসা বিভাগ স্বভাবতই শিক্ষাক্রম কেন্দ্রিক হয়ে থাকে। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বেলাতেও তাই। তবে বিদ্যালয়ের তথ্য-সহায়ের কাজ এক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে শিক্ষার্থীদের সর্বতোভাবে নির্দেশ দিতে হয়। কোন বই'এ কী জাতীয় তথ্য থাকে, কেমন ক'রে কোন বই ব্যবহার করতে হয় তা স্বভাবতই তারা জানেনা। তথ্যসন্ধান এবং বিশ্লেষণের কাজে তাদের হাতে কলমে সাহায্য করতে হয়। বিদ্যাজগতে প্রবেশের প্রথম পদক্ষেপে ছেলেমেয়েরা যেন গ্রন্থাগার সম্পর্কে ধারণা ক'রে নিতে পারে, গ্রন্থ চিনতে শেখে, কোন বইএর তথ্য বা তত্ত্ব ভাসা ভাসা ধরণের, কোন গ্রন্থে তা গভীর তা যেন বুঝতে শেখে। এই শিক্ষাকেই পরে তারা মহাবিদ্যা-লয়ে পরবর্তী উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারবে।

বিশেষ গ্রন্থাগারগুলির কাজই মূলত গবেষণা এবং তথ্যানুসন্ধান। বিশেষ ক'রে উচ্চতর শিক্ষা এবং শিল্প সংস্থা শ্রেণীয় গ্রন্থাগারে। এই সব গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখতেই হয়। উপরন্তু সার সংকলন, আলোকচিত্র প্রতিলিপি প্রভৃতি ব্যাপারে পারঙ্গম হতে হয়। তথ্যনির্দেশ থেকে সুরু ক'রে তথ্যনির্ণয় ও তথ্যবিশ্লেষণ পর্যন্ত সব ধরণের কাজই এই গ্রন্থাগারিকের আওতায় পড়ে। জিজ্ঞাসা বিভাগ প্রায় গবেষণা কেন্দ্রেরই চেহারা নেয়।

এই সূত্রে নথিনিবেশ ( Documentation ) প্রকল্পের কথা আসে। বিশেষত এযুগের প্রয়োজনের ব্যাপকতায় নথিকরণের কাজ অপরিহার্য। রঙ্গনাথন বলেন, বিশেষজ্ঞদের পুঙ্খানুপুঙ্খ মূল সূত্রের সন্ধানে সহায়ক যাবতীয় তথ্যের ত্বরিত সন্নিবেশের কাজ নথিনিবেশ। মৌলিক গবেষণায় ব্যাপৃত বিশেষজ্ঞদের কাজের জন্য যাবতীয় নব উদ্ভাবিত প্রসঙ্গের সংগ্রহ ও বিন্যাসই নথিনিবেশ। পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তৃতভাবে যে সকল চিন্তা ও কাজের ধারা ব্যাপকভাবে পত্র পত্রিকায় এবং নানান উপায়ে প্রকাশ পাচ্ছে তার খেই ধরবার

প্রয়োজনে এই কাজ এক স্বতন্ত্র বিভাগেরই জন্ম দিচ্ছে। নথিনিবেশ কর্মের মধ্যে আছে নথিকরণ ( Documentation work ) এবং নথিকৃত্য (Documentation Service )। সাধারণ ভাবে গ্রন্থাগারের বা বিশেষ গ্রন্থাগারের জিজ্ঞাসা বিভাগে নথিকৃত্য পাঠক ও গবেষকদের সহায়তা করে। এযুগের প্রয়োজনে অপরিহার্য ভাবেই বিবিধ নথিনিবেশ কেন্দ্র স্থাপিত হচ্ছে। এ রকম কয়েকটি কেন্দ্রের নাম জেনে রাখা ভাল। :—

১) ভারতবর্ষ : ইণ্ডিয়ান নেশনেল সাইন্টিফিক ডকুমেণ্টেশন সেণ্টার (INS-DOC) ; নয়াদিল্লি।
(২) ব্রিটেন : ব্রিটিশ ষ্টেণ্ডার্ড ইনষ্টিটুট, লণ্ডন। রয়াল সোসাইটি ; লণ্ডন।
(৩) আমেরিকা : আমেরিকান ডকুমেণ্টেশন ইনষ্টিটুট ; ওআসিংটন, ডি, সি। লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস, ওআশিংটন।
(৪) ফ্রান্স : সেনট্রাল নাসিও নাল দ ল রিসার্চ সাইন্টিফিক ; প্যারিস।
(৫) জাপান : নেশনেল দায়েত লাইব্রেরি ; টোকিয়ো। জাপান ইনফরমেশন সেণ্টার অফ সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজি; টোকিয়ো।

ভারতে কিছুকাল আগে প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন অফ স্পেশাল লাইব্রেরিজ এণ্ড ইনফর্মেশন সেণ্টার, ( IASLIC ) কলিকাতা, নথিনিবেশের কাজ করে থাকে। এবং ব্রিটেনে লণ্ডনস্থ এসোসিয়শন অফ স্পেশাল লাইব্রেরিজ এণ্ড ইনফর্মেশন ব্যুরোজ (ASLIB) ও অন্যতম নথিনিবেশ কেন্দ্র।

নথিনিবেশ কর্মধারাকেও দু'ভাবে ভাগ ক'রে দেখা যায়। নথিকরণের কাজের মধ্যে পড়ে (১) প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত যাবতীয় নথির অনুসন্ধান ও সংগ্রহ ; (২) সংগ্রহের সুনিবদ্ধ শ্রেণীকরণ ও বর্গীকরণ ; (৩) সংগৃহীত সামগ্রীর সূচীকরণ ; এবং (৪) তালিকা প্রকাশ করা। নথিকৃত্যের ধারা যদিও উল্লেখে আবদ্ধ করা যায় না, তবুও কিছু ইঙ্গিত দেওয়া চলে। যেমন, (১) পাঠকদের সাহায্যের জন্য সূচী সন্ধান ; (২) সংগ্রহ ভুক্ত নথি ব্যবহারের ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া ; (৩) দরকার হ'লে আন্ত: গ্রন্থাগার ঋণের মাধ্যমে নথি পত্র সংগ্রহ করা ; (৪) প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নথির নকল সরবরাহ করা ; নকলের কাজ টাইপ করে, আলোকচিত্র সহযোগে বিবিধ প্রতিলিপি তৈরি করে সম্পন্ন হয় ; (৫) পাঠকের অজানা কোনো ভাষা থেকে অনুবাদ করিয়ে সরবরাহ করা। বলা বাহুল্য, নথিনিবেশ জিজ্ঞাসা বিভাগের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া।

## তথ্য গ্রন্থ পরিচয় ( Reference books )

রঙ্গনাথন তথ্যগ্রন্থকে বলেছেন 'প্রত্যক্ষীভূত স্মৃতি' ( externalised memory )। স্মৃতি যেমন যুক্তি থেকে পৃথক তেমনি তথ্যগ্রন্থও সাধারণ পুস্তক থেকে পৃথক। যার মধ্যে সব বিষয়ের তথ্য মেলে অথচ যে বই ধারাবাহিক ভাবে পড়বার নয় তাই তথ্য গ্রন্থ। এতে পরিজ্ঞাত বিষয়াবলীকে এমন ভাবে সাজিয়ে দেয় যা'তে প্রশ্নের অনুসন্ধান ও সমাধান অনতিবিলম্বে ও বিশদ ভাবে বেরিয়ে আসে।

নানান ধরণের তথ্যগ্রন্থ আছে। সামগ্রিক ভাবে সব বিষয় নিয়ে অথবা প্রত্যেক বিষয়েরই বিশেষ বিশেষ শ্রেণী নিয়ে তথ্যপুস্তক রচিত হয়ে থাকে। জিজ্ঞাসা বিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে এগুলিকে নিম্নোক্ত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। :—

(১) অভিধান ( Dictionary )
(২) কোষগ্রন্থ ( Encyclopedia )
(৩) মানচিত্র ( Atlas, Map )
(৪) ভৌগোলিক নির্দেশিকা ( Gazetteer )
(৫) বর্ষপঞ্জী ( Year book )
(৬) ঘটনাপঞ্জী ও বিবিধ বার্ষিক পরিসংখ্যান
(৭) নির্দেশ পঞ্জী ( Directory )
(৮) গ্রন্থপঞ্জী ( Bibliography )
(৯) গ্রন্থ তালিকা ( Catalogue )
(১০) সূচী গ্রন্থ ( Index )
(১১) সংক্ষিপ্তসার ( Abstract )
(১২) লঘুপুস্তক বা সারগ্রন্থ, পথপঞ্জী ( Hand booe, Guide )
(১৩) পঞ্জিকা ( Almanac )
(১৪) নথি ( Document )
(১৫) দৃশ্য শ্রাব্য সামগ্রী ( Audio-Visual Sources )

এগুলি ছাড়াও বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারের বিবিধ বিভাগের নিয়মাবলী ( ডাক বিভাগ, রেল বিভাগ, আয়কর বিভাগ ইত্যাদি ), বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ বিধিনির্দেশাবলী প্রভৃতি এবং বিশেষ পুস্তিকাও সংগ্রহে থাকা বাঞ্ছনীয়

অনেক গ্রন্থাগারের পক্ষেই যাবতীয় তথ্যগ্রন্থ সংগ্রহে রাখা সম্ভব হয়না। বস্তুতপক্ষে কোনো গ্রন্থাগারই তাবৎ তথ্য সামগ্রী সংগ্রহ ভুক্ত করতে পারেনা। বাছাই করতে হয়। বাছাই করার সূত্র নির্ণীত হয় গ্রন্থাগারের শ্রেণী, অবস্থান, পাঠকবর্গ এবং আর্থিক সংস্থানের ভিত্তিতে। উল্লিখিত গ্রন্থগুলি কোন পদ্ধতিতে যাচাই ক'রে দেখতে হয় এবং প্রচলিত গ্রন্থগুলি কোন পরিচয় বহন করে সে সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। একে একে তার আলোচনা করা যাক।

১। অভিধান।

অভিধান বলতে সাধারণত ভাষাভিধান বোঝায়। এর কাজ ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ নিয়ে, ভাষার ব্যবহার নিয়ে নয়। শব্দের বানান, উচ্চারণ, অর্থ, বুৎপত্তি ইত্যাদির নির্দেশ থাকে অভিধানে। এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এগুলির অর্থ পরিষ্কার ভাবে বোঝানোর জন্য কখনো কখনো প্রয়োগ রীতির আভাষ বা উদাহরণও থাকে। অভিধানে কোষগ্রন্থের মতো কোনো বিষয় সম্পর্কিত বিবরণ থাকেনা, কেবলমাত্র শব্দার্থ-টুকুই থাকে। বৃহৎ অভিধানের বিস্তৃত বিবরণের প্রবণতা অনেক সময়ে কোষ গ্রন্থের কাছ ঘেঁষে গেলেও তার মধ্যে বিষয় ব্যাখ্যার বিস্তার থাকে না। অভিধান কেবলমাত্র শব্দ নিয়েই হয় না। নানান ধরণের হয়ে থাকে। যেমন,—বাকভঙ্গি, বিশিষ্টার্থ-বোধক, পারি-ভাষিক, প্রকৌশল বিষয়ক, বেদ, বাইবেল প্রভৃতিতে ব্যবহৃত শব্দাভিধান, সমার্থবোধক শব্দাভিধান, দেশজ ভাষাভিধান, ইত্যাদি; বিশেষ বিষয় সংক্রান্ত অভিধান, যেমন,—প্রবাদ, প্রবচন, পৌরাণিক, লোকসাহিত্য, বা জীবনী অভিধান, ইত্যাদি।

অভিধান নির্বাচনে কয়েকটি প্রসঙ্গ বিচার ক'রে দেখতে হয়। অভি-ধানের ধরণ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকলে কোন অভিধান ক্রয়যোগ্য সে বিষয়ে যেমন নিশ্চিন্ত হওয়া যায় তেমনি কোন কোন অভিধান ঘাঁটলে কোন ধরণের সমাধান মিলবে তা ও জেনে রাখা যায়। অভিধানের প্রারম্ভেই থাকে নির্দেশক অংশ। এর সব কিছুই খুঁটিয়ে দেখে নিতে হয়। অভিধানের নাম ও সংস্করণ (ভাষা প্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে সংস্করণ বিচার গুরুত্বপূর্ণ), প্রণয়নের ইতিহাস ও বৃত্তান্ত, শব্দসজ্জার বিবৃতি ও নির্দেশ, ব্যবহৃত সংকেত ও প্রতীক চিহ্নগুলির ব্যাখ্যা, শব্দ বা বাক্যাংশের সংক্ষিপ্তিকরণ সূত্র (abbrevia-

tions), ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বা পরিচয় ইত্যাদি যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য। এই সঙ্গে অভিধানের ব্যবহারিক পরিধিরও পরিচয় থাকে। দ্বিতীয় অংশে মূল অভিধান। বলাবাহুল্য, অভিধান বর্ণানুক্রমে সজ্জিত থাকে। বানান ও উচ্চারণ এবং পদ-নির্দেশ সংবলিত শব্দাবলী, বুৎপত্তি এবং বুৎপত্তিগত অর্থ, শব্দেতিহাস, প্রয়োজন পক্ষে উদ্ধৃতি বা উদাহরণ, শব্দ সংজ্ঞা প্রভৃতি সমেত শব্দের অর্থ বা অর্থাবলী নিয়ে মূল অভিধানাংশ। অভিধানের তৃতীয় অংশে পড়ে পরিশিষ্ট। এই অংশে বিশেষ বিশেষ ধরণের শব্দার্থ,- যেমন বহুল প্রচলিত বিদেশী শব্দ, বহুল ব্যবহৃত সংক্ষিপ্ত বর্ণাক্ষর পরিচিতি, পরিভাষা সংগ্রহ, প্রবাদ জাতীয় শব্দ সংগ্রহ ইত্যাদি, এবং কোনো ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত জীবনী বা ভৌগোলিক পরিচয়াদিও সংকলিত হয়।

অভিধানের অন্তর্গত এই সব অংশের বিচারের পরেও আকারগত বিশ্লেষণ ক'রে দেখা উচিত। মুদ্রন ও মুদ্রাক্ষর বিচার, কাগজ, বাঁধাই ইত্যাদি দেখে নেওয়া দরকার। এ ছাড়াও বিশেষ কতকগুলি দিক, যেমন বর্ণনির্দেশক ব্যবস্থা আছে কিনা, বানান ও উচ্চারণ বোঝাতে সরলীকৃত অনুশব্দ ব্যবহৃত হয়েছে কিনা, সমার্থ-বোধক শব্দের একত্রীকরণ সূত্র বা পারস্পরিক সম্পর্কের নির্দেশ আছে কিনা এই সব বিষয়ও দেখে নিয়ে অভিধানের ব্যবহারযোগ্যতা, গভীরতা ও পরিধি তলিয়ে দেখে নেওয়া কর্তব্য।

বিশেষ কয়েকটি অভিধানের নাম নিচে দেওয়া হল। :—

ক। বাংলা অভিধান

(১) বঙ্গীয় শব্দকোষ—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্প্রতি দুই খণ্ডে সাহিত্য আকাদেমি থেকে প্রকাশিত)।

(২) বাঙ্গালা শব্দকোষ, ৫ খণ্ড—যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

(৩) বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, ২ খণ্ড—জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, কলিকাতা দি ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস।

(৪) চলন্তিকা—রাজশেখর বসু, কলিকাতা। এম্, সি, সরকার এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ।

(৫) ব্যবহারিক শব্দকোষ—কাজী আবদুল ওদুদ, কলিকাতা, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী।

খ। সংস্কৃত অভিধান

১) নামলিঙ্গানুশাসনম্ ( বা অমরকোষ )—অমর সিংহ – কৃত।

২) শব্দকল্প দ্রুম—রাজা রাধাকান্ত দেব-কৃত।

৩) বাচস্পত্যম্, ৬ খণ্ড – তারানাথ তর্কবাচস্পতি।

৪) অভিধান রাজেন্দ্র, ৬ খণ্ড, [মাগধী প্রাকৃতি-সংস্কৃত কোষ] – রাজেন্দ্র সুরি।

৫) সংস্কৃত্ – ইংলিশ ইংলিশ – সংস্কৃত্ ডিকশনারি, ২ খণ্ড—মোনিএর উইলিয়াম্‌স্।

৬] সংস্কৃত উণ্ড জার্মেন ওয়ার্টের বুখ, ৭ খণ্ড – বোটলিঙ্ক অটোফেন এবং রথ রুডল্‌ফ্।

গ। হিন্দি অভিধান

১) হিন্দি শব্দসাগর, ১০ খণ্ড – কাশী, নাগরী প্রচারিনী সভা।
[ সম্পাদনায় শ্যামসুন্দর দাস ]

২] মানক হিন্দি কোষ, ৫ খণ্ড – প্রয়াগ, হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন।
[ সং—রামচন্দ্র বর্মা ]

৩) বৃহৎ হিন্দি কোষ—[ সং—কালিকাপ্রসাদ ও অন্যান্য ] কাশী, জ্ঞান মণ্ডল লিমিটেড।

৪] রয়াল ডিকশনারি অফ ইংলিশ হিন্দি হিন্দি-ইংলিশ— রেভারেণ্ড টি, ক্রাভেন।

ঘ। ইংরেজি অভিধান

১) অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি, ১৩ খণ্ড ( পূর্বে নাম ছিল নিউ ইংলিশ ডিকশনারি অন হিস্টরিকাল প্রিন্সিপল্‌স )। ইংরেজি ভাষার বিশিষ্টতম এবং আদর্শ অভিধান।

২) দি সেঞ্চুরি ডিকশনারি, ৮ খণ্ড—লুইটনি, লণ্ডন, দি টাইম্‌স্।

৩) ওয়েব্‌স্টার্‌স্ নিউ ইণ্টারনেশনাল ডিকশনারি অফ দি ইংলিশ লেংগুয়েজ।

এগুলি ব্যতীত সহজ ব্যবহার যোগ্য বিশিষ্ট কয়েকটি অভিধান আছে। যেমন, কনসাইজ অক্সফোর্ড ডিকশনারি, চেম্বারসেজ টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ডিকশনারি, ইত্যাদি।

আমেরিকা থেকে প্রকাশিত মার্কিনী ইংরাজির অভিধানের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য,—

'এ ডিকশনারি অফ আমেরিকান ইংলিশ অন হিস্টরিকাল প্রিন্সিপ্‌ল্‌স'; পূর্বকথিত অক্সফোর্ড অভিধানের ধাঁচে চার খণ্ডে প্রকাশিত। ছোটখাটর মধ্যে 'র‍্যাণ্ডম হাউস ডিকশনারি অফ দি ইংলিশ লেংগুয়েজ', ইত্যাদি।

ঙ। জার্মান, ফরাসী, প্রভৃতি

১) হ্বারিগ—ভোর্তের বুখ।

২) হারাপ্‌স্ ষ্টাণ্ডার্ড জার্মান এণ্ড ইংলিশ ডিকশনারি, ২য় খণ্ড (৪ ভাগে)।

৩) কেসেল্‌স্ ইংলিশ—জার্মান জার্মান—ইংলিশ ডিকশনারি।

৪) কেসেল্‌স্ ফ্রেঞ্চ—ইংলিশ ইংলিশ—ফ্রেঞ্চ ডিকশনারি।

৫) হারাপ্‌স্ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফ্রেঞ্চ-ইংলিশ ইংলিশ-ফ্রেঞ্চ ডিকশনারি ২ খণ্ড।

৬) রাশিয়ান-ইংলিশ ইংলিশ-রাশিয়ান ডিকশনারি—ও—ব্রিয়েন কৃত।

৭) চাইনিজ—ইংলিশ ডিকশনারি—ম্যাথুজ কৃত।

৮) টিবেটান—ইংলিশ ডিকশনারি—শরৎচন্দ্র দাস।

৯) উর্দু :— স্ট্যাণ্ডার্ড ইংলিশ—উর্দু ডিকশনারি—আবদুল হক সম্পাদিত; এবং হিন্দুস্তানি—ইংলিশ ডিকশনারি—ফালন কৃত।

১০) ফেনকিয়ুষা-কৃত নিউ জাপানিজ—ইংলিশ ডিকশনারি, এবং নিউ ইংলিশ—জাপানিজ ডিকশনারি।

চ। বিশেষ বিষয় সংক্রান্ত অভিধান।

ভাষা ও সাহিত্য, সমাজবিদ্যা, জীবনী ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের স্বতন্ত্র অভিধান স্বভাবতই আছে। কিছু কিছু নিদর্শন নিচে উল্লিখিত হল। —

১) পৌরাণিক অভিধান—সুধীর চন্দ্র সরকার।

২) জীবনী অভিধান—সুধীর চন্দ্র সরকার।

৩) বিবিধার্থ অভিধান—সুধীর চন্দ্র সরকার। এই অভিধান বিচিত্র ধরণের শব্দ ও অর্থ সংকলিত।

৪) বাংলা বচনাভিধান—অমর নাথ রায়। বিবিধ বচন বা কথ্যাংশ এই অভিধানে সংকলিত।

৫) বিজ্ঞান-ভারতী—দেবেন্দ্র নাথ বিশ্বাস। বৈজ্ঞানিক শব্দের সংকলন।

৬) পরিভাষা কোষ—সুপ্রকাশ রায়।

৭) লৌকিক শব্দ কোষ—কামিনী কুমার রায়।

৮) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অভিধান—রাজকুমার মুখোপাধ্যায়।

৯) বাংলা প্রবাদ—সুশীল দে।

১০) প্রবাদ রত্নাকর—সত্যরঞ্জন সেন।

১১) রবীন্দ্র রচনা কোষ—চিত্তরঞ্জন দেব ও বাসুদেব মাইতি।

১২) রবীন্দ্র অভিধান—সোমেন্দ্রনাথ বসু। (এ যাবত ছয়টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।)

১৩) রবীন্দ্র শব্দ কোষ—বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

১৪) অপরাধ জগতের শব্দকোষ—ভক্তি প্রসাদ মল্লিক।

১৫) ইতিহাস অভিধান, ১ম খণ্ড: ভারত; যোগনাথ মুখোপাধ্যায়।

ইংরাজি ভাষার বিশেষ বিষয়াভিধান:—

১৬) মডার্ণ ইংলিশ ইউসেজ—ফাউলার (ইংরাজি শব্দাদি ব্যবহারের নির্দেশিকা)।

১৭) রজেট্‌স্ থেসরাস্ অফ ইংলিশ ওয়ার্ডস্ এণ্ড ফ্রেজেস্ (শব্দের নানাবিধ অর্থ পরিধির উল্লেখে যথাযথ ব্যবহারের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সংকলন)।

১৮) ডিকশনারি অফ ফ্রেজ এণ্ড ফেব্‌ল্—ই. সি. ক্রয়ার।

১৯) ফাঙ্ক এণ্ড ওআগনল্‌স্ স্ট্যাণ্ডার্ড ডিকশনারি অফ ফোকলোর, মাইথোলজি এণ্ড লিজেণ্ড, ২য় খণ্ড।

২০) ডিকশনারি অফ ও আর্লড্ লিটারেচার—জে. টি. শিপলি।

২১) বেদিক কনকর্ডান্স—ব্লুম ফিল্ড (বৈদিক শব্দাভিধান)।

২২) ডিকশনারি অফ মডার্ণ মিউজিক এণ্ড মিউজিসিয়ান্‌স্—ইগ্‌ল্‌ফিল্ড হাল।

২৩) চেম্বার্সেজ বায়োগ্রাফিকাল ডিকশনারি।

২৪) ইণ্টার ন্যাশনাল হুজ হু (লণ্ডন থেকে ১৯৩৫-এ প্রকাশ আরম্ভ হয়েছে)।

২৫) ওআর্লড্ বায়োগ্রাফি (নিউয়র্কের ইনষ্টিটুট অফ রিসার্চ ইন বায়োগ্রাফি থেকে ১৯৪০-এ প্রকাশ সুরু)।

২। কোষগ্রন্থ।

কোষগ্রন্থ বিশ্বের তাবৎ বিষয় নিয়ে রচিত। সাধারণ গ্রন্থ থেকে এর

পার্থক্য বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যার আকারে ও প্রকারে। বই বিশেষ বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় নিবদ্ধ। কিন্তু কোষগ্রন্থে বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় থাকে, তবে সে পরিচয় আংশিক নয়, —পূর্ণাঙ্গ। অল্প কথায় পুরো পরিচয়ের আভাস যেন মেলে এ ভাবে লেখা। প্রবন্ধ রচয়িতাদের নাম স্বাক্ষরিত থাকে, এবং উল্লেখপঞ্জী ইত্যাদির সাহায্যে বিস্তারিত পাঠের ইঙ্গিতও থাকে। কোষগ্রন্থ সার্বৈষয়িক হতে পারে অথবা বিশেষ বিষয় সংক্রান্তও হতে পারে। যেহেতু এতে সংক্ষিপ্ত পরিচয় মাত্র থাকে এবং গবেষণা বা গভীর পাঠমূলক আলোচনা থাকেনা। নানাবিধ সাম্প্রতিক তথ্য নিয়েই কাজ, সেজন্য কিছুকাল বাদে এটি পুরোনো হয়ে যায়। জ্ঞানের প্রসার ও দিকবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাই নূতন সংস্করণের প্রয়োজন হয়। এমনকি অনেক প্রবন্ধ নূতন সংস্করণে বাতিলও হয়ে যেতে পারে। তবে বিশিষ্ট কোষগ্রন্থ সংস্থা বছরে বছরে পরিশিষ্ট বা সংযোজন গ্রন্থ বা'র করে। তা'তে সাম্প্রতিকতা বজায় থাকে, পুরো গ্রন্থরাজি প্রকাশ করবার দুরূহতা এবং ক্রয়ের অর্থ সামর্থের উপরে চাপ পড়েনা। বিষয় নির্বিশেষে কোনো কোষ গ্রন্থকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলা যায় না। সাধারণত যেদেশে প্রকাশিত সেই দেশের প্রতি পক্ষপাত দেখা যায়, —সব দেশ ও অঞ্চল সমান প্রতিনিধিত্ব পায়না। কোষগ্রন্থের সংস্করন বদলালেও পুরানো খণ্ডগুলি পারতপক্ষে বাতিল না করাই উচিত। কেননা, বিশেষ গবেষণার ক্ষেত্রে তদানীন্তন কালের দৃষ্টিভঙ্গি বা অবস্থা প্রসঙ্গ পুরানো সংস্করণ থেকে জানা যায়। এবং এমনও দেখা যায় যে নূতন কোনো সামগ্রীর স্থান করবার প্রয়োজনে পুরানো কোনো প্রসঙ্গ বা ছোটখাট জীবনী ইত্যাদি নূতন সংস্করণে বাদ দেওয়া হয়েছে।

কোষগ্রন্থ নির্বাচনের প্রথমে এর ভূমিকাটি ভাল ক'রে প'ড়ে জেনে নিতে হয় এটির উদ্দেশ্যে, ধরণ এবং আলোচনার পরিধি। সম্পাদকের কী উদ্দেশ্য। কোন শ্রেণীর পাঠকদের জন্য তৈরি, বিষয় নির্বাচনের ধারা কেমন, সংশোধন সংযোজনাদি কতবারই বা হয়েছে, ইত্যাদি। তারপরে ভিতরের কিছু অংশও প'ড়ে দেখা উচিত কতদূর পর্যন্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করছেন সম্পাদক, গ্রন্থাগারের সদস্যবৃন্দের আগ্রহ মিটবে ব'লে মনে করা যায় কিনা, ইত্যাদি। যে সব দিক বিচার ক'রে দেখা কর্তব্য সেগুলি এর নির্ভর যোগ্যতা, —লেখকরা নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশিষ্ট কিনা, বিন্যাস পদ্ধতি, গ্রন্থপঞ্জী ও উল্লেখপঞ্জী, সাম্প্রতিকতা, যাথা তথ্য ( accuracy ), গ্রন্থন ও অঙ্গসজ্জা। কোষগ্রন্থের সম্পাদক.

প্রবন্ধগুলির লেখক এবং প্রকাশক—প্রত্যেকেরই পরিচয় এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা বিচার্য। পরিকল্পনা এবং বিন্যাস পদ্ধতি-পরিকল্পনার সঙ্গতি বরাবর বজায় থাকছে কিনা এবং বিন্যাস পদ্ধতি সহজ ধারায় কিনা দেখে নিতে হয়। গ্রন্থপঞ্জী প্রবন্ধের সূত্রেই প্রস্তুত অথবা বিষয়টির আরও পাঠের পক্ষে যথেষ্ট কিনা বিচার্য। সাহিত্য সংক্রান্ত মূল্যায়নে দেখতে হয় এর যাথাতথ্য ও প্রামাণিকতা, সাম্প্রতিকতা, রচনাশৈলী পাণ্ডিত্যপূর্ণ না কি জনপ্রিয় ভঙ্গির, বিষয় বিশেষে রচয়িতার অধিকার, আলোচনায় পক্ষপাত হীনতা, ইত্যাদি। গ্রন্থগত বিচারে দেখে নিতে হয় বিন্যাস বর্ণানুক্রমিক কিনা, নির্দেশিকার নির্ভর যোগ্যতা, তথ্য নিবেশের পারম্পর্য, মানচিত্র, ইত্যাদি। মুদ্রণ বিচারে কাগজ, হরফ, ছাপাই, বাঁধাই, শিরোনাম নির্দেশ ইত্যাদি পরীক্ষা ক'রে দেখতে হয়। প্রকাশন সংস্থা বার্ষিক সংযোজন খণ্ড প্রকাশ ক'রে সাম্প্রতিকতা রক্ষা করে কিনা তাও লক্ষ্য করা উচিত।

বিশেষ কয়েকটি কোষগ্রন্থের পরিচয় জানা যাক।

(১ম) সার্ববৈষয়িক বা সাধারণ কোষগ্রন্থ :

ক) বাংলা :—

(১) বিশ্বকোষ, ২২ খণ্ড (১৩০৯—১৩১৮) —নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

(২) ভারতকোষ, ৫ খণ্ড, —বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

(৩) শিশুভারতী, ১০ খণ্ড, —যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

খ) হিন্দি :—

(৪) হিন্দি বিশ্বকোষ, ১২ খণ্ড, —প্রধান সম্পাদনায় কমলাপতি ত্রিপাঠি, নাগরী প্রচারিনী সভা।

(৫) হিন্দি বিশ্ব ভারতী, ৫ খণ্ড, —সম্পাদনায়—নারায়ণ চতুর্বেদী ও কৃষ্ণবল্লভ দ্বিবেদী, লখনৌ।

গ) ইংরেজি :—

(৬) এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ২৪ খণ্ড।

(৭) এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা, ৩০ খণ্ড।

(৮) চেম্বারসেজ এনসাইক্লোপিডিয়া, ১৫ খণ্ড।

(৯) কলিয়ার্স এনসাইক্লোপিডিয়া, ২৪ খণ্ড।

(১০) কম্পটন্‌স্ পিকচার্ড এনসাইক্লোপিডিয়া এণ্ড ফ্যাকট ইনডেক্স, ১৫ খণ্ড। ( শিশুদের উপযোগী )।

(১১) ওআর্লড্ বুক এনসাইক্লোপিডিয়া, ২০ খণ্ড ( ফিল্ড এণ্টারপ্রাইজ, শিকাগো ) ( শিশুদের কোষগ্রন্থ )।

(১২) অক্সফোর্ড জুনিয়র এনসাইক্লোপিডিয়া, ১৩ খণ্ড।

(১৩) বুক অফ নলেজ, ২০ খণ্ড ( শিশুদের কোষগ্রন্থ )।

(১৪) এভ্রিমেনস্ এনসাইক্লোপিডিয়া, ১২ খণ্ড।

(১৫) অষ্ট্রেলিয়ান এনসাইক্লোপিডিয়া, ১০ খণ্ড।

কয়েকটি সংক্ষিপ্ত এক খণ্ডে প্রকাশিত কোষ গ্রন্থের নাম করা যায় :—

(১৬) কলম্বিয়া এনসাইক্লোপিডিয়া ( ইংরাজি )।

(১৭) পিয়ার্স সাইক্লোপিডিয়া ( ইংরাজি )।

(১৮) ছোটদের বুক অফ নলেজ—দেব সাহিত্য কুটির।

## (২য়) বিশেষ বিষয়ের কোষগ্রন্থ :

বাংলা ভাষায় বিশেষ বিষয় সংক্রান্ত অভিধান যদিবা কিছু আছে, কোষ-গ্রন্থের অভাব দেখা যায়। তবু কিছু বইএর নাম করা অযৌক্তিক হবেনা। যেমন, —

(১) জীবনী কোষ, ২ খণ্ড, —শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার।

(২) বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক, ৩ খণ্ড—শিবরতন মিত্র।

(৩) ভারতীয় সংগীত কোষ—বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী।

এই সূত্রে কিছু বলবার আছে। বাংলাতে কোষ এবং অভিধান—এ দু'টি নামের হয়ত সুস্পষ্ট ভাবে পৃথক অর্থ জ্ঞাপক ব্যবহার করা হয়নি। এমন বলা যেতে পারে যে শব্দকোষ ও বিষয় কোষ এই দুটিরই অভিধান-অর্থে ব্যবহার হয়েছে। আবার এ কথাও ঠিক যে উপস্থাপনার যে বৈশিষ্ট্যে অভিধান কোষ হয়ে ওঠে অথবা কোষও অভিধানের পর্যায়ে পড়ে সে সম্পর্কেও সুস্পষ্ট চেতনা রচয়িতাদের থাকেনি বা প্রকাশ করেননি। পূর্বোক্ত পর্যায়ে, অর্থাৎ 'অভিধান' পর্যালোচনার সূত্রে নিম্নোক্ত যে তিনটি বইএর নাম করা হয়েছে সেগুলি কোষ পর্যায়ভুক্ত ক'রে নিচে গ্রথিত করা যাচ্ছে :—

(৪) পৌরাণিক অভিধান—সুধীর চন্দ্র সরকার।

(৫) রবীন্দ্র অভিধান—সোমেন্দ্রনাথ বসু।

৬) বিজ্ঞান ভারতী—দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

এই পর্যায় ভুক্তির কারণ হিসেবে বলা যায়, অভিধান সাধারণত শব্দের বা নামের অর্থ ও পরিচয়টুকুই দেয়, তার অতিরিক্ত আলোচনা অভিধানের এক্তিয়ারভুক্ত নয়। এই বিচারে 'পৌরানিক অভিধান' যেভাবে পুরাণ থেকে আহৃত বিষয়ের বিস্তৃত পরিচয় ও ব্যাখ্যা দিয়েছে তা'তে এটির নাম 'অভিধান' হলেও 'কোষ' বলাই হয়ত সঙ্গত। 'বিজ্ঞান ভারতী' সম্পর্কেও ঐ একই কথা খাটে, —যদিও ব্যাখ্যার অংশ সংক্ষিপ্ত। 'রবীন্দ্র অভিধান' যে ভাবে প্রতিটি শব্দ ও কথার ঐতিহাসিক সূত্র ও ব্যবহার বিশ্লেষণ করেছে তা'তে এটিকে রবীন্দ্র-কোষ হিসেবে মর্যাদা না দেবার কোনো কারণ দেখিনা। অপরপক্ষে, 'রবীন্দ্র রচনা কোষ' নামক গ্রন্থটি উপস্থাপনায় অভিধানেরই সগোত্র।

ইংরাজি ভাষার বিশিষ্ট কিছু বিষয় কোষ গ্রন্থের নাম নিচে দেওয়া হল :-

৭) এনসাইক্লোপিডিয়া অফ রিলিজিয়ন এণ্ড এথিক্স্, ১৩ খণ্ড, —সম্পাদনায় জেম্স্ হেস্টিংস ও অন্যান্য।

৮) এনসাইক্লোপিডিয়া অফ সোশ্যাল্ সায়েন্সেস্, ১৫ খণ্ড, —সম্পাদনায় ই. আর. এ. সেলিগমান ও অন্যান্য।

৯) সাইক্লোপিডিয়া অফ এডুকেশন, ৫ খণ্ড, —সম্পাদনায় পল মনরো, নিউয়র্ক।

১০) বুক অফ পপুলার সায়েন্স, ১০ খণ্ড, —গ্রোলিয়ার।

১১ এনসাইক্লোপিডিয়া অফ সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজি, ১৫ খণ্ড+২ খণ্ড পরিশিষ্ট, —ম্যাকগ্র-হিল।

১২) এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ওআর্ল্ড্ আর্ট, ১৫ খণ্ড, —ম্যাকগ্র-হিল।

১৩) ইন্টারনেশনাল সাইক্লোপিডিয়া অফ মিউজিক এণ্ড মিউজিশিয়ান্স —সম্পাদনায় অস্কার টম্পসন।

১৪) এনসাইক্লোপিডিয়া অফ জেনারেল অ্যাক্ট্স্ এণ্ড কোড্স্, ১৪ খণ্ড+পরিশিষ্ট—তেজ বাহাদুর সপ্রু।

১৫) এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ওআর্ল্ড্ লিটারেচার—শিপলি।

১৬) এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ওআর্ল্ড্ হিস্টরি—ল্যাঙ্গার।

১৭) হিন্দু ওআর্লড্, ২ খণ্ড, —বেঞ্জামিন ও আকার।

১৮) এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ইসলাম, ৪ খণ্ড—সম্পাদনায় হোৎসমা ও অন্যান্য,

১৯) ল্যাণ্ডস্ এণ্ড পিপল্. ৭ খণ্ড, —গ্রোলিয়ার।

২০) নিউ এনসাইক্লোপিডিয়া অফ স্পোর্টস্—এফ. জি. মেন্‌কে।

২১) এনসাইক্লোপিডিয়া অফ লাইব্রেরিয়ানশিপ—টি. ল্যান্‌ডৌ।

২২) এনসাইক্লোপিডিয়া অফ লাইব্রেরী এণ্ড ইনফর্মেশন সায়েন্স. —সম্পাদনায় আলান কেন্ট এবং হেরল্‌ড্ ল্যাংকার (এ যাবত চারটি খণ্ড প্রকাশিত)।

২৩) কনসাইজ এনসাইক্লোপিডিয়া অফ লিভিং ফেথ্‌স্—আর. সি. জাইনার।

হিন্দি ভাষায় সংগীত সম্পর্কে ছয় খণ্ডের নিম্নোক্ত সংগীত কোষ উল্লেখযোগ্য। :—

২৪) হিন্দুস্থানী সংগীতকি এনসাইক্লোপিডিয়া. ৬ খণ্ড.—ফিরোজ ফ্রামজি।

ইংরাজি ভাষার আরেকটি উল্লেখনীয় সংগীত কোষ হল—

২৫) ওআর্লড্ অফ মিউজিক, ২ খণ্ড—কে. বি. সাণ্ডবেড।

৩। মানচিত্র।

জ্ঞানের সকল শাখার পক্ষেই মানচিত্রের প্রয়োজন। কখনো নানাবিধ অঙ্কনে, নক্সায় বা বিবিধ ছকে ও তালিকায় এর রকমফের। ভূগোল, ইতিহাস, ভূবিদ্যা, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি সব বিষয়ের মানচিত্র অপরিহার্য। এমনকি ভ্রাম্যমানের জন্যও সড়ক মানচিত্র। শহর মানচিত্র ইত্যাদির দরকার।

মানচিত্র দুই ধরণের, দেয়াল মানচিত্র এবং মানচিত্রাবলী গ্রন্থ। বিষয় বিশেষের জন্য মানচিত্র পৃথক হয়ে থাকে। ভূপরিচিতির জন্য একরকম, ভূবিদ্যা বা অর্থনীতির প্রয়োজনে এক রকম, ঐতিহাসিক বা রাজনৈতিক প্রয়োজনে স্বতন্ত্র ধরণের। আবার প্রাচীন ইতিহাস অথবা বৈজ্ঞানিক তথ্যের মানচিত্রের প্রকার আলাদা। প্রত্যেক বিষয়েরই সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ তথ্য এবং পরিসংখ্যান মানচিত্রে থাকে। মানচিত্রাবলী নির্বাচনে কয়েকটি দিক বিচার করে দেখতে হয়। ক) পরিধি ; —এলাকা বিস্তৃত না কি সীমায়িত, অর্থাৎ রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থ-নৈতিক, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক প্রভৃতির স্বতন্ত্র মানচিত্র অথবা একীভূত মানচিত্র। খ) যে দেশ থেকে প্রকাশিত সে দেশের প্রতি ঝোঁক বেশি দিয়ে অন্যান্য দেশ সম্পর্কে পরিমিত কিনা। গ) প্রকাশকাল,

—অর্থাৎ সাম্প্রতিকতার বিচার। ঘ) প্রকাশক ও গ্রন্থস্বত্ব, —এতে মানচিত্র গ্রন্থের মান এবং নির্ভর যোগ্যতা সম্পর্কে ধারণা হয়। ঙ) নির্দেশিকা ও সূচীপদ্ধতি, —প্রতি দেশের জন্য স্বতন্ত্র সূচী, অথবা একীভূত সূচী। চ) জন-সংখ্যা ও অন্যান্য তথ্য আছে কিনা। ছ) স্থান-নামের উচ্চারণ নির্দেশ করা হয়েছে কিনা। জ) দ্রাঘিমা লঘিমা নির্দেশিত কিনা।

দেয়াল মানচিত্র নির্বাচনে নামধাম প্রকাশক ইত্যাদি ছাড়াও দেখে নিতে হয়, ক] প্রকাশকাল ও সংস্করণ, খ] অনুপাতিক মাপ নির্দেশ ; গ] প্রকার, অর্থাৎ ভাষা, এবং আকার, অর্থাৎ গোটানো, ভাঁজ-করা অথবা পাত, প্রভৃতি ব্যবহারিক দিক ; ঘ] রঙ,—প্রতি দেশের বিভিন্নতা নির্দেশক বিভিন্ন রং আছে কিনা এবং সে রং পাকা কিনা ; ঙ] মানচিত্রাঙ্কন প্রথা, —মাপজোকের পারম্পর্য ; ইত্যাদি।

ইংরাজি ভাষায় উল্লেখযোগ্য মানচিত্র গ্রন্থ :—

১] রাণ্ড মেকনেলি-কৃত 'ওআর্লড্ এটলাস এণ্ড গেজেটিয়ার'।

২] জে. জি. বর্থলোমিউ-কৃত 'সিটিজেন্স্ এটলাস অফ দি ওআর্লড্'।

৩] হ্যামণ্ড-কৃত 'মেডালিয়ন ওআর্লড্ এটলাস'।

৪] কলিয়ের-কৃত 'ওআর্লড্ এটলাস এণ্ড গেজেটিয়ার'।

৫] রীডার্স ডাইজেস্ট গ্রেট ওআর্লড্ এটলাস।

বিশেষ বিষয়ের মানচিত্র গ্রন্থ হিসেবে উল্লেখযোগ্য :—

৬] রাণ্ড মেকনেলি-কৃত 'এটলাস অফ ওআর্লড্ হিস্টরি'।

৭] শেফার্ড-কৃত 'হিস্টরিকাল এটলাস'।

৮] মুর-কৃত 'এটলাস অফ এনশেণ্ট এণ্ড ক্লাসিকাল হিস্টারি' এবং হিস্টরিকাল এটলাস : এনশেণ্ট, মিডিয়াভেল এণ্ড মডার্ণ'।

৯] সেলমান কৃত 'এন আউটলাইন এটলাস অফ ইস্টার্ণ হিস্টরি'।

ভারতে প্রকাশিত মানচিত্রাবলীর মধ্যে নাম করা যায়—

১০] ইণ্ডিয়া ইন ম্যাপ্স্—ভারত সরকার।

১১] ভারত রাষ্ট্রীয় এটলাস—এস্. পি. চট্টোপাধ্যায়।

১২] নেশনাল এটলাস অফ ইণ্ডিয়া—ভারত সরকার।

১৩] গ্রীন-কৃত, ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত 'ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক মানচিত্রাবলী' (বাংলা ভাষায়)।

এছাড়া জরীপ বিভাগ, ভূতত্ত্ব বিভাগ, নৃতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত

বিশেষ মানচিত্রাবলী অবশ্যই উল্লেখনীয়। বাংলা ভাষায় চণ্ডীচরণ দাস—কৃত কিছু মানচিত্রাবলী আছে। আর আছে অক্সফোর্ড প্রকাশিত বিবিধ মানচিত্রাবলী। সাধারণত বিদ্যালয়ের শিক্ষার কাজেই এগুলির ব্যবহার।

৪। ভৌগোলিক নির্দেশিকা (বা গেজেটিয়ার)

ভৌগোলিক নির্দেশিকা বা অভিধান পৃথিবীর অথবা দেশ বিশেষের শহরাদি, নদনদী, হ্রদ, পাহাড়পর্বত প্রভৃতির অবস্থানগত নির্দেশ এবং ক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়। কোনো স্থান সম্পর্কে তথ্য পেতে হলে এটি খুবই সাহায্য করে। এতে কেবলমাত্র ভৌগোলিক সমাচারই থাকে না। স্থানটিকে কেন্দ্র ক'রে তা'র ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, ব্যবসা-বাণিজ্যিক এবং নানাবিধ প্রয়োজনীয় তথ্য ও বিবৃতি থাকে। ভৌগোলিক নির্দেশিকা পুরোনো হলেও তা'র মূল্য কমে না। কেননা বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্রিক পরিবর্তনের ধারা, জনসংখ্যা প্রভৃতির পরিসংখ্যান বিশ্লেষণের কাজে লাগে। দেশের ভৌগোলিক অবস্থান এক থাকলেও তা'র আয়তনে পরিবর্তন ঘটতে পারে,—কেননা রাষ্ট্রনীতির নানান ওঠা নামা ভাঙ্গাগড়ায় নূতন পদ্ধতির জন্ম হয়, পুরোনো দেশ নূতন নাম নেয়, নূতন ক'রে ভাগ হয়। নূতন ইতিহাসের সূচনা হয়। শিল্প সংস্থা এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটে। এ জন্য ইতিহাস চর্চায় পুরুনো নির্দেশিকাও কাজে লাগে। নির্দেশিকা নির্বাচনে এর পরিধি ও বিন্যাস পদ্ধতি দেখে নিতে হয়। বর্ণানুক্রমিক ভাবে সজ্জিত কিনা। দেশগত ভাষা কী ভাবে সূচীকৃত হয়েছে, কোন কোন ধরণের তথ্য এতে লিপিবদ্ধ হয়েছে, ইত্যাদি।

কয়েকটি বিশিষ্ট ভৌগোলিক অভিধানের নাম নিচে দেওয়া হল।

(ক) আন্তর্জাতিক :

(১) চেম্বারসেজ্ ওআর্ল্ড্ গেজেটিয়ার এণ্ড জিওগ্রাফিকেল ডিকশনারি।

(২) কলম্বিয়া লিপিংকট গেজেটিয়ার অফ দি ওয়ার্ল্ড্, পরিশিষ্ট খণ্ডসহ।

(৩) লিপিংকট্স্ নিউ গেজেটিয়ার।

(৪) দি ম্যাকমিলান্স্ ওআর্ল্ড্ গেজেটিয়ার।

(খ) স্থানিক

(১) ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অফ ইণ্ডিয়া ২৬ খণ্ড।

(২) নব জ্ঞান-ভারতী—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

(৩) বাঁকুড়া পরিক্রমা—অনুকূল চন্দ্র সেন।

এছাড়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সরকারী প্রকাশনে বিভিন্ন জিলা বিবরনী ( District Handbooks ), জনসংখ্যান বিভাগের বিবরনী ( Census of India Handbooks ), ইত্যাদি। পূর্ববর্তী পর্যায়ে আলোচিত মানচিত্রাবলী এবং ভৌগোলিক অভিধান পরস্পরের সহায়ক এবং সম্পূরক বলা চলে।

৫। বর্ষপঞ্জী, বার্ষিকী ( Year books, Annuals )

বর্ষপঞ্জীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও চেহারা আছে। সারা বছরে যে সব ঘটনা ঘটে মূলত সেগুলিরই সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকে বর্ষপঞ্জীতে। এ ছাড়াও স্থায়ী মূল্যের তথ্যাবলীও বর্ষপঞ্জীতে পাওয়া যায়। কেবলমাত্র প্রতিবছরে প্রকাশিত হবার গৌরব নিয়েই সব গ্রন্থ তথ্যসহায়ক প্রকল্পের পরিপ্রেক্ষিতে হয়ে ওঠেনা। সংবাদ পরিবেষণের ধরণই প্রধান ভিত্তি। কোনও চলতি প্রশ্নের সমাধানে জিজ্ঞাসায়, গ্রন্থাগারিক প্রথমেই বর্ষপঞ্জীর সাহায্য নেন। বর্ষপঞ্জী নানা প্রকারের। দেশবিদেশের রাজনীতিতে যে সব ঘটনা ঘটে, যেসব বিষয় নিয়ে ইতিহাস তৈরি হয়। তা'র ধারাবিবরণী অথবা সংক্ষিপ্ত সংকলন নিয়ে এক শ্রেণীর বার্ষিকী প্রস্তুত হয়। আবার খুবই সংক্ষিপ্তভাবে যাবতীয় ঘটনা বা বিশেষ বিশেষ খবর নিয়ে। এবং ঐ সঙ্গে 'কে ও কী' জাতীয় তথ্য ও বিশিষ্ট মানুষের পরিচিতি নিয়ে ( Who's Who ) এক ধরণের সাধাপণ বর্ষপঞ্জী প্রস্তুত হয়। কতকগুলির মূল্য চিরকাল বা বহুকাল বজায় থাকে, কতকগুলি বছর ঘুরতেই পুরানো হয়ে যায়।. সুতরাং বর্ষপঞ্জী নির্বাচনে আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন এবং বিষয় বিন্যাসের পরিকল্পনা ও ধরণ বিচার করে দেখতে হয়।

বিভিন্ন শ্রেণীর কতকগুলি বর্ষপঞ্জীর তালিকা নিচে লিপিবদ্ধ হল :—

(ক) সাধারণ শ্রেণীয় .

(১) এন্যুয়েল রেজিস্টার অফ ওআর্ল্ড্ ইভেন্ট্স্ ; ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বিশ্বসংবাদ সম্পর্কিত প্রকাশন, ১ম খণ্ডের প্রকাশকাল ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দ।

(২) ইয়োরোপা ইয়ার বুক ; ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ২য় খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। ১৯৬০ থেকে বিন্যাসক্রম—১ম খণ্ডে ইয়োরোপ, ২ খণ্ডে আফ্রিকা, আমেরিকাদ্বয়, এশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া।

(৩) নিউ ইন্টার নেশনেল ইয়ার বুক ; ১৯৩২ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রকাশ স্থান নিউয়র্ক।

(৪) লুইটেকার্স এলমেনাক ; ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রকাশিত। গ্রেট ব্রিটেন

সংক্রান্ত সংবাদ ও পরিসংখ্যান বিষয়ক।

৫] স্টেট্‌স্‌ম্যান্‌স্‌ ইয়ার বুক ; ১৮৬৪ থেকে প্রকাশিত। সারা পৃথিবীর ইনিহাস ও পরিসংখ্যান সংবলিত বিবিধ সংবাদ থাকে।

৬] ইয়ার বুক অফ দি ইউনাইটেড নেশন্‌স্‌ ; ১৯৪৬-৪৭ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে।

(খ) দেশ ভিত্তিক, সংস্থা ভিত্তিক—

৭] ইয়ারবুক অফ হিউমেন রাইট্‌স।

৮] ইণ্ডিয়া : এ রেফারেন্স এনুয়েল ; ভারত সরকার কর্তৃক ১৯৫৩ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে।

৯] রাইটার্স এণ্ড আর্টিস্টস্‌ ইয়ার বুক ; ১৯০৬ থেকে লণ্ডনস্থ প্রকাশন। শিল্পী, লেখক, অভিনেতা প্রভৃতির প্রয়োজনীয় তথ্য ভিত্তিক।

১০] হিন্দুস্থান ইয়ার বুক এণ্ড হু'জ হু ; কলকাতা থেকে প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশ ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে।

১১] ডেইলি মেল ইয়ার বুক ; লণ্ডন থেকে প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত জীবনী অধ্যায় সংবলিত। প্রথম প্রকাশ ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ।

১২] বর্ষপঞ্জী ; সন্তোষ রঞ্জন সেনগুপ্ত সং ; ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ থেকে প্রতি বছর প্রকাশিত হচ্ছে।

## ৬। ঘটনা পঞ্জী ও বিবিধ বার্ষিক পরিসংখ্যান :

বর্ষপঞ্জী গুলির থেকে ঘটনা পঞ্জী ও পরিসংখ্যান গ্রন্থগুলিকে সম্পূর্ণ ভাবে পৃথক ক'রে দেখা কঠিন। এদের প্রকাশও সাধারণত বার্ষিক পর্যায়ে। কিছু পরিসংখ্যান অন্যবিধ কালক্রম অনুযায়ী প্রকাশ পায়। সংবাদপত্র জাতীয় কিছু প্রকাশন আছে যে গুলিতে ঘটনাবলী সংক্ষিপ্ত ভাবে গ্রথিত হয়। এবং বর্ষ-পঞ্জীতেও একই ভাবে ঘটনার বিবরণ এবং পরিসংখ্যান সংক্ষেপেসংকলিত হয়।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা পঞ্জী ও পরিসংখ্যানের পরিচয় নিচে দেওয়া হল। :—

১] কীসিংস্‌ কনটেম্পোরারি আর্কাইভ্‌স্‌ ; সাপ্তাহিক সংবাদ চয়ন, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রকাশ স্থল ব্রিস্টল। সাপ্তাহিক সূচী ছাড়াও প্রতি পক্ষে সূচী সংকলিত হয়। এবং এই সূচী প্রতি তিন মাস অন্তরে একবার ক'রে সম্পূর্ণ ভাবে সংকলিত হয়।

বৎসরান্তে পুরা বছরের সূচী নির্দেশ থাকে স্বতন্ত্র ভাবে। তিন বছরে একটি খণ্ডের সমাপ্তি।

২] ফ্যাক্টস্ অন ফাইল; বিশ্ব সংবাদের সাপ্তাহিক সংকলন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রকাশ স্থান নিউয়র্ক। বিষয় শিরোনামা-ক্রমে তারিখ অনুসারে সংবাদ সংকলিত হয়। তিন মাস অন্তর সূচীসার সংকলিত হয় এবং বর্ষশেষে পুরা সূচীসার দেওয়া হয়।

৩] এশিয়ান রেকর্ডার; সূচী নির্দেশ সহ এশীয় ভূখণ্ডের সাপ্তাহিক ঘটনা-পঞ্জী। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। প্রকাশ স্থান দিল্লি, প্রকাশ সংস্থা শঙ্করন। ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সূচীসার সংকলন থাকে এবং তিন বৎসরে এক খণ্ডের সমাপ্তি।

৪] স্টেটিস্‌টিকাল ইয়ার বুক; ইউনাইটেড নেশনস্ কর্তৃক ১৯৪৯ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে।

৫] স্টেটিস্‌টিকাল এবষ্ট্রাক্ট অফ দি ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন। প্রতি বৎসর প্রায় নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত এই গ্রন্থে ভারতবর্ষের যাবতীয় তথ্যসার থাকে।

## ৭। নির্দেশ পঞ্জী ( Directory)

নির্দেশ পঞ্জীর বিশিষ্ট চরিত্র নির্ণয়ে বিচার্য এর মধ্যে কোন ধরণের সংবাদ সংকলিত হয়েছে। সাধারণত এই গ্রন্থে কোনো দেশ, প্রদেশ এবং শহরের বিশিষ্ট সংস্থা বা ব্যক্তির নাম ঠিকানা ও বৃত্তান্ত নির্দেশিত হয়। শহরের সড়ক সংস্থান, বিশেষ বিশেষ ভবন ও প্রতিষ্ঠানের সন্ধানও এতে মেলে। আর থাকে ব্যবসায় ও বাণিজ্য বিভাগ, যার থেকে বিভিন্ন সামগ্রীর উৎপাদন ও প্রাপ্তি সংবাদও মেলে। বিশেষ বিষয় বা বিভাগেরও নির্দেশ পঞ্জী থাকে—যা সাধারণ লোকের কাজে লাগে, যেমন ডাক ও তার বিভাগ। দূরবার্তা ( Telephone ) বিভাগ, ইত্যাদি।

নির্দেশ পঞ্জীর প্রকাশনের অনিয়মিততা লক্ষনীয় ব্যাপার। কিছু যদি বা বছরে একটি বা দু'বছরে একটি প্রকাশিত হয়, অন্যগুলির প্রকাশের কোনো নির্দিষ্ট ক্রম সচরাচর থাকে না। তবে প্রকাশের উদ্দেশ্য বজায় থাকে ঠিকই। আরেকটা বিষয় দ্রষ্টব্য, শিল্প বাণিজ্যের অংশই এই জাতীয় পঞ্জীতে প্রধান স্থান অধিকার করে, অন্যান্য পরিচিতির স্থান দ্বিতীয় সারিতে। তার একটা কারণ হয়ত এই যে ব্যবসায়িক দিকটাই প্রকাশকরা বেশী প্রকট করতে চান

ব্যবসায়ের আনুকূল্যের জন্য।

বিশেষ কয়েকটি নির্দেশপঞ্জীর পরিচয় দেওয়া হ'ল। :—

১) ট্রেড ডাইরেক্টরিজ অফ দি ওআর্লড্; অলংগ্ন পত্রকের বার্ষিক সংকলন, বিভিন্ন নির্দেশ পঞ্জীর পরিচয় জ্ঞাপক।

২) কেলীজ (kelly's) ডাইরেক্টরি অফ মার্চেণ্ট্স, ম্যানুফেকচারার্স্ এণ্ড শিপার্স, ২ খণ্ড; লণ্ডন থেকে প্রতি বছরে প্রকাশিত এই নির্দেশ পঞ্জী সারা পৃথিবীর শিল্প ও বাণিজ্য সংবাদ লিপিবদ্ধ করে।

৩) থ্যাকার্স্ (Thacker's) ইণ্ডিয়ান ডাইরেক্টরি এণ্ড দি ওআর্লড্ ট্রেড; কলকাতা থেকে প্রকাশিত এই নির্দেশ পঞ্জীতে ভারত ও রাজ্য সরকার, শিল্প বাণিজ্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিবিধ সংস্থা প্রভৃতির বিবরণ থাকে। বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত ভাবে সংবাদ বিন্যস্ত। /

৪) টাইম্স্ অফ ইণ্ডিয়া ডাইরেক্টরি এণ্ড ইয়ার বুক; ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রকাশিত বোম্বাই এর এই নির্দেশ পঞ্জীতে (পূর্বে 'ইণ্ডিয়া ইয়ার বুক এণ্ড হু'জ হু' নামে প্রকাশিত) ভারতের, ভারতীয় সরকারের, শিল্প বাণিজ্যাদির যাবতীয় পরিসংখ্যান ও তথ্য থাকে।

৫) ডাইরেক্টরি অফ ইনস্টিটুশন্স্ ফর হায়ার এডুকেশন; ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রক থেকে প্রকাশিত এই পঞ্জীতে যাবতীয় বিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকল্পের বিবরণ থাকে। বিভিন্ন বিভাগে ভাগা ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষ এবং উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণা সংস্থা, প্রভৃতির শিক্ষাক্রমের পরিচয় বিন্যস্ত।

৬) ডাইরেক্টরি অফ বুকসেলার্স, পাবলিশার্স, লাইব্রেরিজ এণ্ড লাইব্রেরিয়ান্স্ ইন ইণ্ডিয়া (হু'জ হু); প্রিমিয়ার পাবলিশার্স, নয়াদিল্লী।

## ৮। গ্রন্থপঞ্জী

গ্রন্থপঞ্জীর রকমারি ধরণ সম্পর্কে ইতিপূর্বে গ্রন্থবিদ্যা অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে বিবিধ গ্রন্থপঞ্জীর কথা বলা যাবে। সহজ অর্থে গ্রন্থপঞ্জী হল বিশেষ লেখক বা দেশ বিশেষের গ্রন্থ তালিকা, অথবা সাহিত্য বা বিষয়গত গ্রন্থ তালিকা। তথ্য সংগ্রহের সহায়ক হিসেবে গ্রন্থপঞ্জী কোনো বিষয় বা লেখক সম্পর্কে সন্ধান দেয়, বইটির বিবিধ আভ্যন্তরীন বিন্যাস যাচাই করবার কাজে লাগে, টীকা প্রভৃতির সহযোগে বিষয়ের মূল্যায়নে সহায়তা করে, সূচীপত্রকে গ্রথিত করা যায় না এমন অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ করে এবং বিষয়, বিন্যাস, কাল, অবস্থান প্রভৃতিকে সূত্রবদ্ধ আকারে উপস্থিত

করে।

গ্রন্থ পঞ্জীর উৎকর্ষ নির্ণয়ে বিচার্য, ১) সংকলন, —অর্থাৎ সংকলন কর্তা বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ও নির্ভর যোগ্য কিনা ; ২) পরিধি বা এলাকা, —উপস্থাপনা বিস্তারিত কিনা অথবা সীমাবদ্ধ, ভাষাগত ভাগ আছে কিনা, পর্যালোচনা বিশেষ স্থানের গ্রন্থ সংক্রান্ত অথবা সর্বদেশীয় কিনা ; ৩) বিন্যাস, —অর্থাৎ বিন্যাসের ধারা বিষয়ানুক্রমিক, বর্ণানুক্রমিক, কালানুক্রমিক প্রভৃতি কোন পদ্ধতির ; ৪) বিবরণ সন্নিবেশ সংক্ষিপ্ত অথবা সম্পূর্ণ কিনা ; ৫) টীকা আছে কিনা, থাকলে পুঙ্খানুপুঙ্খ কিনা ; ৬) প্রাপ্তিস্থান সম্পর্কে নির্দেশ আছে কিনা, ৭) মূল্য উল্লিখিত হয়েছে কিনা।

বিবিধ বিষয়ের এবং বিবিধ ধরণের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থপঞ্জীর নাম নিচে দেওয়া হ'ল। :—

ক) জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী ; বিশেষ দেশে প্রকাশিত অথবা কোনো বিশেষ দেশ সংক্রান্ত সার্ব-বৈষয়িক গ্রন্থপঞ্জী :—

১) ব্রিটিশ নেশনেল বিব্লিওগ্রাফি ( বি, এন, বি ), ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রকাশিত।

২) ইণ্ডিয়ান নেশনেল বিব্লিওগ্রাফি ( আই, এন্, বি ), ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রকাশিত।

৩) বিবলিওগ্রাফি দ' ল' ফ্রাঁস, ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রকাশিত।

খ) সাধারণ গ্রন্থপঞ্জী ; সার্বদেশিক, সার্ব-বৈষয়িক :—

৪) বিবলিওতেকা ব্রিটানিকা—রবার্ট ওআট-কৃত, ৪ খণ্ড, ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ। ব্রিটিশ ও বিদেশী পুস্তকের পঞ্জী।

৫) সাবজেক্ট লিস্ট অফ বুক্স্ পাবলিশড্ বিফোর এইটিন এইট্টি—আর, এ, পেডি-কৃত।

৬) ইনডেক্স ট্রানস্লেটিও নাম। ইউনেস্কো প্রকাশিত এই ধারাবাহিক গ্রন্থপঞ্জী প্রথমে প্যারিসের ইন্টারনেশনেল ইনস্টিটিউট অফ ইনটেলেকচুআল কো-অপারেশন কর্তৃক ১৯৩২ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। ইউনেস্কো থেকে নবপর্যায়ে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে—বার্ষিক খণ্ড হিসাবে। পৃথিবীর যাবতীয় ভাষার যাবতীয় অনুবাদ গ্রন্থের পঞ্জী। বিন্যাস প্রথমে দেশওয়ারি এবং পরে বিষয় অনুযায়ী।

গ) বাণিজ্যিক গ্রন্থপঞ্জী ; পুস্তক ব্যবসায় সংক্রান্ত গ্রন্থপঞ্জী। এতে পুস্তকের

লেখকের ও প্রকাশকের নাম ধাম এবং মূল্যের উল্লেখ থাকে। সাধারণ পুস্তক বিক্রেতার বিক্রয় তালিকাকে এ পর্যায়ে ফেলা যায় না, বিজ্ঞাপনের পর্যায়ে পড়ে। :—

(৭) হুইটেকার্স কিউমুলেটিভ বুক লিস্ট, ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হচ্ছে।

(৮) কিউমুলেটিভ বুক ইনডেক্স, —উইলসন কোং, নিউইয়র্ক, থেকে প্রকাশিত। ১৮৯৮ থেকে কেবলমাত্র আমেরিকাতে প্রকাশিত পুস্তকের এবং ১৯৩০ থেকে ইংরাজি ভাষায় প্রকাশিত যাবতীয় পুস্তকের তালিকা।

(৯) বুক্স্ ইন প্রিন্ট. — নিউয়র্ক, ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে।

(১০) ইম্পেক্স্ ক্যাটালগ ( IMPEX ), — ভারতে প্রকাশিত ইংরেজি ভাষার পুস্তক তালিকা ; নয়াদিল্লির ইণ্ডিয়ান বুক এক্সপোর্ট এণ্ড ইম্পোর্ট কোম্পানি থেকে প্রকাশিত।

ঘ। নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী, বিষয় গ্রন্থপঞ্জী : —

(১১) সোনেনশি ( Sonnenschein )— কৃত বেস্ট বুক্স্, ৬ খণ্ড। প্রকাশস্থল লণ্ডন।

(১২) আশা ডন ডিকিন্‌শন্ — কৃত ওআর্ল্ড্‌স্ বেস্ট বুক্স্। প্রকাশস্থল নিউয়র্ক।

(১৩) কেম্ব্রিজ বিব্‌লিওগ্রাফি অফ ইংলিশ লিটারেচার, ৬০০ — ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ, ৫ খণ্ড। পরিশিষ্ট।

(১৪) ইন্টার নেশনেল বিবলিওগ্রাফি অফ পলিটিকাল সায়েন্স, ৮ খণ্ড। ইউনেসকো।

(১৫) ইন্টারনেশনেল বিবলিওগ্রাফি অফ সোশিওলজি, ৯ খণ্ড। ইউনেসকো।

(১৬) ইন্টারনেশনেল বিবলিওগ্রাফি অফ ইকনমিক্স্, ৮ খণ্ড। ইউনেসকো।

(১৭) এ বিবলিওগ্রাফি অফ মডার্ন হিষ্টরি — সং-জন রোচ। কেমব্রিজ।

(১৮) বিবলিওগ্রাফি অফ ইনডোলজি, ১ম খণ্ড—ইণ্ডিয়ান এন্‌থ্রোপলজি কলকাতা, জাতীয় গ্রন্থাগার।

(১৯) ইন্টারনেশনেল ক্যাটালগ অফ সায়েন্টিফিক লিটারেচার, ১৪ খণ্ড। লণ্ডন, রয়াল সোসাইটি।

২০) এনুয়াল বিবলিওগ্রাফি অফ ইংলিশ লেংগুএজ এণ্ড লিটারেচার, ৪১ খণ্ড ( ১৯৬৮ )। কেমব্রিজ।

২১) গাইড টু রেফারেন্স বুক্‌স্, —সি. এম্. উইন্‌চেল। আমেরিকান লাইব্রেরি এসোসিয়েশন।

২২) এ ওয়ার্লড্ বিবলিওগ্রাফি অফ বিবলিওগ্রাফিজ—৫ খণ্ড, — থিও-ডোর বেস্টারমেন।

২৩) বিবলিওগ্রাফি অফ মহাত্মা গান্ধী, —জগদীশ শরণ শর্মা। নয়দিল্লী এস্. চাঁদ।

২৪) এনুএল বিবলিওগ্রাফি অফ ইণ্ডিয়ান হিস্টরি এণ্ড ইনডোলজি। বম্বে হিস্টরিকাল সোসাইটি।

২৫) গাইড টু রেফারেন্স বুক্‌স্, —আই. জি.মাজ। আমেরিকান লাইব্রেরি এসোসিয়েশন।

২৬) এ গাইড টু রেফারেন্স মেটিরিয়াল্‌স্ অন ইণ্ডিয়া, ২ খণ্ড। এন্. এন্. গিদোয়ানি ও কে. নবলানি সম্পাদিত। সরস্বতী পাবলিকেশন্‌স্, জয়পুর, ১৯৭৪। বিষয়ানুক্রমে সজ্জিত।

২৭) রবীন্দ্র রচনা পঞ্জী—প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়।

২৮) শিশু গ্রন্থপঞ্জী—বাণী বসু। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ।

২৯) নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থ তালিকা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ।

## ৯। গ্রন্থ তালিকা ( Catalogue )

বস্তুতপক্ষে গ্রন্থ তালিকা এবং গ্রন্থ পঞ্জীর মধ্যে বিশেষত তথ্যসহায়ক হিসেবে প্রচলিত এই জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কঠিন হয়ে পড়ে। গ্রন্থ তালিকা যদিও কোনো বিশেষ সংগ্রহের মধ্যে আবদ্ধ, এবং গ্রন্থপঞ্জীর তেমন সীমা নির্দিষ্ট নেই, তবুও উপস্থাপনা ও বিন্যাসে এ দুটি প্রায় কাছ ঘেঁষে যায়। গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুতিতে গ্রন্থতালিকা হয়ত সীমিত ভাবে কাজে লাগে, কিন্তু গ্রন্থ তালিকা প্রস্তুতিতে গ্রন্থ পঞ্জীর প্রয়োজন হয়না।

দুই শ্রেণীর গ্রন্থ তালিকা গবেষণার সহায়ক হিসেবে কাজে লাগে। গ্রন্থাগার বা বিশেষ গ্রন্থ সংগ্রহের তালিকা এবং ব্যবসায়িক গ্রন্থ তালিকা। ব্যবসায়িক গ্রন্থ তালিকা গ্রন্থ নির্বাচনের জন্য অবশ্যই ব্যবহৃত হয়।

এ দুই শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের পরিচয় নিচে দেওয়া হল। ;—

১) ব্রিটিশ মিউজিয়াম: জেনারেল ক্যাটালগ অফ প্রিণ্টেড বুক্‌স্।

১৮৮১ থেকে সুরু ক'রে ২৬৩ খণ্ডে প্রকাশিত।

২) লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস ক্যাটালগ। সংগ্রহস্থ সূচীপত্রক অনুসারে ১৯৪২ থেকে ১৯১ খণ্ডে প্রকাশিত। পরে ১৯৫৬ থেকে নেশনেল ইউনিয়ন ক্যাটালগ হিসেবে প্রকাশ পাচ্ছে।

৩) বিবলিওতেক নাশিওনেল ক্যাটালগ ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে চলছে।

৪) ক্যাটালগ অফ ইয়োরোপিয়ান প্রিন্টেড বুক্স্ ইন দি ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি। ৯ খণ্ড।

৫) এ ডেসক্রিপটিভ ক্যাটালগ অফ সংস্কৃত বেনাস্ক্রিপ্ট্স্ ইন তাঞ্জোর সরস্বতী মহল লাইব্রেরি; ২০ খণ্ড।

৬) ক্যাটালগ অফ আরবিক এণ্ড পার্শিয়াল মেনাস্ক্রিপ্ট্স্ ইন দি ওরিয়েণ্টাল পাবলিক লাইব্রেরি, বাঁকিপুর; ২৫ খণ্ড।

৭) ক্যাটালগ অফ কয়েন্স্ (coins) ইন দি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, কলকাতা; ৪ খণ্ড।

এছাড়াও এশিয়াটিক সোসাইটি সংগ্রহের, জাতীয় গ্রন্থাগারের, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির গ্রন্থতালিকা মুদ্রিত হয়েছে এককালে।

## ১০। সূচীগ্রন্থ Index

সাধারণভাবে সূচীনির্দেশের কাজ গ্রন্থাগারের সূচীপত্রক যেমন করে তেমনি আবার প্রত্যেকটি বই এর সঙ্গেও নির্দেশিকা বা অনুক্রমণিকা অংশ থাকে। কিন্তু গ্রন্থজগতে পঞ্জী আকারে নানান ধরণের সূচীগ্রন্থ প্রকাশিত হয় যেগুলি গ্রন্থাগারিকের যেমন কাজে লাগে তেমনি গবেষক-দের সমসাময়িক এবং সাম্প্রতিকতম প্রসঙ্গ নির্ণয়ে অপরিহার্য। এরকম তিন জাতীয় সূচীগ্রন্থের সাক্ষাৎ মেলে। (১) পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদির সূচী; (২) সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিষয়াবলীর সূচী; এবং (৩) সঞ্চয়ন বা সংকলন গ্রন্থে প্রকাশিত সামগ্রীর সূচী।

সূচীগ্রন্থ নির্বাচনে তাই গ্রন্থমধ্যস্থ প্রসঙ্গের বিচার ও মূল্যায়ন ক'রে দেখা দরকার, দরকার প্রবন্ধাদি কাল নির্ণয় ক'রে দেখা। অর্থাৎ, গ্রন্থাগার বিশেষের প্রয়োজনে ঠিক কোন ধরণের সূচীগ্রন্থ সংগ্রহ করলে কাজ হবে তা স্থির ক'রে নিতে হয়। কিনবার আগে প্রকাশের পর্ব এবং মূল্যও দেখতে হয়। পত্রিকাদির সূচীগ্রন্থে প্রাচীন আমলে প্রকাশিত তালিকাও থাকে, আবার হাল আমলের সংগ্রহও থাকে। পুরানো

সূচীগ্রন্থ থেকে মিলবে পূর্বতন প্রকাশন ও গবেষণাদির নিদর্শন, এবং নূতন সূচীগ্রন্থ সন্ধান দেবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিকতম অগ্রগতির। সূচীগ্রন্থ নির্দেশ দেয় কোন্ প্রবন্ধ কোন্ পত্রিকার কোন্ খণ্ডে বা কোন্ তারিখে কত পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে।

সংবাদপত্রের সূচী নির্দেশ অবশ্য বিরাট এবং জটিল ব্যাপার। তবে সংবাদ সূচী বা বিষয়সূচী যদি কোনো পত্রিকা সংস্থার তরফে তৈরী হয় তাহলে মোটামুটি ভাবে সব পত্রিকা সংক্রান্ত সূচী নির্দেশের কাজ চলে যায়। কেননা, সাধারণত একই রকমের খবর একই দিনে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়ে থাকে।

সঞ্চয়ন বা সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ সুপ্রাচীন পদ্ধতি। প্রতি ভাষায় প্রত্যেক বিষয়ে এক জাতীয় সংকলন গ্রন্থ প্রচুর প্রকাশিত হয়। কোনো পাঠকের পক্ষে প্রত্যেকটি সংকলন গ্রন্থ ঘেঁটে বিশেষ প্রবন্ধাংশ বা কাব্যাংশ বার করা প্রায় অসম্ভব। সেজন্য এজাতীয় সূচীগ্রন্থের প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

বিভিন্ন ধরণের কয়েকটি প্রয়োজনীয় সূচীগ্রন্থের উল্লেখ নিচে করা যাচ্ছে।

১) সাবজেক্ট ইনডেক্স টু পিরিঅডিকেল্স্; ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে লণ্ডন লাইব্রেরি এ্যাসোশিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত হয়ে আসছে।

২) রীডার্স গাইড টু পিরিঅডিকেল লিটারেচার; ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে নিউয়র্কের উইলসন কোম্পানি কর্তৃক প্রকাশিত হচ্ছে।

৩) পূল্স্ (Poole's) ইনডেক্স টু পিরিঅডিকেল লিটারেচার; ৬ খণ্ড; ১৮০২—১৯০৬ কালক্রমের মধ্যে প্রকাশিত পত্রিকা সমূহের বিষয়-সূচী।

৪) ইন্টারনেশনেল ইনডেক্স; সমাজবিজ্ঞান ও মানবিকবিদ্যা (প্রজ্ঞান) সংক্রান্ত পত্রিকার সূচী; নিউয়র্কের উইলসন কোম্পানি কর্তৃক ত্রৈমাসিক বার্ষিক ও দ্বিবার্ষিক সংকলন হিসেবে ১৯০৭ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। ১৯৬৫ থেকে এটির নাম পরিবর্তিত হয়ে 'সোশাল সায়েন্সেস এণ্ড হিউম্যানিটিস ইনডেক্স' নাম হয়েছে।

৫) লাইব্রেরি লিটারেচার; নিউয়র্কের উইলসন কোম্পানি কর্তৃক ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ত্রৈমাসিক, বার্ষিক এবং দ্বিবার্ষিক সংকলনে প্রকাশিত।

৬) ইন্‌স্‌ডক (INSDOC) লিস্ট অফ কারেন্ট সায়েন্টিফিক লিটারেচার; পাক্ষিক সংকলনে কিছুকাল প্রকাশের পর বন্ধ আছে।

ভারতে ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরি এসোসিয়েশন, এশিয়াটিক সোসাইটি, ইণ্ডিয়ান স্টেটিস্‌টিক্যাল ইনষ্টিটুট প্রভৃতি সংস্থা থেকে ইউনিয়ন ক্যাটালগ বা সংযুক্ত পত্রিকাসূচী বেরিয়েছে, যেমন, ইউনিয়ন ক্যাটালগ অফ লার্ণেড পিরিঅডিকাল পাবলিকেশন্‌স্‌ ইন সাউথ এশিয়া, ইউনিয়ন লিষ্ট অফ সায়েন্টিফিক পিরিঅডিকেল্‌স্‌ ইন ক্যালকাটা লাইব্রেরিজ, ইত্যাদি।

সঞ্চয়ন বা সংকলন সূচীগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য—

(১) গ্র্যাঙ্গার্‌স্‌ (Granger's) ইনডেক্স টু পোয়েট্রি এণ্ড রিসাইটেশান: কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে প্রকাশিত, পরিশিষ্ট সমেত। এতে শিরোনাম। প্রথম পংক্তি সূচী এবং বিষয়সূচী গ্রথিত।

(২) অক্সফোর্ড ডিকশনারি অফ কোটেশন্‌স্।

(৩) ফ্যামিলিআর কোটেশন্‌স্—জন বার্টলেট।

(৪) হোম বুক অফ প্রোভার্ব্‌স্, ম্যাক্সিম্‌স্ এণ্ড ফ্যামিলিআর ফ্রেজেস্‌—বার্টন স্টিভেনশন!

(৫) রবীন্দ্র সুভাষিত—বিনয়েন্দ্র নারায়ণ সিংহ।

(৬) রবীন্দ্র নির্দেশিকা—নির্মলেন্দু রায় চৌধুরী।

পূর্বে অভিধান পর্যায়ে নিম্নোক্ত যে দুটি বই-এর নাম করা হয়েছে সে দুটিকেও এই পর্যায়ভুক্ত করা করা চলে :—

(১) বাংলা প্রবাদ—সুশীল কুমার দে।

(২) প্রবাদ রত্নাকর—সত্যরঞ্জন সেন।

## (১১) সংক্ষিপ্তসার বা সার সংগ্রহ (Abstracts)

সার সংগ্রহ কোনো বই, পুস্তিকা অথবা পত্রিকার বিষয় বস্তু বা প্রবন্ধাদির সংক্ষিপ্ত ভাষ্যের সংকলন। এটিকে এক ধরণের গ্রন্থপঞ্জী বলা চলে, যার মধ্যে টীকা ও উল্লেখ সমেত সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়। ক্রমবর্ধমান সাময়িকী সম্ভারের পরিপ্রেক্ষিতে, বিশেষত বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি-বিদ্যার অগ্রগতির পটভূমিকায় এখন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে যে কেবলমাত্র বই বা পত্রিকার নাম অথবা প্রকাশিত প্রবন্ধের উল্লেখ বা তালিকা তৈরি ক'রেইদায়িত্ব শেষ হচ্ছে না। বিষয়বস্তুর চুম্বক বা প্রবন্ধ সার সংকলন

ক'রে দিতে পারলে গবেষকদের পক্ষে প্রকৃত উপকার হয়। সেজন্য, বিভিন্ন বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার কথা মনে রেখে নানাবিধ প্রবন্ধসার সংকলনের পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে বিভিন্ন সংস্থা থেকে। এগুলির নির্বাচনে বিচার ও বিবেচনা করে দেখতে হয় কে বা কাহারা এর সার সংকলয়িতা, কোন সংস্থা থেকে প্রকাশিত হচ্ছে, সংস্থা এবং সংকলয়িতারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য বা বিশেষজ্ঞ কিনা, দেশ বিশেষের প্রকাশিত প্রবন্ধে সীমাবদ্ধ না কি সার্বদেশিক, প্রবন্ধ শিরোনাম ও বিশেষ তথ্য মূল মূল ভাষায় উল্লিখিত কিনা, সূচী নির্দেশ লেখক, বিষয় প্রভৃতির ভিত্তিতে করা হয়েছে কিনা, প্রকাশন-ক্রম কিরূপ, কাল ব্যবধান কত, এবং প্রকাশন নিয়মিত কিনা, ইত্যাদি।

গ্রন্থ পঞ্জীর মতো প্রবন্ধ সারও নির্বাচিত অথবা সর্বাশ্রয়ী হতে পারে। আকারের দিক থেকে পত্রক পর্যায়ের হতে পারে, মুদ্রিত পত্রিকাকারে হতে পারে। নিজ নিজ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনে সার-পত্রক রাখা যায়। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে আবার পত্রিকার বদলে সার-পত্রক প্রকাশিত হয়। আজকাল প্রায় সব বিষয়েরই সার সংগ্রহ বেরোচ্ছে। সাধারণ সার পত্রিকা হিসেবে নাম করা যায় রীডার্স্ ডাইজেস্ট, ইমপ্রিণ্ট, নবনীত (হিন্দি), অনন্যা (বাংলা, সম্প্রতি স্থগিত প্রকাশ) ইত্যাদি। মর্যাদায় এরা সাধারণ সাময়িকীর মতো। পাণ্ডিত্যের প্রচার উদ্দেশ্য নয়।

বিশেষ ও প্রকৃষ্ট সার সংগ্রহের মধ্যে উল্লেখনীয় :—

(১) কেমিকেল এবস্টাক্টস্, আমেরিকান কেমিকেল সোসাইটি, ওআশিংটন, কর্তৃক ১৯০৭ থেকে প্রকাশিত।

(২) ফিজিক্স্ এবষ্ট্রাক্টস্, ইনষ্টিটুট অফ ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার্স্, লণ্ডন, কর্তৃক ১৮৯৮ থেকে প্রকাশিত।

(৩) বায়োলজিকাল একষ্ট্রক্ট্স্, পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ফিলাডালফিয়া থেকে ১৯২৬ থেকে প্রকাশিত।

(৪) সোশিওলজিকাল এবস্ট্রাক্ট্স্, এনঅর্বর, মিশিগান, আমেরিকা, —১৯৫৩এ থেকে প্রকাশ স্থরু।

(৫) এডুকেশন এবষ্ট্রাক্ট্; ইউনেসকো, ১৯৪৯ থেকে।

(৬) হিস্টরিকাল এবষ্ট্রাক্ট্স্, সান্তা বার্বারা, ক্যালিফোর্নিয়া, থেকে

১৭৭৫ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে।

(৭) লাইব্রেরি এণ্ড ইনফর্মেশান সায়েন্স এবষ্ট্রাক্ট্স ; লণ্ডন লাইব্রেরি এসোসিয়েশন কর্তৃক ১৯৫০ থেকে প্রকাশিত।

(৮) ইণ্ডিয়ান সায়েন্স এবষ্ট্রাক্ট্স্, দিল্লি, ইনসডক, থেকে ১৯৬৫ থেকে প্রকাশ পাচ্ছে।

১২ পথপঞ্জী, লঘু পুস্তক বা সারগ্রন্থ (Guides, Hand books)

সর্বসাধারণের সর্ববিষয়ে সহায়তার জন্য কিছু অতি সাধারণ অথচ প্রয়োজনীয় সারপুস্তক বাজারে চালু আছে। এর মধ্যে কিছু বই নানাবিধ সন্ধান সূত্রে প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি তথ্যও সংক্ষেপে দিয়ে থাকে। ইংরেজি গাইড বুক বা হ্যাণ্ডবুক এই শ্রেণীর গ্রন্থ। বাংলাতে এর স্বতন্ত্র নামকরণ কঠিন।

পথপঞ্জী বা ভ্রাম্যমানের নির্দেশপঞ্জী বা গাইড বুক এক ধরণের ভৌগলিক নির্দেশিকা। কোনো স্থান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় যাবতীয় তথ্য এতে সংকলিত হয়। স্থানিক ইতিহাস, পরিবেশ, পরিচিতি, পথের ও বাসস্থানের খবর ইত্যাদি নিয়ে এই গ্রন্থ। এইজাতীয় বই যত্ন সহকারে রচিত হলে বক্ষ্যমান দেশের বিভিন্ন অঞ্চলগুলির মূল্যবান নির্দেশক হয়ে ওঠে। দেশ ভিত্তিক কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পথপঞ্জীর নাম দেওয়া হল :—

(১) নিউন্যান্স্ ইয়োরোপীয়ান ট্রাভেল গাইড।

(২) গাইড টু আমেরিকা—এলমার জেনকিন্স্।

(৩) এ হাণ্ডবুক ফর ট্রাভেলার্স ইন ইণ্ডিয়া, পাকিস্তান, বার্মা এণ্ড সিলোন। (মারেজ গাইড)।

(৪) ফোডোরস্ গাইড টু ইণ্ডিয়া।

(৫) হোলি প্লেসেজ অফ ইণ্ডিয়া—বি, সি, লাহা।

(৬) বাংলায় ভ্রমণ, ২ খণ্ড,—রেল বিভাগ।

(৭) ভারত ভ্রমণ : টুরিষ্ট গাইড—চিত্র সেন।

(৮) ইণ্ডিয়ান ব্রাডশ (মাসিক প্রকাশন)।

আর্কিওলজিকেল সারভে অফ ইণ্ডিয়া প্রকাশিত স্থানিক পুস্তকাবলী, বা 'সী ইণ্ডিয়া' (See India) গ্রন্থমালা এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য।

লঘুপুস্তক' অর্থে ইংরাজিতে যাকে ম্যানুয়েল বা হ্যাণ্ডবুক বলে ; এক ধরণের সংক্ষেপিত গ্রন্থ বা গ্রন্থচুম্বক। পথপঞ্জীর সঙ্গে এক শ্রেণীভুক্ত

করার সম্পর্কে বিষয় সাদৃশ্যের যুক্তি নেই! তবে ধরণ অনেকটা একরকম, কেননা দুই শ্রেণীতেই সংক্ষেপে বিষয় পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়। চরিত্রে এরাও গাইডবুক,—নিজ নিজ বিষয়ের। হাতের কাছে থাকা এমন একটি ক্ষুদ্র পুস্তক যা'র মধ্যে সংক্ষেপে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়—অন্যান্য বই হাতড়ে বেড়াতে হয়না। জ্ঞান বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রিক পরিবর্তনাদির ফলে নানাবিধ শব্দের বা বাক্যের সৃষ্টি হয়, এসব অভিধানে স্থান পায়না বা পেতে দেরি হয়, কোনো গ্রন্থভুক্ত হয়না বা হলেও কোথায় আছে বা'র করতে অসুবিধা হয়। এই জাতীয় বাক্যাংশ বা শব্দাবলী যেমন নানাবিধ লঘুপুস্তকে স্থান পায়, তেমনি স্থায়ী মূল্যের অনেক কিছু—যেমন কী ক'রে কী হল, কী করে কী করতে হয়। এসব নিয়েও লঘুপুস্তক তৈরি হয়। 'হোয়াইট পেপার' কী, 'মুলতুবি প্রস্তাব' কাকে বলে, 'চায়ের পেয়ালায় ঝড়' কথাটির উদ্ভব কোত্থেকে। 'ফোর্থ ইণ্টারনেশনেল' বলতে কী বোঝায়, 'পৃথিবীর সাত বিস্ময়' কী কী, 'ইউনিসেফ' কী বস্তু, 'কোন টি কি' কী ব্যাপার 'অলিম্পিক' কথাটি এল কোন সূত্রে, 'দিয়েগো গার্সিয়া' নিয়ে ব্যাপারটা কী ঘটছে,—এই জাতীয় নানান প্রশ্নের সমাধান যেমন থাকে কোনো লঘুপুস্তকে, তেমনি কোনো বিশেষ বিষয় সম্পর্কে সার-সংবাদ নিয়েও হয় লঘুপুস্তক।

এই জাতীয় কিছু পুস্তকের নাম উল্লেখ করা হল।

(১) ফেমাস ফার্স্ট ফ্যাক্ট্স্—জে. এন. কানে; নিউয়র্ক, উইলসন কোং।

(২) বুক অফ ফ্যাক্ট্স্—বোম্বাই, জয়কো।

(৩) কমপ্লিট রাউণ্ড-দি-ক্লক কুক বুক—মীরা ওয়াল্ডো; নিউয়র্ক, ডাব্ল্ডে।

(৪) স্পিচ্মেকার্স (Speech meker's) কমপ্লিট হ্যাণ্ডবুক—ই. এল. ফ্রিয়েডম্যান, নিউয়র্ক, হার্পার।

(৫) গাইড টু ডিপ্লোমেটিক প্র্যাকটিস্—ই. স্যাটো; লণ্ডন, লংম্যান্স্ গ্রিন এণ্ড কোং।

(৬) পার্লামেন্টারি প্র্যাকটিস্—টি. ই. মে, লণ্ডন।

(৭) এভ্রিম্যান্স্ ডিকশনারি অফ ডেট্স্;—লণ্ডন।

(৮) হেনলিজ এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ফরমুলাজ, প্রসেসেজ্ এণ্ড ট্রেড

সিক্রেট্‌স্‌; নিউয়র্ক।

৯) ওয়ার্ল্ড্‌ অফ লারলিং। লণ্ডন, ইয়োরোপা।

১০) পলিটিকেল হ্যাণ্ডবুক অফ দি ওয়ার্ল্ড,—নিউয়র্ক।

১১) ফ্রিডম মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল ( ১৮১৮-১৯০৪ )—নির্মল সিংহ সং; শিক্ষামন্ত্রক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এই বইটিতে বিজ্ঞাপিত কালসীমার মধ্যে যে সকল দেশবরেণ্য নেতা স্বাধীনতার চিন্তাধারাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এবং দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের জীবন কথা আছে। তাই এটিকে উক্ত কর্মপরিমণ্ডলের জরীপ গ্রন্থ বলা যায়।

১২) হিন্দুস্থান ইয়ার বুক। এটি বর্ষপঞ্জী। এর মধ্যে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য সংকলিত থাকে, তাই এটিকে নির্দেশ পুস্তক বা গাইড বুক হিসেবে বিশেষ স্থান দেওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে, এ জাতীয় বর্ষ-পঞ্জী মাত্রেই নির্দেশ পুস্তক।

১৩) ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়—অক্ষয় কুমার দত্ত। ধর্মসম্প্রদায় ও জ্ঞানমার্গের বিশিষ্ট এই গ্রন্থকে উক্ত বিষয়ের জরীপ পুস্তক ও বলা অযৌক্তিক নয়। বিশেষ বিশেষ বিষয়ে এই ধরণের সর্বাশ্রয়ী বই আছে যেগুলি সন্ধান সহায়ক হিসেবে কাজ দেয়।

১৪) জ্ঞান বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড—মৌমাছি। ছোটদের জন্য এটি সর্ব বিষয়ের জ্ঞান ও তথ্যের আধার।

১৫) নক্ষত্র পরিচয়—জগদানন্দ রায়। এটি আকাশের মানচিত্র হিসেবে অতি প্রয়োজনীয়। নক্ষত্র জগতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় চিত্র সহযোগে প্রকাশিত।

১৬) রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জী—প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়। তারিখ অনুসারে রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালের ঘটনা পরিচিতি।

১৭) উইসডেন ক্রিকেটার্স এনমেনাক। ক্রিকেট ক্রীড়া সংক্রান্ত বাৎসরিক তথ্য পুস্তক।

১৮) দি রোজ ( Rose ) ইন ইণ্ডিয়া—বি, পি, পাল ( বিশেষ বিষয় ক্ষেত্রের নমুনা হিসেবে। এ জাতীয় বই কৃষি, শিল্প ইত্যাদি সব বিভাগেই মেলে। )

১৯) ভারতীয় ইতিহাসের কালপঞ্জী ( ১৬৬৪-১৮৫৮ )—কার্ল মার্কস্‌। ( এ জাতীয় তথ্যপঞ্জী এবং পরিসংখ্যান পুস্তক বিভিন্ন বিষয়েই মেলে। )

১৩ পঞ্জিকা

পঞ্জিকা এক ধরণের বর্ষপঞ্জী। বাংলাভাষায় পঞ্জিকার অর্থ সীমিত; এতে দিনক্ষন তারিখ হিসেবে যাবতীয় জ্যোতিষী বিবরণ থাকে। রাশিচক্র, নক্ষত্র সংস্থান, জ্যোতিষী গণনার হিসাব, পূজাপার্বন প্রভৃতির বিবরণ নিয়ে প্রতিবছর এর প্রকাশ। ইংরাজিতে অবশ্য এলমানাক (almanac) অর্থে পঞ্জিকা বোঝালেও কেবলমাত্র তারিখ বা রাশি নক্ষত্রের অবস্থান নিয়েই এর কাজ নয়। এলমানাক পুস্তকে বর্ষপঞ্জীর ধারায় প্রায় সব তথ্যই লিপিবদ্ধ হয়। যেমন, 'ওয়ার্ল্ড এলমেনাক' (World Almanac) বা 'ইনফরমেশন প্লিজ এলমেনাক' (Informaation Please Almanac) গ্রন্থ। আবার স্বতন্ত্রভাবে, নামটির মুল অর্থ অনুযায়ী, তারিখ সমেত নভোসারণি বা নৌসারনি হিসাবেও প্রকাশিত হয়। যেমন 'এসট্রোনমিকেল এফিমোরিস্ বা 'আমেরিকান এফিমোরিস এণ্ড নটিকেল (Ephemeris & Nautical) এলমেনাক'। এখানে এই দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত বই সম্পর্কেই বলা হচ্ছে। নিচে কিছু পঞ্জিকার নাম লিপিবদ্ধ হল।

(১) ইণ্ডিয়ান এফিমেরিস এণ্ড নটিকেল এলমেনাক; ভারত সরকার, আবহ বিভাগ থেকে প্রকাশিত।

(২) বুক অফ ইণ্ডিয়ান এরাজ (Eras)—আলেকজাণ্ডার কানিংহাম। এই গ্রন্থে ভারতীয় যেকোনো সালের তারিখ বার করবার হিসাবের তালিকা আছে।

(৩) গুপ্তপ্রেস ডাইরেকটারি পঞ্জিকা।

(৪) বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা।

(৫) রাষ্ট্রিয় পঞ্চাঙ্গ। ভারত সরকার প্রকাশিত এই পঞ্জিকার ভিত্তি বাংলা শকাব্দ।

পুরানো তারিখ হিসাব ক'রে বার করবার জন্যও পঞ্জিকা আছে। যেমন, 'টু হানড্রেড ইয়ার্স্ এফিমোরিস'—ম্যাকগ্রেগ-কৃত, অথবা পুরাতন পঞ্জিকা'—চন্দ্র বিদ্যানিধি কৃত।

১৪ নথি ( Documents )

আজকালকার দিনে সরকারী পর্যায়ে, এবং বেসরকারী বা আন্তর্জাতিক বহু প্রতিষ্ঠান থেকে ধারাবাহিকভাবে নানাবিধ তথ্যসামগ্রী প্রকাশিত হচ্ছে। আপাতদৃষ্টীতে সাময়িকীর মতো চালে বেরোলেও এগুলি স্থায়ী

নথির কাজ করে। কোনো বিষয় সম্পর্কে লিখিত বা মুদ্রিত তথ্য সামগ্রীকেই নথি বলা যায়। এগুলি সংখ্যায় এত বেশি এবং বৈচিত্র্যে এত বিস্তৃত যে সবগুলির সন্ধান রাখা বা সবগুলি সংগ্রহে রাখা ক্ষমতা বহির্ভূত হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত নির্বাচনের ব্যাপারেও সমস্যা হয়। কেননা সাধারণ গ্রন্থপঞ্জী, সূচীগ্রন্থ অথবা গ্রন্থব্যবসায়ীর তালিকায় এর উল্লেখ থাকে না। গবেষক বা উচ্চতর জ্ঞানের পাঠকদের কাছেই এ জাতীয় নথি তথ্যের সমাদর। বিশেষ গ্রন্থাগার অথবা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে ইতস্তত ভাবে কিছু পরিমাণে নথি সংগৃহীত হলেও পুস্তিকা, নথি বা ধারাবাহিক প্রকাশন সম্পর্কে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েই থাকে। নথি যেহেতু জ্ঞানক্ষেত্রের শেষতম সংবাদটুকু দেয় সেহেতু এ সম্পর্কে খুবই সচেতন থাকতে হয়, সংগ্রহের ব্যাপারে খবর রাখতেও তৎপর হতে হয়। এবং এর প্রয়োজনীয়তা ও নির্ভর যোগ্যতা সম্পর্কে ধারণা স্বভাবতই সকলের থাকে না, এজন্য বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন। অপ্রচুর ব্যবহারের জন্য এবং, অবশ্যই, আর্থিক সঙ্গতির কথা বিবেচনা ক'রে, গ্রন্থাগার গুলি নথি সংগ্রহের দিকে ঝোঁকেনা। বিভিন্ন দেশের জাতীয় গ্রন্থাগার অথবা বিশেষ প্রতিষ্ঠান দেশের প্রয়োজনে নথি কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে। তবে সরকারী প্রকাশন মাত্রেই কাছ ঘেঁষে গেলেও তার মধ্যে বৃহৎ এক শ্রেণী সাধারণ বই হিসেবেই চিহ্নিত হবে, এবং কিছু আসবে জিজ্ঞাসা বিভাগের আওতায় বস্তুতপক্ষে, জিজ্ঞাসা বিভাগের সহায়তার ব্যাপক প্রয়োগের সূত্রে নথি মূলক সামগ্রীর সন্ধান রাখা এই বিভাগের কর্তব্য হয়ে পড়ে স্বভাবতই। নথির যাচাই ও বাছাইএর জন্য বিবিধ সংস্থার কিছু গ্রন্থের উল্লেখ নিচে উদাহরণ হিসাবে দেওয়া হল। :—

১) কী ( key ) টু লীগ অফ নেশন্‌স্‌ ডকুমেণ্টস্‌ – মেরি জে. কেরল ; ( ১৯২০-১৯২৯ ।।

২) ব্র্যাশা-ভতিয়ের ( Breycha-Vauthier ) কৃত সোর্সেস্‌ অফ ইনফর্‌মেশন। লীগ অফ নেশন্‌স্‌, জেনেভা, প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা পুস্তক।

৩) ইউনাইটেড নেশন্‌স্‌ ডকুমেণ্ট্‌স্‌ ইনডেক্স—নিউয়র্ক থেকে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে মাসিক প্রকাশন।

৪) জেনারেল ক্যাটালগ অফ ইউনেসকো পাবলিকেশন এণ্ড ইউনেসকো —স্পন্‌সর্ড পাবলিকেশন্‌স্‌, ১৯৪৬—১৯৫৯।

৫) ক্যাটালগ অফ সিভিল পাবলিকেশন্‌স্‌ টু দি গর্ভনমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। মাসিক কিস্তিতে পরিশিষ্ট সহ।

৬) ভার্টিকেল ফাইল ইনডেক্স ; ১৯৩২ থেকে নিউয়র্কের উইলসন কোং প্রকাশিত এই মাসিক পত্র বিষয়ানুক্রমে এবং আখ্যা অনুসারে নির্বাচিত পুস্তিকার তালিকা প্রকাশ করে।

৭) ডকুমেণ্টেশন অন এশিয়া। গিরিজা কুমার ও ভি. মাচোয়ে সম্পাদিত এই গ্রন্থ ইণ্ডিয়ান কাউনসিল অফ ওআর্লড্ এফেয়ার্স থেকে প্রকাশিত। ৪ খণ্ড, ১৯৭৪ পর্যন্ত।

একালের নথি নিবেশ প্রকল্পে আলোক চিত্রলিপি অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। নথি জাতীয় সকল সামগ্রী সংগ্রহ করা সহজ নয়। মঞ্চস্থ করাও বৃহৎ ব্যাপার। সেজন্য হয় সমগ্র ভাবে কোনো, বই বা প্রবন্ধ, অথবা অংশ বিশেষ, কিম্বা বিবিধ নক্সা বা চিত্রের আলোক চিত্রানুলিপি ব্যবস্থার প্রচলন। এই অনুলিপি অনুচিত্র, অনুপত্রক বা চিত্রপত্র, অথবা খণ্ডিত ফিল্মেও সংগ্রহ করা যায়। বড় বড় বই বা পত্রিকাদি নকল করতে অনুচিত্রণ, ছোটখাট অংশের জন্য ফিল্ম-খণ্ড, এবং পত্রক জাতীয় প্রয়োজনে অনুপত্রক পদ্ধতির মাধ্যম বেছে নেওয়া যায়। সাধারণত নথিকেন্দ্রে—যেমন ভারতে নথিনিবেশ কেন্দ্র ( INSDOC ) এ জাতীয় কাজ ক'রে দেয়। আবার কিছু সংস্থা এ জাতীয় নকলের সঞ্চয় সরবরাহও ক'রে থাকে। এজন্য সন্ধান সূত্র হিসাবে কিছু তালিকা গ্রন্থের নাম করা যায়, যার থেকে প্রয়োজনীয় নথি চিত্রানুলিপির খোঁজ পাওয়া যাবে। যেমন, —

১) গাইড টু মাইক্রোফর্মস্ ইন প্রিণ্ট. —ওআশিংটনের মাইক্রোকার্ড এডিশন্স্ সংস্থা থেকে প্রকাশিত। প্রতিবছর সংশোধিত হয়ে বেরোয়।

২) ফিল্ম স্ট্রিপ গাইড. —নিউয়র্কের উইলসন কোম্পানি থেকে ৩৫ মিঃ মিঃ ফিল্মের তালিকা।

৩) রীডেক্স মাইক্রোপ্রিণ্ট পাবলিকেশন্স্ :—নিউয়র্কের রীডেক্স ( Readex ) মাইক্রোপ্রিণ্ট সংস্থা প্রকাশিত চিত্রানুলিপি সামগ্রীর তালিকা; দেশ ভিত্তিক পর্যায়ে বিন্যস্ত, বর্ণানুক্রমিক সূচী সংবলিত।

৪) ইউনেসকো, ডকুমেণ্ট রিপ্রোডাকশন সার্ভিস্।

৫) এ ডাইরেক্টরি অফ ব্রিটিশ ফোটো-রিপ্রোডাকশন সার্ভিসেস, —লণ্ডনস্থ লাইব্রেরি এসোসিয়েশন।

১৫। দৃশ্য-শ্রাব্য সামগ্রী।

এটিও আধুনিকতম অবদান। আজকাল অনেক ক্ষেত্রেই মুদ্রিত সামগ্রী জ্ঞান আহরণের পক্ষে যথেষ্ট ব'লে মনে হয়না। ইন্দ্রিয়ান্তর গ্রাহ্য আরো কিছু প্রত্যক্ষ সামগ্রীর প্রয়োজন হয়। পাদপূরণ করতে হয় নানান বিষয়ের মধ্যেকার অপূর্ণতার বা অপ্রতুলতার। শিশু এবং নাবালকদের জন্য যেমন এ জাতীয় কিছু সামগ্রীর সহায়তায় তাদের শিক্ষা প্রয়াসকে মনোগ্রাহী ক'রে তোলা যায়, সরাসরি উদাহরনাদির মাধ্যমে পাঠ ত্বরান্বিত করা যায়, তেমনি বয়স্ক বা সাবালকদেরও নানাভাবে এর মাধ্যমে সাহায্য করা যায় প্রত্যক্ষ ভাবে। নিরক্ষর বা নানাভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের শিক্ষাদানের ব্যাপারেও দৃশ্য-শ্রাব্য সামগ্রী অপরিহার্য। কিছু শিক্ষাক্রম এবং গবেষণার প্রকল্প আছে যাতে বই এর চেয়েও শ্রুতিগ্রাহ্য ও দৃষ্টিগ্রাহ্য বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা বেশি ছাড়া কম নয়। যেমন সংগীত, আবৃত্তি ও ভাষণের ধারক; নানাবিধ ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক তথ্যচিত্র; স্বাস্থ্য ও শিক্ষা, কৃষি ও শিল্প সম্বন্ধীয় নানাবিধ স্থিরচিত্র, নক্সা, ইত্যাদি; আলোকচিত্রের সাহায্যে বিবিধ বিষয়ের পরিস্ফুটন; রেডিয়ো, টেলিভিশন, ইত্যাদি। এ জাতীয় সামগ্রীর সন্ধান সূত্র স্বভাবতই জিজ্ঞাসা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়। জিজ্ঞাসা বিভাগের অঙ্গ হিসাবে দৃশ্য-শ্রাব্য সামগ্রীর সুষ্ঠু সংগ্রহ, এবং সংলগ্ন কক্ষে চিত্র প্রদর্শনের প্রক্ষেপ যন্ত্র, গ্রামাফোন, রেডিয়ো, ইত্যাদি রাখা একালে খুবই দরকার হয়ে পড়ছে। দৃশ্য-শ্রাব্য সামগ্রী নির্বাচনের জন্য কিছু তালিকা গ্রন্থ স্বভাবতই সংকলিত হচ্ছে। এ গুলির সাহায্যে নিজ গ্রন্থাগারের প্রয়োজন মতো জিনিস বাছাই করা চলে। যেমন,—

১) ইউনেসকো প্রকাশিত ওআর্লড্ ফিল্ম ডাইরেক্টরি।

২) নিউয়র্ক উইলসন কোং প্রকাশিত এডুকেশনেল ফিল্ম গাইড, ১৯৫৪-৫৮। বার্ষিক পরিশিষ্ট সমেত।

৩) নিউ গাইড টু রেকর্ডেড মিউজিক—আরভিং কোলোডিন।

৪) গাইড্স্ টু নিউআর এডুকেশনেল মিডিয়া—রুফ্স্ ভোল্ড এবং গাস। এই গ্রন্থে ফিল্ম, রেকর্ড, স্থিরচিত্র ফলক, ইত্যাদির তালিকা সংকলিত হয়েছে।

৫) রেকর্ড সংগীত,—দি গ্রামোফোন কোং অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড কর্তৃক অনিয়মিত ক্রমে প্রকাশিত রেকর্ডের তালিকা।

৬) কবিকণ্ঠ—সন্তোষ কুমার দে ও কল্যাণ বসু ভট্টাচার্য্য-কৃত। ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ প্রকাশিত রেকর্ডে রবীন্দ্র সংগীতের তালিকা ও পরিচিতি সহ ইতিবৃত্ত।

## (ঝ) গ্রন্থাগার প্রচার ও প্রসার

গ্রন্থাগারের প্রচার ও প্রসার বলতে বোঝায় জ্ঞান সামগ্রীর প্রচার ও প্রসার। শিক্ষায়তন যেমন তার শিক্ষা প্রকল্প বিজ্ঞাপিত করে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যেমন তৈরি এবং ক্রেতব্য জিনিসের বিজ্ঞাপন দেয়, গ্রন্থাগারও তেমনি সংগৃহীত পুস্তক এবং বিবিধ সাহায্যকারী প্রকল্পগুলি জনসমক্ষে প্রচারিত করে। এখানে লেখক শ্রেণী উৎপাদক, গ্রন্থাগার পরিবেষক এবং পাঠকবর্গ গ্রাহক।

একথা অবশ্যই মনে হতে পারে যে জ্ঞানার্জনের প্রয়োজন যাঁদের আছে, যাঁদের আছে পড়বার আগ্রহ তাঁরা তো গ্রন্থাগারে আসবেই। আর যাঁদের সে প্রয়োজন নেই, যাঁরা আগ্রহ অনুভব করেনা তাঁদের জন্য চিন্তা ভাবনার দরকার কী। কিন্তু জ্ঞানজগতের অংশীদার হিসেবে, গণতন্ত্রের অংশ হিসেবে এবং সমাজের অঙ্গ হিসেবে দায় এড়িয়ে যাবার প্রশ্ন ওঠেনা। গ্রন্থাগারিক কেবল গ্রন্থের দায় নিয়ে থাকেন না। পাঠকদের দায়ও বহন করেন। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেন, 'লাইব্রেরির নিজের একটা দায় আছে। সে হচ্ছে তার সম্পদের দায়। যেহেতু তার বই আছে সেই হেতু সেই বইগুলি পড়িয়ে দিতে পারলেই তবে সে ধন্য হয়।' কোনো পণ্য সামগ্রী বিজ্ঞাপিত করার সময়ে যেমন সম্ভাব্য ক্রেতাকে আকৃষ্ট করাই চিন্তনীয়, তেমনি গ্রন্থাগারও সম্ভাব্য পাঠকের কথা মনে করে গ্রন্থাদির ঘোষণা করে, প্রকল্পের প্রচার করে।

কোনো জনপদে গ্রন্থাগার থাকলেও যখন দেখা যায় জন সংখ্যার অনুপাতে খুব কম লোকই তার সুযোগ নিচ্ছে তখন বুঝতে হবে গ্রন্থাগারের সম্যক বৃত্তান্ত জনসাধারণের কাছে পৌছায়নি। গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব জানা থাকলেও তার ক্রিয়াপর্ব সম্পর্কে সাধারণ বাসিন্দারা অজ্ঞ। জনসাধারণ যে পড়াশোনা করতে চায়না বা পৃথিবীর খবরাখবর জানতে চায় না তা নয়। কোথায় গেলে কেমন ভাবে জ্ঞান লাভ করবে সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা নেই। গ্রন্থাগার তাদের মধ্যে এই ধারণা জন্মাবে। শিক্ষার আগ্রহ মেটাবে, জ্ঞানস্পৃহা জাগিয়ে দেবে এবং তার নিরসন করবে।

কিন্তু লোকে যদি সে সুযোগ না নেয় তাহলে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ কী করবেন? সর্বসাধারণকে শিক্ষিত ক'রে তোলা গণতন্ত্রের অন্যতম আবশ্যিক সর্ত। সেই সর্ত পূরণের প্রচেষ্টায় গ্রন্থাগারকে – তার সর্ববিধ সহায়ক প্রকল্পকে সকলের কাছে জাহির করতে হয়। তাদের কী বলব, কেমন ক'রে বলব সেটা যেমন জনসংযোগের কাজ, তেমনি গ্রন্থাগার সম্পর্কে তাদের কী বলব, কী ভাবে আগ্রহ জাগিয়ে তুলব - আকর্ষণ বাড়াব সেটাই প্রচারের কাজ।

গ্রন্থাগারের প্রচার এবং প্রসার একই উদ্দেশ্যের দু'টি কর্মধারা। গ্রন্থাগারে সংগৃহীত সামগ্রী ব্যবহারের আহ্বান জানিয়ে নানাবিধ প্রচার প্রকল্প নিলে জনসাধারণ নিজের রুচি ও প্রয়োজন মতো তার সাহায্য নিতে পারে। আর গ্রন্থাগারের কর্মধারা তার চৌহদ্দির মধ্যে আবদ্ধ না রেখে আশেপাশে ছড়িয়ে দেবার প্রকল্প গ্রহণ ক'রে প্রসারের কাজ চালানো যেতে পারে। রঙ্গনাথনের গ্রন্থাগার নীতির প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টি বলছে। পুস্তকমাত্রই ব্যবহারের জন্য, প্রতিটি পাঠকের জন্য উপযোগী বই সরবরাহ করা দরকার এবং প্রতিটি পুস্তকের জন্য পাঠক থাকা আবশ্যক। এই নীতিগুলির ভিত্তিতে গ্রন্থাগারের গ্রন্থসম্পদের কথা পাঠক-জনসাধারণকে জানাতে হয়, পাঠকদের রুচি এবং চাহিদা জেনে নিয়ে তার পূরণ করতে হয়। এই থেকেই প্রচারের সূত্রপাত। গ্রন্থাগারভেদে এই প্রক্রিয়ার প্রকৃতিভেদ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে একাজ অনেকটা সহজ ধারায় চলে। পরিচালনার মূল পাঠক্রম-কেন্দ্রিক, তাই প্রচারের মূল ধারাও তদনুরূপ। পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও পরিপূরক নানারকম বই পড়তে হয়, বিষয় বহির্ভূত বই পড়বার আগ্রহ থাকে। তাই এজাতীয় বইএর ঘোষণা দরকার হয়।

জনগ্রন্থাগারের প্রচারপর্বের জন্য নানান উপায়ের কথা ভাবতে হয়। সমাজের সর্বশ্রেণীর লোকের জন্য গ্রন্থাগার। তাদের রুচিতে যেসব বৈচিত্র্য তেমনি আগ্রহ প্রকাশের ধরণও বিচিত্র। শিক্ষক, গবেষক বা ছাত্র যেমন এর পাঠক, তেমনি স্বল্পশিক্ষিত অথবা নিরক্ষর ব্যক্তিরাও গ্রন্থাগারে অপাংক্তেয় নয়। তাই জনসমাজে প্রচার ক'রে দিতে হয় যে এখানে একটি গ্রন্থাগার আছে, সে গ্রন্থাগার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত, প্রতিদিন অমুক সময়ে এটি খোলা থাকে, এখানে অমুক জাতীয় বইপত্র দেওয়া নেওয়ার ব্যবস্থা আছে, এছাড়াও এখানে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিনোদন ইত্যাদির অমুক জাতীয় ব্যবস্থা আছে, ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, প্রচারের পূর্বে মজুত গ্রন্থাদির পঠন-পাঠন

শ্রবণ-দর্শনের যাবতীয় প্রকল্প চালু ক'রে তবেই বিজ্ঞাপন জাহির করতে হয়। কেউ যেন এসে ফিরে না যায়, কেউ যেন সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়। এর ফলে স্বভাবতই এক কান থেকে দশ কানে গ্রন্থাগারের কৃতিত্ব প্রকাশ হয়ে পড়বে। গ্রন্থাগার প্রচারের অর্থ গ্রন্থাগার সম্পদের যা'তে পুরোপুরি সদ্ব্যবহার হয় তার আয়োজন করা।

প্রচারবিধি দু'রকমের; সাধারণ ও বিশেষ। সাধারণ বা সাদামাটা প্রচারের কায়দা সহজ, ক্ষেত্র ব্যাপক। এই ধরণের বিজ্ঞপ্তি গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, গ্রন্থপাঠ সম্পর্কিত নীতি ও নিয়ম, ইত্যাদি ঘোষণা করে। যেমন, (১) বই পড়ার মূল্য, বই কেন পড়া উচিত, কী এর উপকারিতা; (২) সমাজে শিক্ষা ও শিক্ষিতের স্থান (৩) গ্রন্থাগারকে কেন জনশিক্ষা কেন্দ্র বলা যায়, গ্রন্থাগার কীভাবে শিক্ষা প্রসারে এবং রুচি গঠনে সহায়তা করে; (৪) সমাজে ও জীবনে গ্রন্থাগারের স্থান কোথায়, যে কোনো শ্রেণীর লোক গ্রন্থাগারে এসে কীভাবে কতখানি সাহায্য পেতে পারে বা তথ্যাদি আহরণ করতে পারে; (৫) জনসেবায় গ্রন্থাগারে কী ভূমিকা; (৬) গ্রন্থাগারের নানাবিধ ইতিবৃত্ত, ইত্যাদি। এজাতীয় প্রচারের ধরণটা ব্যাপক, সর্বাশ্রয়ী। এর ফলে দেশবাসীকে গ্রন্থাগার – সচেতন ক'রে তোলা যায়, গ্রন্থপাঠে আগ্রহের সৃষ্টি করা যায়। প্রচারের অঙ্গ হিসেবে সাক্ষরদের জন্য প্রবন্ধ রচনা ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা। স্বাক্ষর নিরক্ষর নির্বিশেষে সকলের জন্য সমাবেশ-বক্তৃতা, বেতার ভাষণ, দেয়াল চিত্র আলোকচিত্রাদি প্রদর্শন ইত্যাদি প্রকল্প নেওয়া যায়। সরকারী গ্রামসেবা পরিকল্পনার সঙ্গে এর মিল আছে। কাজটা গ্রন্থাগারিক বা শিক্ষাবিদ সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য। উদ্দেশ্য সার্বিক উন্নয়ন, বুদ্ধিযুক্ত সচেতনতার বিকাশ।

বিশেষ প্রচার গ্রন্থাগারের প্রত্যক্ষ সংগ্রহের ঘোষণা। এই প্রচার প্রক্রিয়া দ্বিবিধ; গ্রন্থাগারের অভ্যন্তরস্থ প্রচার, এবং গ্রন্থাগারের সীমানার বাইরে ব্যাপকতর প্রচার। আভ্যন্তরীণ প্রচার গ্রন্থাগারের আগত পাঠকদের গ্রন্থ-পরিচয় এবং গ্রন্থাগার—পরিচয় সাধন করে, গ্রন্থ-পাঠে এবং গ্রন্থাগার ব্যবহারে তাদের উৎসাহিত করে। এই কাজের মধ্যে আছে গ্রন্থাগার পরিচিতির ছক, পরিবেশনের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান; সুসংগঠিত পুস্তক নির্দেশিকা, নূতন বইএর ঘোষণা এবং প্রদর্শনী, সাময়িকী বা নির্ণয় গ্রন্থাদির (reference books) আকর্ষণীয় সজ্জা, ছবি, স্বরধারক (records), আলোকচিত্র প্রভৃতির সংগ্রহ ও ব্যবহারের

সুবন্দোবস্ত, পাঠচক্র বা আলোচনা সভার আয়োজন, এবং এই জাতীয় প্রয়োজনগত বিশেষ পরিকল্পনা।

গ্রন্থাগারের কোথায় কী আছে, কোন অংশে গেলে কোন ধরণের জিনিষ মিলবে তার একটি ছক বা নক্সা তৈরি ক'রে প্রবেশ পথের সামনে টাঙিয়ে রাখা ভাল। এই ছক পাঠকদের ব্যবহৃত সদস্য পত্রেও মুদ্রিত থাকতে পারে। গ্রন্থাগারের পরিবেশ স্বচ্ছন্দ ও ঘরোয়া করবার জন্য কর্মীদের সচেষ্ট সহায়তা থাকা দরকার। পরিচ্ছন্ন পরিবেশে পরিপাটি ভাবে গ্রন্থাগারটিকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখলে মন প্রফুল্ল হয়। নীরবে নিঃশব্দে কাজ ক'রে গেলেও, এবং গ্রন্থাগারের মধ্যে নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য বিরাজ করলেও সমগ্র আবহাওয়াটি যা'তে সজীব এবং ক্রিয়াশীল বলে মনে হয় তেমন পরিবেশ সৃষ্টি করা উচিত। পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে পাঠকরা যেন স্বচ্ছন্দ বিশ্রাম করতে পারে সেরকম ব্যবস্থা রাখতে হয়। এই ব্যবস্থা গুলিকে প্রচারেরই সগোত্র বলে ধরা যায়, কেননা যে কাজেরই লক্ষ্য লোককে সন্তুষ্ট এবং আকৃষ্ট করা তাই আন্তরিক আহ্বানের সামিল। শুধুমাত্র প্রদর্শনী বা সাজসজ্জাই নয়, এখানে প্রতিটি বিজ্ঞপ্তি বা নির্দেশনামা, পত্রক বিন্যাস বা মঞ্চসজ্জা—সবই কোনো না কোনো ভাবে গ্রন্থাগারকে প্রচারিত করেছে। ক্রেতা যেমন কোনো দোকানে গিয়ে আন্তরিকতার অভাব দেখলে পুণরায় সেখানে যাবার উৎসাহ বোধ করেনা, পাঠক এবং গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা সেই রকম দাঁড়ায়।

আভ্যন্তরীন প্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন বিভাগের শ্রেণীকরণ, পুস্তকাদির সরল সজ্জা ও সূচীপত্রকের সুপটু বিন্যাসের দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। বিভিন্ন বিভাগের শ্রেণীবদ্ধ বিন্যাস গ্রন্থাগারের বিশেষত্ব প্রকাশ করে। কক্ষ-গুলির অবস্থান এমন হওয়া উচিত যাতে সহজেই নজরে পড়ে। যাতায়াতে অসুবিধা হয় না, যেন গোলোক ধাঁধাঁর সৃষ্টি না করে। মঞ্চকক্ষের পুস্তক-সজ্জা সরল ও পরিচ্ছন্ন হবে, নির্দেশিকার সাহায্যে মঞ্চের পরিচয় দিতে হবে। গ্রন্থসজ্জার, অর্থাৎ বর্গীকরণ প্রকল্পের একটি ছক ও প্রবেশ পথে রাখা উচিত। সূচীপত্রকাধার গুলির বিন্যাস আকর্ষণীয় ক'রে তুলতে হয়। প্রবেশদ্বারের কাছাকাছি বিশিষ্ট স্থান বেছে নিয়ে যথোপযুক্ত নির্দেশকের সহায়তায় এগুলির ব্যবহার সরল করে তোলা আবশ্যক। সূচীপত্রক গ্রন্থ সংগ্রহের পরিচয় দেয় ব'লে এটি প্রচারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের কথায়, 'সাধারণত লাইব্রেরি বলে থাকে, আমার গ্রন্থতালিকা আছে, স্বয়ং দেখে নেও, বেছে নেও। কিন্তু

তালিকার মধ্যে তার নিজের আগ্রহের পরিচয় পাই, যে নিজে এগিয়ে গিয়ে পাঠককে অভ্যর্থনা করে আনে, তাকেই বলি বদান্য—সেই হল বড়ো লাইব্রেরি —আকৃতিতে নয়, প্রকৃতিতে।' গ্রান্থাগার তরফে এই আহ্বান এবং অভ্যর্থনাই প্রচারের প্রকৃত সূত্র।

এর পরেই বলা যায় নতুন বইএর ঘোষণার কথা। ঘোষণা মুদ্রিত সূচী বা তালিকার সাহায্যে করা যায় অবশ্যই। কিন্তু ঘোষণা আকর্ষনীয় ক'রে তুলতে বইএর অলগ্ন মলাটি—এমনকি পুরা বইটিই, অথবা তার বিশেষ কোনো অংশ উপযুক্ত বিন্যাসে প্রদর্শিত হতে পারে। অলগ্ন মলাট গুলি বই থেকে খুলে সুদৃশ্য প্রদর্শ-ফলকে গেঁথে প্রবেশ কক্ষে সুন্দর ভাবে সাজিয়ে রাখা যায়। পুরো বই কাচের আধারে সাজিয়ে রেখে প্রদর্শিত হতে পারে। কোনো বিশেষ অংশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হলে এই পদ্ধতিতেই বইটি খুলে আধারের মধ্যে রাখা যায়। বইএর মলাট বিজ্ঞাপনের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। গ্রন্থাগারিকের পক্ষেও এর মূল্য অনুপেক্ষনীয়। মলাটটিকে খুবই আকর্ষণীয় ক'রে ছাপানো যায়। এতে সংক্ষেপে গ্রন্থ এবং গ্রন্থকারের পরিচয় প্রকাশ করা চলে। জ্ঞাতব্য প্রাথমিক তথ্য পাঠক এর থেকেই পেতে পারেন। 'প্রত্যেকটি পুস্তকের জন্য পাঠক'—এই নীতি অনুসরণের সূত্রে মলাটের প্রদর্শনী খুবই কার্যকর।

ঘোষণার আরেকটি বিশিষ্ট পর্যায় পুস্তক প্রদর্শনী। কেবলমাত্র নতুন বইএর জন্যই নয়, বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে সকলকে বইএর খবর জানানোর উপায় হিসেবে প্রদর্শনী অপরিহার্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। কখনো কোনো বিশেষ বিষয় বেছে নিয়ে সেই অনুযায়ী পুস্তকের প্রদর্শনী করা যায়। বিশেষ কোনো ঘটনা নিয়ে—যেমন যুদ্ধ বা শান্তি চুক্তি বা নির্বাচন বা ভূমিকম্প প্রভৃতি যে কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে সে বিষয়ে জ্ঞাতব্য তথ্য সংক্রান্ত বইএর প্রদর্শনী হতে পারে। বিশিষ্ট কোনো ব্যক্তির স্মরণে—যেমন রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী, সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মহাপ্রয়াণ ইত্যাদিকে কেন্দ্র ক'রে প্রদর্শনীর আয়োজন করা যায়। প্রদর্শনী কেবলমাত্র গ্রন্থসজ্জা দিয়েই নয়। সংশ্লিষ্ট পত্রিকা, মানচিত্র, চিঠিপত্র, আলোকচিত্র ইতাদির সাহায্যেও আকর্ষণীয় ভাবে সাজানো সম্ভব। প্রদর্শনীর ধরণ আন্তর্জাতিক, স্থানিক বা জাতিক হতে পারে। অর্থাৎ কোন দৃষ্টিকোণ থেকে সাজালে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থসেবীদের পক্ষে উপযুক্ত এব উপকারী হবে সেটি স্থির করে নিয়ে সেভাবে

বিন্যস্ত করা বাঞ্ছনীয়। জনগ্রন্থাগারের উপযোগী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষ গ্রন্থাগারের দৃষ্টিকোণ স্বভাবতই স্বতন্ত্র হয়। এই সূত্রে স্মর্তব্য যে প্রদর্শনী কখনোই স্বয়ং সম্পূর্ণ হয় না, ধারা অনুসরণের সূত্র তুলে ধরে মাত্র। সেই সূত্রগুলি যথাযথ বজায় রেখে এর চেহারাটা সর্বতোভাবে নির্দেশক ক'রে তুলতে হয়।

গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাপনায় পাঠচক্র বা আলোচনা সভার আয়োজন করলে সাধারণের আগ্রহ পাড়বে। বিশেষ প্রদর্শনীর সূত্রে অথবা স্বতন্ত্রভাবে এরকম সভার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তা'তে নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়, জানার আগ্রহ জাগে। গ্রন্থাগার সামগ্রীরও বিজ্ঞপ্তির কাজ হয়। গ্রন্থাগার যে শ্রেনীরই হোক না কেন, সমসাময়িক কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে মাঝে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। এতে গ্রন্থাগারও জীবন্ত হয়ে ওঠে রুচি ও উৎসাহের প্রসার হয়। গ্রন্থগারে সংগৃহীত ছবি এবং গানের রেকর্ড প্রদর্শিত করার এবং শোনানোর জন্য স্বতন্ত্র কক্ষ থাকা উচিত। এ জাতীয় সামগ্রী শিক্ষার প্রয়োজনে ব্যবহার হয় নিশ্চয়, কিন্তু তা ছাড়াও বিনোদন. সৌন্দর্য-জ্ঞান স্বকুমার বৃত্তির বিকাশ এবং রুচির প্রকাশে সহায়তা করে।

গ্রন্থাগারের চৌহদ্দির বাইরে গ্রন্থাগার সংক্রান্ত প্রচার সমাজ সেবারই অঙ্গ হয়ে উঠতে পারে। গ্রন্থাগার সম্পর্কিত সরাসরি বিজ্ঞাপন, স্থানীয় পত্র পত্রিকার মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি, ইস্তাহার (hand bill) বিলি করা, প্রাচীর-পত্র (poster), প্রচার পত্র (bulletion) প্রকাশ, বেতার বক্তৃতার ব্যবস্থা ইত্যাদি এই প্রকল্পের অঙ্গীভূত। তা ছাড়া শহরের ও শহরতলী বা গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা সমিতির সহায়তায় বক্তৃতা এবং প্রদর্শনীর আয়োজন, স্থিরচিত্র বা চলচ্চিত্র প্রদর্শন, ভ্রামামাণ গ্রন্থাগার প্রভৃতি কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে গ্রন্থ সংযোগ ও জ্ঞানের বিস্তার করা যায়। এই সকল কাজের নমুনা হিসেবে বলা চলে, গ্রন্থাগারের বিশেষ পুস্তক সংগ্রহ অথবা নতুন সংযোজনের সংবাদ, অথবা বিশেষ কোনো কার্যাক্রমের বিজ্ঞাপন ঐ এলাকার বিশেষ বিশেষ স্থানে—যেমন বিদ্যালয়, পৌর সংস্থা, ডাকঘর, আদালত, সমিতি বা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি স্থানে প্রচার করা যায়। স্থানীয় পত্রিকা বা সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে গ্রন্থাগারের নানাবিধ কার্যধারা অথবা কোনো বিশেষ বক্তৃতার ব্যবস্থা করার কথা সাধারণের গোচরে আনা যায়। ইস্তাহার বিলি ক'রে বা প্রাচীর পত্র টাঙিয়ে দূরবর্তী অঞ্চলে বা ঘনবসতি শহরে এ জাতীয় ঘোষণা সম্ভব।

গ্রন্থাগার থেকে প্রচার পত্র বা বুলেটিন প্রকাশ বিশিষ্ট প্রকল্প ব'লে নিঃসন্দেহে স্বীকৃত। এটি বিনা মূল্যে বিলি করা চলে বা স্বল্প মূল্যে বিক্রিও করা যায়। প্রচার পত্র দু'রকমের হতে পারে। প্রথমটি স্থায়ী পরিচয়. দ্বিতীয়টি ক্রমিক কর্মকাণ্ডের বিবৃতি। স্থায়ী পরিচয় পত্র হিসেবে একটি ছোট পুস্তিকা ছাপিয়ে রাখা আবশ্যক। এর মধ্যে থাকবে গ্রন্থাগারের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ও পরিচিতি। গ্রন্থাগারটির নক্সা—যাতে বিভিন্ন বিভাগের অবস্থান নির্দেশিত হবে, গ্রন্থ বিন্যাস সংকেত এবং বর্গীকরণ, সূচীকরণ প্রকল্পের বিবরণ, গ্রন্থাগারের অনুসৃত নীতি এবং আইন কানুন। ক্রমিক পর্যায়ে গ্রন্থাগার থেকে নির্দিষ্ট কালের ব্যবধানে যে পুস্তিকা বা পত্রিকা প্রকাশিত হবে তাতে থাকবে ঐ সময়ের মধ্যে সংগৃহীত নূতন গ্রন্থাদির তালিকা, ঐ কাল ব্যবধানে গৃহীত বিশেষ প্রকল্প কথা—বক্তৃতা প্রদর্শনী ইত্যাদির বিবরণ এবং সেই সূত্রে সার লিখন বা বিশেষ পরিচয়, পরবর্তী পর্যায়ে গৃহীতব্য প্রকল্পগুলির বিজ্ঞপ্তি। এছাড়াও এটিকে কার্যকর ও আকর্ষনীয় ক'রে তুলবার জন্য বিশেষ কিছু প্রসঙ্গ, যেমন, গ্রন্থাগারের কোনো বিষয়ের গ্রন্থপঞ্জী, প্রাসঙ্গিক কোনো প্রবন্ধ. ইত্যাদি। এই প্রচার পত্র দেশের বিভিন্ন জায়গায় পাঠালে পারস্পরিক যোগসূত্র রক্ষা হয়, আন্তঃ গ্রন্থাগার ঋণ প্রকল্পেও সহায়তা করে।

স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা সমিতির সঙ্গে সহযোগিতায় নানান ধরণের আকর্ষণীয় প্রদর্শনীর আয়োজন করলে ব্যাপকতর ফললাভ হতে পারে। প্রদর্শনী. বিশেষ বক্তৃতা, স্থিরচিত্র, আলোক চিত্র; চলচিত্র ইত্যাদির সহায়তায় বিচিত্র ধরণের প্রসঙ্গ প্রচার করা যায়। স্বল্প বিদ্যা অথবা নিরক্ষর ব্যক্তিরাও এতে খুবই উপকৃত হন। দেশ-বিদেশের গ্রন্থ ও গ্রন্থ সংগ্রহের পরিচয়. বিশিষ্ট ব্যক্তি জীবনী. প্রাচীন ইতিহাস ও শিল্প নিদর্শন, স্থানিক ইতিহাস ও পরিচিতি ইত্যাদি বিষয় বৈচিত্র্যে এই প্রকল্পটিকে সমৃদ্ধ করে তোলা যায়। জন গ্রন্থাগারের সঙ্গে একটি ক'রে ভ্রাম্যমান শাখা থাকলে সুদূর গ্রামাঞ্চলেও পুস্তক সম্ভার বহন করে নেওয়া যায়। অর্থাৎ গ্রন্থাগারটিকেই যেন পড়ুয়াদের দরবারে উপস্থিত করা। এই ভ্রাম্যমানকে গ্রন্থাগার আসলে বিশেষ ভাবে সাজানো একটি গাড়ি। নির্ধারিত কয়েকটি দিনে বই এর লেনদেনর কাজ করে এই খুদে গ্রন্থাগার। এর সংগ্রহে রেকর্ড, ছবি ইত্যাদিও রাখা যায়। এবং চিত্রাদি প্রদর্শন সামগ্রীও অন্তর্ভুক্ত করলে আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে। ভ্রামামান গ্রন্থাগার-শকট একটি কামরায় নিবদ্ধ হতে পারে

—যার মধ্যে গিয়ে পড়ুয়ারা বই বাছাই করে আনতে পারেন। অথবা এই শকট যোগে কয়েকটি বাক্সে করে বই বয়ে নিয়ে যাওয়া চলে, —ব্যবহারিক সুবিধার জন্য যে গুলির মুখ গাড়ির পাশের দিকে রেখে বাইরে থেকে ডালা খুলে পড়ুয়াদের সামনে পুস্তক সম্ভার উন্মুক্ত ক'রে দেওয়া যায়; পড়ুয়ারা গাড়িটির পাশে দাঁড়িয়ে বই বাছাই করতে পারেন।

গ্রন্থাগার প্রচার ও প্রসারের শেষতম এবং বিশিষ্টতম পর্যায় ব্যক্তিগত যোগাযোগ। প্রচারের যত মোক্ষম বিধিই থকুক না কেন, ব্যক্তিগত যোগাযোগ না থাকালে সেগুলি ম্লান হয়ে পড়ে। গ্রন্থসামগ্রী পাঠকদের কাছে যান্ত্রিক ভাবে তুলে ধরলে অথবা প্রদর্শনী ইত্যাদি নিস্পৃহ উদাসিন্যে সম্পন্ন করলে প্রচার-গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য শেষ হয়েছে বলে মনে করা সঙ্গত নয়। ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে কাজটি সফল ক'রে তুলতে হবে। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেন, 'প্রত্যেক লাইব্রেরির অন্তরঙ্গ সভ্য রূপে একটি বিশেষ পাঠকমণ্ডলী থাকা চাই। সেই মণ্ডলীই লাইব্রেরিকে প্রাণ দেয়। লাইব্রেরিয়ান যদি এই মণ্ডলীকে তৈরি করে তুলে একে আকৃষ্ট করে রাখতে পারেন তবেই বুঝব তাঁর কৃতিত্ব।' এই মণ্ডলীকে ব্যাপকতর করে সমাজের মধ্যে বিশেষ প্রেরণার সঞ্চার করতে পারেন তিনি। তাঁর পরিমণ্ডলের, অর্থাৎ সীমাভুক্ত অঞ্চলের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য তাঁর জেনে রাখা দরকার। ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনার সূত্রে সকলের প্রবণতা বুঝে দেখবেন অস্পষ্টতা থাকলে স্পষ্টতর ধারণা গ'ড়ে তুলতে সহায়তা করবেন। প্রয়োজন হলে বাড়িতে বাড়িতে গিয়েও যোগসূত্র গড়ে তুলবেন। সমাজের যে কোনো শ্রেণীর লোকেরাই প্রয়োজনে নিজের সাধ্যমতো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারেন গ্রন্থাগারিক। এবং এই মনোভঙ্গির ফলে গ্রন্থাগার প্রচার ও প্রসারের কাজ প্রেরণা পায়।

বহিরঙ্গ প্রচার, অর্থাৎ গ্রন্থাগারের বাইরে এই প্রচারের কাজ প্রকৃতপক্ষে প্রসারের ( Library extension ) কাজ। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার অথবা শিক্ষা বিভাগগুলি যেমন শিক্ষা-সম্প্রসারণ বক্তৃতামালার ( Extension lecture ) ব্যবস্থা ক'রে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা ক্ষেত্রকে ব্যাপ্ততর করে, পাঠচক্র বা আলোচনা সভার ( Reading Circle, Symposium ) মাধ্যমে সম্প্রসারণের কাজ করে, জনগ্রন্থাগার গুলিও এ জাতীয় পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে শিক্ষা প্রসার করে। শিক্ষার মাধ্যম এযুগে কেবলমাত্র গ্রন্থের মধ্যে আবদ্ধ

নেই, এমন কি কেবল মাত্র বক্তৃতা আর আলোচনা সভাই ব্যাপ্তি দান করেনা, গ্রন্থাতিরিক্ত বহুবিধ মাধ্যমের প্রচল হয়েছে আজকাল। গ্রামোফোনের সাহায্যে তথ্যের ধারণ সম্ভব হয়েছে এবং আরো এক ধাপ এগিয়ে এসেছে টেপ রেকর্ডার। স্থির চিত্রের পরে এসেছে সবাক চিত্র। আলোক চিত্রের পরে এসেছে অনুচিত্রণ। এসেছে বেতারের পরে টেলিভিশন। সুতরাং গ্রন্থাগারের প্রসারক্রিয়া বিচিত্রতর হয়েছে। শিক্ষার প্রসারে গ্রন্থ পাঠের তথাকথিত একঘেয়েমি এবং বক্তৃতা বা আলোচনার তথাকথিত শুষ্কতা দূর হয়েছে, আগ্রহ এবং কৌতুহল বেড়ে গিয়েছে, প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে পরিকল্পনা এবং তার রূপায়ণ। শিক্ষিতরা পাচ্ছেন বৈচিত্র্য, নিরক্ষররা পাচ্ছেন আনন্দ। এমন কি মূক বধির চক্ষুহীনরাও বঞ্চিত হচ্ছেন না। শিশু বা বৃদ্ধ, রুগ্ন বা অক্ষম, কুলবধূ বা পর্দানসীন—সকলের সামনেই গ্রন্থাগার তা'র সম্পদ নিয়ে হাজির হতে পারছে।

——

# ৪র্থ অধ্যায়

## সমাপক

### একালের গ্রন্থসংগ্রহ-কথা ; গ্রন্থাগার আন্দোলন

মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার হ'ল যেদিন সেদিন থেকেই গ্রন্থজগতে আধুনিক যুগের সূত্রপাত একথা কাল-ব্যবধানের হিসেব মনে রেখেও বলা যায়। একদা কাগজের আবিষ্কার যেমন গ্রন্থরচনার ব্যাপারে নতুন যুগের প্রবর্তন করেছিল, মুদ্রণের যান্ত্রিক মাধ্যম ঘটাল যুগান্তকারী গ্রন্থ বিপ্লব। যদিও ১০৪০ খ্রীষ্টাব্দে চীন দেশে হরফ-মুদ্রনের কৃতিত্ব দেখা গিয়েছিল, তবু স্বভাবতই সেই মাটির ছাঁচের ব্যাপক প্রসার ঘটেনি, সবদিক থেকেই এর ক্ষমতা ছিল সীমিত। এবং পরবর্তীকালে মাটির বদলে কাঠের ছাঁচ তৈরি হলেও ঐ একই কারণে তা'র বহুল ব্যবহার ঘটেনি। আধুনিক মুদ্রন যন্ত্রের আবিষ্কারের কৃতিত্ব অর্পন করা হয় জার্মানির মাইন্‌জ্ ( Mainz ) শহরের জোহান গুটেনবুর্গের ( John Gutenberg ) উপরে। অপর দাবিদার হল্যাণ্ডের লরেন্স য়ানস্থন কস্টর ( Laurens Janszoon Coster )। গুটেনবুর্গের যন্ত্র আবিষ্কারের কাল সম্ভবত ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দ। এই কাল নির্ধারণের কারণ তিনি ১৪৫০ থেকে ১৪৫৬ এই কালের মধ্যে বিখ্যাত ৪২-পংক্তি সংবলিত বাইবেল গ্রন্থ ( Fortytwo line Bible ) মুদ্রিত করেন। ইংলণ্ডে প্রথম মুদ্রণ গৌরবের অধিকারী উইলিয়াম ক্যাক্সটন ( William Caxton )। তিনি ১৪৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েষ্ট মিনষ্টারে তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'দার্শনিকদের সুভাষিত' ( The ' ayings of the Philosophers ) মুদ্রিত করেন। তারপরে দেখা যায় ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দেই সুইজারল্যাণ্ডে প্রথম কোষগ্রন্থ মুদ্রিত হয়ে গেল। ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় (তখন আমেরিকান কলোনি ) প্রথম গ্রন্থ 'বে সাম বুক' (Bay Psalm Book) মুদ্রিত হল। বস্টন শহরে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হল ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে।

গ্রন্থমুদ্রন পঞ্চদশ শতাব্দি থেকেই সুরু হয়ে গেলেও নানান দেশে তা'র প্রসার এবং আধুনিক শিক্ষা ও গ্রন্থাগারের আরম্ভ সপ্তদশ শতাব্দিতে। ষোড়শ শতাব্দি থেকেই ইউরোপে নানাবিধ গ্রন্থাগার গ'ড়ে উঠতে থাকে। রোমের ভাটিকান, মিলানে এম্‌ব্রোসিয়ান, প্যারিসে বিবলিওতেক নাসিওনেল, অষ্ট্রিয়ার

রয়াল প্রভৃতি গ্রন্থাগারের নাম বিক্ষিপ্ত ভাবে উল্লেখ করা যায়। ইংলণ্ডে অক্স-ফোর্ডের বডলিয়ান লাইব্রেরি স্থাপিত হয় ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ২০০০ বই নিয়ে। ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দেই এই গ্রন্থাগার থেকে প্রথম মুদ্রিত পুস্তক তালিকা প্রকাশিত হয়। অবশ্য জার্মানিতে পূর্বেই ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়েছিল গ্রন্থতালিকা। ইংলণ্ডে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় পঞ্চদশ শতাব্দিতে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে প্রতিষ্ঠা ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। উনবিংশ শতাব্দির প্রথমার্ধে এর গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থরক্ষক ( Keeper of Books ) নিযুক্ত হন এন্টনি পানিৎসি ( Anthony Panizzi ); তিনি মিউজিয়ামটির জন্য একটি সূচীকানুন ( Cataloguing Code ) প্রস্তুত করেন। সমসাময়িক কালেই এডোয়ার্ড এডোয়ার্ড্স্ প্রমুখ পণ্ডিতেরা জনগ্রন্থগারের পত্তনের জন্য চেষ্টা সুরু করেন। অবশ্য ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দেই ইংলণ্ডে একটি জনগ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছিল। এডোয়ার্ড্সের প্রচেষ্টায় ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে জনগ্রন্থাগার প্রকল্প সমীক্ষার জন্য একটী কমিশন গঠিত হয়, এবং ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রস্তুত হয় জনগ্রন্থাগার আইন ( Public Libraries Act )। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই চালু হয়ে গেল ৬০০টি জনগ্রন্থাগার।

আমেরিকায় ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়, ১৭৪৬-এ প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় গ'ড়ে উঠল। হার্ভার্ডের গ্রন্থাগার সুরু হয় ৩২০ টি বই নিয়ে। আজ এটি পৃথিবীর বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ( ১৯৬৭-র সমীক্ষায় গ্রন্থসংখ্যা ৪,০০০,০০০ )। লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮১৪-তে এটিকে পুড়িয়ে দেয় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা। পরবৎসর (১৮১৫ জেফারসনের ব্যক্তিগত ৬,৪০০ গ্রন্থ সংগ্রহ নিয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় গ্রন্থাগারটি। আমেরিকায় জনগ্রন্থাগারের সূত্রপাত চাঁদাভিত্তিক গ্রন্থাগার এবং ব্যক্তিগত বা ব্যষ্টিগত মালিকানার গ্রন্থাগার থেকে। যেমন, ১৮০৭-এ স্থাপিত বস্টন এথিনিয়াম ( Boston Atheneum ) থেকেই ১৮৫৪-তে বস্টন পাবলিক লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা। এবং এই থেকেই সুরু ব্যাপক জনগ্রন্থাগার আন্দোলনের। অবশ্য ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরি কোম্পানিকেই জনগ্রন্থাগারের জনক বলা যায়। ১৮৫৪-তে উক্ত দেয়ক-বিহীন জনগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগার আইনও প্রণীত হয়, এবং এটিই পৃথিবীর সর্বপ্রথম গ্রন্থাগার আইন। মেলভিল ডিউই দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতি প্রণয়ন করেন ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে।

ব্রিটেনের গ্রন্থাগার পরিষদ সূচীকরণ বিধি প্রবর্তন করে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে, আমেরিকার গ্রন্থাগার পরিষদের সূচীকরণবিধিও ঐ একই অব্দে প্রকাশিত।

গ্রন্থসংখ্যার প্রভূত বৃদ্ধি এবং শিক্ষার প্রসারের ফলে আধুনিক কালে স্বভাবতই গ্রন্থাগারের পরিমান ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন পৃথিবীর সর্বত্রই প্রতিটি মানুষ শিক্ষিত হয়ে উঠবার সুযোগ পাচ্ছে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে দূরত্ব কমে আসছে, যোগাযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতিসঙ্ঘের শিক্ষাপ্রসার পরিকল্পনার ফলে পৃথিবীর অনগ্রসর দেশগুলিতেও গ্রন্থাগার আন্দোলন হয়ে উঠেছে ব্যাপকতর। পৃথিবীর প্রত্যেক অঞ্চলে গ'ড়ে উঠছে গ্রন্থাগার। এযুগের বৈশিষ্ট্য জনগ্রন্থাগার এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের পরিকল্পনা। এই সূত্রে পশ্চিম জগতের কয়েকটি জাতীয় গ্রন্থাগারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

১। ব্রিটিশ মিউজিয়াম গ্রন্থাগার। প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। কটন লাইব্রেরির অধ্যক্ষগণের চেষ্টায় ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আনীত প্রস্তাবে উক্ত গ্রন্থাগার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করবার সূত্রেই ব্রিটিশ মিউজিয়াম গ্রন্থাগারের সূত্রপাত। লাইব্রেরি গ'ড়ে তোলার ইতিহাসে পানিৎসির ( Panizzi ) নাম অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। জাতীয় সংগ্রহশালা এবং গ্রন্থসংগ্রহ এই দুই অঙ্গে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত। অন্যূনপক্ষে ৬০,০০০ পুথি সংগ্রহ ১০০,০০০ সনদ ( charter ), ১৮,০০০ প্রাচীন শীলমোহর, ৩,০০০ গ্রীক ও লাতিন পেপিরস পুস্তক যেমন এর সম্পদ বৃদ্ধি করেছে, তেমনি কয়েক লক্ষ মানচিত্র, গীতলিপি, পত্রপত্রিকা ইত্যাদি এর সংগ্রহভুক্ত। এই সঙ্গে মুদ্রিত গ্রন্থসংগ্রহ তো আছেই। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসংগ্রহে এটি জগদ্বিখ্যাত। নবনির্মিত ভবনে এর সংগ্রহশালা ( museum ) থেকে গ্রন্থাগারটিকে পৃথক করা হবে, স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে পারবে ব্রিটিশ জাতীয় গ্রন্থাগার। বিশালতা এবং জটিলতার জন্য গ্রন্থসংগ্রহ স্বতন্ত্র বিষয় বিভাগে বিন্যাসের কাজ কঠিন হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন সংগ্রহ বিভাগের মধ্যে দূরত্বের সৃষ্টি হলে অবশ্যই কার্যকর অসুবিধা দেখা দেয়। তাই হয়েছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের বিজ্ঞান এবং প্রকৌশল সংগ্রহকে আলাদা করাতে। মার্কিন লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস এবং রুশ লেনিন লাইব্রেরি নবনির্মিত সংযোজন ভবনের সঙ্গে মূল গৃহের যোগাযোগ সহজ করবার জন্য ভূগর্ভে পথসংযোগ তৈরি ক'রে নিয়েছে।

ব্রিটিশ জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর প্রকাশকেন্দ্র ব্রিটিশ মিউজিয়াম। সমগ্র ব্রিটিশ

ভূখণ্ডে প্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থের বিবরণ এতে পাওয়া যায়। তাছাড়া সমগ্র সংগ্রহের তালিকা (Catalogue) ছাপানোর প্রকল্প ও এই গ্রন্থাগারের অঙ্গীভূত। উপরন্তু বিশেষ বিশেষ সংগ্রহসূচীও প্রকাশিত হয়।

ব্রিটিশ মিউজিয়াম ব্যতীত আরো দু'টি গ্রন্থস্বত্ব ভোগী (Copyright) গ্রন্থাগার আছে যুক্তরাজ্যে। ওয়েল্স (Wales) এবং স্কটল্যাণ্ডের জাতীয় গ্রন্থাগার।

২। বিবলিওতেক নাসিওনেল। ফরাসী রাজাদের সংগ্রহ থেকে ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে গ'ড়ে ওঠে। সপ্তদশ শতাব্দিতে চতুর্দশ লুই-এর রাজত্বকালে এটি প্রভূত ভাবে বিস্তার লাভ করে এবং জনগণের ব্যবহারের জন্য এটিকে উন্মুক্ত করা হয়। ফরাসী বিপ্লবের পর যখন গির্জা সমূহের গ্রন্থ সংগ্রহ বাজেয়াপ্ত হয় তখন ন্যূনপক্ষে ৩০,০০০ গ্রন্থ ও পুথি জাতীয় গ্রন্থাগারভুক্ত হয়। এই সূত্রে জোসেফ ভ্যান প্রীচের নাম উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থাগারের সংগ্রহে আছে মিশরের প্রাচীনতম পেপিরস পুস্তক—সম্ভবত ২৮৮০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে লিখিত 'দি প্রিসে পেপিরস' (The Prisse Papyrus)। প্রায় ৫,০০০,০০০ গ্রন্থ ও পুথি, ৪০০,০০০ মানচিত্রাদি, ৪৫০,০০০ পদক ও মুদ্রা, ১৩০,০০০ সাময়িকী প্রভৃতি এই সংগ্রহ শালার গৌরব বৃদ্ধি করেছে। গিলে মালে (Gilles Mallet) ১৩৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম সূচী তৈরী করেন—যার পাণ্ডুলিপি আজো সংরক্ষিত আছে। ১৫৩৭ থেকে প্রকাশকদের গ্রন্থ জমা দেবার নীতি চলে আসছে—গ্রন্থস্বত্ব গ্রন্থাগার হিসেবে। এখন সাপ্তাহিক গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশিত হয়। আধুনিক সূচী ও তালিকা করন সূত্রে জোসেফ নোদে (Joseph Naudet)-এর নাম উল্লেখ্য।

৩। লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস। আধুনিক কালের বৃহত্তম গ্রন্থাগার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস মাত্র ৩,০০০ গ্রন্থ নিয়ে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। আমেরিকা অর্বাচীন দেশ হলেও বলিষ্ঠ পদযাত্রায় অনেককে পিছনে ফেলে এগিয়ে এসেছে পুরোভাগে। প্রতিষ্ঠিত হবার কিছুকাল পরেই. ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের অগ্নি সংযোগে ওয়াশিংটনের অনেক কিছুর সঙ্গে এটিও ভস্মীভূত হয়। পর বৎসরই তদানীন্তন মার্কিন প্রেসিডেণ্ট টমাস জেফারসন তাঁর নিজস্ব ৬,৪০০ গ্রন্থসংগ্রহ দিয়ে এটিকে পুণ: প্রতিষ্ঠিত করেন। গ্রন্থাগারের ইতিবৃত্তে দেখা যাচ্ছে, ১৮৬১-তে গ্রন্থাগারিক স্পফোর্ড মাত্র ৭ জন কর্মী, ২টি কামরা এবং ৬৩,০০০ গ্রন্থসংগ্রহ নিয়ে কাজ চালাচ্ছেন। কিন্তু এর বৃদ্ধি

এবং ভবিষ্যৎ কর্মধারা ও নূতন ভবনের চেহারাটা তিনি ছকে দিয়েছিলেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বস্টন পাবলিক লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক পাটনাম লাইব্রেরী অফ কংগ্রেসের গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। ঐ সময়ে গ্রন্থসংখ্যা ছিল ৮০০,০০০; এবং ১৯৩৯-এ সেই সংখ্যা বর্ধিত হয়ে ৬,০০০,০০০ হয়। এখন অন্তত দেড় কোটি গ্রন্থ এবং সাড়ে চার কোটি পুথি, মানচিত্র, রেকর্ড ইত্যাদি আছে এর সংগ্রহে। সংগ্রহ দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে, কেননা লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস যুক্তরাষ্ট্রের গ্রন্থস্বত্ব গ্রন্থাগার হিসেবে যেমন কাজ করছে তেমনি পৃথিবীর সব দেশের সঙ্গে পুস্তক পত্রিকাদির বিনিময় ও সংগ্রহ প্রকল্প এর বিশেষ কার্যক্রম হিসেবে রয়েছে। কর্মবৈচিত্র্যে গ্রন্থাগার জগতে এটি তুলনারহিত। তথ্য সন্ধান ও গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন থেকে সুরু ক'রে আইন জগৎ ও বিধান পরিষদের প্রয়োজনে যাবতীয় তথ্যাদি সরবরাহ করা যেমন এর কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। তেমনি এখানে রয়েছে প্রাচীন পুথি থেকে সুরু করে আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ। জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশ না করলেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মহাদেশের গ্রন্থপঞ্জী সহায়ক কাজ, বিজ্ঞান জগতের প্রতি বিভাগের জন্য সংস্থা, রাশিয়া, চীন, আফ্রিকা প্রভৃতি সংক্রান্ত বিশেষ গবেষণা—সবাই এর কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্ত। যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত সমগ্র বইএর কেন্দ্রীয় সূচীকরণ প্রকল্প লাইব্রেরি অফ কংগ্রেসের অন্যতম বিশিষ্ট অবদান। লাইব্রেরি অফ কংগ্রেসের নিজস্ব গ্রন্থবর্গীকরণ পদ্ধতি আছে, এবং সে পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য। ডিউই দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতিপ্রকাশন ও পরিমার্জনের দায়িত্ব নিয়ে একটি বিভাগও এর অন্তর্ভুক্ত।

৪। লেনিন স্টেট লাইব্রেরি। মসকৌ শহরে অবস্থিত রাশিয়ার জাতীয় গ্রন্থাগার। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় মসকৌ শহরের রুম্যান্ত্‌সেভ্‌ পাবলিক মিউজিয়াম। রুশ বিপ্লবন্তে সোভিয়েত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর লেনিন প্রবর্তিত জনশিক্ষা প্রকল্পের ফলস্বরূপ যাবতীয় ব্যক্তিগত অথবা প্রতিষ্ঠানগত গ্রন্থসংগ্রহের রাষ্ট্রিয়করণ সূত্রে রুম্যান্ত্‌সেভ্‌ মিউজিয়ামটি জাতীয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার হিসেবে গ'ড়ে ওঠে। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে এই গ্রন্থাগারের নাম হল লেনিন স্টেট লাইব্রেরি। ১৮ তলা বিশিষ্ট এই সুবিশাল গ্রন্থাগারে ১৭০টি ভাষার প্রায় আড়াই কোটি পুস্তক ও পত্রিকাদি আছে। প্রতি বছর অন্তত ৮০ হাজার বিদেশী বই এবং ১৩ হাজার সাময়িকী নথিভুক্ত হয়। আন্তর্জাতিক গ্রন্থ বিনিময় সূত্রে অন্তত ৮১টি দেশ থেকে এই গ্রন্থাগারে

বই আসে। এখানে বিদেশী বই এবং রুশ বইএর জন্য স্বতন্ত্র সূচীকরণ প্রকল্প চালু আছে।

জাতীয় গ্রন্থাগার, দেশজোড়া জনগ্রন্থাগার এবং বিশেষ বিশেষ শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থাগার এ যুগে সারা পৃথিবীতে গ'ড়ে উঠছে। প্রত্যেক নাগরিককে শিক্ষিত এবং সমাজ সচেতন ক'রে তুলবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একালে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। প্রত্যেক সরকারেরই কর্তব্য এই দায়িত্ব পালন। একালের গণচেতনা এবং গণতান্ত্রিক গড়ন সেই সুযোগ এবং শপথ এনে দিয়েছে। ইউরোপীয় দেশগুলিতে গ্রন্থাগারের বিকাশ এবং অগ্রগতি এসেছে সবার আগে। জার্মানিতে ফেডারেশন পদ্ধতির দেশবিন্যাস হবার দরুণ এখানে অন্যান্য দেশের মতো একটিমাত্র প্রধান জাতীয় গ্রন্থাগার গ'ড়ে ওঠেনি। তবে প্রুশিয়ান ষ্টেট লাইব্রেরী একাজ বহুল পরিমাণে ক'রে এসেছে। জার্মানির প্রধান বৈশিষ্ট্য— যা'তে সে অন্যান্য দেশের উপরে টেক্কা দিয়েছে— সেটি এখানকার আঞ্চলিক রাজ্যগ্রন্থাগার প্রণালী,— স্টাট্‌স্‌বিব্‌লিওতেকেন ( Staatsbibliotheken ) এবং লাণ্ডেস্‌বিব্‌লিওতেকেন ( Dandesbibliotheken )। এগুলির সহযোগিতা করে ডয়শে ফোরশুংস্‌গেমাইনশাফ্‌ট্ ( Deutsche Forschungsge meinschaft ) নামক বেসরকারী সংস্থা, যেটিকে সরকারও কিছু সাহায্য করে। ১৯৪৯ থেকে এই সংস্থা জাতিক বিশেষত্ব অর্জন করেছে, ৪০ টি বিশেষ গ্রন্থাগারে চালু করেছে ৯০ টি বিশেষ শিক্ষা বা গবেষণা প্রকল্প। ব্রোক হাউস নামক বিশিষ্ট প্রকাশন সংস্থা বহুকালের প্রয়াসের পর ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে 'ডয়শে বুকেরি' ( Eeutsche Bucheri ) নামক পুস্তকাগার স্থাপন করেছে বার্লিন শহরে। এই গ্রন্থাগার থেকেই বেরোচ্ছে জার্মানির জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী 'ডয়শে নেশনেল বিবলিওগ্রাফি'। ১৯৪০ থেকে এই গ্রন্থাগার সরকারী জনগ্রন্থাগার হিসেবে কাজ করছে।

এশীয় দেশগুলিতেও গ্রন্থাগার গ'ড়ে উঠেছে জাতীয় ভিত্তিতে। চীনের প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা সর্বজন বিদিত। সেকালের রাজাদের গ্রন্থাগার এবং বৌদ্ধ মঠাদির গ্রন্থসংগ্রহ জ্ঞানের যে ধারা বহন করেছে তার অনেকটাই যুদ্ধ-বিগ্রহ অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিনষ্ট হলেও যে সম্পদ এখনো বর্তমান আছে তাও বিশাল। পিকিং জাতীয় গ্রন্থাগারের পত্তন হয় ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে। এর সংগ্রহে আছে ত্রয়োদশ শতাব্দির দক্ষিণ সুং গ্রন্থরাজি, ঘিং ( ১৩৬৮—১৬৪৪ ) এবং চুং বা মাঞ্চু ( ১৬৪৪—১৯১১ ) রাজাদের গ্রন্থসংগ্রহ। এর সাম্প্রতিক

গ্রন্থসংখ্যা হবে ৪৫ লক্ষ, এবং বলা বাহুল্য—অতুলনীয় এর পুথিসংগ্রহ।

জাপানের ঐতিহ্যও চীনেরই অনুরূপ। তবে টোকিওর নেশনেল দায়েৎ লাইব্রেরি ( National Diet Library ) ১৯৪৮-এ প্রতিষ্ঠিত হয়। সুরু থেকেই এটি গ্রন্থস্বত্ব গ্রন্থাগার হিসেবে কাজ করতে থাকে। এই গ্রন্থাগারেরই দায়িত্বে রয়েছে পূর্বতন জাতীয় গ্রন্থাগার উএনো লাইব্রেরি (Ueno Library) এবং কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ( Central Library ) তাদের উভয়ের ১০ লক্ষ ক'রে গ্রন্থসংগ্রহ সমেত। এই গ্রন্থাগারের নিজস্ব গ্রন্থসংখ্যা প্রায় ২২ লক্ষ। জাপানের জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী, সাময়িকী সূচী প্রভৃতিও এখান থেকেই প্রকাশিত হয়।

আধুনিক গ্রন্থাগার স্থাপনের ক্ষেত্রে আফ্রিকার দেশসমূহও পিছিয়ে নেই। কায়রোতে অবস্থিত ইজিপশিয়ান নেশনেল লাইব্রেরি স্থাপিত হয় ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে। এর গ্রন্থসংখ্যা সাত লক্ষেরও অধিক। সম্প্রতি ইউনেস্কোর সহযোগিতায় ঘানা, নাইজেরিয়া, জাম্বিয়া প্রভৃতি ছোটখাট সকল স্থানেই জাতীর মর্যাদায় গ্রন্থাগার গ'ড়ে উঠছে। অনুরূপভাবে দক্ষিণ আমেরিকার রাজ্যসমূহেও গ্রন্থাগারের বিস্তৃতি ঘটেছে। অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলেণ্ড, কানাডা প্রভৃতি সম্পন্ন দেশের কথা তো বলাই বাহুল্য। অষ্ট্রেলিয়ার জাতীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয় কেনবেরাতে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে; গ্রন্থসম্পদ পাঁচ লক্ষাধিক। কানাডায় ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে গ্রন্থাগার চেতনা বৃদ্ধি পায়। নোভা স্কোটিয়াতে ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে মার্ক লেসকার্বটের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার উল্লেখযোগ্য। কুয়েবেক এ ( Quebec ) জেসুইটদের কলেজ গ্রন্থাগার গ'ড়ে উঠেছিল ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে—হার্ভার্ডেরও আগে। ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় গ্রন্থাগার আইন Bibliotheque Nationale du Quebec Act )-এর ফলে এই রাজ্যের 'লা বিবলিওতেক সেণ্ট সুলপিস্' ( La Bibliotheque Saint Sulpice ) নামক তথ্য গ্রন্থাগারটিকে জাতীয় গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করা হয়। এনড্রু কার্নেগীর বদান্য দানের ফলে ১৯০১ থেকে অনটারিয়ো প্রভৃতি রাজ্যে গ্রন্থাগারের পত্তনাদির কাজ বিশেষ প্রসার পায়। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের জন-গ্রন্থাগার আইনের ফলে কানাডায় ১৪টি আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠার কাজ সুরু হয়ে যায়।

ভারত বিভাগের পরে পাকিস্তান তা'র গ্রন্থের ভাগ নিয়ে করাচীতে লিয়াকৎ জাতীয় গ্রন্থাগারের পত্তন করে। এর হাজার চল্লিশেক গ্রন্থ সংগ্রহের

দুই তৃতীয়াংশই ইউরোপীয় ভাষারাজির। দেশের মধ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাত করেছে পাকিস্তান এবং গ্রন্থাগার সমিতির মাধ্যমে নানাবিধ আলোচনা সভা এবং পুস্তক তালিকা প্রকাশ করেছে। ঢাকাতেও পূর্বপাকিস্তান গ্রন্থাগার আন্দোলন সুরু হয়—এখন যেটি বাংলাদেশ গ্রন্থাগার আন্দোলন। আয়ুবের আমলে ঢাকায় জনগ্রন্থাগার তৈরি হয়—যদিও পরে এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারেরও আবাস হয়ে ওঠে। সম্প্রতি জনগ্রন্থাগারের জন্য স্বতন্ত্র" বিশাল বাড়ি তৈরি হয়েছে। এভাবে গোড়াপত্তন হবে বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগারের। গ্রন্থাগারবৃত্তি শিক্ষার পাঠক্রম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত এবং গ্রন্থাগার সমিতিতে শংসা Certificate ) শিক্ষাক্রম পর্যন্ত চালু আছে।

## ভারতীয় গ্রন্থাগার কাহিনী

ভারতে গ্রন্থাগার গঠন ও প্রসারের ইতিহাস তমসাবৃত। বস্তুতপক্ষে, প্রাচীন আমলে কোনো গ্রন্থাগার ছিল এমন প্রমাণ অবিসংবাদিত ভাবে মেলেনা। তবু সেকালের আশ্রম শিক্ষা এবং বৌদ্ধযুগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানাদির সংগঠনের যে ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় তা'র থেকে সেকালের গ্রন্থাগারের অস্তিত্বের ও ধারাবাহিকতার আভাস মেলে। প্রতীচ্যের দেশগুলিতে প্রাচীন কালে ব্যবহৃত মাটির চাকতি, পেপিরস, চামড়া প্রভৃতির পুথি সংগ্রহের নিদর্শন যেমন সেকালের গ্রন্থাগারেরর অস্তিত্বের সূচনা করে, সেই রকম কোনো প্রত্যক্ষ বা প্রামাণিক নিদর্শন ভারতবর্ষে মেলেনা। এর একটি কারণ ভারতে নানান দেশের নানান ধর্মের সাম্রাজ্যলিপ্সু জাতির আগমন এবং ধ্বংসলীলা। বিধর্মীরা এতদ্দেশে প্রচলিত ধর্ম-সমাজ রীতি-নীতি শিল্প-সংস্কৃতি সব ধ্বংস করে নিজেদের ধর্ম ও সংস্কার কায়েম করতে চেয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াও এইসব কারণে বিলুপ্ত হয়েছে বহু সামগ্রী। দ্বিতীয় কারণ, বৈদিক যুগ থেকে প্রচলিত গুরুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষা সেকালে সমাজের সর্বস্তরে প্রসারিত ছিলনা। সাধারণত ব্রাহ্মণরাই ছিলেন শিক্ষায় অধিকারী। বালক বয়সে শিক্ষার্থীরা গুরুগৃহে (আশ্রমে) যেত এবং দশবারো বছর বা আরো অধিককাল শিক্ষালাভ করে 'স্নাতক' হয়ে ফিরে আসত। গুরুর মুখ থেকেই শিক্ষালাভ; আশ্রম গ্রন্থ গৃহে রক্ষিত পুথি পাঠ করলেও সেগুলি নকল ক'রে আনার উপায়

ছিলনা। বিদ্যার ব্যাপকতায় এই সকল আশ্রমকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দেওয়াও অযৌক্তিক নয়। আশ্রম প্রধানকে বলা হত 'কুলপতি'; কোনো কোনো আশ্রমে দশ হাজার পর্যন্ত ছাত্রও থাকত বলে জানা যায়। সুতরাং একে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় বললে অত্যুক্তি হয় না। সেকালের শিক্ষার অধিক ভাগই ছিল মন্দির বা ধর্মকেন্দ্রিক। বহু মন্দিরেও পুথির সংগ্রহ থাকত এবং শিক্ষা দানের কাজও চলত। সর্বসাধারণ বিদ্বান হবার সুযোগ না পেলেও সমাজের সাংস্কৃতিক ধারা এমন ছিল যে ধর্মগ্রন্থাদির জ্ঞান তারা সহজেই লাভ করত। সেকালের ধর্মগ্রন্থাদি পাঠের সভা, কথকতা থেকে সুরু করে পালা-গান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এই অভ্যাস।

বৌদ্ধযুগে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার বিদ্যাকে জনসাধারণের কাছাকাছি এনে দেয়। সংস্কৃত ভাষা সাধারণের বোধগম্য ছিল না, অধিকারও ছিল না। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র লোক প্রচলিত পালি ভাষায় রচিত হওয়ায় এর আঙিনা অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ক'রে দেয়। বৌদ্ধ বিহারগুলি ছিল শিক্ষার কেন্দ্র। এরই সঙ্গে সঙ্গে চলেছিল ব্রহ্মণ্য শিক্ষার ধারা। বারাণসী, মিথিলা প্রভৃতি ছিল সংস্কৃত শাস্ত্র শিক্ষার কেন্দ্র বিন্দু। এই সকল স্থানে থাকত পুথির বিরাট সংগ্রহ। দক্ষিণ ভারতে গ্রন্থাগারের অস্তিত্বের নিদর্শন মেলে সে যুগের 'সরস্বতী ভাণ্ডার' প্রতিষ্ঠায়। সংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলিকে বলা হত অগ্রহার, ঘটিক এবং ব্রহ্মপুরী। উত্তর ভারতের তক্ষশীলা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় বিশিষ্ট। বৌদ্ধ বিহার গুলির মধ্যে নালন্দা, রাজগৃহ, ও দন্তপুরী, পাটলিপুত্র তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি বিখ্যাত। এই সবই বহিরাগত শত্রুর আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। মুসলমান বিজেতারা নিষ্করুণ ভাবে প্রায় সবই ভেঙ্গে-চুরে নষ্ট করেছে। তবু যে সব প্রমাণ পাওয়া যায় শু আন ৎসং (হুউএনৎসাং), ফা-শিয়েন (ফা হিয়েন), ই ৎসিং প্রভৃতি চীনা পরিব্রাজকদের প্রত্যক্ষদৃষ্টি বিবরণ থেকে তা'তে ভারতের গ্রন্থৈতিহ্য এবং গ্রন্থাগার সংগঠনের সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকে না। এই সকল শিক্ষার্থী পরিব্রাজক নালন্দা, ওদন্তপুরী, পাটলিপুত্র প্রভৃতির বৌদ্ধবিহার থেকে শিক্ষা সমাপনান্তে প্রচুর পরিমাণ অনুলিপি নিজ দেশে বহন ক'রে নিয়ে যান। ভারতীয় পণ্ডিত ভিক্ষু অসঙ্গ, কুমারজীব, দীপঙ্কর, শ্রীজ্ঞান, অতীশ প্রভৃতিরা দ্বীপময় ভারতে ও চীন, তিব্বত প্রভৃতি দেশে গিয়ে শাস্ত্রের অধ্যাপনা ও প্রচার করেন। যখন মুসলমান আক্রমণে ভারতের জ্ঞানপীঠ গুলি ধ্বংস হয়ে গেল এবং বৌদ্ধধর্ম তা'র জন্মভূমি

থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, তখন—উক্ত পণ্ডিতদের জ্ঞান প্রসারের ফলস্বরূপ—নিকট ও দূর প্রাচ্যের দেশগুলিতে অনুবাদের আকারে ধর্মশাস্ত্র গুলি থেকে গেল। এবং সেগুলিকে সংগ্রহ করে, পুণরনুবাদ ক'রে ভারতে অবলুপ্ত অংশগুলির পুণরুদ্ধারের কাজ সম্ভব হ'ল পরবর্তী কালের পণ্ডিতদের পক্ষে। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার যে সে যুগে মধ্য এশিয়া পর্যন্তও ব্যাপ্ত ছিল তারও নিদর্শন মেলে। অশ্ব ঘোষের রচনার কিছু অংশ যেমন আছে তুরফান সংগ্রহে;

প্রাক্-বৌদ্ধ যুগের গ্রন্থাগার সম্পর্কে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বা নিদর্শন বিশেষ না মিললেও সেকালের শিক্ষাধারা ও আশ্রমরীতির উল্লেখ সূত্রে গ্রন্থাগারের অস্তিত্বের অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু বৌদ্ধযুগে শিক্ষার সংগঠন এবং গ্রন্থাগার গঠন যেভাবে হয়েছিল তা'র প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে এবং প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে গ্রন্থাগারের অস্তিত্বের অবিসংবাদিত প্রমাণ মেলে। এমনই এক বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান ছিল নালন্দায়,— যা'র কথা গ্রন্থারম্ভে উল্লিখিত হয়েছে। নালন্দা মহাবিহার ও বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে গুয়ান ৎসং এবং ই ৎসিং যথাক্রমে ৬৪৫ ও ৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে এখানে এসে যা দেখেছেন তা লিপিবদ্ধ ক'রে গিয়েছেন। এছাড়াও তিব্বতী রচনায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ মেলে। এই সকল সূত্র থেকে জানা যায় অন্তত ৪০০ খ্রীষ্টাব্দে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ ঐশ্বর্যশালী ছিল। হাজার হাজার শিক্ষার্থী এখানে অধ্যয়ন করতে আসতেন, এখানকার পুথি সংগ্রহ ছিল সুবৃহৎ। তিনটি বৃহৎ বাড়িতে বিভক্ত ছিল এই গ্রন্থাগার। সেগুলির নামও ছিল স্বতন্ত্র,—'রত্নসাগর', রত্নরঞ্জক এবং 'রত্নদধি'। সমগ্রভাবে গ্রন্থাগার এলাকার নাম ছিল 'রত্নগঞ্জ'। 'রত্নসাগর' সংগ্রহ শালাটিই ছিল নয় তলা বিশিষ্ট এক বাড়িতে। বৌদ্ধ, অ-বৌদ্ধ সবরকম পুথিই ছিল গ্রন্থাগার সংগ্রহে। চৈনিক শিক্ষার্থী ই ৎসিং দশ বছর এখানে ছিলেন এবং কমপক্ষে চারশো সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ তিনি স্বদেশে নিয়ে যান। গ্রন্থাগারে বেদ, বেদান্ত, সাংখ্য দর্শন, পুরাণ, সাহিত্য, ব্যকরণ, তর্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষ শাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতি সেকালীন সকল বিষয়েরই পুথি ছিল, এবং এই সকল বিষয়েরই পঠন-পাঠন হ'ত। বিবরণ থেকে জানা যায় পুথি সমূহ প্রায় সবই ছিল তালপাতার, কাপড়ে জড়িয়ে সূতো দিয়ে বেঁধে পাথরের বা ইটের তাকের উপরে রাখা হ'ত। পড়ুয়ারা মেঝেতে বসেই পড়তেন। বিশেষ গবেষকদের জন্য স্বতন্ত্র কামরার ব্যবস্থাও ছিল। দ্বাদশ

শতাব্দীর শেষ দিকে বক্তিয়ার খিলজির আক্রমনে এই মহাবিহার ও গ্রন্থাগার সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ধর্মোন্মত্ততা এবং সাম্রাজ্য লিপ্সা ভারতের সংস্কৃতিকে বারবার যেভাবে খর্ব করতে চেয়েছে। যেভাবে ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে বিনষ্ট করতে প্রয়াসী হয়েছে এটি তার এক বেদনা দায়ক নিদর্শন। বিক্রমশীলা মহাবিহার এবং গ্রন্থাগারটিও অনুরূপ ভাবেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

পশ্চিম ভারতে বলভীর বিদ্যালয়ও খুবই খ্যাতি অর্জন করেছিল। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে শিক্ষার্থীরা এখানে অধ্যয়ন করতে আসতেন। অষ্টম শতাব্দির শেষভাগে আরব আক্রমণের ফলে এটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ধ্বংসস্তূপ থেকে কিছু তাম্রানুশাসন পাওয়া গিয়েছে যার থেকে এই মহাবিদ্যালয় ও মহাবিহারের কিছু নিদর্শন মেলে।

সেকালের আরেক বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র গন্ধার রাজ্যের তক্ষশীলা। বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়নের এবং দর্শন শাস্ত্র ও অষ্টাদশ শিল্পচর্চার এটি ছিল বিশিষ্ট কেন্দ্র। মিথিলা, উজ্জয়িনী, বারাণসী প্রভৃতি জায়গা থেকে পর্যন্ত এখানে আসতেন শিক্ষার্থীরা। খ্রীষ্টিয় তৃতীয় শতকে কুশান রাজত্বকাল পর্যন্ত তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামডাক ছিল। এখানেও পরবর্তীকালে বৌদ্ধ জ্ঞানপীঠ গ'ড়ে উঠেছিল। আক্রমণকারী বিদেশীদের হানায় এ সবই অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

দক্ষিণ ভারতে নাগার্জুন কোণ্ডাতে নাগার্জুন বিদ্যাপীঠ বৌদ্ধসংস্কৃতি-কেন্দ্র হিসেবে খ্যাতিমান হয় খ্রীষ্টিয় সপ্তম শতাব্দিতে। পাহাড়ের উপরে অবস্থিত এই বিদ্যায়তনের নাম ছিল 'পর্বতবিহার'। পাঁচতলা ইমারতের সর্বোচ্চ তলায় ছিল গ্রন্থাগার। বিখ্যাত পণ্ডিত নাগার্জুন এঁটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে রসায়নাদি শাস্ত্র এবং বৌদ্ধ মহাযান শাস্ত্র চর্চার প্রবর্তন করেন। অমরাবতী এবং নাগার্জুন কোণ্ডার খননকার্যে এর অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। এখানকার সংগ্রহে ত্রিপিটক এবং বৌদ্ধ গ্রন্থই শুধু নয়, চিকিৎসা শাস্ত্র, খনিজবিদ্যা, ভূগোল, উদ্ভিদবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের পুথিরও ছিল। সুদূর ব্রহ্মদেশ, চীন, সিংহল প্রভৃতি দেশ থেকেও এখানে জ্ঞান আহরণের জন্য আসতেন শিক্ষার্থীরা।

মিথিলা স্মরণাতীত কাল থেকেই হিন্দু শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের বিশিষ্ট কেন্দ্র হিসেবে বিখ্যাত ছিল। ন্যায় দর্শনের চর্চায় মিথিলা পঞ্চদশ শতাব্দি পর্যন্ত স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। গঙ্গেশ উপাধ্যায় কৃত নব্যন্যায় শাখার

'তত্ত্ব চিন্তামণি' গ্রন্থ বহু শতাব্দি ধ'রেই আলোচনার বিষয় ব'লে গণ্য হয় এবং এর প্রচুর টীকা গ্রন্থ রচিত হয়। বাংলাদেশে নবদ্বীপ ছিল প্রাচীন কাল থেকে ন্যায়দর্শন অধ্যায়নের বিখ্যাত কেন্দ্র। মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের আমলে নবদ্বীপ যখন ছিল গৌড়ের রাজধানী তখন এই ন্যায়চর্চা বিশেষ ভাবে বিকাশ লাভ করে। সেকালে যেসব শিক্ষার্থী মিথিলায় যেতেন তাঁরা গুরুর কাছে বসে বিদ্যালাভ করতেন, কিন্তু কোনো পুথির নকল নিয়ে আসতে পারতেন না। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও নবদ্বীপ মিথিলার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণি ন্যায় চর্চার প্রবর্তন করেন। এই ন্যায়চর্চা গ'ড়ে ওঠার পিছনে একটি বিস্ময়কর ইতিহাস আছে, – যেটির উল্লেখ করা হয়েছে প্রথম অধ্যায়ে। পঞ্চদশ শতাব্দিতে বাসুদেব সার্বভৌম ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য মিথিলায় যান, এবং তীক্ষ্ণ মেধার জন্য 'সার্বভৌম' উপাধি লাভ করেন। কিন্তু পুথি নকল ক'রে আনা সম্ভব ছিল না। বাসুদেব করলেন কি, সমগ্র 'তত্ত্ব চিন্তামণি' এবং 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি' কণ্ঠস্থ ক'রে নিয়ে এলেন নবদ্বীপে, —লিখে ফেললেন বই দু'খানা। তাঁর এই নব্যন্যায় পাঠের প্রথম ছাত্র রঘুনাথ শিরোমণি, —যিনি মিথিলায় তাঁর গুরুকেও আলোচনায় পরাজিত করেন। এই ভাবেই নবদ্বীপের নব্যন্যায় পাঠের কেন্দ্র ভারতবর্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ আসনের গৌরব লাভ করে। এখানকার মহাবিদ্যালয়ের পুথি সংগ্রহ ছিল বিশাল। এখানেই কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ কৌল অথবা তন্ত্র শাস্ত্রের গোড়াপত্তন করেন। জ্যোতিবিদ্যা চর্চারও একটি শাখা পরে এখানে স্থাপিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দির এক হিসাবে দেখা যায় এখানে শিক্ষক সংখ্যা ছয়শত এবং শিক্ষার্থী সংখ্যা চার হাজার।

দক্ষিণ ভারতীয় কিছু প্রাচীন লিপি থেকে সেকালের কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারের বৃত্তান্ত জানা যায়। এই রকম একটি কেন্দ্র ছিল একাদশ শতাব্দিতে চালুক্য রাজকর্মচারী মধুসূদন প্রতিষ্ঠিত 'চটি কলাশালা'। এই আবাসিক মহাবিদ্যালয়ে ২৫২ জন শিক্ষার্থী বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন। আরও জানা যায় বিদ্যালয়ের গ্রন্থ সংগ্রহের ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক যিনি ছিলেন তাঁর মর্যাদা ছিল অধ্যাপকদের সমপর্যায় ভুক্ত। খিলজী ও তুঘলক বংশ শাসিত মধ্যযুগের ভারতে বিবিধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের ইতিহাস মেলে। বিশেষ ক'রে নবাবদের প্রাসাদ-গ্রন্থাগার গুলির। সুলতান জালালুদ্দীনের আমালে আমীর খসরু ছিলেন রাজ-গ্রন্থাগারিক বা

বা 'কিতাবদার'। তাঁর খ্যাতি পাণ্ডিত্যে, কবিত্বে এবং সংগীতবিদ হিসেবে সুবিদিত। শেখ নিজামুদ্দীন আউলিয়া সাধারণের চাঁদায় জনগনের ব্যবহারের জন্য একটি গ্রন্থাগার গ'ড়ে তুলেছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে গ'ড়ে উঠেছিল দক্ষিণ ভারতে তাঞ্জোরের প্রাসাদ গ্রন্থাগার 'সরস্বতী মহল'। এখানে বিশ হাজারেরও বেশী পুথি রক্ষিত আছে। এই সংগ্রহে দক্ষিণ ভারতীয় গোষ্ঠী ছাড়া দেবনাগরী, বাংলা, ওড়িয়া, কাশ্মীরী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার পুথিও অন্তর্ভুক্ত। সরভোজী মহারাজ ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে এটিকে আধুনিক ধাঁচে পুনর্গঠিত করেন। ক্রমে এর একটি সংগ্রহ তালিকাও মুদ্রিত হয়। বারানসীর সংস্কৃত চর্চার ধারা রাজনৈতিক ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে প্রায় অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে সেই ধারায় নূতন জোয়ার আসে। বার্নিয়েরের ভ্রমন বৃত্তান্তে বারানসীতে কবীন্দ্রাচার্যের প্রসঙ্গ আছে। এই পণ্ডিতের কাছে ভিড় ক'রে আসতেন সংস্কৃত শিক্ষার্থীরা। এঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ ছিল সুবিশাল। সংস্কৃত পুথিগুলি সুবিন্যস্ত পদ্ধতিতে রক্ষিত ছিল গ্রন্থাগারে। অন্যান্য বিষয়ের পুথিও ছিল তাঁর সংগ্রহে। সম্রাট সাজাহানও নাকি এই গুণীকে সম্মান করতেন, এবং যুবরাজ দারা ছিলেন তাঁর ভক্ত।

অম্বররাজ দ্বিতীয় জয়সিংহ জয়পুর শহরের যেমন স্রষ্টা ছিলেন তেমনি তাঁর প্রাসাদ গ্রন্থাগার গড়ে তোলেন ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে। সংস্কৃত, গ্রীসীয় ও আরবীয় ভাষার নানাবিধ মূল্যবান সংগ্রহে এটিকে তিনি বিশিষ্টতা দেন। জ্যোতিবিজ্ঞানের প্রাচীনতম পণ্ডিত উদ্যোক্তা হিসেবে তাঁর নাম সুবিহিত, এবং তাঁর গ্রন্থাগারে এ বিষয়ে গবেষণালব্ধ প্রচুর পুস্তক সংগৃহীত হয়। পৃথিবীর বহু স্থান থেকে তিনি গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। জয়পুরের 'মানমন্দির' এবং দিল্লির 'যন্তর মন্তর' আজও জয়সিংহের জ্যোতিবৈজ্ঞানিক কীর্তি ঘোষণা করছে।

মুসলমান রাজত্বকালে দেখা যায় একদিকে যেমন ভারতের পুস্তকাদি সম্পদ তারা ধ্বংশ করেছিল তেমনি অপর দিকে শিক্ষা প্রসারেরও পত্তন করেছিল। এমন কি, মহম্মদ ঘোরী ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে গজনিতে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন। তুঘলক সম্রাটদের আমোলেও বেশ কয়েকটি মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। তাঁদের প্রাসাদে ছিল 'কিতাবশালা'। ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দের এক বিবৃতিতে দেখা যায় দিল্লির প্রাসাদ গ্রন্থাগারে অন্তত ৪০'০০০ পুথি ছিল। যার

মূল্য সেকালের হিসাবে হবে ৬০,০০০,০০ টাকা। বাবর থেকে সুরু ক'রে ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত মুঘল বাদশাহরা ছিলেন গ্রন্থানুরাগী। বাবরের পুত্র হুমায়ুন বিদ্বান ছিলেন. গ্রন্থাগার ছিল তাঁর প্রিয় স্থান'—নিত্য পাঠসঙ্গী। তিনি শেরশাহের বিলাস মঞ্জিলটিকে গ্রন্থাগারে রূপায়িত করেন, এবং এটি পরিদর্শন-কালে তিনি এরই সিঁড়ি থেকে প'ড়ে গিয়ে মারা যান। রাজকীয় গ্রন্থাগারটিকে আগ্রায় স্থানান্তরিত ক'রে লালাবেগকে তিনি তার গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করেন। আকবরের রাজত্বকালে ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে শিক্ষাচর্চার সুযোগ ছিল। প্রাসাদ গ্রন্থাগারিক ছিলেন পীর মহম্মদ। এই সময়ে প্রধান গ্রন্থাগারিককে বলা হত নাজিম। উপ-গ্রন্থাগারিকের আখ্যা ছিল দারোগা-ই-কিতাবখানা। সহকারীকে বলা হ'ত দারোগা। গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে থাকত নকল নবীশ। দপ্তরী, অনুবাদক ইত্যাদি। পূর্ববর্তী নবাবদের তুলনায় আকবরই ছিলেন গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় বিশিষ্ট। তাঁর পূর্ববর্তীরা ছিলেন বিদগ্ধ। কিন্তু তিনি নিজে পড়াশোনা না করলেও বিদ্যার প্রসারে ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় ছিলেন অগ্রগণ্য। আকবর পড়তে না পারলেও সমুদয় গ্রন্থ অন্যদের দিয়ে পড়িয়ে নিবিষ্ট মনে শুনতেন। ঐশ্বর্যশালী গ্রন্থাগার গ'ড়ে তুলেছিলেন তিনি. সবই ছিল মূল্যবান পুথি। অতি উঁচু দরের মহার্ঘ চিত্রিত পুথি সংগ্রহ করে-ছিলেন তিনি। এই রকম ২৪ ০০০ পুথি ছিল তাঁর সংগ্রহে, যার মূল্য সেকালের হিসাবেও অন্ততপক্ষে সাড়ে ষাট লক্ষ মুদ্রা। বিখ্যাত পারসিক পণ্ডিত ফৈজী ছিলেন গ্রন্থাগারিক। ফৈজীর নিজস্ব সংগ্রহেও ছিল বিধিমত সূচীকৃত ৪,৬০০ বই। পরবর্তী কালে সম্রাট জাহাঙ্গীর, শাজাহান প্রভৃতিরাও গ্রন্থাগারের সম্পদ বৃদ্ধিতে যত্ন করেন। দারা শিকো সংস্কৃত ও পারসিক উভয় ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন; এবং বহু সংস্কৃত গ্রন্থের পারসিক অনুবাদও করেন। কিন্তু ইতিহাসের বিচিত্র নির্মমতায় অষ্টাদশ শতাব্দিতে নাদির শাহ এই গ্রন্থরাজি লুঠ ক'রে পারস্যে নিয়ে যান, এবং সেখানে সাধারণ লুঠের মাল হিসাবে এগুলি রাস্তার পাশে প্রায় ওজন দরে বিক্রিত হয়।

গ্রন্থসম্পদ লুঠ করার নজির পরবর্তী যুগেও লক্ষ করা যায়। কিন্তু মুসলমান বিজয়ের নানান পর্যায়ে যেভাবে সেগুলি বিনিষ্ট করা হ'ত তার নজির বড় একটা মেলেনা। বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীরের লুঠ করা বৈষ্ণব গ্রন্থরাজি তাঁর এবং তাঁর দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। পলাশী যুদ্ধের পর কোম্পানীর আমলে ভারতের নানান দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ সাগর পারে

চালান হতে থাকে। তবে সেখানে পুথিপত্র সব সযত্নে রক্ষিত হ'ত। ভারতে প্রকাশিত গ্রন্থের একটি ক'রে খণ্ডও ইংলণ্ডে গচ্ছিত রাখার নীতি প্রচলিত হয়। সাগর পারে গ্রন্থপ্রেরণের বিশেষ ঐতিহাসিক কাণ্ডটি ঘটে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। টিপু সুলতানের পতনের পর তাঁর অতি মূল্যবান গ্রন্থাগার লুঠ করে প্রথমে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পাঠানো হয়। পরে এই সংগ্রহ সম্পর্কে সচেতন ইংরেজ পণ্ডিতেরা এটিকে লণ্ডনে স্থানান্তরিত ক'রে কোম্পানির গ্রন্থাগারের শ্রীবৃদ্ধি করেন। এই প্রসঙ্গেই গড়ে ওঠে লণ্ডনের প্রাচ্য বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র। এবং ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি।

উনবিংশ শতাব্দি থেকে—আসলে অষ্টাদশ শতাব্দির শেষার্ধ থেকেই ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব প্রসারের ফলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নবজীবনের—নূতন প্রেরণার সূত্রপাত হয়। মুসলমান আমোলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারণ ও প্রসার ঘটলেও তার ক্ষেত্র ছিল সীমাবদ্ধ। কেননা তাঁরা মুদ্রনের সহায়তা নেন নি। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার এবং প্রসার প্রতীচ্যে ঘটলেও তাঁরা ভারতে ছাপাখানার প্রবর্তন করেন নি কোন অজ্ঞাত কারণে সেটা কিছু পরিমাণে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। সে যুগে ভাল গ্রন্থাগারের নিদর্শন মেলে, ভাল ভাল পুথির সংগ্রহ ও বিনাশের সংবাদ মেলে কিন্তু আধুনিক চিন্তাধারার প্রসার ঘটতে দেখা যায় না। অথচ সমসাময়িক পাশ্চাত্ত্য জগতে এদিকে বেশ কিছুটা অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। তবে একথা সত্য যে মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা ভারতের জনগণের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, ভারতীয় সংস্কৃতিতে স্বাঙ্গীকৃত হয়েছিল,—যে ঘটনা ইংরেজ আমোলে দেখা যায় না। প্রথম দিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থের দিকেই লক্ষ্য রেখে চলেছে এবং ভারতীয় শিক্ষা সংস্কৃতির দিকে নজর দেয়ান। ইংরেজরা মূলত খ্রীষ্টধর্মের প্রচার এবং শাসনকর্মের সুবিধার জন্যই এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন করে এবং ভারতীয় ভাষা শিক্ষার প্রতিও মন দেয়। সপ্তদশ শতাব্দির শেষ এবং অষ্টাদশ শতাব্দির প্রারম্ভেই এই নূতন ধারার গ্রন্থাগার স্থাপিত হতে দেখা যায়। ইংরেজরা একদিকে যেমন এদেশ থেকে মূল্যবান গ্রন্থাদি নিজেদের দেশে নিয়ে যাচ্ছিল, অন্যদিকে তেমনি এদেশে শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থাও করছিল।

আগেই বলা হয়েছে যে খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকদের চেষ্টাই উক্ত প্রসারের ব্যাপারে প্রধান ছিল। এই সূত্রে বাংলাদেশে বেঞ্জামিন এডাম্‌স্ ও রেভারেণ্ড লং সাহেবের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া রামমোহন রায় প্রমুখ

মনীষীর, এবং পরবর্তীকালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনস্বীর প্রচেষ্টায় শিক্ষায় ও সমাজে নব-জাগরন এসেছিল। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা যুগান্তর এনে দিল। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দেই ইংরেজি শিক্ষার প্রসার দেখে ইংরেজি ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করা হ'ল। বই এর ব্যবসা তখনো জেঁকে বসেনি। স্কুল কলেজের গ্রন্থাগার অন্যান্যদেরও ব্যবহার করতে দেওয়া হত। হিন্দু কলেজের প্রথম গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হতে দেখা যায় ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে, – মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে। সে কালের হিসাবে টাকার অঙ্কটা নেহাৎ কম ছিল না কলকাতায় 'স্কুল বুক সোসাইটি' স্থাপিত হয়েছিল ১৮১৭-তে। এবং তা'র পশ্চাৎপট হিসেবে দেখা যায় ১৮১৫-তে রামমোহন রায় স্থাপিত 'আত্মীয় সভা'। ইংরেজি শিক্ষার প্রচল হতে লাগল সাধারণের মধ্যে। রাজমোহন রায় ইংরেজি শিক্ষাকে সাদরে বরণ করেন এবং মনে করেন এই শিক্ষার প্রসারের ফলে আধুনিক জীবনে ও জগতে দেশ বাসীর পদক্ষেপ দৃঢ়তর হবে। কলকাতায় প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল সম্ভবত ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। এই ছাপাখানার মালিক ছিলেন হুগলির পুস্তক ব্যবসায়ী এনড্রুজ, এবং তিনিই এই বছর প্রকাশ করলেন হালহেদ-এর বাংলা ব্যাকরণ ( A Grammar of the Bengali Language, by Nathanicl Brassey Halhed )। বাংলায় হরফ খোদায় করেন প্রাচ্য বিদ্যায় সুপণ্ডিত চার্লস্ উইলকিন্স্, এবং তাঁকে সহায়তা করেন পঞ্চানন কর্মকার। পঞ্চাননের এই শিক্ষাই শেষে বাংলা মুদ্রণ প্রসারের কাজে লাগল। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ছাপানো পূর্ণাঙ্গ পুস্তক। তবে বাংলা ছাপাখানার ইতিহাস উজ্জ্বল হ'ল উইলিয়ম কেরীর অক্লান্ত প্রয়াসে। কেরী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি থেকে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের অনুমতি না পেয়ে দিনেমার সরকারের বদান্যতায় শ্রীরামপুরে মিশন স্থাপন করেন। নিজ প্রচারের প্রয়োজনে বাইবেলের বঙ্গানুবাদের ছাপানোর প্রয়োজন বোধে তিনি ছোটখাট একটি কাঠের মুদ্রাযন্ত্র বসান। এবং তাঁর ছেলে ফেলিক্স্ এবং সহকারী ওআর্ডের সহযোগীতায় কেরী-কৃত বাইবেলের বাংলা অনুবাদ পুস্তক প্রকাশিত হয়। ক্রমে তাঁর এই কাজ যখন বাড়তে লাগল তখন আরো প্রচুর বাংলা হরফের দরকার হয়ে পড়ল। উইলকিন্স্ সাহেবকে তিনি অনুরোধ করলেন পঞ্চানন কর্মকারকে তাঁর কাজে নিয়োগ করবার অনুমতি প্রদান করতে। পঞ্চাননের নিয়োগকর্তা কোলব্রুক সাহেব রাজি হলেন না। তখন অল্পকালের জন্য তাঁর হরফের কাজে পরামর্শ

দিতে পঞ্চাননকে পাঠাতে অনুরোধ জানান। এবং পঞ্চানন আসবার পর তাঁকে আর ছাড়লেন না। এই ভাবে পঞ্চানন, এবং তাঁর জামাতা মনোহরের কুশলী দক্ষতায় কেরী সাহেবের হরফ ঢালাইএর কারখানা জেঁকে উঠল। ভারতের সব ভাষা ছাড়াও আরবী, ফারসী—এমন কি চীনা, ব্রহ্মদেশীয় প্রভৃতি ভাষার হরফও এখানে প্রস্তুত হতে লাগল।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে গোড়াপত্তন হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের। ১৮২৪ এ স্থাপিত হ'ল সংস্কৃত কলেজ—যা'র সঙ্গে প্রাচ্য বিদ্যায় পণ্ডিত হোরেস্ হেমান উইলসনের নাম জড়িত। শিক্ষায় ও সমাজ সংস্কারে, চরিত্রের দৃঢ়তায় এবং নেতৃত্বের বলিষ্ঠতায় এই কালের শ্রেষ্ঠ পুরুষ চিরস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া বিদ্যোৎসাহীদের জন্য রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির ( ও লাইব্রেরির ) প্রতিষ্ঠা হয় ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। গবেষণার ক্ষেত্রে এটির স্থান শিখরে। বিদেশী ও এদেশীয় তাবৎ বিদ্বজ্জনের নাম এই সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে পার্কষ্ট্রিট ও চৌরঙ্গী রোডের মোড়ে এর নূতন ভবন গ'ড়ে উঠেছিল,—যেখানে আবার নূতন ক'রে ভবনটিকে ভেঙ্গে তৈরী করা হয়েছে। এখন এটির নাম এশিয়াটিক সোসাইটি।

১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই সেকালের রাজা মহারাজা জাতীয় বড় জমিদারদের জীবনে ভাঁটা পড়তে থাকে এবং জন্ম নেয় কোম্পানীর প্রসাদপুষ্ট বেনিয়ান মুৎসুদ্দি প্রভৃতি দালাল জাতীয় নূতন শ্রেণীর হঠাৎ বড়লোকি আভিজাত্য। এই যুগ পরিবর্তনের ফলে এবং ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপ্তি ও ছাপাখানার আবির্ভাবের ফলে গ্রন্থসংগ্রহ গড়ে উঠতে থাকে জনসাধারণের মধ্যে। ইংরেজদের গ্রন্থাগার তৎপরতা দেখে ভারতের অনেক স্থানেই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার কাজ সুরু হয়ে যায়। ১৮৫০-এ ইংলণ্ডে গ্রন্থাগার আইন চালু হবার পরই দেখা যায় ভারতে—বিশেষত বাংলাদেশের সর্বত্র গ্রন্থাগার গ'ড়ে উঠেছে জনগণের চেষ্টায়। ১৮৫১ তে মেদিনীপুরে রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার, ১৮৫৪-তে হুগলী জন গ্রন্থাগার, ১৮৫৬-তে কৃষ্ণনগর জন গ্রন্থাগার, ১৮৫৯-তে উত্তরপাড়া জয়নারায়ন গ্রন্থাগার প্রভৃতি এর বিশিষ্ট নিদর্শন। বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানেও গ্রন্থাগার—তৎপরতা সুরু হয়ে যায়। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি ও তা'র গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হ'ল—প্রাচ্যতত্ত্ববিদ বুলার (Buhler) এবং পণ্ডিত কানে-র [Kane] নাম যা'র সঙ্গে যুক্ত। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই সরকার গ্রন্থাগার গঠনের জন্য সাহায্য দানের প্রস্তাব

আনে। সরকার তরফে উৎসাহ সঞ্চারের এটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আমেদাবাদ পুনা প্রভৃতি শহরেও উনবিংশ শতাব্দিতেই কিছু গ্রন্থাগার গ'ড়ে উঠে। পাটনার খুদা বক্স গ্রন্থাগার বিশেষভাবে উল্লেখের যোগ্য, কেননা একজনের চেষ্টায় এই গ্রন্থৈশ্বর্য গ'ড়ে উঠেছে। ঐশ্লামিক চর্চার এটি এক বৃহৎ কেন্দ্র। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে খুদা বক্স এই গ্রন্থাগার ভবনটি সহ সমগ্র সংগ্রহ যা'তে জন গ্রন্থাগার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে সেরকম বন্দোবস্ত ক'রে দেন।

বোম্বাই অঞ্চলে উনবিংশ শতাব্দির প্রথম দিকেই কিছু সাহিত্য সমিতি জাতীয় গ্রন্থাগার গ'ড়ে উঠেছিল। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে রত্নগিরি নগর বাচনালয় এবং ১৮৪০-এ নাসিক শহরে সার্বজনিক বাচনালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মেকানিকেল ইনস্টিটুট প্রতিষ্ঠার পর ডেভিড সাস্থনের বদান্য দানে এখানে একটি পাঠাগারও স্থাপিত হয়। ওয়াদিয়া পরিবারের দানে গ'ড়ে উঠে নেটিভ জেনারেল লাইব্রেরি। পরে পিপ্‌ল্‌স্ ফ্রি রিডিং রুম লাইব্রেরির সঙ্গে এটি সংযুক্ত হয়। আধুনিক আমোলে এসে বোম্বায়ের গ্রন্থাগার জগৎ প্রভূত প্রসার লাভ করেছে।

আধুনিক গ্রন্থাগারের সূচনায় বড়োদার নাম ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে। বড়োদার সয়াজি রাও ২য় গাইকোয়াড় পশ্চিম ভ্রমণে বেরিয়ে সেখানকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা দেখে মুগ্ধ হন, এবং নিজ রাজ্যে অনুরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তনের সংকল্প নিয়ে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা থেকে উইলিয়াম আলানসন বোর্ডেন সাহেবকে আহ্বান ক'রে আনেন এবং তাঁকে রাজ্য গ্রন্থাগারের অধিকর্তা নিয়োগ করেন। ফলে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বড়োদারাজের নিজস্ব ২০,০০০ গ্রন্থ সংগ্রহ নিয়ে স্থাপিত হ'ল কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, এবং এটির সঙ্গে মহিলা ও শিশুদের জন্য স্বতন্ত্র দু'টি বিভাগও সংযুক্ত হ'ল। ইতিপূর্বেই, ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে বড়োদায় অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয়েছিল। এখন সারা রাজ্য এক গ্রন্থাগার-বৃত্ত সৃষ্ট হ'ল। প্রত্যেক শহরে ও গ্রামাঞ্চলে গ'ড়ে উঠল গ্রন্থাগার। দূরতম গ্রামাঞ্চলের জন্য ভ্রাম্যমান গ্রন্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা চালু হ'ল। এটিকে ঠিক ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার বলা যায় না। বড় বড় বাক্সে ক'রে বইপত্র গ্রামে নিয়ে যাওয়া হ'ত এবং নূতন বই পড়ুয়াদের দিয়ে পুরানো বই ফেরৎ আনা হত বাক্সবন্দী ক'রে। ১৯৩০-এ মধ্যেই বড়োদা রাজ্যের শতকরা ৮০ জন নাগরিকই গ্রন্থাগার ব্যবহার করছে দেখা গেল। বোর্ডেন সাহেব তিন বছর বড়োদায় ছিলেন। নিউটন মোহন দত্ত বড়োদার গ্রন্থাগার-বৃত্তের প্রথম সর্বাধ্যক্ষ।

শ্রীঅরবিন্দ ও প্রথম জীবনে বড়োদায় গ্রন্থাগারিক ছিলেন।

জাতীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এ যুগের একটি বিশিষ্ট ব্যাপার তা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। ভারতে এখন চারটি জাতীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু আছে। 'ডেলিভারি অফ বুক্‌স্ অ্যাক্ট' অনুযায়ী প্রকাশিত প্রতি গ্রন্থের চারটি সংখ্যা সরকারকে জমা দিতে হয়; তার একটি ক'রে জমা হয় কেন্দ্র পরিচালিত চার গ্রন্থাগারে। কলকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগার, বোম্বাই এ টাউন-হল-স্থিত কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, মাদ্রাজে কন্নেমারা জনগ্রন্থাগার এবং দিল্লীতে জাতীয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। ভারতের প্রথম ন্যাশনেল লাইব্রেরী, কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার কিভাবে গ'ড়ে উঠল তার ইতিহাস বিচিত্র। এর সূত্রপাত ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে। তদানীন্তন 'ইংলিশম্যান' সংবাদপত্রের সম্পাদক স্টকোয়েল সাহেবের প্রচেষ্টায় একটি গ্রন্থাগার পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়। তদনুযায়ী কলকাতা জন গ্রন্থাগার, বা ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি স্থাপিত হ'ল ষ্ট্রাং সাহেবের এসপ্লানেডস্থ বাড়ীতে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ গ্রন্থাগারের প্রায় সাড়ে চার হাজার বই এবং আরো অনেকের দান নিয়ে গ্রন্থাগারটি গঠিত হয়। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে এটি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজেরই একাংশে স্থানান্তরিত হয়। পরে সরকার তরফে গ্রন্থাগারের জন্য একখণ্ড জমি দেওয়া হয় এবং সেখানে 'মেটকাফ হল' নামক বাড়ি তৈরি হ'লে ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাগারটি এই বাড়িতে উঠে আসে। গ্রন্থাগারের পরিচালনার ভার ছিল নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপরে, এবং মালিকানা ছিল কয়েকজনের হাতে। ক্রমে এটির অবস্থা অর্থাভাবে শোচনীয় হয়ে ওঠে। প্রথম গ্রন্থাগারিক প্যারীচাঁদ মিত্র—যিনি টেকচাঁদ ঠাকুর নামে বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত—তিনি এটিকে চালু রাখবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু ক্রমে আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হ'তে লাগল, এবং ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাগারের কার্য নির্বাহক সমিতির পক্ষে রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ সরকারের কাছে এক আবেদন পাঠান সাহায্যের জন্য। তদুত্তরে বাংলা সরকারের অন্যতম সেক্রেটারী ম্যাকেঞ্জি সাহেব গ্রন্থাগার পরিচালনার কড়া সমালোচনা করেন, এবং মালিকানা ব্যবস্থার পরিবর্তে জনগ্রন্থাগার হিসেবে সেটির ভার সরকারের হাতে দেবার প্রস্তাব করেন। এর ফলে গ্রন্থাগারটি কলকাতা কর্পোরেশনের হাতে চ'লে আসে। এই সময়ে বিপিন পাল—যিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের বিশিষ্ট নেতা হিসেবে স্মরণীয়—তিনি গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন এবং ১৮৯২ পর্যন্ত কাজ করেন। পণ্ডিত হরপ্রসাদ

শাস্ত্রী ও পরিচালক সমিতির অন্যতম সদস্য হন। কিন্তু তবুও তেমন সুরাহা হলনা। ১৮৯৪-তে লর্ড কার্জন এলেন বড়লাট হয়ে, কলকাতাকে করতে চাইলেন একটি আদর্শ রাজধানী। কলকাতা জনগ্রন্থাগারটি ব্রিটিশ মিউজিয়ামের মতো ক'রে গ'ড়ে তুলবার স্বপ্ন দেখছিলেন তিনি। এবং তাঁরই হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে আইন প্রণয়ণের মধ্য দিয়ে জন্ম নিল ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরি। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের জন ম্যাকফারলেন হন এর প্রথম গ্রন্থাগারিক ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পরে এই পদে নিযুক্ত হন বহু ভাষাবিদ মনীষী হরিনাথ দে। ১৯১১-তে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এই পদে বহাল থাকেন তিনি। পরবর্তী গ্রন্থাগারিক জে, এ, চ্যাপমেন—যিনি ১৯৩০-এ অবসর নেবার পর গ্রন্থাগারিক হিসেবে আসেন কে এম, আসাদুল্লা। এর মধ্যে গ্রন্থাগারটি মেটকাফ হল থেকে উঠে এসেছে পাঁচ নম্বর এসপ্লানেড ইষ্ট-এ বৈদেশিক ও সামরিক দপ্তরের বাড়ীতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে বাড়ীটি ছেড়ে দিয়ে গ্রন্থাগার বসানো হ'ল চিত্তরঞ্জন এভেনিউ-স্থিত জবাকুসুম হাউসে। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত এটি এখানেই ছিল এবং আসাদুল্লা সাহেবই ছিলেন গ্রন্থাগারিক। স্বাধীনতার সঙ্গে হ'ল ভারত ভাগ। আসাদুল্লা চলে গেলেন পাকিস্থানে। গ্রন্থাগারিক হিসেবে এলেন বি, এস, কেশবন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরি নবজন্ম লাভ করল ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার বা নেশনেল লাইব্রেরি হিসেবে। গ্রন্থাগারটি ঠাঁই পেল বেলাভিডিয়ারে বড় লাটের বাড়ীতে।

জাতীয় গ্রন্থাগার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবার সময়ে এর গ্রন্থ সংখ্যা ছিল সাড়ে তিন লক্ষের মতো। এখন তা অন্তত চার গুণ বেড়ে গিয়েছে। গ্রন্থস্বত্ব বা কপি রাইট গ্রন্থাগার হবার দরুণ এবং দেশ বিদেশের প্রচুর বই সংগ্রহের দরুন এর গ্রন্থ সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে জন্য সাত তলা বিশিষ্ট নূতন আরেকটি বাড়ি তৈরি হয়েছে। জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী (I.N.B.) প্রণয়নের কাজ হয় বলে এটির কর্ম ব্যাপকতা বৃহৎ। ঐশ্লামিক বিষয়ের বুহার সংগ্রহ এবং আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ষাট হাজার গ্রন্থ সংগ্রহ জাতীয় গ্রন্থাগারের বিশেষ সম্পদ।

জাতীয় গ্রন্থাগারে গ্রন্থ সম্পদ সর্বব্যাপী হলেও, এবং জনসাধারণ এটি ব্যবহার করতে পারলেও এটিকে, অথবা কোনো জাতীয় গ্রন্থাগারকেই জনগ্রন্থাগার বলা চলে না। সাধারণের প্রবেশ এখানে অবারিত নয়, সীমিত।

প্রকৃত জনগ্রন্থাগার,--যা বিদেশে গ্রন্থাগার কর দ্বারা সমর্থিত, তা ভারতে
নেই। ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলি সম্প্রতি এ ধরনের গ্রন্থাগারবৃত্ত
চালু করার প্রকল্প নিয়েছে,— তবে গ্রন্থাগার দেয়ক দ্বারা সমর্থিত নয়,— শিক্ষা
খাতের অর্থবরাদ্দের একাংশ এতে ব্যায়িত হয়। এই গ্রন্থাগার প্রসারের পদ-
ক্ষেপে কলকাতা সাধারণ গ্রন্থাগার হিসেবে স্থাপিত হয়েছে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক
রোডের 'এমারালুড্ বাওআর' গৃহে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। এই পরিকল্পনায়
অন্যান্য রাজ্যেও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে। তবে জনগ্রন্থাগার
হিসাবে প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা হয় ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইউনেসকো এবং ভারত
সরকারের সংযুক্ত প্রয়াসে দিল্লি পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠায়। ব্রিটিশ জন-
গ্রন্থাগার বিশারদ এফ, এম, গার্ডেনার এবং এডোআর্ড সিডনির তত্ত্বাবধানে
এটি গ'ড়ে ওঠে। পরে ডি, আর, কালিয়া এর গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন।
গ্রন্থাগার ব্যবহারে কোনো বাধা নিষেধ নেই। সকলের অবারিত প্রবেশ
স্বীকৃত। এমনকি পুস্তকমঞ্চও সকলের জন্য উন্মুক্ত, অবারিত। গ্রন্থাগারটির
সঙ্গে সংযুক্ত আছে শিশুদের জন্য বিশেষ বিভাগ এবং সমাজকল্যান বিভাগ।
এটিকে সর্বতোভাবে আদর্শ জনগ্রন্থাগার হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে
এবং তা সার্থকও হয়েছে।

জনগ্রন্থাগার বা সাধারণ পাঠাগার স্থাপনের উদ্যোগ এদেশে এতাবৎকাল
বিশেষ লক্ষ্য করা যায়নি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দিতে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের
ফলে শিক্ষিতদের মধ্যে চিন্তাধারার যে নূতনত্ব ও সজীবতা এল তা'র ফলে
গ্রন্থাদি পাঠ ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার আগ্রহ বৃদ্ধি পেল। সেই সঙ্গে জেগে উঠল
স্বাজাত্যবোধ, স্বাধীনতার আকাঙ্খা ও পরাধীনতার গ্লানির অনুভূতি। এই
পরিপ্রেক্ষিতে দেশের সর্বত্র গ্রন্থাগার বা পাঠগৃহ স্থাপনের জোয়ার এল।
বিশেষ ক'রে বাংলাদেশেই এর প্রাবল্য লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষাদীক্ষায়; চিন্তা
যুক্তি প্রভৃতির ক্ষেত্রে বাংলার দিকপালেরা ছিলেন অগ্রনী। দেশ জুড়ে শহরে
গ্রামে সর্বত্র গ'ড়ে উঠল ছোট খাট সমিতি, এবং গ্রন্থাগার বা পাঠগৃহ হ'ল
সেগুলির কেন্দ্রবিন্দু। নিরক্ষরদের সাক্ষর করার জন্য রাত-পাঠশালা গ'ড়ে
উঠল এগুলিকে কেন্দ্র করে। নানাবিধ সামাজিক কল্যানকর্মের দিকে নজর
দিল সচেতন যুবকের দল। পরিণামে এরা রাজসরকারের সন্দেহ ভাজন হয়ে
উঠল। দেশে সুরু হল স্বাধীনতা আন্দোলন, আর এরা স্বভাবতই রইল বিষ
নজরে। কিন্তু এই সব সামান্য চাঁদা ভিত্তিক পাঠাগার দেশের সামাজিক ও

সাংস্কৃতিক চেহারাটাই যেন বদলে দিয়ে গেল। এখনো পর্যন্ত সেই ধারা শেষ হয়নি। সরকারী সাহায্য ছাড়াই, অথবা নামমাত্র সাহায্য পেয়েই ছোট ছোট গ্রন্থাগার নিজ নিজ এলাকার ক্ষুধা মিটিয়েছে। ইংরেজ সরকার অবশ্য শেষ দিকে গ্রন্থাগার গঠনের প্রতি কিছুটা নজর দিয়েছিল। ভারত স্বাধীন হবার পর নানাবিধ পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে গ্রন্থাগারের উন্নতি সাধন এবং দেশজোড়া গ্রন্থাগারবৃত্ত গঠনের প্রতি ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলি নজর দিচ্ছে। গতি শ্লথ হলেও ক্রমে স্বীকৃতি পাচ্ছে গ্রন্থাগারিকতা।

সম্প্রতি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির মাধ্যমে সমাজশিক্ষা বিভাগের আওতায় গ্রন্থাগার বৃত্ত গ'ড়ে তোলা হচ্ছে। প্রত্যেকটি কমিউনিটি কেন্দ্রে একটি ক'রে আঞ্চলিক গ্রন্থাগার এবং ছয়টি ক'রে শাখা গ্রন্থাগার স্থাপনের ব্যবস্থা হয়েছে। আঞ্চলিক গ্রন্থাগারগুলিতে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার-কর্মী নিযুক্ত হচ্ছে। এগুলির সমুদয় খরচ সরকার বহন করে। গ্রন্থাগারগুলির শীর্ষে আছে একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, যেখান থেকে সব কিছু পরিচালিত ও পরিপোষিত হচ্ছে। প্রারম্ভে বাণীপুরে এবং কালিম্পঙে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপন করে পশ্চিমবাংলা সরকার। আঞ্চলিক গ্রন্থাগার তৈরী হয় কলানবগ্রাম, সরিষা ও শ্রীনিকেতনে।

গ্রন্থাগার বৃত্তের প্রকল্পে প্রত্যেক জিলায় একটি ক'রে,—বড় জিলার ক্ষেত্রে একাধিক জিলা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হয়েছে। এই জিলা বা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে আঞ্চলিক গ্রন্থাগার বা শাখা গ্রন্থাগার থেকে দূরতম পল্লী অঞ্চলেও গ্রন্থাগারের সুযোগ সুবিধা প্রসারিত ক'রে দেওয়া হচ্ছে। এই বৃত্তের কেন্দ্রে আছে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, তার পরবর্তী ধাপে আছে জিলা গ্রন্থাগারগুলি। জিলা গ্রন্থাগারের আওতায় মহকুমা ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগার। এবং এগুলির পরবর্তী পর্যায়ে থানা ও পঞ্চায়েত গ্রন্থাগার—যাদের ক্রিয়াপর্বে আছে দূরতম অঞ্চলে পরিবেষণ কেন্দ্র।

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
|
জিলা গ্রন্থাগার
|
মহকুমা এবং আঞ্চলিক
গ্রন্থাগার
|
গ্রামীন গ্রন্থাগার
থানাভিত্তিক, পঞ্চায়েৎ ভিত্তিক
|
দূরাঞ্চল পরিবেষণ কেন্দ্র

এই গ্রন্থাগার বৃত্ত রাজ্য সরকারের সমাজ শিক্ষা বিভাগের পরিচালনায় রূপায়িত হয়। এজন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রন্থাগার কর্মীর জন্যও সরকার দু'একটি কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। একেকটি পরিকল্পনা কালে নির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ ক'রে ক্রমে তা প্রসারিত হয়। ভারতের প্রত্যেকটি রাজ্যই এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ চলেছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে (১৯৫১—৫৬) শিক্ষা সম্প্রসারণ প্রকল্পের সঙ্গে গ্রন্থাগার নেবার কাজও উন্নততর করবার ব্যবস্থা হয়। সারা ভারতে গ্রন্থাগারের বৃত্ত রচনা করবার এই প্রকল্পে ছিল দিল্লিতে জাতীয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। কলকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগার এবং মাদ্রাজ ও বোম্বায়েও অনুরূপ জাতীয় গ্রন্থাগার স্থাপন, এবং পশ্চিমবঙ্গ, আসাম প্রভৃতি নয়টি রাজ্যে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপন। প্রতিষ্ঠিত হল দিল্লির জনগ্রন্থাগার ( Delhi Public Library )।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ( ১৯৫৬ – ৬১ ) ভারত সরকার ১৪০'০০০,০০ টাকা বরাদ্দ করল বিভিন্ন রাজ্যের ৩২০ টি জিলায় গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হল গ্রন্থাগারবিদ্যা শিক্ষনের প্রতিষ্ঠান।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ( ১৯৬২ – ৬৭ ) পূর্ব পরিকল্পিত ব্যবস্থাগুলির সুষ্ঠু রূপায়ন এবং প্রসারের দিকে নজর দেওয়া হল। সরকার উপলব্ধি করল যে সুপরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থার জন্য সুপরিচালিত সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার-বৃত্ত অপরিহার্য। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গবেষণার সুবিধা বাড়ানো হ'ল এবং সেই সঙ্গে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বিশেষ শিক্ষন ও গবেষণার ব্যবস্থাও করা হ'ল।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কালে (১৯৬৯—৭৪) দেখা গেল দেশে শিক্ষিতের হার কিছু বেড়ে গিয়েছে। ১৯৫১-তে যেখানে শতকরা ১৭ জন শিক্ষিত ছিল। সেই হার বেড়ে ১৯৭২ নাগাদ শতকরা ৩৫ জন হবার সম্ভাবনা আছে মনে ক'রে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ের দিকে নজর দেওয়া হয়। গ্রন্থাগারের সুযোগ সুবিধা বাড়াবার দিকে ঝোঁক পড়ল। গ্রামাঞ্চলের ৫২২৩টি কেন্দ্রের ( block ) ১৩৯৪ টিতে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সংখ্যা বাড়িয়ে ২৬১০ করার ব্যবস্থা হ'ল। এই নূতন প্রকল্পের জন্য প্রতি গ্রন্থাগার পিছু বাৎসরিক ১৫,০০০ টাকা এবং গৃহের জন্য এককালীন ২৫,০০০ টাকা বরাদ্দ করার প্রয়োজন স্বীকৃত হয়। কেবল মাত্র এই গ্রন্থাগার কেন্দ্রই যথেষ্ট নয়. গ্রামাঞ্চলের জন্য ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার ও কর্মীর কথাও বিবেচনায় স্থান

পেল। এবং এই সূত্রে সমস্ত সাক্ষরদের জন্য উপযুক্ত সংখ্যায় বই সরবরাহের ব্যবস্থাও করা হ'ল।

এই পরিকল্পনাগুলির রূপায়ণ এ পর্যন্ত যতটা হয়েছে তা পর্যাপ্ত নয়। আশানুরূপ অগ্রগতি এখনো হয়নি। গ্রন্থাগার এবং তা'র কর্মীদের মানও যথোপযুক্ত উন্নত হয়নি। তার ফলে উচ্চমানের শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা এই কাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়নি,—অন্তত যথেষ্ট পরিমাণে হয় নি। বিশ্ববিদ্যালয়াদির ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণে হলেও জনগ্রন্থাগার বা বিদ্যালয় গ্রন্থাগার পিছনেই প'ড়ে আছে। পরবর্তী পরিকল্পনায় এদিকে লক্ষ্য রাখা হবে ব'লে আশা করা যায়।

গ্রন্থাগারের প্রতি জনসাধারণের এবং সরকারের সচেতনতা যেমন বৃদ্ধি পেতে লাগল তেমনি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থাও চালু হতে লাগল। প্রত্যেক রাজ্যে গ্রন্থাগার সমিতি সংগঠিত হ'ল। রঙ্গনাথনের পরিচালনায় ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজে গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতে প্রথম গ্রন্থাগার আইনের সূত্র প্রণয়ণের কৃতিত্ব ও তাঁরই। ১৯২৯-এ স্থাপিত হয় পাঞ্জাব গ্রন্থাগার পরিষদ, এবং ১৯৩৩-এ ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদেরও সূচনা হয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গোড়াপত্তন হয়েছিল ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে বেলগাঁও শহরে অনুষ্ঠিত ৩৯তম জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে দেশে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। ঐ সময়েই ওখানে তৃতীয় সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের অধিবেশন বসে এবং রাজ্যে রাজ্যে গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপনের প্রস্তাব হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে বাংলায় প্রতিনিধিরা ঐ প্রস্তাব অনুযায়ী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপনে কৃতসংকল্প হন এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি হিসাবে মনোনীত করে এবং সুশীলকুমার ঘোষ মহাশয়কে কর্মসচিব নির্বাচিত করে সমিতি বা কমিটি গঠিত হয়। ১৯২৫ এর ২০শে ডিসেম্বর স্থাপিত হয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। ১৯২৮-এ এর দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সরলা দেবী, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ মণীষীরা যোগ দেন। ১৯৩১ এর তৃতীয় সম্মেলনে পরিষদকে ঠিকমত গড়ে তোলার এবং কর্ম্মধারা নির্ণয়ের জন্য ভার দেওয়া হয় ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক আসাদুল্লা সাহেব এবং কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের উপরে। মুণীন্দ্র দেবকে সভাপতি করে ১৯৩৩ এ একটি কার্যকরী সমিতি গঠিত হল। তিনকড়ি দত্ত ছিলেন অন্যতম সদস্য যিনি পরে পরিষদের অর্থ-

সচিব হিসাবে কাজ করে গেছেন তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত। মূণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের অনলস সেবা এবং গ্রন্থাগার দরদের কথা পরিষদের এবং বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি গ্রন্থাগারকে এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের মর্যাদার জন্য সরকারের কাছে প্রস্তাবাদি পেশ করেন এবং এমনকি রঙ্গনাথনের পূর্ব্বেই গ্রন্থাগার আইন প্রবর্ত্তনের জন্য পরিকল্পনা নেন এবং সরকারের কাছে সুপারিশ করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এদেশের গ্রন্থাগার সমিতির ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান নিয়ে আছে। 'গ্রন্থাগার' নামে একটি মাসিক পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশ এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট পাঠক্রম পরিষদের বিশিষ্ট দুটি ক্রিয়াপর্ব্ব। প্রতি বৎসর বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানে, কখনো শহরে কখনো গ্রামে গ্রন্থাগার সম্মেলনের অধিবেশন আহ্বান করে এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের উন্নতি ও সর্ব্বত্র গ্রন্থাগারের সুসংহত পরিচালনার ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারকে সচেতন রাখার চেষ্টা করে চলেছে পরিষদ। সম্প্রতি কলকাতার পরিষদের নিজস্ব ভবনও তৈরী হয়েছে।

গ্রন্থাগারের উন্নতি অব্যাহত রাখার জন্য গ্রন্থাগার আইন প্রবর্ত্তন করা প্রয়োজন। ইংলণ্ডে ১৮৫০ খ্রীষ্টব্দে গ্রন্থাগার আইন চালু হয়। আইনের বিধি এমন ছিল যাতে প্রতি জনপদের করদাতা সম্পত্তি কর যাঁরা দিতেন তাঁদের সমর্থনে পাউণ্ড প্রতি আধ পেনি গ্রন্থাগার দেয়ক হিসাবে ধার্য হত। ১৮৫৫তে এই হার হল এক পেনি এবং পেটর প্রতিষ্ঠানগুলির উপরে এই সুবাদে এল কিছু ক্ষমতা। ক্রমে আইনটির নানাবিধ রদবদল হয়ে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে দেয়কের পরিমাণ গ্রন্থাগারের সেবাক্রম ও খরচের অনুপাতে নেবার অধিকার জন্মায় 'কাউন্টি কাউন্সিল'গুলির উপরে। ভারতে গ্রন্থাগারের জন্য নির্দ্দিষ্ট কর বা দেয়ক পদ্ধতি নেই। শিক্ষাখাতের একাংশ সরকারের বিবেচনা অনুযায়ী ব্যয়িত হয় গ্রন্থাগারের জন্য। ভারতে সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থাগার আইন চালু হয় রঙ্গনাথনের প্রচেষ্টায় মাদ্রাজে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে। এর খসড়াটি রঙ্গনাথন ১৯৪২এ তৈরী করেন এবং বোম্বাই সর্ব্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে এটি আলোচিত হয়। এই আইনের ধারা অনুসারে মাদ্রাজে রাজ্যগ্রন্থাগার সমিতি (State Library Committee ) গঠিত হল, সভাপতি হলেন শিক্ষা মন্ত্রী এবং একজন গ্রন্থাগার অধিকর্ত্তা নিয়োগ ক'রে তাঁর উপরে ভার দেবার ব্যবস্থা রইল। তাঁর কর্মধারার মধ্যে রইল স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ। সম্পত্তি করের উপরে প্রতি টাকায় তিন পয়সা ধার্য হ'ল গ্রন্থাগার কর বা দেয়ক

( Library Cess ) মাদ্রাজের পরে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে হায়দ্রাবাদে এবং ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে অন্ধ্ররাজ্যে গ্রন্থাগার আইন চালু হয়েছে। কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় ইতিপূর্বে. ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে, বঙ্গীয় আইন পরিষদে গ্রন্থাগার বিল প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ফল হয়নি। .

১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার এক গ্রন্থাগার উপদেষ্টা সমিতি গঠন করে। তাঁতে স্থির হয়েছিল ভারত সরকার কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করবে, প্রতি রাজ্যে ও অনুরূপ রাজ্য গ্রন্থাগার আইন চালু হবে, পৌর প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষ ক্ষমতা বলে সম্পত্তি করের উপর গ্রন্থাগার দেয়ক ধার্য করতে পারবে এবং রাজ্য সরকার ঐ দেয়ক থেকে প্রাপ্ত অর্থের তিন গুন পরিমান অর্থ গ্রন্থাগারের সাহায্য বাবদে দেবে। এবং কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে তাদের দেয় অর্থের সমান পরিমান অর্থ সাহায্য করবে। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাগার বিল তৈরী করার জন্য ধীরেন্দ্র মোহন সেনকে নিয়ে একটি কমিটিও হয় এবং ১৯৬৩-তে শিক্ষা-মন্ত্রকে এক খসড়া দাখিলও করা হয়। কিন্তু এ পর্যন্ত সেটির কোনো ব্যবস্থা হয়নি।

এখন ভারতে সব রাজ্যেই গ্রন্থাগারে পরিষদ গ'ড়ে উঠেছে। সরকারী সাহায্যও কিছু কিছু জুটছে। এরা নানাবিধ সম্মেলন ক'রে পরিকল্পনাও দাখিল করছে। গ্রন্থাগার কর্মীদের বৃত্তিগত সচেতনতাও বেড়েছে। কিন্তু সর্বৈব ভাবে সর্বভারতীয় কোনো গ্রন্থাগার উন্নয়ণ পরিকল্পনা নেওয়া হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ বিশ্ববিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের বৃত্তি কুশলতা' বেতনের হার ও মর্যাদায় যেমন একটা সমতা রক্ষার পরিলল্পনা নিচ্ছে। তেমনি সরকার তরফে বিদ্যালয় ও জন-গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য অনুরূপ ভিত্তি তৈরী করা দরকার। সমাজে গ্রন্থাগারের স্থান বিশিষ্ট এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার অপরি-হার্য বলেই নূতন ইতিহাস গ'ড়ে তুলতে। নূতন পথ তৈরী করতে। নূতন জীবন এবং নূতন মানুষ সৃষ্টি করতে গ্রন্থাগারকে মর্যাদাসম্পন্ন ক'রে তোলা অবশ্যই প্রয়োজন।

⟵::⟶

# পরিশিষ্ট

দ্বিবিন্দু বর্গীকরণের শেষতম, অর্থাৎ ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে কৃত ষষ্ঠ সংস্করণ অনুযায়ী পরিমার্জিত ছকটি যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হয়নি। এতে গ্রীক এবং অন্যান্য অপ্রচলিত অক্ষরের বাহুল্য বর্জিত হয়ে সরলীকৃত রূপ প্রকাশ পেয়েছে। ছকটি নিম্নরূপ : —

| | |
|---|---|
| A | প্রাকৃত বিজ্ঞান (Natural Science) |
| AZ | গাণিতিক বিজ্ঞান (Mathematical Science) |
| B | গণিত |
| BZ | পদার্থ বিজ্ঞান সমূহ (Physical Science) |
| C | পদার্থ বিজ্ঞান |
| D | পূর্ত বিদ্যা |
| E | রসায়ন শাস্ত্র |
| F | প্রযুক্তিবিদ্যা |
| G | জীববিদ্যা |
| H | ভূবিদ্যা |
| HZ | খনিবিদ্যা |
| I | উদ্ভিদবিদ্যা |
| J | কৃষিবিদ্যা |
| K | প্রাণীবিজ্ঞান |
| KZ | পশুপালন |
| L | চিকিৎসা বিজ্ঞান |
| LZ | ওষধিবিদ্যা (Pharmacoguosy) |
| M | ব্যবহারিক শিল্প |
| △ | আধ্যাত্মিকতা ও মরমীয়াবাদ (Mysticism) |
| MZ | মানববিদ্যাদি ও সমাজবিজ্ঞান |

| | |
|---|---|
| MZA | মানববিদ্যা (Humanities) |
| N | সুকুমারশিল্প |
| NZ | ভাষা ও সাহিত্য |
| O | সাহিত্য |
| P | ভাষাবিজ্ঞান (Linguistics) |
| Q | ধর্ম |
| R | দর্শন |
| S | মনোবিজ্ঞান |
| SZ | সমাজবিজ্ঞান |
| T | শিক্ষা |
| U | ভূগোল |
| V | ইতিহাস |
| W | রাষ্ট্রবিজ্ঞান |
| X | অর্থনীতি |
| Y | সামাজিক বিদ্যা (Sociology) |
| YZ | সমাজসেবা (Social work) |
| Z | আইন |

INSTITUTE OF EDUCATION FOR WOMEN Deptt. of Extension Services CALCUTTA-27

ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী ও বাংলা লিপির বিবর্তন।

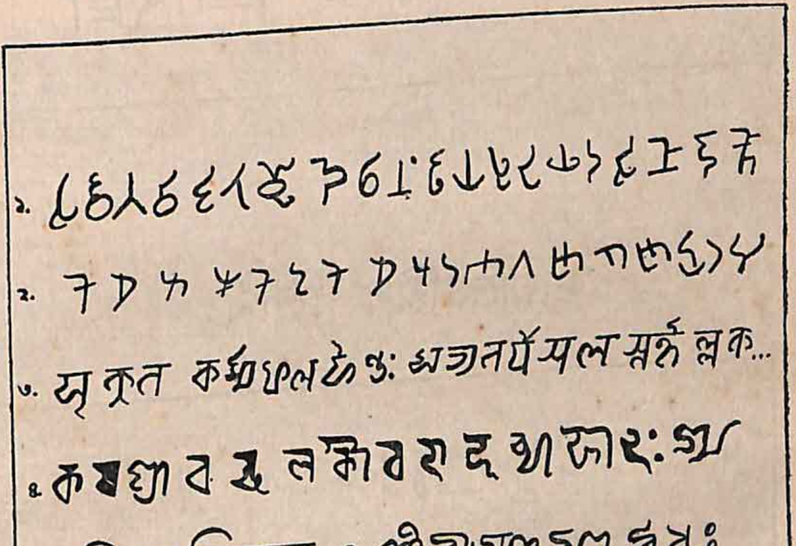

১. ৩য় খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ ব্রাহ্মী - গির্নার অশোক লিপি
২. ৩য় খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ খরোষ্ঠী- শাহবাজগড়ী অশোক লিপি
৩. ৬ষ্ঠ খ্রীষ্টাব্দ ব্রাহ্মী - কুটিল লিপি
৪. ৯ম খ্রীষ্টাব্দ রাজা লক্ষ্মণ শিলালিপি
৫. ১২শ খ্রীষ্টাব্দের বাংলা লিপি

চিত্র নং ২

## কিউনিফর্ম লিপি

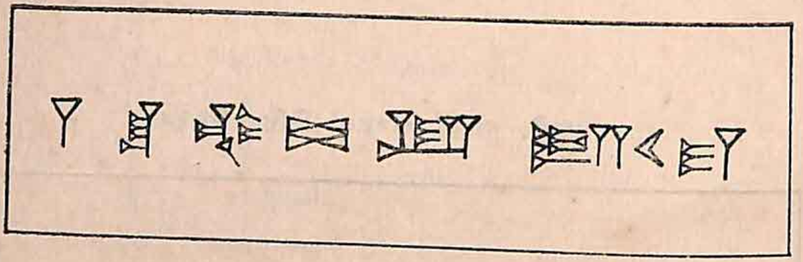

## হায়ারোগ্লিফ লিপি

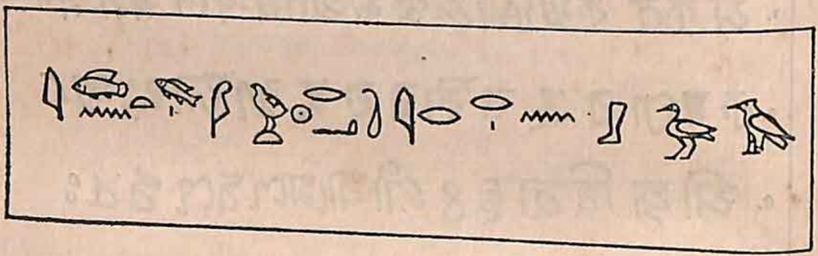

## সিন্ধু লিপি

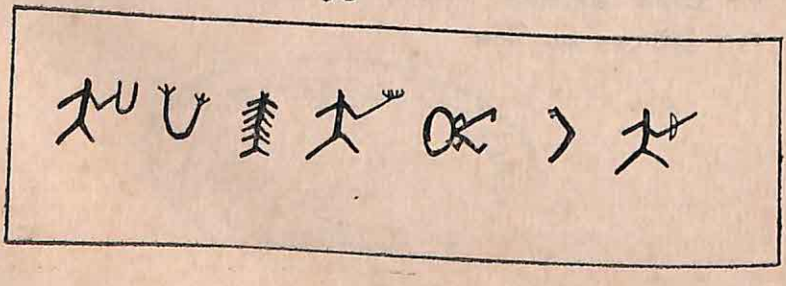

চিত্র নং ২

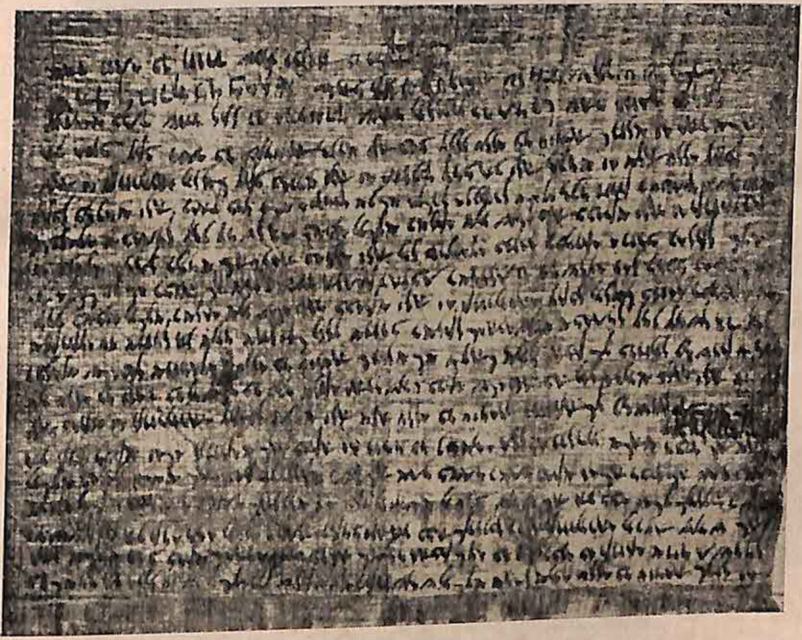

পেপিরসে লিখিত বইএর পৃষ্ঠা : মিশর ৫ম শতাব্দী

চিত্র নং ৪

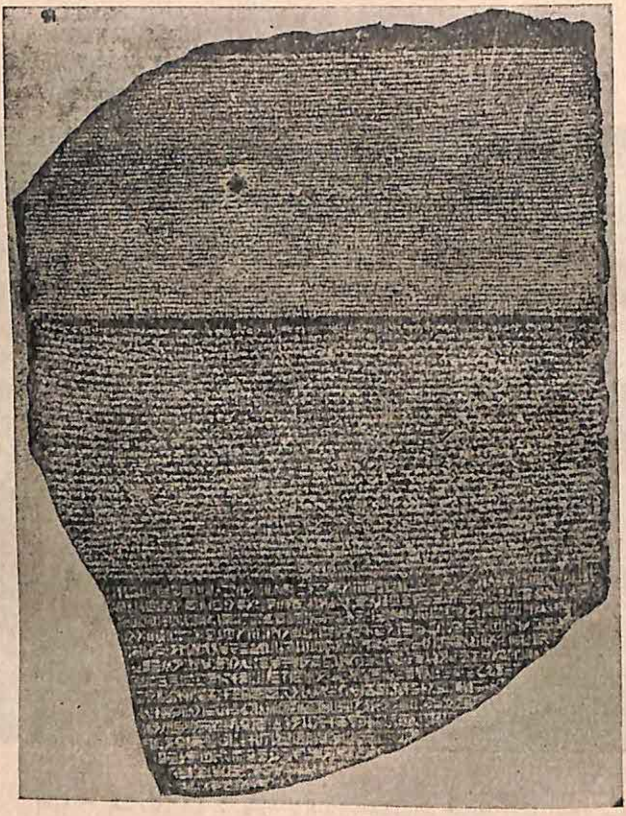

রসেটা শিলা লেখ
( বিশ্বভারতীর সৌজন্যে )

বুক অফদি ডেড গ্রন্থের পৃষ্ঠা
( বিশ্বভারতীর সৌজন্যে )

চিত্র নং ৬

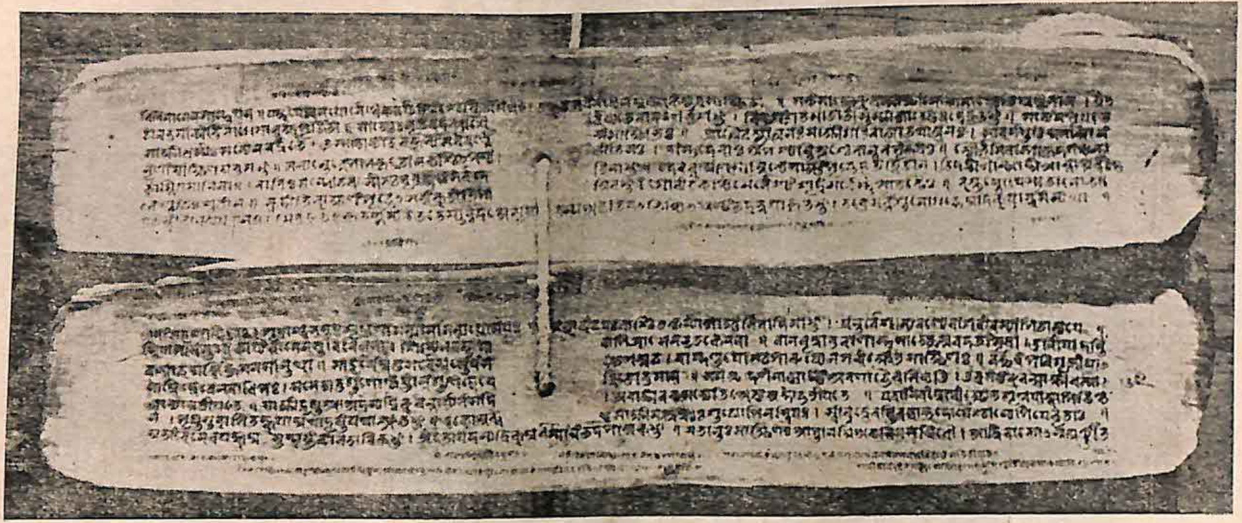

১৪৩৯ খ্রীষ্টাব্দের বাংলা হরফে লেখা সংস্কৃত ভৃগুর চিত্র 'মানবধর্মশাস্ত্র' পুঁথির একটি পৃষ্ঠা।

উপকরণঃ চেরা কাঠের পাতলা তক্তি।

( বিশ্বভারতীর সৌজন্যে )

চিত্র নং ৭

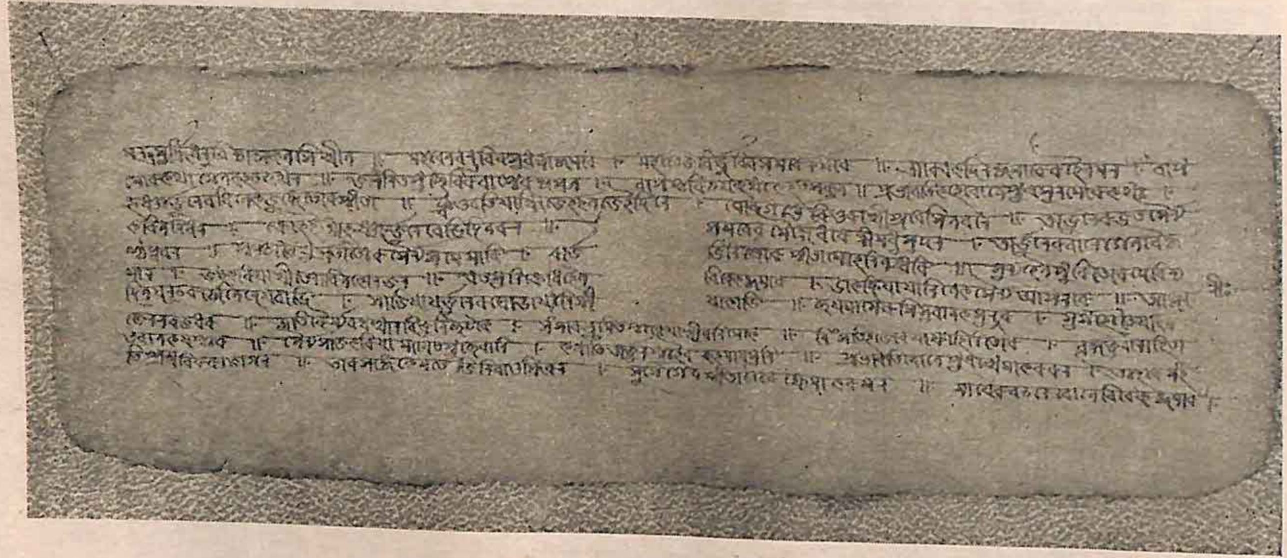

তুলোট কাগজের পুঁথি : 'মহাভারত' বাংলা লিপি. লিপিকাল ১১৩৯ বঙ্গাব্দ।
( বিশ্বভারতীর সৌজন্যে )

চিত্র নং ৮

বাংলা পুথির চিত্রিত পাটা

( বিশ্বভারতীর সৌজন্যে )

চিত্র নং ৯

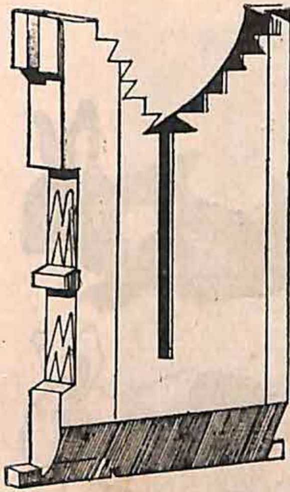

লাইনোটাইপ ছাঁচ

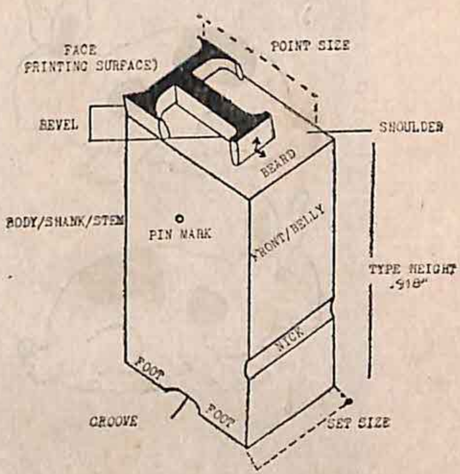


হরফ (Type)

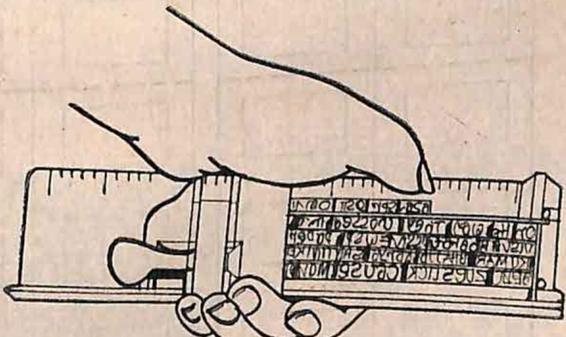

মুদ্রাবিন্যাসের আধার (COMPOSING STICK)

রেখা চিত্রণ Line Block)

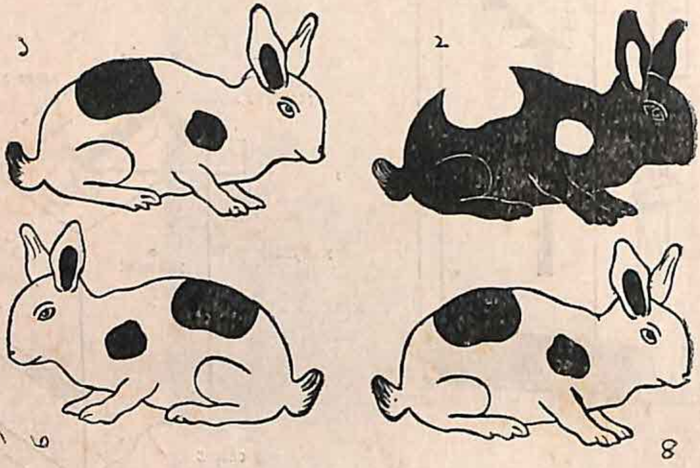


রেখাচিত্রন-

উপস্থাপন ( Imposition )

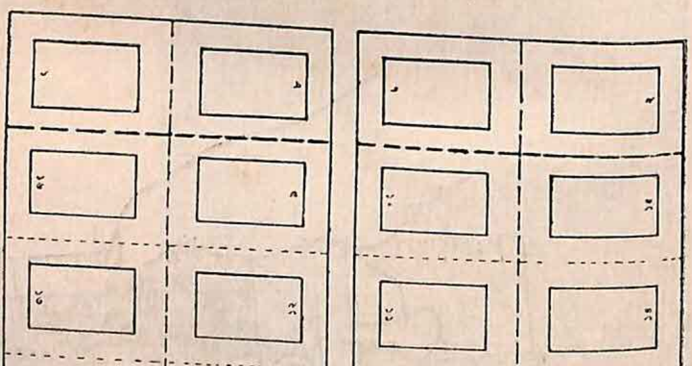

অন্তর্ভাগ (Iner forma) বহির্ভাগ (Outer forma)

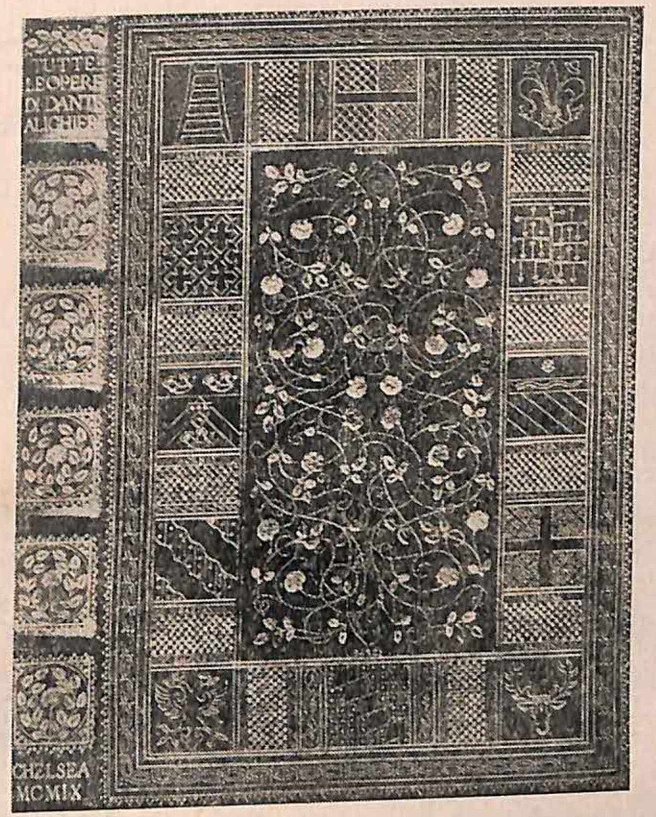


চিত্রিত বাঁধাইএর নমুনা

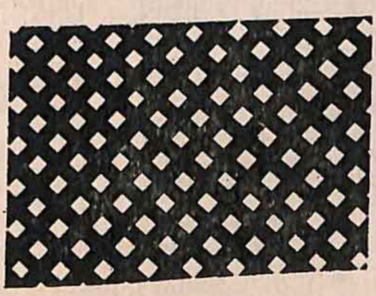

হাফটোন পর্দা - বিবর্দ্ধিত নক্সা

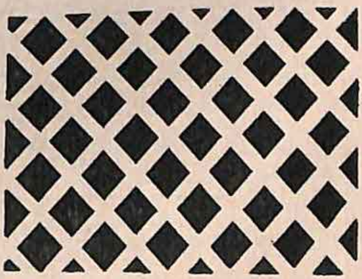

ফটোগ্রেভিওর পর্দা - বিবর্দ্ধিত নক্সা

চিত্র নং ১২

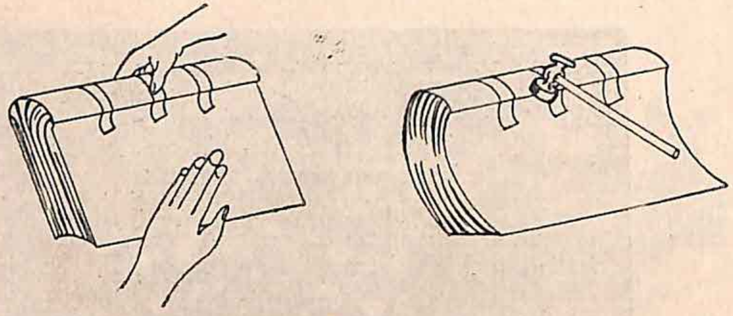

বর্তুলীকরণ

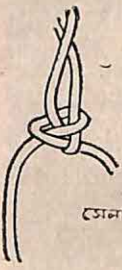

সেলাই এর নমুনা

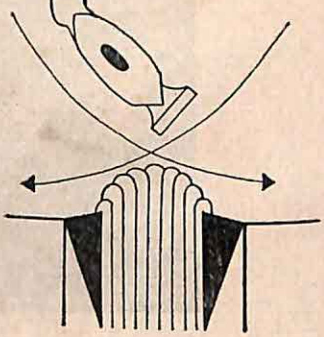

পুট পেষন

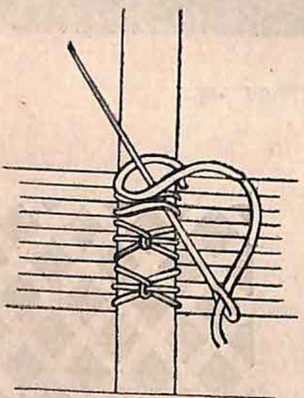

তশলা সেলাই

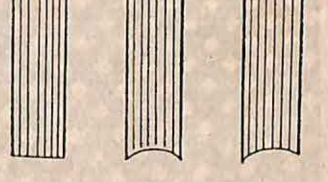

সেলাই এর পরে    বর্তুলীকরণের পরে    পুট পেষনের পরে

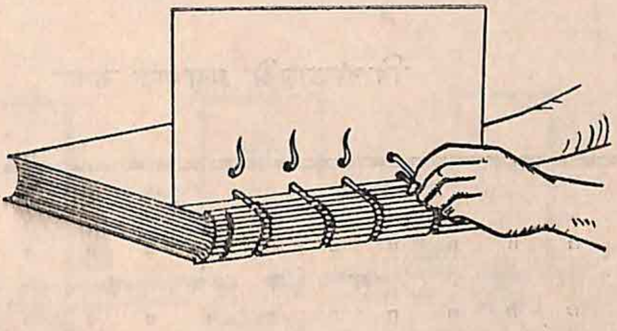

মলাটের কাজ    ফিতে লাগানো

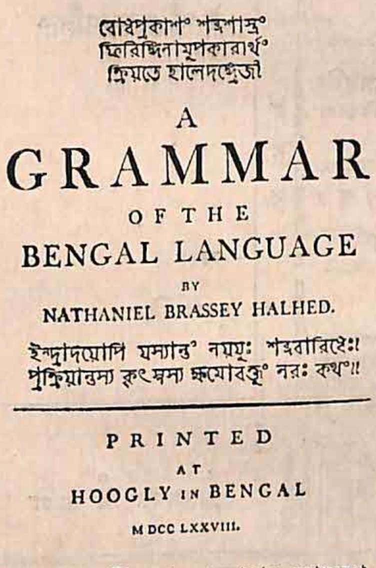

বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং
ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং
ক্রিয়তে হালেদঙ্গ্রেজী

A
GRAMMAR
OF THE
BENGAL LANGUAGE
BY
NATHANIEL BRASSEY HALHED.

ইন্দ্রাদয়োপি যস্যান্তং নযযুঃ শব্দবারিধেঃ।
প্রক্রিয়ান্তস্য কৃৎস্নস্য ক্ষমোবক্তুং নরঃ কথং॥

PRINTED
AT
HOOGLY IN BENGAL
MDCC LXXVIII.

হালহেদ রচিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ
গ্রন্থের আখ্যা পত্র (১৭৯৩খ্রী)

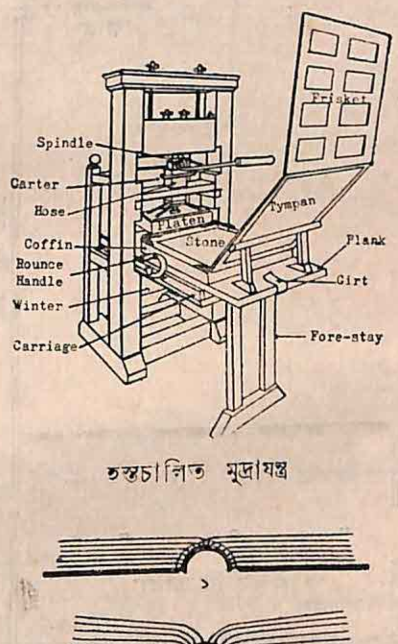


হস্তচালিত মুদ্রাযন্ত্র

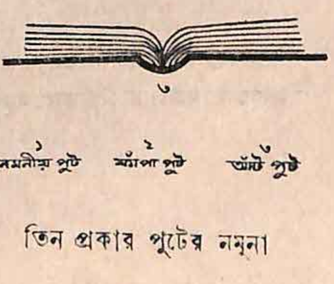


১ নমনীয় পুট    ২ ঝাঁপা পুট    ৩ আঁট পুট

তিন প্রকার পুটের নমুনা

চিত্র নং ১৪

বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার ভবন

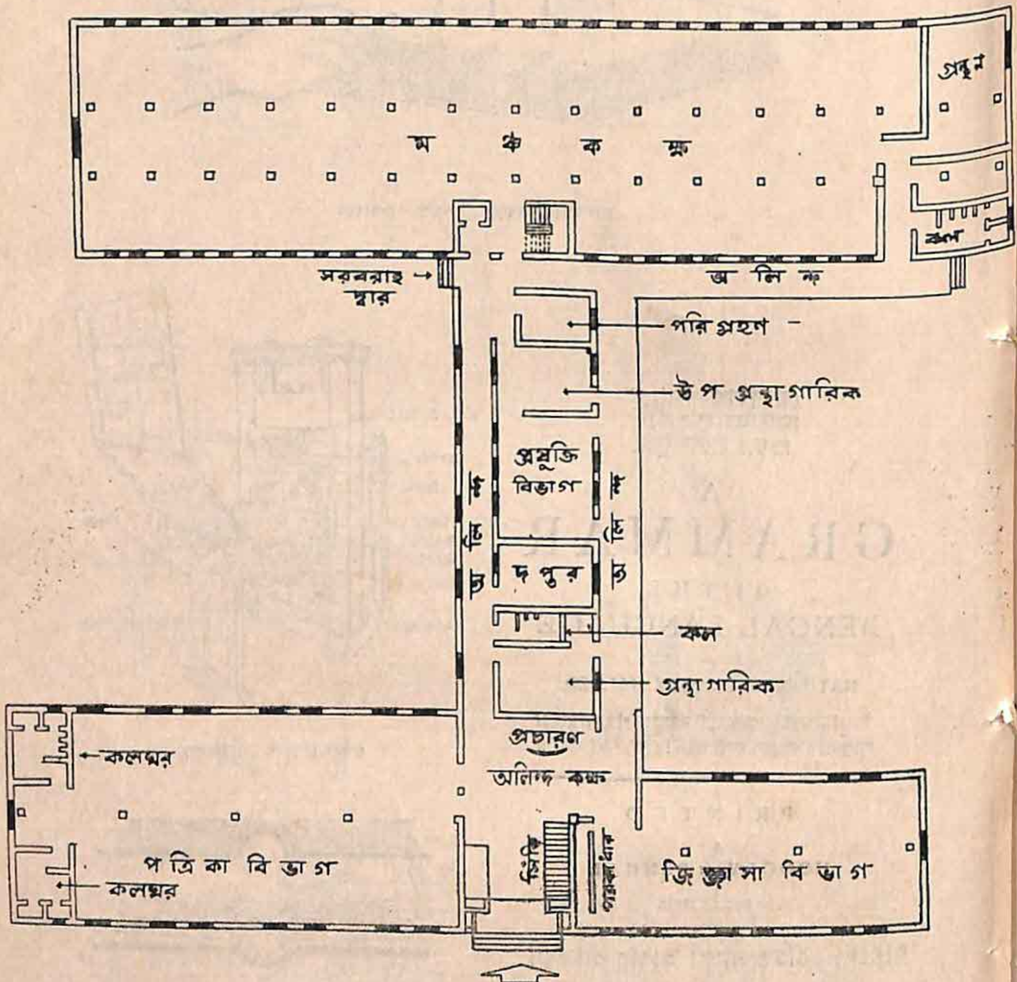


ভবনের সম্মুখাংশ দ্বিতল, পত্রিকা বিভাগের উপরের প্রকোষ্ঠ পাঠকক্ষ
জিজ্ঞাসা বিভাগের ঊর্দ্ধতল বক্তৃতা কক্ষ। পশ্চাতের মঞ্চকক্ষাংশ ত্রিতল

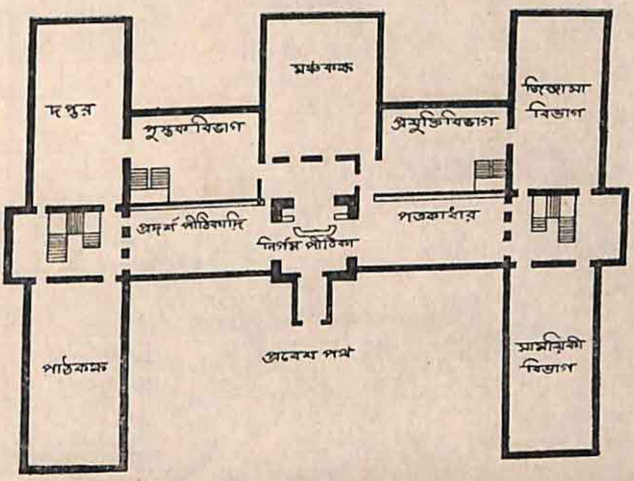


ছোট গ্রন্থাগারের নকসা

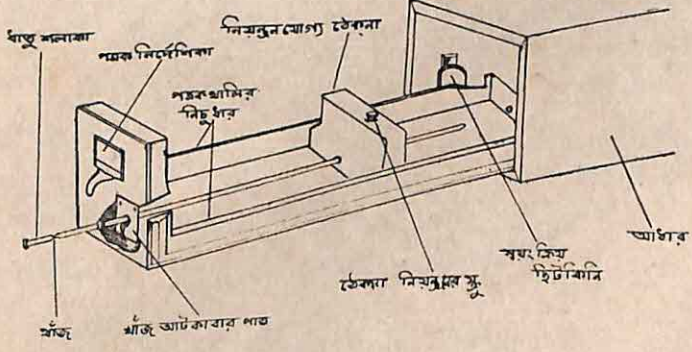


পত্রকাধার (Card Box)

চিত্র নং: ১৬

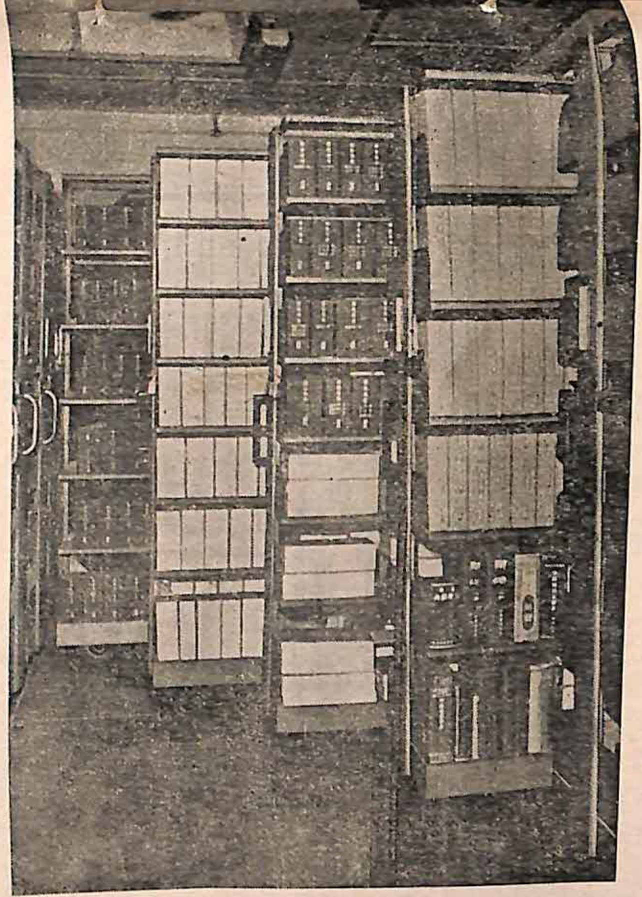

চাকা সংযুক্ত পুস্তক মঞ্চ (জাতীয় গ্রন্থাগারের সৌজন্যে)

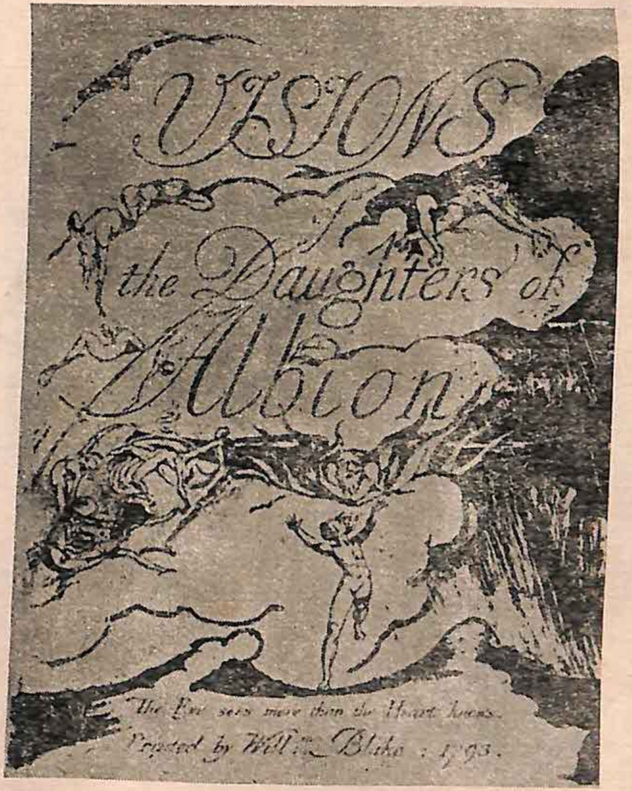


উইলিয়াম ব্লেক রচিত একটি গ্রন্থের আখ্যাপত্র (১৭৯৩খ্রী)

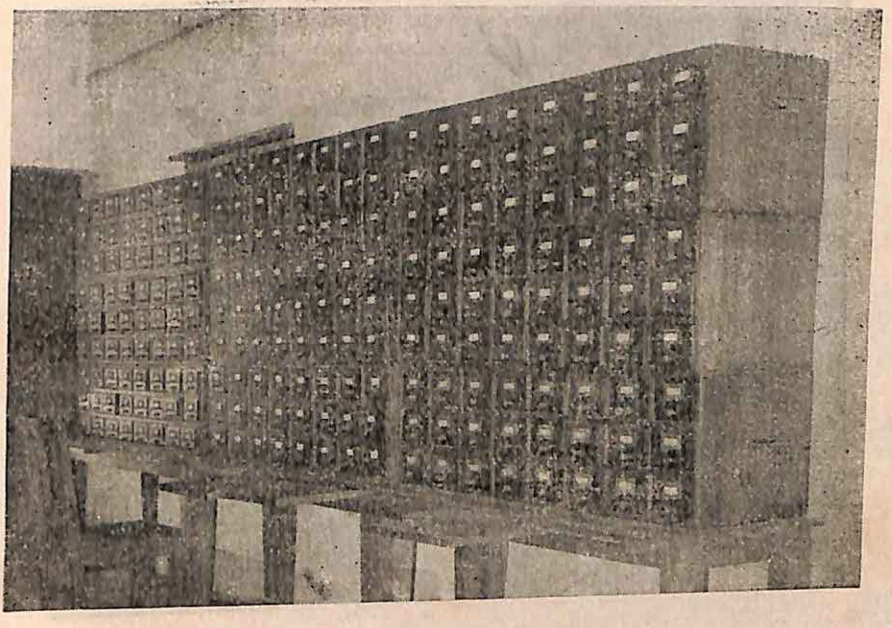

মঞ্চ পত্রকাধারের একাংশ, বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার

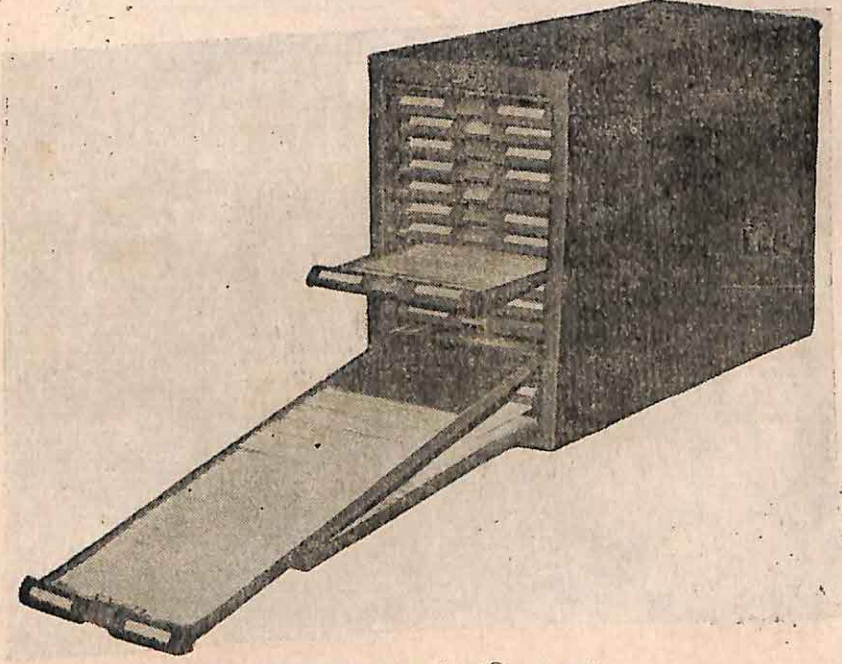

পত্রিকা পত্রকাধার ( রোলিং-ডেস্ক )

চিত্র নং ১৮

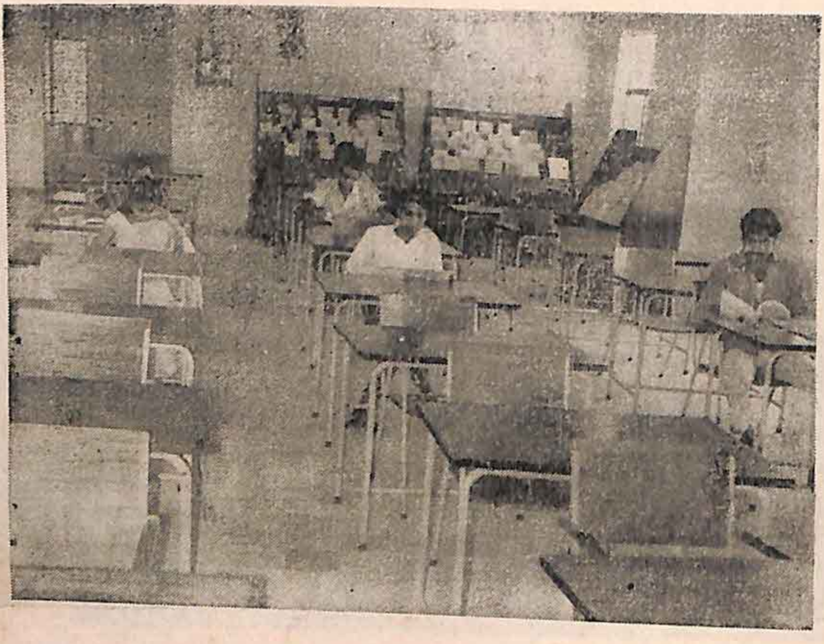

পত্রিকা কক্ষ ( পত্রিকা মঞ্চ দ্রষ্টব্য ) বিশ্বভারতী

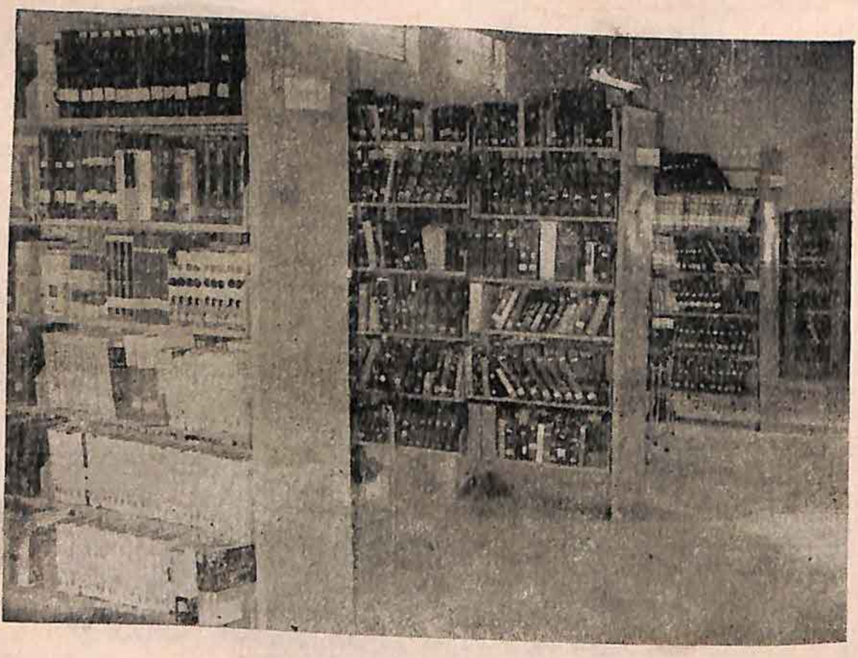

ইস্পাতের পুস্তক মঞ্চ ( বিশ্বভারতী )

চিত্র নং ১২

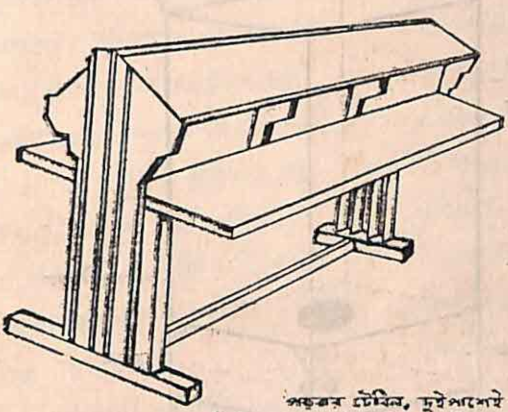

পড়বার টেবিল, দুইপাশেই বসা যায়
(পত্রিকার প্রদর্শ ও স্ট্যান্ড হিসেবেও চলতে পারে)

পত্রিকা প্রদর্শ মঞ্চ
তাকের নিচে পুরানো সংখ্যাগুলি রাখার ব্যবস্থাযুক্ত

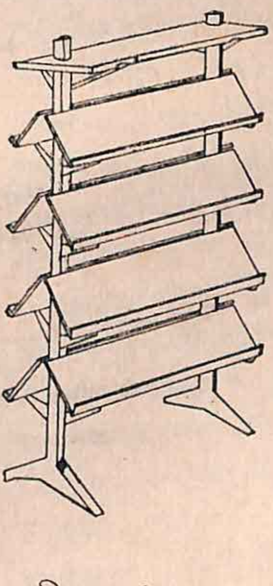

পত্রিকার প্রদর্শ মঞ্চ

চিত্র নং ২০

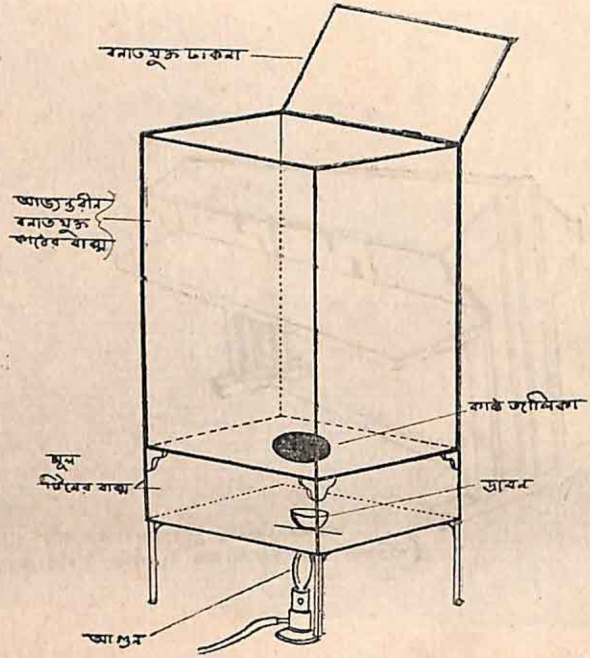


ফরমালডিহাইড কক্ষ

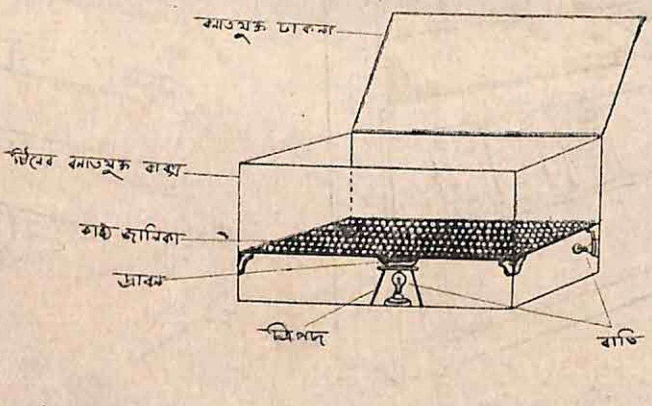


জাইলল কক্ষ

# গ্রন্থে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দকোষ

Abbreviation—সংক্ষিপ্তিচিহ্ন
Accession—পরিগ্রহণ
Accession No.—পরিগ্রহণ সংখ্যা
Accession register—পরিগ্রহণ পঞ্জী
Acquisition—সংগ্রহ, পুস্তক সংগ্রহ
Analytic Card—বিশ্লেষ পত্রক
Audio-visual aid—দৃষ্টি-শ্রুতি সহায়
Author mark—লেখক চিহ্ন
Backing—পুটপেষণ
Band head, tail)—শিরজা
Bevel—ঢালু
Board—পাটা
Book mark—গ্রন্থচিহ্ন
Bulletin—বৃত্তান্ত পত্র
Call No.—গ্রন্থসংলেখ
Card—পত্রক, সূচী পত্রক
Card box—পত্রকাধার
Card cabinet—সূচীপত্রকাধার
Card filing—পত্রক বিন্যাস
Case—মলাট
Catalogue—তালিকা
Cataloguing code—সূচীকানুন
Cataloguing convention—সূচীরীতি
Cataloguing rules—সূচীকরণবিধি
Cess—দেয়ক
Charging system—প্রচলন পন্থা
Circulation—সঞ্চারন
Class—শ্রেণী
Class No—বর্গসংখ্যা
Classified catalogue—অনুবর্গসূচী
Collation—গ্রন্থপ্রকরণ, পুস্তকতথ্য
Composing case—মুদ্রাথালি
Composing stick—মুদ্রাবিন্যাসাধার
Concave—অবতল
Contents—সূচী
Convex—উত্তল
Copy—প্রস্থ
Copy right—স্বত্ব, গ্রন্থস্বত্ব
Counter—পীঠিকা
Cover—মলাট
Cross reference—নির্দেশ পরম্পরা
Deckle—জাল ছাঁকুনি
Decoration—অলঙ্করণ
Department—প্রভাগ
Dictionary catalogue—অনুবর্ণ সূচী
Discount—অবহার
Display board—প্রদর্শফলক
Division—বিভাগ
Documenatation—নথিনিবেশ
Documentation service—নথিকৃত্য
Documentation work—নথিকরণ
Dummy system—প্রতিরূপ প্রথা
Dust cover—অলগ্ন মলাট
Edition—সংস্করণ
End paper—পুস্তানি—
Extension—প্রসার

Extension lecture--শিক্ষা প্রসারণ বক্তৃতা
Faculty—সংকায়, অনুষদ
Fly leaf - অমুদ্রিত পত্র
Form class—আকারগত শ্রেণী
Form division – প্রকারগত বিভাগ
Foyer—অলিন্দ কক্ষ
Frontispiece – সম্মুখচিত্র
Gathering – গুচ্ছ
Guide card - সংকেত পত্রক
Half title—গ্রন্থনামপত্র
Hand book—সারগ্রন্থ
Illumination – জ্যোতিচিত্রণ
Illustration – চিত্রশোভন. চিত্র
Imposition – উপস্থাপন
Imprint—গ্রন্থপরিচয়, মুদ্রণ তথ্য
Indention—পংক্তিক্রম, সংস্থান
Index—নির্দেশিকা, অনুক্রমনিকা
Intaglio – অবক্ষেপন
Inter-library loan – আন্তঃ গ্রন্থাগার ঋন
Issue—নির্গম
Issue card—নির্গক পত্রক
Issue counter—নির্গম পীঠিকা
Issue register – নির্গম বহি
Jacket—অলগ্ন মলাট
Janitor – তত্ত্বাবধায়ক
Lending section - পুস্তক ঋন বিভাগ
Lining – আস্তরন
Long range - ব্যাপ্তবৃত্ত
Lower case—নিম্নথালি
Maintenance —পরিপোষন
Margin—পরিচ্ছদে
Micro card – অনুপত্রক
Micro film – অনুচিত্র
Movable type—সংচাল্য হরফ
Notes—টীকা, মন্তব্য
Notice board – বিজ্ঞপ্তি ফলক
Order – অনুজ্ঞা
Order form – অনুজ্ঞা পত্র
Painting—বর্ণাঙ্কন, বর্ণচিত্রণ
Photostat – আলোকচিত্রানুলিপি, চিত্রপত্র
Planography – সমতল
Price - দাম, মূল্য
Professional বৃত্তিকুশলী
Publicity—প্রচার
Record (disc) – স্বরধারক থালিকা স্বরথালিকা
Record (tape) – স্বরধারক ফিতা, স্মরপটিকা
Recto পত্রমুখ
Reference তথ্যসন্ধান, প্রসঙ্গ নির্দেশ
Reference book - তথ্যসহায় পুস্তক
Reference card – নির্দেশক পত্রক
Reference department— জিজ্ঞাসা বিভাগ
Reference desk - তথ্যসহায় পীঠিকা
Reference questioon – জিজ্ঞাসা
Reference service – নির্ণয়কৃত্য
Relief – অভিক্ষেপণ
Return – আগম

Rounding – বর্তুলীকরণ
Running title – ক্রমায়ত গ্রন্থনাম
Schedule – ছক
Section – শাখা
See – দেখুন, পশ্য
See also – আরও দেখুন, অপিচ পশ্য
Seminar – শিক্ষামণ্ডল, পাঠমণ্ডল
Semi-professional – অর্ধকুশলী
Series – গ্রন্থমালা
Set – সমষ্টি, সংগ্রহ
Shelf – মঞ্চ, তাক
Shelf arrangement – মঞ্চসজ্জা
Shelf card – মঞ্চপত্রক
Shelf list – মঞ্চতালিকা
Shelf system – মঞ্চপদ্ধতি
Shift – কাল পর্য্যায়
Shift duty – বদলি কৃত্যক
Short range – স্বল্পবৃত্ত
Signature – গুচ্ছচিহ্ন, দপ্তরচিহ্ন
Shine – পুট
Stock taking – পুস্তক সম্ভারগণন
Sub-division – উপবিভাগ
Sub-section – প্রশাখা
Sub-title – উপ-আখ্যা, উপাখ্যা
Term – নাম, আখ্যা
Title – আখ্যা, গ্রন্থাখ্যা
Title page – আখ্যাত্র, গ্রন্থনামপত্র
Tooling – খোদাই
Tracing – অনুসরনী
Type – হরফ, মুদ্রা
Upper case – উর্দ্ধথালি
Value – দর
Verso – পত্রপৃষ্ঠ
Volume – খণ্ড
Water mark – জলছাপ

# গ্রন্থে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দকোষ

অনুজ্ঞা – Order
অনুজ্ঞা পত্র – Order form
অনুক্রমণিকা – Index
অনুচিত্র – Micro film
অনুপত্রক – Micro card
অনুবর্গসূচী – Classified catalogue
অনুবর্ণসূচী – Dictionary catalogue
অনুসরণী – Tracing
অনুষদ – Faculty
অপিচ পশ্য – See also
অবক্ষেপন – Intaglio
অবতল – Concave
অবহার – Discount
অভিক্ষেপন – relief
অমুদ্রিত পত্র – Fly leaf
অর্ধ কুশলী – Semi-professional
অলঙ্করণ – Decoration
অলগ্ন মলাট – Jacket, dust cover
অলিন্দ কক্ষ – Foyer
আকারগত শ্রেণী – From class
আখ্যা – Title, term
আখ্যাপত্র – Title page
আগম – Return
আন্তঃ গ্রন্থাগার ঋন – Inter-library loan
আরও দেখুন – See also
আলোক চিত্রানুলিপি – Photostat
আস্তরণ – Lining
উত্তল – Convex

উপ-আখ্যা, উপাখ্যা – Sub-title
উপবিভাগ – Sub-division
উপস্থাপন – Imposition
উর্ধথালি – Upper case
কাল পর্যায় – Shift
ক্রমায়ত গ্রন্থনাম – Running title
খণ্ড – Volume
খোদাই – Tooling
গুচ্ছ – Gathering
গুচ্ছচিহ্ন – Signature
গ্রন্থাখ্যা – Title
গ্রন্থচিহ্ন – Book mark
গ্রন্থনাম পত্র – Half title
গ্রন্থ পরিচয় – Imprint
গ্রন্থ প্রকরণ – Collection
গ্রন্থমালা – Series
গ্রন্থ সংখ্যান – Accession
গ্রন্থ সংলেখ – Call No
গ্রন্থস্বত্ব – Copy right
চিত্র, চিত্রশোভন – Illustration
চিত্রপত্র – Photostat
ছক – Schedule
জলছাপ – Water-mark
জাল ছাঁকুনি – Deckle
জিজ্ঞাসা – Reference question
জিজ্ঞাসা বিভাগ – Reference department
জ্যোতিচিত্রণ – Illumination

টীকা – Notes
ঢালু – Bevel
তত্ত্বাবধায়ক – Janitor
তথ্যসন্ধান – Reference
তথ্য সহায় পীঠিকা—Reference desk
তথ্য সহায় পুস্তক – Reference book
তাক—Shelf
তালিকা – Catalogue
দপ্তর চিহ্ন – Signature
দর – Value
দাম – Price
দৃষ্টি-শ্রুতি সহায় – Audio-visnal aid
দেখুন – See
দেয়ক – Cess
নথিকরণ – Documentation work
নথিকৃত্য – Documentation service
নথিনিবেশ – Documentation
নাম – Term
নিম্নথালি – Lower case
নির্গম – Issue
নির্গম পত্রক – Issue card
নির্গম পীঠিকা – Issue counter
নির্গম বহি – Issue register
নির্ণয় কৃত্য – Reference service
নির্দেশক পত্রক – Reference card
নির্দেশিকা – Index
নির্দেশ পরম্পরা – Cross reference
পংক্তিক্রম – Indention
পত্রক – Card
পত্রক বিন্যাস – Card filing
পত্রকাধার – Card box
পত্রপৃষ্ঠ – Verso
পত্রমুখ – Recto
পরিচ্ছেদ – Margin
পরিগ্রহন – Accession
পরিগ্রহন পঞ্জী – Accession register
পরিগ্রহন সংখ্যা – Accession no
পরিপোষণ – Maintenance
পশ্য – See
পাটা – Board
পাঠমণ্ডল – Seminar
পীঠিকা – Counter
পুট – Spine
পুটপেষণ – Backing
পুনর্মুদ্রন Reprint
পুস্তানি – End paper
পুস্তক ঋণ বিভাগ – Lending section
পুস্তক তথ্য – Collation
পুস্তক সংগ্রহ – Acquisition
পুস্তক সম্ভার গণন – Stock-taking
প্রকারগত বিভাগ – Form division
প্রচলন – Circulation
প্রচলন প্রথা – Charging sytem
প্রচার – Publicity
প্রতিরূপ প্রথা – Dummy system
প্রদর্শ ফলক – Display board
প্রভাগ – Department
প্রশাখা – Sub-section
প্রসার – Extension
প্রসঙ্গ নির্দেশ – Reference

প্রস্থ – Copy
বদলি কৃত্যক – Shift duty
বিজ্ঞপ্তি ফলক – Notice board
বিভাগ – Division
বিশ্লেষ পত্রক – Analytic card
বৃত্তান্ত পত্র – Bulletin
বৃত্তি কুশলী – Professional
ব্যাপ্ত বৃত্ত – Long range
বর্গ সংখ্যা – Class no
বর্তুলী করণ – Rounding
বর্ণাঙ্কন – Painting
মঞ্চ – Shelf
মঞ্চ তালিকা – Shelf list
মঞ্চ পত্রক – Shelf card
মঞ্চ পদ্ধতি – Shelf system
মঞ্চসজ্জা – Shelf arrangement
মন্তব্য – Notes
মলাট – Cover, case
মুদ্রন – Print
মুদ্রন তথ্য – Imprint
মুদ্রা – Type
মুদ্রাথালি – Composing case
মুদ্রাবিন্যাসাধার – Composing stick
মূল্য – Price
লেখক চিহ্ন – Author mark
শাখা – Section
শিক্ষা প্রসারবক্তৃতা – Extension lecture
শিক্ষা মণ্ডল – Seminar
শিরজা – Band (head, tail)
শ্রেণী – Class
সংকায় – Faculty
সংকেত পত্রক – Guide card
সংক্ষিপ্তি চিহ্ন – Abbreviation
সংগ্রহ – Acquisition, set
সংচাল্য হরফ – Movable type
সঞ্চারন – Circulation
সংস্করন – Edition
সমতল – Planography
সমষ্টি – Set
সম্মুখচিত্র – Frontispiece
সারগ্রন্থ – Hand book
সূচী – Contents
সূচীকরণবিধি – Cataloguing rules
সূচী কানুন – Cataloguing code
সূচী পত্রক – Card
সূচীপত্রকাধার – Card cabinet
সূচীরীতি – Cataloguing convention
স্বত্ব – Copy right
স্বরথালিকা, স্বরধারিক থালিকা – Record (dise)
স্বর পট্টিকা, স্বরধারক ফিতা – Record (tape)
স্বল্পবৃত্ত – Short range
হরফ – Type

---

# নির্দেশ পঞ্জী


## অ

অক্টেভিয়ান লাইব্রেরী ১১
অগাষ্টাস ১১
অটোগ্রাফিক ৫১
অতীশ দীপঙ্কর, শ্রীজ্ঞান ১৪
অনুজ্ঞা (বইএর) ২৯৬, ২৯৭
অনুজ্ঞা পত্র ২৯৮
অনুসরণী ১৬০, ১৭০, ১৭৩, ১৯৪
অন্তর্ভুক্তি পত্রক ১৮৭-৮৯
অন্ধদের গ্রন্থাগার ২২৯
অবক্ষেপন প্রক্রিয়া ৫১
অভিক্ষেপন প্রক্রিয়া ৫০
অভিক্ষেপণ পদ্ধতি ৫১
অভিধান ৩৬৪, ৩৬৮
অভিধান, কোষ ১৯০-৯১
অমুদ্রিত পত্র ৬৮
অর্থ বণ্টন খতিয়ান ৩১৭
অর্থ বণ্টনের সূত্র ২৮৫
অর্ধকুশলী ২৮৪
অল্ আজিজ ১২
অল্ মামুদ ১২
অলগ্ন পত্রকসূচী ১৬১-৬২
অলঙ্করন ৫০
অলিন্দ কক্ষ ২৬৬,২৬৭
অবিচেন্না ১২
অশ্লীলতা ২৯৩

## আ

আখ্যাপত্র ৬৯, ১৬৯
আক্কাদ ১০
আকবর ৪১৬
আকারগত শ্রেনী ৯৭, ১০৫
আদেয়ক খতিয়ান ৩১৮
আন্তঃগ্রন্থাগার পুস্তক ঋণ ২৮৬
আন্তঃগ্রন্থাগার লেন দেন ২৪৮
আন্তর্জাতিক বর্গীকরণ ১৪৫, ১৪৭
আবু আলি ইবণ সিনা ১২
আভিধানিক তালিকা ১৬৪, ১৬৬
আমীর খসরু ৪১৪
আরদাশির ১২
আরশোলা ৩২৩
আর্যভট্ট ১৪
আলতেনজেন ১৫
আলপিয়ান লাইব্রেরী ১১
আলোক চিত্রায়ণ ৫১
আসবাবপত্র ৩২৯
আসবাব ( গ্রন্থাগার ভবনের ) ২৬৭
আসাদুল্লা ৪২২
আমিনিয়ান চেল্লিও ১১
আসিরীয় ৫
আসুরবানি পাল ৫, ১০

## ই

ইউফোরিয়ান ১১
ইউমেনেস, দ্বিতীয় ১১
ইংলণ্ড ১৩
ইজিপশিয়ান নেশনেল লাইব্রেরি ৪০৯
ইৎ সিং ১৪
ইঁদুর ৩২৬
ইন্টাগ্লিও পদ্ধতি ৫১
ইবন্ আব্বাদ ১২

ইলেক্‌ট্রোটাইপ ৪৪, ৪৫
ইসিডোর, সেভিল ১১

উ

উইপোকা ৩২৬
উইল্‌কিন্‌স্‌, জন ১৮, ৪১৮
উইলিয়াম কেরী ১৮, ১৯, ৪১৮, ৪১৯
উকুনের মত খুদে পোকা ৩২৫
উড এনগ্রেভিং ৫২
উড কাট ৫২
উৎসর্গ পত্র ৬৯
উপস্থাপন ৩৭, ৩৮

এ

এক-পত্রক নথিভুক্তি (সাময়িকী) ৩৩৭-৩৩৮
এ কোয়ার্টিন্ট ৫৫
এচিং ৫৮
এথেন্স ১১
এন্‌ ৩৪-৩৫
এন্‌ড্রনিকাস ১১
এম্‌ ৩৪-৩৫
এরিস্টট্‌ল ১০,১১
এলামিট ৫
এশিয়াটিক সোসাইটি ৪১৯

ও

ওভ কাগজ ২৫
ওদন্তপুরী ১৪
ওমর-অল-ওয়াকিদিদি ১২
ওয়্যারমাউথ ১৩

ক

কথোপকথন ( কেরীপ্রণীত ) ১৯
কপার এন্‌গ্রেভিং ৫৬ ৫৭
কবীন্দ্রাচার্য ৪১৫
কনস্তান্তিনোপল ১১
কর্মী নিয়োগ ২৭৫-২৭৭
কর্মী নিয়োগের সূত্র ২৮২-২৮৪
কর্মী সহযোগ ২৪৭
কলদীয় ১৩
কস্টার, লরেন্স ১৭, ৪০৩
কহ্লন ১৪
কাগজ ১৮, ২০-২৭
কাগজ (কলে তৈরী) ২১-২২, ২৩-২৪, ২৫
কাগজ (হাতে তৈরী) ২১-২২, ২৩-২৪, ২৫
কাগজের ওজন ২৭
কাগজের মাপ ২৬
কাগজের মলাট ৮৬
কাচ (সংরক্ষণ) ৩৩০
কাটার, চার্ল্‌স এম্মি ১১৮
কাঠ ৭, ৮
কাঠ খোদাই ৫২
কাঠ খোদাই ( পুথি ) ১৭
কাঠের তাক ( সংরক্ষণ ) ৩২৮
কাপড় ( সংরক্ষণ ) ৩২৯
কারা গ্রন্থাগার ২২৭
কার্ল ক্লিক্‌ ৫৯
কালজয়ী গ্রন্থাদি পত্রক ১৭২, ১৮২
কালি ২৭-২৯
কায়রো ১২
কাশ্মীর ১৪
কিউনিফর্ম ৫
কীলকাকার ( লিপি ) ৫
কুমারজীব ১৪
কেরী, উইলিয়াম ১৮, ১৯, ৪১৮, ৪১৯
কেশ ৪২২
কোডেক্স, কোড ৭
কোরিয়া ১৭
কোলোটাইপ ৬৩-৬৪
কোষ, অভিধান ১৯০-৯১
কোষগ্রন্থ ৩৬৮-৩৭৩

| | |
|---|---|
| কৌটিল্য | ১৪ |
| ক্যাক্সটন উইলিয়াম | ১৮,৪০৩ |
| ক্যানটার বারি | ১৩ |
| ক্রয় নির্দেশ পত্র | ২৯৭ |

## খ

| | |
|---|---|
| ক্ষেমেন্দ্র | ১৪ |
| খরোষ্ঠি | ৮ |
| খুদাবক্স গ্রন্থাগার | ৪১০ |
| খুদে গুবড়ে জাতীয় পোকা | ৩২৫ |

## গ

| | |
|---|---|
| গবেষণা গ্রন্থাগার | ২২২ |
| গাছের ছাল | ৮ |
| গিজে, ইজিপ্ট | ১০ |
| গিলগামেস মহাকাব্য | ৫ |
| গিলে মালে | ১৩ |
| গুটেনবুর্গ, যোহান | ১৭, ৪০৩ |
| গেজেটিয়ার | ৩৭৫ |
| গোয়া | ১৮ |
| গ্রন্থ (বুৎপত্তি) | ৮ |
| গ্রন্থ, পুস্তক (পরিচয়) | ২১২,২১৩ |
| গ্রন্থকক্ষ | ২৬৪ |
| গ্রন্থকার | ১৬০, ১৬৭ |
| গ্রন্থকার চিহ্ন | ১৫৫ |
| গ্রন্থকার পত্রক | ১৭১,১৭৪ |
| গ্রন্থচিহ্ন | ১৫৪ |
| গ্রন্থতালিকা | ২৮৭,৩৮২,৩৮৩ |
| গ্রন্থন | ৬৬-৮৭ |
| গ্রন্থন (ইতিহাস) | ৭৪-৭৭ |
| গ্রন্থন (প্রকাশন) | ৩৩২ |
| গ্রন্থন খতিয়ান | ৩১৬ |
| গ্রন্থনাম পত্র | ৬৮ |
| গ্রন্থপঞ্জী | ১৫৮,৩৭৯,৩৮২ |
| গ্রন্থ পরিচয় | ১৬০ |
| গ্রন্থ প্রকরণ | ১৬০ |
| গ্রন্থ বিদ্যা | ১৯৭ |
| গ্রন্থবীক্ষণ | ২০৩-২১০ |
| গ্রন্থবৃত্ত বর্গীকরণ | ১২৪-১৩০ |
| গ্রন্থমালা পত্রক | ১৭২-১৭৬ |
| গ্রন্থরাজি- (প্রাচীন) | ১৫ |
| গ্রন্থ সংগ্রহ (এ কালের) | ৪০৩-৪১০ |
| " " (সেকালের) | ৯,১৬ |
| " সংলেখ | ১৫৫,১৫৯ |
| " সংহারক | ৩২৩ |
| " সূচী | ১৫৭,১৫৮,১৫৯ |
| " স্বত্ব | ৭২,৭৪ |
| গ্রন্থখ্যা | ১৬০,১৬৭ |
| " পত্রক | ১৭১,১৭৬ |
| " সংস্থান | ১৬৮,১৬৯ |
| গ্রন্থাগার | ২,৩,৯,৮৯,২১১-১২,১৩-১৪ |
| " আইন | ৪২৭,৪২৮ |
| " কর্মী | ২৭৫ |
| " দপ্তর | ৩৩১-৩৩৩ |
| " দর্শন | ২৪৪,২৭৬ |
| " নিয়মাবলী | ২৭৭,২৭৯ |
| " পরিচালনা | ২৭৯,২৮০ |
| " প্রচাণ ও প্রসার | ৩৯৪-৪০২ |
| " (প্রাচীন) | ১৪-১৬ |
| " বিজ্ঞান | ১,২৪৪-২৪৬ |
| " বৃত্তি | ২৪৬ |
| " ভবন | ২৬১-২৭২ |
| " সমিতি | ২৭২-২৭৪ |
| গ্রন্থাগারিক | ২,২৩৩,২৩৪,২৩৫, ২৫৮,২৬০,২৭২,৩৫৭,৩৫৮ |
| " (প্রাচীন) | ১৬ |
| " ও গ্রন্থাগার সমিতি | ২৭৪-৭৫ |
| " ও পাঠক | ২৩০ |
| গ্রন্থাগারের পঞ্চনীতি | ২৩৫,২৩৬-২৪০ |

গ্রন্থাগারের ব্যবহারিক নীতি ২৪৯,২৫৮
,, সময় ২৭৭
,, সেবাক্রম ২৪৭,২৪৯
গ্রন্থাগার সংগঠন ২৬০
গ্রন্থেক্ষণ ১৯৮-২০৩
গ্রাহক খতিয়ান ৩০৫
গ্রীক ৭
গ্রীস ১০
গ্যালি ৩৪,৩৭

## ঘ

ঘটনাপঞ্জী ৩৭৭-৩৭৮

## চ

চটি কলাশালা ৪১৪
চরক ১৪
চণ্ডীচরণ মুন্সী ১৯
চামড়া ৭
চামড়া [সংরক্ষণ] ৩২৯,৩৩০
চাহিদা [বই এর] ২৮৮,২৮৯,২৯০
চিত্র [সংরক্ষণ] ৩৩০,৩৩১
চিত্রতক্ষণ ৫২
চিত্র প্রধান (ভাষা) ৪
চিত্রণ ৪৯,৬৫
চিত্ররূপ (বইএর) ২০
চিত্রসূচী ৭০
চিত্রশোভন ৫০
চীন ৮,১৪,১৭
চীন (বর্গীকরণ) ১৫৪-৫৫
চীনা ভাষা ৫
চেজ ৩৭
চেয়ার ২৬৮,২৬৯
চোষ কাগজ ২৬
চোষণ যন্ত্র ২৭১
চ্যাপমেন ৪২২

## ছ

ছত্রাক ৩২৫
ছদ্মনাম লেখক পত্রক ১৭২,১৭৯
ছাঁচ (হরফের) ২৯,৩০
ছাপাখানা ১৮
ছাপার কালি ২৯
ছাপার ভুল ৪৬
ছোটখাট পত্রিকা ৩৪৩

## জ

জন গ্রন্থাগার ২১৬-১৭,২৩৪,২৪৯,২৭২,
২৭৮,২৮৪,২৮৫,২৯১,
৩৫৬,৩৫৭,৩৬০,৩৯৫
জন গ্রন্থাগার, কলকাতা ৪২৩
জন গ্রন্থাগারিক ২৪৯,২৮৭
জলছাপ ২৪,২৫
জল রং ৫৫
জয়পুর ৪১৫
জাতীয় গ্রন্থাগার ২১৪,১৫
,, ,, কলিকাতা ৪২১
,, ,, ভারত ৪২১
জার্মানী ৪০৮
জাষ্টিফিকেশন ৩৬,৩৭
জিজ্ঞাসা বিভাগ ২৮১,৩৫১
জিনকোগ্রাফি ৫২,৫৩
জীবক ১৪
জুলিয়াস সিজার ১১
জেরুজালেম ১১
জেরোগ্রাফি ৪৫,৪৬
জ্ঞান কেন্দ্র ১২
জ্ঞান ভাণ্ডার ১২,১৪
জ্ঞানের বিন্যাস ১২৪,১২৬
জ্ঞানের শ্রেনী বিভাগ ৮৯,৯০,১৪৭-৪৮
জ্বালামুখী ১৪

জ্যোতি চিত্রণ ৫০

ট

টিপু সুলতান ৪১৭
টিরান্নিয়ন ১১
টীকা ১৬০
টেবিল ১৬৭,১৬৮
ট্রেডল ৪৯

ড

ডিউই দশমিক বর্গীকরণ ১০০,১১৪
ডিউই মেলভিল ১০০
ডেকল এজ ২২
ডেক্‌ল ২১
ডেমেট্রিয়স ১০
ড্রাই পয়েন্ট ৫৭

ত

তক্ষশীলা ১৪,৪১৩
তথ্যগ্রন্থ ৩৬৩
তথ্য জিজ্ঞাসা ৩৫৪,৩৫৫
তথ্য নির্ণয় ৩৫২
তথ্য নির্দেশ ৩৫২
তথ্য বিভাগ ২৮৪
তথ্য সরবরাহ ৩৬০
তথ্য সহায় ৩৫২
তথ্য সহায় প্রকল্প ২৪৭
তত্ত্বাবধায়ক ২৬৯
তাঞ্জোর ৪১৫
তাম্রতক্ষণ ৫৬,৫৭
তালপাতা ৮
তালিকা প্রণয়ন ১৫৭
তালিকা (প্রাচীন) ১৫
তিনকড়ি ঘোষ ৪২৬
তিব্বত ১০,১৪
তুন হুয়াং ১৭
তুলোট কাগজ ১৪,২০,২১
তেল রং ৫৬
তেল্লো ১০
ত্রিপত্রক প্রথা (সাময়িকী) ৩৩৯,৩৪২

থ

থাইসল কক্ষ ৩২৭,৩২৮
থিওডিসিয়াস ১১

দ

দপ্তর চিহ্ন ৪১
দাঁড়া মঞ্চ (পত্রিকা) ২৬৮
দারা শিকো ৪১৬
দার্ঢ্য (বাঁধাই) ৭৮
দিনাঙ্ক খতিয়ান ৩০৬
দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরী ৪২৩
দ্বিবিন্দু বর্গীকরণ ১৩০,১৪১
দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ২৯৩
দৃশ্য শ্রাব্য সামগ্রী ৩৯৩,৩৯৪
দেয়াল ফলক ২৭০
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ৪২৬
দৌমিনা থ্রাইস্টা ১৮

ধ

ধর্মগঞ্জ ১৪
ধ্বনি প্রধান (ভাষা) ৪

ন

নগর কোট ১৪
নথি ৩৯০,৩৯২
নথিকৃত্য ৩৬২
নথি নিবেশ ৩৪৭,৩৬১,৩৬২

নথিনিবেশ কেন্দ্র (Insdoc) ৩৪৬,৩৪৭,৩৪৮
নবদ্বীপ ৪১৪
নবদ্বীপে ন্যায়চর্চা ৯
নমনীয়তা [বাঁধাই] ৭৭
নর্দামব্রিয়া ১৩
নাগার্জুনকোণ্ডা ৪১৩
নাম খোদাই (বাঁধাই) ৮৩
নাম তালিকা ১৬৪
নালন্দা ৯,১৪,৪১২
নিউআর্ক প্রচলন প্রক্রিয়া ৩০৮,৩০৯
নিউআর্ক প্রচলন প্রক্রিয়া পত্রক ৩১০
নিনেভে ১০
নির্গম পরিসংখ্যান ৩১৪
নির্গম পত্রক ৩০৪
নির্গম পীঠিকা ২৬৯
নির্গম ব্যবস্থা ৩০৪
নির্ণয় কৃত্য ৩৫৫
নির্দ্দেশক পত্রক ১৭৮
নির্দ্দেশপঞ্জী ৩৭৮,৩৭৯
নির্ব্বাত প্রকোষ্ঠ ৩২৮
নিবন্ধ পত্রক (সাময়িকী) ৩৩৯,৩৪০
নিরূপন পত্রক (সাময়িকী) ৩৩৯,৩৪০,৩৪১
নিয়ন্ত্রণ পীঠিকা ২৬৯
নুইবন মনসুর ১২
নেশনেল দায়েৎ লাইব্রেরী, টোকিও ৪০৯

## প

পক্ষধর মিশ্র ৯
পঞ্চানন কর্মকার ১৮,৪১৮,৪১৯
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ৪২৪,৪২৬
পঞ্জিকা ৩৯০
পঞ্জিকা, বর্ষপঞ্জী (পত্রক) ১৯২
পাঠকক্ষ ২৬৬,২৬৭
পড়ার টেবিল ২৬৭
পত্র ৮
পত্রক ১৬২,২৬৯,২৭০
পত্রক বিন্যাস ১৯৫,৯৬
পত্রক সূচী ১৬৩
পত্রকাধার ১৬২,২৬৯,২৭০,৩০৭
পত্রিকা ১৯৩,২৬৮
পত্রিকা পরিসংখ্যান ৩১৫
পত্রিকা মঞ্চ ২৬
পথপঞ্জী ৩৮৭,৩৮৯
পরিগ্রহণ ২৮৪, ২৯৯-৩০১
পরিগ্রহণ পঞ্জী ৩০০
পরিগ্রহণ সংখ্যা ১৫৯ ১৬০
পরিগ্রহণ পরিসংখ্যান ৩১৩
পরিপূরক পর্ব (গ্রন্থন) ৮০
পরিশোধণ বিভাগ ২৮৪,৩১৯,৩২৩,৩৫৮
পরিসংখ্যান (বার্ষিক) ৩৭৭
পম্পেই ৯
পয়েন্ট ৩১,৩২
পাঠক ২৮৮,২৯০,৩৩৭
পাঠ্যাংশ (বই এর) ৭০
পাতা ৩৮
পার গেমাম ১১
পারসিক ৫
পারস্য ১২
পার্চমেন্ট ৭,১৫
পিং শাং ১১৭
পিকিং জাতীয় গ্রন্থাগার ৪০৮
পিসিস্ট্রেটস ১০
পীঠিকা ২৬৯
পুট ৮২,৮৩
পুটপেষণ (বাঁধাই) ৮১
পুথি ৯,১৩
পুথি (সংরক্ষণ) ৩৩০
পুলিয়ান ১১
পুস্তক (ব্যুৎপত্তি) ৮
পুস্তক (সংজ্ঞা) ৭১

পুস্তক, গ্রন্থ (পরিচয়) ২১২,২১৩
পুস্তক তথ্য ১৬০,১৬৭
পুস্তক নির্বাচন ২৮১,২৮৮,২৯৫
পুস্তক বর্গীকরণ ৯৩,১৫৫
পুস্তক বিভাগ ২৮৪,২৯৫,২৯৮,৩৫৮
পুস্তক ঋণ বিভাগ ২৬৭
পুস্তক সংরক্ষণ ৩২৩-৩৩১
পুস্তক সম্ভার গণন ৩২০-৩২২
পুস্তক সূচীকরণ ১৫৬-১৯৫
পুস্তকের শ্রেণীবিভাগ ৯০-৯২
পুস্তিকা ৩৪৮-৩৫১
পুস্তিকা (পরিচয়) ২১২ ২১৩
পুস্তিকা (সংজ্ঞা) ৭১
পৃষ্ঠা ৩৮
পেপিরস ৬,৭,১০,১৩,১৫
প্যারীচাঁদ মিত্র ৪২১
প্যালেস্টাইন ১২
প্রকারগত বিভাগ ৯৭,১০৪,১০৭
প্রকাশন ২৪৮
প্রকাশকের বাঁধাই ৮৬
প্রচল প্রকল্প ২৪৭
প্রচলন প্রক্রিয়া ৩০৪ ৩১৮
প্রচারণ ৩০১-৩০২
প্রতিচিত্রায়ণ ৫১
প্রতিরূপ প্রথা (পুস্তক ঋণ) ৩০৭
প্রতীক, প্রতীক চিহ্ন ৯৭,৯৮,১০৪
১২৪,১২৬,১৫৫
প্রদর্শফলক ২৬৭
প্রদর্শ মঞ্চ ২৬৮
প্রবন্ধসার ৩৪৫-৩৪৭
প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ১০৯ ১১২
প্রমথ চৌধুরী মুখবন্ধ : খ-ঘ
প্রযুক্তি তত্ত্ব ২৮০,২৮২
প্রযুক্তি বিভাগ ২৮৪
প্রসারশীল বর্গীকরণ ১১৮-১২১
প্রস্তাব পত্রক ২৯৬
প্রস্তুতি পর্ব্ব (বাঁধাই) ৭৮
প্রাচ্য বর্গীকরণ ১৪৭-১৫৪
প্রারম্ভিক পত্রগুচ্ছ ৬৮
প্রিস পেপিরস ৬
প্রুফ দেখা ৪৬-৪৭
প্লাই হোতেপ ৬
প্লুটার্ক ১১
প্লেনোগ্রাফিক পদ্ধতি ৫১

ফ

ফটো অফসেট ৪৫
ফটো গ্রেভিয়োর ৫৮,৬০
ফটো মেকানিকেল ৫১
ফটো লিথো অফসেট ৬২,৬৩
ফটো লিথোগ্রাফি ৬১
ফন্ট ৩৩
ফরমাল-ডি হাইড কক্ষ ৩২৭
ফর্মা ৩৮
ফা হিয়েন ১৪
ফুরড্রিনিয়ার ২৩
ফৈজী ৪১৬
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ১৮, ৪১৯
ফ্রান্স ১৩

ব

বই বাঁধাই ৭৭,৮৪
বই এর আঙ্গিক ২০
বই এর দুই রূপ ১৯,২০
বই এর বাজার ১৫,১৯
বই এর বিভিন্ন অংশ ৬৭-৭১
বই এর মাপ ৩৯,৪১
বই এর শত্রু ৩২৫,৩২৬
বক্তিয়ার খিলজী ১৪

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ৪২৬-৪২৭
বড়োদা ৪২০
বন্ধনী ১৭০
বর্ণাঙ্কন ৫০
বয়শিল্পী ৫
বরাহ মিহির ১৪
বর্গীকরণ ৯২,৯৪,৯৬,৯৮,২৮১
বর্গীকরণ (প্রাচীন) ১৫
বর্গীকরণ পদ্ধতি ৯৯
বর্জ্জন চিহ্ন ১৬৯
বতু্লীকরণ (বাঁধাই) ৮০
বর্ষপঞ্জী ৩৭৬,৩৭৭
বর্ষপঞ্জী, পঞ্জিকা (পত্রক) ১৯২
বলভী ৪১৩
বাঁধানো সাময়িকী ৩৪৪
বাংলাদেশ (গ্রন্থাগার) ৪১০
বাংলা হরফ ১৮
বাগদাদ ১২
বাছাই (বই) ২৯৪
বানিজ্য গ্রন্থাগার ২২৫
বাতিল (বই) ২৯৪
বার্ণ সম্মেলন ৭৩
বার্ষিকী ৩৭৬
বাসকারভিল, জন ২৫
বাসুদেব সার্ব্বভৌম ৯
বিক্রমশীলা ১৪
বিক্রেতা (পুস্তক) ২৯৬,২৯৭
বিজাপুর ১৪
বিদ্যাপুরী ১৪
বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ২১৭-২০, ২৫১, ৩৬১
বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক ২৫২
বিদ্যাসাগর ৪১৯
বিপিন পাল ৪২১
বিবলিওতেকা আমাপেটি ১১
বিবলিওতেকা নাসিওনেল ১৩, ৪০৬
বিশেষ গ্রন্থাগার ২২৩, ২৫৬, ২৭৮, ২৮৪, ৩৫৬, ৩৬১
বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ২২১-২২, ২৫৪, ২৭৩, ২৭৮, ২৮৫, ২৯১, ৩৫৬, ৩৬০, ৩৬১
বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার (প্রাচীন) ১৬
বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক ২৫৬
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ ২৮৩
বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার ১০৯
বিশ্লেষ পত্রক ১৭৩, ১৮৫
বিষয় পত্রক ১৭২, ১৭৭
বিষয় সূচী ৯৮, ১৫৮
বিষয় সূচীপত্রক (সাময়িক) ৩৪২
বিষয়ানুক্রমিক তালিকা ১৬৫
বিষয়ানুক্রমিক বর্গীকরণ ১২১-১২৪
বিষয়ানুবর্নিক তালিকা ১৬৫
বিষ্ণুপুর ৪১৬
বুক অফ দি ডেড ৪৯
বুদ্ধ ১৪
বৃত্তি কুশলী ২৮৪
বেতার গ্রন্থাগার ২২৪
বেনেডিক্ট বিস্‌কপ ১৭
বোথারো ১২
বোর্ডেন ৪২০
বোম্বাই ৪২০
ব্যয় বরাদ্দ ( গ্রন্থাগার ) ২৭৪
ব্যাবিলনীয় ৫, ১০
ব্রাউন, জেম্‌স্ ডাফ ১২১
ব্রাউন প্রচলন প্রক্রিয়া ৩০৯, ৩১২
ব্রাউন প্রচলন প্রক্রিয়া পত্রক ৩১১
ব্রাসেল্‌স্ ১১৪
ব্রাহ্মী ৮, ৯
ব্রিটিশ মিউজিয়াম ৬, ৪০৫-৪০৬
ব্লিস, হেনরি ইভলীন ১২৪

ভ

ভাব প্রধান ( ভাষা ) ৪
ভারত ১৩, ১৪, ১৮

ভারতীয় গ্রন্থাগার কাহিনী ৪১০-৪২৮
ভারতীয় নাম ১৮০-৮১
ভাস্করাচার্য ১৪
ভীমহ ১৪
ভীমজী পারেখ ১৮
ভূর্জপাতা ৮
ভূমিকা ৬৯
ভেলম ৭
ভৌগলিক নির্দেশিকা ৩৭৫,৩৭৬
ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার ৪০০

ম

মঞ্চকক্ষ ২৭১,২৭২,২৮২
মঞ্চ পত্রক ১৭১,১৭৪
মঞ্চ পদ্ধতি ৩০২ ৩০৪
মঞ্চ বিন্যাস ২৭১
মঞ্চ সংস্থান ২৬৫,২৬৭
মঞ্চ সজ্জা ৩২২,৩২৩
মনোটাইপ ৪২,৪৩
মম্মট ১৪
মলাট ৬৭,৮১,৮৩,৮৪,৮৭
মস্থল ১২
মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার ২২০-২১,২৫৩,৩৬১
মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক ২৫৪
মহীশূর ১৪
মহেঞ্জোদাড়ো ৮
মানচিত্র ৩৭৩,৩৭৫
মাদ্রাজ ১৮
মালাবার হরফ ১৮
মিথিলা ৪১৩
মিশরীয় ৬
মুক্ত মঞ্চ ৩০২,৩০৩
মুখবন্ধ ৬৯
মুনীন্দ্র দেব রায় ৪২৬,৪২৭
মুদ্রণ ২০,৭২
মুদ্রণ তথ্য ১৬০,১৬৭
মুদ্রণ যন্ত্র ৪৭
মুদ্রা ১৯,৩৩
মুদ্রাথলি ৩৩,৩৪
মুদ্রা বিন্যাস ৩৩ ৩৭
মুদ্রা বিন্যাস (যান্ত্রিক) ৪১
মুদ্রা বিন্যাস আধার ৩৪
মুদ্রিত পুস্তক সূচী ১৬১
মুদ্রিত পৃষ্ঠা (ভিন্ন) ৩৫,৩৬
মূক বধিরাদির গ্রন্থাগার ২২৯
মূল পত্রক ১৬০
মূল্যায়ণ (বই এর) ২৮৯,২৯২
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ১৯
মেইসেনবাখ. জর্জ ৫৩
মেজোটিন্ট ৫৬
মোলড ২৩
ম্যাকফারলেন ৪২২
ম্যাট্রিক্স ২৯,৩০

য

যথাযথতা (বাঁধাই) ৭৮
যুগ্ম লেখক পত্রক ১৭১.১৭৫

র

রঙীন ছবি ৬৫,৬৬
রঙ্গনাথন ২৬, ১১৫, ১৩০, ২৩১,২৫৫, ২৪৪,২৮২,২৮৬,২৮৯ ৩৩৯, ৩৬১,৩৬৩,৩৯৫,৪২৬
রত্নদপি ১৪
রত্নরঞ্জক ১৪
রত্নসাগর ১৪

রবীন্দ্রনাথ ২,২৪৪,২৮৯,৩৯৪,৩৯৭ ৪০১,৪২৬
রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার ২৪০-২৪৪
রসরূপ বই এর) ২০,৮৭
রসিদ প্রথা (পুস্তক ঋণ) ৩০৭
রসেটা শিলা ৬,৭
রামমোহন রায় ৪১৮
রামরাম বসু ১৯
রামেসাম, দ্বিতীয় ৬,১০
রিলিফ ৫০,৫১
রমি (কাগজ. হিসেব) ২৭
রুদ্ধমঞ্চ ৩০৩
রূপালি খুদে মাছ পোকা ৩২৫
রেখাচিত্র ৫২,৫৩
রোটারী ৪৯
রোম ৭,১১

ল

লঘুপস্তক ৩৮৭,৩৮৯
লর্ড কার্জন ৪২২
লাইনোটাইপ ৪৩,৪৪
লাইব্রেরী ৮,৯
লাইব্রেরী অফ কংগ্রেস ১০,৪০৬,৪০৭
" " " বর্গীকরণ ১৪১,১৪৫
লাতিন ৭
লিখিত ভাষা ৩,৯
লিথোগ্রাফি ৬০,৬১
লিবার, লিবর ৮
লিয়াকৎ জাতীয় গ্রন্থাগার, করাচী ৪০৯
লুকুল্লাস ১১
লুভর ৫,১৩
লেখক তালিকা ১৬৪
লেখক পত্রক ১৬৬
লেখক সংস্থান ১৬৮,১৬৯
লেখন সামগ্রী ৩,৯
লেড কাগজ ২৫
লেনিন স্টেট লাইব্রেরী ৪০৭
লোডিং (কাগজ) ২২
ল্যামিনেশন ৮৬

শ

শিক্ষায়তন গ্রন্থাগার ২১৭,২৯২
শিল্প গ্রন্থাগার ২২৫
শিরজ্বা ৮২
শিশু গ্রন্থাগার ২১৯,২০,২৫০
শিশু গ্রন্থাগারিক ২৫১
শুদ্ধিপত্র ৭০
শুয়ান সং (হিউয়েন সাং) ১৪
শ্রীঅরবিন্দ ৪২১
শ্রীরামপুর ১৮,১৯
শ্রেনী বিভাগ ৯৩

স

সংকেত পত্রক ১৯৬
সংক্ষিপ্তসার ৩৮৫,৩৮৭
সংক্ষিপ্তি চিহ্ন ১৭০
সংচাল্য হরফ ১৭
সংবাদ গ্রন্থাগার ২২৩
সংবাদ পত্র ৩৪৫
সংবাদ পত্র (সংরক্ষণ) ৩৩১
সংযুক্ত গ্রন্থসূচী ২৮৭
সংস্করণ ৭২
সঞ্চারন ২৭৮, ২৮২
সঞ্চারন বিভাগ ২৮৪, ৩৮৫
সতীশ চন্দ্র গুহ ১৪৭
সদস্যীকরণ ২৭৮
সমতল প্রক্রিয়া ৫১

সমাপ্তি পত্রগুচ্ছ ৭০
সম্মুখ চিত্র ৬৮
সর্ট ( হরফের ) ৩১
সরবন্ ১৩
সর্বশ্রেষ্ঠ বই ২৯১
সাইজিং ( কাগজ ) ২২
সাময়িকী ৩৩৩ ৩৪৮
সাময়িকী বিভাগ ২৬৬, ২৮৪, ৩৫৯
সারগ্রন্থ ৩৮৮ ৩৮৯
সার সংগ্রহ ৩৮৫-৩৮৭
সারদাপীঠ ১৪
সার হেনরী রলিনসন ৫
সার্বদশমিক বর্গীকরণ ১১৪-১১৮
সিসেরো ১১
সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় ১১২
সুমেরীয় ৫, ১০
সুল্লা ১১
সুশীল কুমার ঘোষ ৪২৬
সূচীকরণ ৯২, ১৬০, ২৮১
সূচীকরণ বিভাগ ৩৫৮
সূচীনিদান ১৬৬
সূচীগ্রন্থ ৩৮৩-৩৮৫
সূচীপত্র ৬৯, ১৫৭
সূচীপত্রক ১৫৯, ১৬০, ৩৫৭
সূচীপত্রকাধার ২৬৭, ২৬৯, ৩৫৭
সূচীরীতি ১৬৯
সেট ( হরফের ) ৩১
সেনেফেলডার, আলোয়া ৫৯
সেলাই ( বাঁধাই ) ৭৮-৮০
সেলুলোজ ২৩
সেণ্ট টমাস একুইনাস ১১
স্টিরিওটাইপ ৪৪
স্টেশনার ১৫
স্পেস ( হরফের ) ৩১, ৩৬-৩৭
স্মারক পুস্তিকা ৩৪৯-৩৫০
স্বতন্ত্র পত্রকসূচী ১৬২
স্থায়ীত্ব ( বাঁধাই ) ৭৮

হ

হরপ্পা ৮
হরফ ২৯-৩৩
হরফের আকার ৩১
হরফের মাপ ৩২
হরিনাথ দে ৪২২
হাফটোন ৫৩-৫৪
হাম্মুরাবি ৫
হায়ারোগ্লিফ ৬
হারুন-অল-রসিদ ১২
হালহেদ, নাথালিয়েল ব্রাসি ১৮
হাসপাতাল গ্রন্থাগার ২২৬
হিন্দু কলেজ ৪১৮
হীরক সূত্র ১৭
হুমায়ুন ৪১৬
হো-আং-তি ৯
হ্যাণ্ড প্রেস ৪৮


সমাপ্ত

INSTITUTE OF EDUCATION FOR WOMEN CALCUTTA-27

## FORTHCOMING PUBLICATION

| | |
|---|---|
| INTRODUCTION TO INDIAN ART | Dr. Bimal Dutta |
| LOGIC OF RELIGIOUS LANGUAGE AND OTHER ESSAYS | Dr. Santosh Sengupta |
| STUDIES IN ANCIENT GEOGRAPHY OF INDIA | Dr. Sudhakar Chattopadhyaya |
| GRANTHALAYA | Dr. Jimut Bahan Roy |

'icals ( Publishing House )
-gar, Midnapore.